
হুগলি জেলা
সাহিত্য ও সংস্কৃতি



হুগলি জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সম্পাদনা

জগবন্ধু কুণ্ডু

সহযোগী সম্পাদনা

অজয় মিশ্র

সাহিত্য-সেতু প্রকাশনী

বাঁশবেড়িয়া, হুগলি-৭১২৫০২

পরিবেশক

পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

HOOGHLY ZILA : SAHITYA-O-SANSKRITI
A collection of Literary & Cultural History of Hooghly

Edited By : Jagabandhu Kundu

Published By : SAHITYA-SETU PRAKASHANI
Bansberia, Hooghly-712502

PRICE : Rs. 180.00 $ 6

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ১৪০৯, (২০০৩)

গ্রন্থস্বত্ব
সাহিত্য-সেতু প্রকাশনী

বিন্যাস ও প্রচ্ছদ নামলিপি
অজয় মিত্র

প্রচ্ছদের ছবি
প্রভাস পাল

মোটিফ ও প্রচ্ছদ
দীপক দে

প্যানেল
কমল সাহা

অক্ষর বিন্যাস
ঋষিতা কমপিউটেক্, শেওড়াফুলি, হুগলি।

মুদ্রক
ডায়মন্ড আর্ট প্রেস
…৩/এ, বেন্টিংক স্ট্রীট, কলকাতা - ৬৯

প্রকাশক
সাহিত্য-সেতু প্রকাশনী
বাঁশবেড়িয়া, হুগলি - ৭১২৫০২
দূরভাষ ২৬৩৪-৬৩৮৪

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
…নিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯
দূরভাষ ২২৪১-৬১৮৯

দাম
একশত আশি টাকা

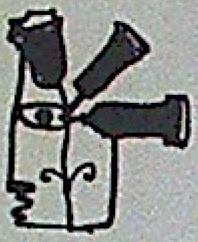
PAGE DONATED BY : The Ganges Manufacturing Company Ltd., Bansberia

উৎসর্গ

•••••••

অংশগ্রহণকারী যে সব প্রাবন্ধিক গ্রন্থটির প্রকাশ
দেখে যেতে পারেন নি —

ড. বসন্ত কুমার সামন্ত
অধ্যাপক শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
ড. প্রমোদ মুখোপাধ্যায়
এবং
সাহিত্য-সেতু পরিচালকমণ্ডলীর
সভাপতি
কানাই ঘোষ-এর
স্মৃতির উদ্দেশে



কৃতজ্ঞতা

যাঁরা মূল্যবান পরামর্শ, সাহায্য, ফোটোগ্রাফ, স্কেচ, মানচিত্র
দিয়ে আমাদের ঋণী করেছেন —

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (বিধায়ক, বাঁশবেড়িয়া)
অধ্যাপক শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (তেলিনীপাড়া)
দীপক দে (কলকাতা)
ড. দীপকরঞ্জন দাস (চুঁচুড়া)
সোমজিত দাশগুপ্ত (চুঁচুড়া)
তারাপদ সাঁতরা (নবাসন, হাওড়া)
প্রণব রায় (ডানকুনি)
ড. প্রভাতকুমার দাস (কলকাতা)
শৈলেন্দুনারায়ণ কুণ্ডু (বাঁশবেড়িয়া)
ড. বসন্তকুমার সামন্ত (হুগলি)
অজয় মজুমদার (চন্দননগর)
সত্যজিৎ চক্রবর্তী (ডানকুনি)
শম্ভুনাথ মিত্র (সোনাটিকরী)
ইনসটিটিউট দ্য চন্দননগর (চন্দননগর)

বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি
জয়কৃষ্ণ পাঠাগার (উত্তরপাড়া)
নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় (চন্দননগর)
কুশলকান্তি চট্টোপাধ্যায় (চন্দননগর)
পতিতপাবন ঘোষ
দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় (চুঁচুড়া)
ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (কলকাতা)
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা)
পল্লব মিত্র (কলকাতা)
সুধীর কুমার মিত্র (হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ)
প্রভাস পাল (মশাট)
অরুণ মুখোপাধ্যায় (চন্দননগর)
কেরী মিউজিয়াম (শ্রীরামপুর)
হুগলি জিলা পরিষদ

এ ছাড়া অন্যান্য লেখক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী।

নেপথ্যের কুশীলব

কানাই ঘোষ সুপ্রিয় দাশগুপ্ত শান্তা রায়চৌধুরী
অশোক গঙ্গোপাধ্যায় অমিত কুণ্ডু নব বন্দ্যোপাধ্যায়
বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় তপন দাশগুপ্ত প্রকাশ নন্দী
ধীরেন্দ্রনাথ মোদক পীযূষকান্তি সিন্‌হা সুবোধ গোস্বামী
নির্মল তেওয়ারি মিঠু মুখোপাধ্যায়।

বিষয়সূচি

চিত্রসূচি

ভূমিকা

মনে করুন একটি ছবি। আজ থেকে ২২৪ বছর পিছনে চলে যেতে হবে। একজন লিপিকর বসে বসে ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে ক্রমান্বয়ে হরফ গেঁথে তুলছেন, যা দিয়ে বঙ্গ-দেশে প্রথম ছাপা হবে একটি বই —'A Grammar of Bengal Language' সেই শিল্পীটির নাম পঞ্চানন কর্মকার। এবং তিনি আদতে 'সাহিত্য-সেতু' যেখান থেকে প্রকাশিত হয়, সেই বাঁশবেড়িয়ার বাসিন্দা। সেই জায়গাটিও বর্তমানে চিহ্নিত হয়েছে। বাংলা মুদ্রণ-ইতিহাসে এই যুগান্তকারী ঘটনাটির নেপথ্যে একজন স্থানীয় মানুষের ভূমিকায় আমরা অবশ্যই গর্বিত।

আমরা জেনে বিস্মিত হয়েছিলাম যে ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে বিবেকানন্দের সংগী ছিলেন আরও একজন বাঙালি। তিনি অবশ্য ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে বলতে গিয়েছিলেন, সেই দেবেন্দ্রনাথ অনুগামী কেশবচন্দ্রের শিষ্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও বাঁশবেড়িয়ার মানুষ। সাধে কি আর বিদ্বজনেরা হুগলি জেলার বিশেষণ দিয়েছেন 'মনীষার শ্রীক্ষেত্র'।

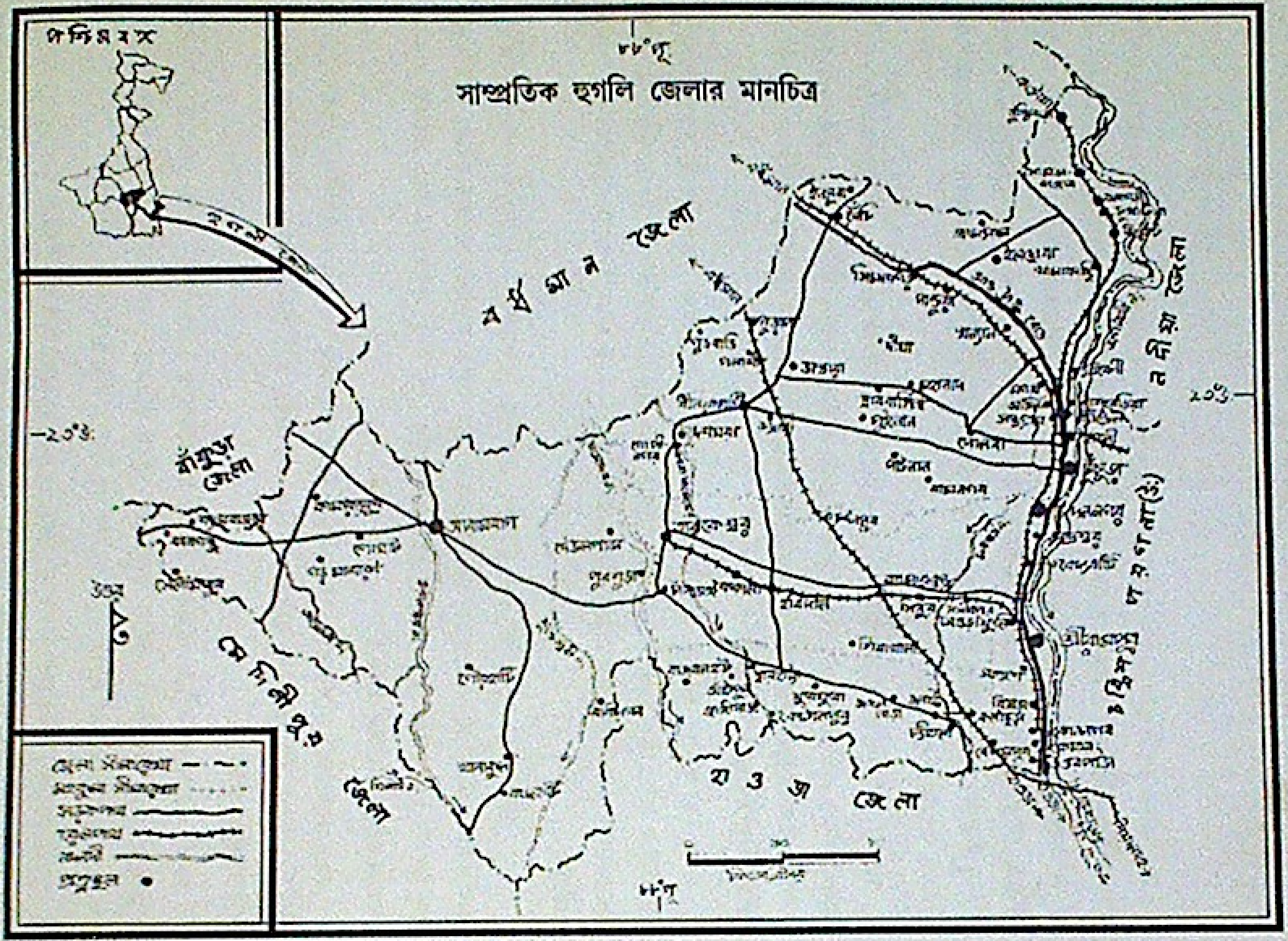
এখন তো ছাপার জগতে কত বৈপ্লবিক পরিবর্তন। প্রায় সব পত্র-পত্রিকাই প্রবেশ করেছে কম্পিউটার যুগে। কিন্তু হরফ গেঁথে গেঁথে ছাপার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল হুগলি জেলায় এবং তাতে বাঁশবেড়িয়ার হরফশিল্পী পঞ্চাননের সক্রিয় অংশগ্রহণ — এই ঘটনাটি যথেষ্ট উদ্দীপন যুগিয়েছিল আমাদের।

আর কোন্ জেলাতেই বা এত বিদেশি বণিকের আগমন? পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-দিনেমার-বেলজিয়ান-জার্মানি-ফরাসি-ইংরেজ এই জেলাতেই এসে বসতি করেছে। বাণিজ্য করতে এসে তাঁরা কিছু নিয়েছে। দিয়েছেও কিছু। তাঁদের সেই 'দেওয়া'র বেশ কিছু অবশেষ এখনও জেলার এখানে সেখানে ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে।

সমগ্র দেশের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার গুরুত্বের কথা ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করে নিয়েছেন। সেই আঞ্চলিক ইতিহাসের কিছু খণ্ড-বিখণ্ড ছবি রচনার প্রয়াস এই '**হুগলি জেলা : সাহিত্য ও সংস্কৃতি**' গ্রন্থটি।

অবশ্য এই সংকলনটিতে আমাদের বিশেষ মনোযোগ ও চর্চার বিষয় হয়েছে জেলার 'সাহিত্য-সংস্কৃতি'র পুঙ্খানুপুঙ্খ জগৎ। প্রাচীন সাংস্কৃতিক গৌরব-গরিমার কিয়দংশ ছবি এখানে মুদ্রিত হয়েছে অক্ষরমালার মাধ্যমে। এই সচিত্র গ্রন্থটি আকর-গ্রন্থ হিসাবে গণ্য হবে, আশা করা যায়।

গ্রন্থটি প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ১৯৯৫-এ। আশা ছিল প্রকাশিত হবে অচিরাৎ। আর্থিক ও অন্যান্য বহু বাধা বিঘ্নের জন্য প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব হ'ল। ফলত পুস্তক-তালিকা ও প্রবন্ধ-তালিকা সময়ানুগ করা গেল না। এজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।


সাম্প্রতিক হুগলি জেলার মানচিত্র
পশ্চিমবঙ্গ
বর্ধমান জেলা
বাঁকুড়া জেলা
মেদিনীপুর জেলা
হাওড়া জেলা
নদীয়া জেলা
আরামবাগ
শ্রীরামপুর
উত্তর

হুগলি : জন্মকথা

বসন্ত কুমার সামন্ত

"১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে নবাব মিরকাশিম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে চাকলা বর্ধমান, চাকলা মেদিনীপুর ও চাকলা ইসলামাবাদ (বর্তমান নাম চট্টগ্রাম) প্রদেশের সকল অধিকার ছাড়িয়া দিলে, এই স্থান ত্রয়ে সর্বপ্রথম ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।"[১] কোম্পানীর রাজত্বে এলাকা বাড়লে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলা ও বিহারকে মোট ৬টি জেলায় ভাগ করেছিলেন। পরে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশকে ১৪টি জেলায় ভাগ করা হয়েছিল। এই দুটি ভাগের ক্ষেত্রে বৃহদাকার বর্ধমান জেলা অন্যতম জেলা ছিল। অবশেষে শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে কোম্পানী সরকারের ১৭৯৫ -এর ৩৬নং বিধান (Regulation XXXVI of 1795) — মোতাবেক প্রধানত বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে হুগলি জেলা গঠিত হয়েছিল। সেই হুগলি জেলা অবশ্য আজকের পরিপ্রেক্ষিতে আয়তনে বড় ছিল।

তখন 'মহকুমা'র ধারণা ছিল না; জেলাকে কয়েকটি থানার সমষ্টি ভাবা হত। সেদিক থেকে বলা যায়, ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে যে হুগলি জেলা জন্ম নিয়েছিল তাতে ছিল মোট ১৩টি থানা — হুগলি, বাঁশবেড়িয়া, পাণ্ডুয়া, বেনীপুর, ধনিয়াখালি, হরিপাল, রাজবলহাট, জাহানাবাদ, দেওয়ানগঞ্জ, চন্দ্রকোনা, ঘাটাল, বাগনান ও আমতা। এদের মধ্যে পরে পাঁচটি থানার নাম বদলে হয়েছিল — বাঁশবেড়িয়ার স্থলে মগরা, বেনীপুরের বদলে বলাগড়, রাজবলহাট, জাহানাবাদ, ও দেওয়ানগঞ্জ -এর নূতন নাম যথাক্রমে জাঙ্গিপাড়া, আরামবাগ ও গোঘাট। প্রসঙ্গত একটি কথা গৌরবের সঙ্গে স্মরণীয়, পূর্বোক্ত ঘাটাল থানার মধ্যে ছিল বীরসিংহ গ্রাম — যেখানে জন্মসূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হুগলি জেলার অন্যতম বরেণ্য সন্তান।

এরপরে নবগঠিত জেলায় যুক্ত হয়েছিল ১৮১৪ সালে রাজাপুর * ও বৈদ্যবাটি থানা এবং ১৮১৯ -এ কোটরা* ও উলুবেড়িয়া থানা। ওলন্দাজ শহর চুঁচুড়া এক চুক্তিবলে ১৮২৫ সালে স্থায়ীভাবে ইংরেজদের হাতে আসার পর ১৮৩১-এ চুঁচুড়া থানা গড়ে উঠলে ক্রমবর্ধমান হুগলি জেলায় থানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৮টি। এবার এল বড় বিয়োগের পালা। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২৬৮ নং সরকারী নির্দেশানুসারে হুগলি জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে হাওড়া জেলা গড়ে উঠল — যার অংশীভূত হল বাগনান, আমতা, রাজাপুর, কোটরা ও উলুবেড়িয়া থানা। ১৮৪৫ সালে দিনেমার শহর শ্রীরামপুর ক্রয় সূত্রে ইংরেজদের হাতে এলে এটি হুগলি জেলার অংশ হয়েছিল। ফলে শ্রীরামপুরে একটি নূতন থানার পত্তন হল এবং এলাকা বদল হয়ে বৈদ্যবাটি থানার স্থলে এল সিঙ্গুর থানা।

এরপর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল থানা মেদিনীপুর জেলায় গিয়েছিল।

* রাজাপুর বর্তমানে জগৎবল্লভপুর ও কোটরা এখন শ্যামপুর।

(ফলে বিদ্যাসাগরের ৫২ বছর বয়সে তাঁর জন্মস্থান জেলান্তরিত হল।) ঐ একই তারিখে জাহানাবাদ ও গোঘাট থানা বর্ধমান জেলায় গেলেও হুগলি জেলায় আবার ফিরে এসেছিল ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪-এ জেলার সিংটে আউটপোস্ট অঞ্চল ৪২টি গ্রাম সহ শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে হাওড়া জেলায় গিয়েছিল। বিহারের গয়া জেলায় আর একটি জাহানাবাদ থাকার কারণে ১৯০০ সালের ২৫ এপ্রিল তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জাহানাবাদের নূতন পরিচিতি হল আরামবাগ। স্বাধীন ভারতে ১৯৫০-এর ২মে ফরাসী চন্দননগরের ভারতভুক্তি ঘটলেও সেটি আইনগত ভাবে পশ্চিমবঙ্গের তথা হুগলি জেলার অংশ হয়েছিল ১৯৫৪-এর ২ অক্টোবর তারিখে। জেলার এলাকার শেষ পরিবর্তন হয়েছে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-এ যখন বর্ধমান জেলার রায়না থানার শাহলালপুর এই জেলায় এসেছিল।

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মলাভের কারণে হুগলি জেলার বয়স এখন ২০১ বৎসর হলেও হুগলি শহর কিন্তু বেশ পুরাতন। বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে সে সময়ে যে নূতন জেলা গড়ে উঠেছিল, তাঁর কেন্দ্রে ছিল ইংরেজ-বন্দর হুগলি এবং তার নামেই নবগঠিত জেলার নাম দেওয়া হয়েছিল হুগলি। কাজেই হুগলি জনপদের কথাও আমাদের কিছুটা জানতে হবে।

দুঃসাহসী নাবিক ভাস্কো ডা গামা ভারতে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে ১৪৯৭-এর ৮ জুলাই যাত্রা করে অবশেষে দক্ষিণ ভারতে কালিকট বন্দরে এসেছিলেন ১৪৯৮-এর আগস্টে। ফলে ভারতে পোর্তুগীজ বাণিজ্য শুরু হয়েছিল। বঙ্গদেশে পোর্তুগীজ শক্তি এসেছিল ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে এবং ক্রমে তারা চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম বন্দরে বাণিজ্য ঘাঁটি তৈরি করেছিল। চট্টগ্রাম ছিল তাদের 'Porto Grande' (বড় বন্দর) ও সপ্তগ্রাম ছিল 'Porto Pequeno' (ছোট বন্দর)। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে সরস্বতী নদীতে পলি জমার কারণে এর নাব্যতা নষ্ট হয়েছিল এবং ভাগীরথী দিয়েই পুরা জলপ্রবাহ বয়ে যেতে শুরু করেছিল। ফলে সরস্বতী তীরস্থ সপ্তগ্রাম ছেড়ে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগীজেরা ভাগীরথীতীরস্থ হুগলি জনপদকে বন্দর হিসাবে গড়ে তুলেছিল। হুগলি হয়েছিল তাদের নূতন 'Porto Pequeno'। এ-ব্যাপারে পোর্তুগীজ ক্যাপ্টেন পেড্রো ট্যাভারেসকে সম্রাট আকবরের দেওয়া ১৫৭৯-৮০ সালের ফরমান পরে খুবই কাজে এসেছিল।

একটা প্রশ্ন এসে যায় — ভাগীরথী-তীরের এই জনপদের 'হুগলি' নাম কিভাবে, কখন থেকে হয়েছিল। পোর্তুগীজ ঐতিহাসিকগণ বলেন, ঐ জনপদের পাশের নদীতে প্রচুর 'হোগলা' গাছ (elephant grass) জন্মাত, সেই 'হোগলা' থেকে ক্রমে 'হুগলি' নামটি এসেছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের পুরাতন নথিপত্রে, হেজের ডায়েরি (Hedgis Diary) প্রভৃতিতে নূতন বন্দরকে পোর্তুগীজেরা ওগোলি, ওগলি, হিউগলি, গোলিন, গোলি ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছে দেখা যায়।

তবে লক্ষণীয়, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে (১৫৯৬ খ্রি:) ও আবদুল হামিদ লাহোরীর লেখা (১৬৩২ খ্রি:) ইত্যাদিতে স্পষ্টভাবে 'হুগলি' নামই ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ একই সময়ে বা এর কিছু পরে লিখিত ফারিয়া সৌজার গ্রন্থে গোলিন, হিউগেস ও পার্কারের চিঠিতে 'গোল্লিন' এবং বার্নিয়ের-এর লেখায় 'ওগোলি' দেখা যাচ্ছে। বিদেশীদের রচনায় উচ্চারণ বিকৃতি থাকলেও মুসলমান লেখকগণ সঠিক উচ্চারণেই জনপদের নাম লিখেছেন। সেদিক থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় 'হুগলি' নামটি বিদেশীদের দেওয়া নয়। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ-বিষয়ে মন্তব্য করেছেন --- "Hooghly was even before the settlement of the Portuguese, a place of some importance ... Bipradas who writes before the arrival of the Portuguese in India mentions it by the proper name Hughly."[৪] হিসাব করে দেখা

গেছে বিপ্রদাসের মনসার ভাসান সম্পর্কিত পুঁথি ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত। কাজেই হুগলি একটি প্রাচীন জনপদ এবং তার নামকরণের মধ্যে পোর্তুগীজদের কোন ভূমিকা ছিল না। তবে হুগলির গুরুত্ব এই বিদেশী শক্তির ব্যবসায়-প্রসঙ্গে বেড়েছিল।

সে সময়ে হুগলি বন্দরে ম্যানিলা, মালাক্কা, চীন প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান থেকে বাণিজ্যপোত আসত। এমন একটি নদীবন্দরের আকর্ষণে অনেকে নানা মতলবে এসেছিলেন এবং এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে মোগল, পারসিক, আর্মেনীয়, পোর্তুগীজ প্রভৃতি বহিরাগত মানুষেরা স্থান করে নিয়েছিলেন। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী জনগণের সংখ্যা ক্রমে বাড়ছিল। অবশেষে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে হুগলির বালি অঞ্চলে নির্মিত হয়েছিল কনভেন্ট ও গীর্জা।

আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে কোন অসুবিধা না থাকলেও সম্রাট শাহজাহান নানা কারণে পোর্তুগীজদের উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। ১৬৩২ সালে তাঁর নির্দেশে বঙ্গের তৎকালীন শাসক কাশিম খাঁ হুগলি অভিযান করেছিলেন। সেই যুদ্ধের ফলে পোর্তুগীজ শক্তি পরাজিত হল এবং হুগলিস্থ তাদের কনভেন্ট, গীর্জা, ঘরবাড়ি সবই ধ্বংস হয়েছিল। বহু পোর্তুগীজকে বন্দী করে আগ্রায় সম্রাটের দরবারে পাঠানো হলে সেখানে কোন ঘটনার জেরে শাস্তির বদলে শেষ পর্যন্ত মিলেছিল ব্যান্ডেল অঞ্চলে ৭৭৭ বিঘা জমি। এর পরে বঙ্গে পোর্তুগীজ শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারলেও ব্যান্ডেলে প্রাপ্ত জমিতে গোমেস ডি সোটোর চেষ্টায় ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে কনভেন্ট ও গীর্জা পুনর্নির্মিত হয়েছিল।

১৬৩২ সালের যুদ্ধের পর হুগলি রাজকীয় বন্দর বলে ঘোষিত হল। ক্রমে ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপীয় শক্তি হুগলিতে বা ভাগীরথী তীরস্থ নিকটবর্তী কোন কোন অঞ্চলে বাণিজ্যকুঠী স্থাপন করেছিল; যেমন ওলন্দাজেরা প্রথমে হুগলিতে, পরে চুঁচুড়ায়, ইংরেজরা হুগলিতে, ফরাসীরা চন্দননগরে, দিনেমারগণ প্রথমে গোঁদলপাড়ায়, পরে শ্রীরামপুরে, ফ্লেমিশরা বাঁকিবাজারে* ও প্রুশিয়ানরা চন্দননগরের এক মাইল দক্ষিণে এক স্থানে। তা ছাড়া রিষড়ায় গ্রীক ও কোন্নগরে আর্মেনীয় ব্যবসায়ীদের উপস্থিতির কথা জানা গিয়েছে। লক্ষ্ণীয়, বাঁকিবাজার ছাড়া অন্য বিদেশী বাণিজ্য স্থানগুলি পরবর্তীকালে হুগলি জেলার অন্তর্গত হয়েছিল। পাশের ভাগীরথী নদীকে বিদেশী বণিকেরা চিহ্নিত করেছিল হুগলি নদী নামে। বঙ্গদেশে ইংরেজদের ঘাঁটির সংখ্যা বাড়লেও "Streynsham Mastars, who was sent out from England to reorganise the Bengal settlements, reached Hooghly on 13th September 1676, ... He decided and very properly that Hooghly should be the chief factory in Bengal." (২) তাঁর এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই হুগলির গুরুত্ব স্বীকৃত এবং ১৭৯৫ সালে যখন নূতন জেলা গড়ে উঠল হুগলি হল তার কেন্দ্রীয় শহর।

সে সময়ে জেলার সংজ্ঞা ছিল এক জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের শাসনাধীন এলাকা। এই জেলায় প্রথম জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সি. এ. ব্রুস। তবে শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে নূতন একটি জেলা গঠিত হলেও অনেক দিন পর্যন্ত হুগলি জেলা বর্ধমান জেলার কালেক্টরের নিয়ন্ত্রণে ছিল। পরে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে হুগলি জেলার নিজস্ব কালেক্টরেট হয়েছিল। জেলার প্রথম কালেক্টর ছিলেন উইলিয়াম বেলী। ১৮২৯ সালে জেলা জজের পৃথক অফিস হয়েছিল এবং প্রথম জজ হয়েছিলেন ডি. সি. স্মিথ। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি বর্ধমান বিভাগের কমিশনার পদ তৈরী হয়েছিল এবং বিভাগীয় কমিশনারের অফিস বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি ও চুঁচুড়ায় বিভিন্ন সময়ে অবস্থিত

* বাঁকিবাজার ভদ্রেশ্বরের অপর পারে, বর্তমান পাতুলিয়ায়। ফ্লেমিশ ও প্রুশিয়ানদের কুঠী সম্পর্কে ওমালি সাহেব উক্ত মত পোষণ করলেও হান্টারের মতে প্রুশিয়ানরা বাঁকিবাজারে ও ফ্লেমিশরা চন্দননগরের দক্ষিণে কুঠী স্থাপন করেছিল।

হলেও শেষ পর্যন্ত ১৮৯৬-এর নভেম্বর থেকে চুঁচুড়াতেই আছে। ওলন্দাজ গভর্নরের প্রাসাদটিই এখন কমিশনারের বাসস্থান।

মহকুমার ধারণা আসার পর প্রথমে হুগলি জেলায় ছিল দু'টি মহকুমা — হুগলি সদর ও শ্রীরামপুর*। হুগলি সদর মহকুমায় ছিল হুগলি, বাঁশবেড়িয়া, বলাগড়, পাণ্ডুয়া ও ধনিয়াখালি পাঁচটি থানা। আর শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটি, হরিপাল, কৃষ্ণনগর ও চণ্ডীতলা থানাগুলি ছিল শ্রীরামপুর মহকুমায়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে জাহানাবাদ, গোঘাট ও খানাকুল থানা নিয়ে জেলার তৃতীয় মহকুমা জাহানাবাদ গঠিত হয়েছিল। জেলার চতুর্থ মহকুমা তৈরি হয়েছিল ১৯৫৪ সালের শেষদিকে চন্দননগর থানা ও শ্রীরামপুর মহকুমার ভদ্রেশ্বর, সিঙ্গুর, হরিপাল ও তারকেশ্বর থানা নিয়ে। (খানাকুল পূর্বে বড় হুগলি জেলার 'মাহেশরাখা' মহকুমায় ছিল।)

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে জেলার রাস্তাঘাট নির্মাণ, স্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষাদান, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি জনহিতকর কাজ করার জন্য হুগলি জেলা বোর্ড গঠিত হয়েছিল। জেলা বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন জি. টয়েনবি, যাঁর লেখা A Sketch of the Administration of the Hooghly District from 1795 to 1845' জেলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক মূল্যবান দলিল।

শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রাযন্ত্রের একটি বড় ভূমিকা আছে। এ দেশে বাংলা-অক্ষর সমন্বিত প্রথম ছাপাখানা 'অ্যানড্রুস প্রেস' হুগলি শহরে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হলে চার্লস উইলকিন্‌সের তত্ত্বাবধানে ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহেড লিখিত প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ 'A grammar of the Bengal Language' মুদ্রিত হয়েছিল।

মুদ্রাযন্ত্রকে অবলম্বন করে সাংবাদিকতার যে প্রসার ঘটেছিল তাতে হুগলি জেলার বিশেষ গৌরবের স্থান বর্তমান। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের সাহায্যে শ্রীরামপুর থেকে প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র 'দিগ্‌দর্শন' (এপ্রিল, ১৮১৮ খ্রি:), প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ (২৩শে মে, ১৮১৮) ও ইংরেজী সংবাদপত্র 'Friend of India' (৩০ এপ্রিল, ১৮১৮) প্রকাশিত হয়েছিল। একই সময়ে হুগলি জেলার বড়াগ্রাম-নিবাসী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে একটি সংবাদপত্রের আবির্ভাবের কথা জানা যায়।

সে যুগে কথকতা, কবিগান, তরজা, যাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে বিনোদন তথা লোকশিক্ষার যে ধারা বর্তমান ছিল তার সঙ্গে থিয়েটার যুক্ত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও হুগলি জেলা পিছিয়ে ছিল না। তখনকার সংবাদপত্র থেকে জানা যাচ্ছে "২৯শে মে ১৮৫৮ সালে জনাইয়ের জমিদার বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও ব্যয়ে তাঁহার নিজ বাটীতে 'শকুন্তলা' নাটক অভিনীত হয়। ১৮৫৭ সালে কলকাতায় নতুন থিয়েটারগুলি দেখা দিবার পর বৎসরই তিনি জনাই গ্রামে তাঁর নিজ বাটীতে একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন।"[৬]

সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে জেলার অবদান ব্যাপক। প্রবন্ধের পরিসরের কথা ভেবে এ বিষয়ে লেখকদের নাম উল্লেখ না করলেও বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'চিত্তবিলাসিনী'-র (১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ) লেখিকা হিসাবে বলাগড় এলাকার সুখাড়িয়া গ্রামের গৃহবধূ কৃষ্ণকামিনী দাসীর** কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি।

---

*W.W. Hunter জেলায় ৪টি মহকুমার কথা বললেও বাকী দুটি মহকুমা মাহেশরাখা (শ্যামপুর, বাগনান, উলুবেড়িয়া, আমতা ও খানাকুল থানা) এবং হাওড়া (হাওড়া ডোমজুড় ও জগৎবল্লভপুর থানা) হাওড়া জেলার অঙ্গীভূত (খানাকুল ছাড়া) হওয়ায় এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে।

**লেখিকার গ্রন্থটি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে কবিতা ও সমাজতত্ত্ব উভয় বিভাগেই স্থান করে নিয়েছিল। অসাধারণ এই গ্রন্থ ও তার উপর দীর্ঘ আলোচনা যুক্ত করে বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের 'বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ' 'সাহিত্যলোক' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিপাদ্য বিষয়ের ঘনীভূত রূপ হিসাবে উপসংহারে অরবিন্দের একটি উক্তি — (যেটি সুধীর কুমার মিত্র- সম্পাদিত 'চন্দননগর' পাক্ষিক পত্রিকার শিরোভূষণ রূপে মুদ্রিত হয়েছিল) সেটি উদ্ধৃত করা হল : 'সমগ্র ভারতের হৃদয় ভূমি বঙ্গদেশ — বাংলার হৃদয়স্পন্দন ধ্বনিত হয় হুগলী জেলায়।'

[প্রবন্ধের অংশ হিসাবে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের হুগলি জেলার চেহারা মোটামুটি বোঝার জন্য প্রবন্ধকারের অপটু হাতে আঁকা একটি ম্যাপ সংযুক্ত হল। (চিত্র নং - ২)]

উল্লেখপঞ্জী

(১) সুধীর কুমার মিত্র — হুগলী জেলার ইতিহাস (প্রথম সংস্করণ, ৩০ শ্রাবণ ১৩৫৫), পৃ. ১০১

(২ Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, December 1892. মাসিক বসুমতী মাঘ ১৩৪০, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'হুগলী জেলার ইতিহাস' প্রবন্ধ, পৃ. ৬১০-এ উদ্ধৃত।

(৩) Shambhu Chund· De – Hooghly Past and Present (1906). P. 163

(৪) সুধীর কুমার মিত্র — হুগলী জেলার ইতিহাস (প্রথম সংস্করণ, ৩০ শ্রাবণ ১৩৫৫), পৃ. ৭১৮

হুগলি : বিদেশীর চোখে

নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য

এ কথা বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না যে হুগলি জেলার নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকাই অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী কাল থেকে বিশ শতকের মধ্যবর্তী কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস নির্ধারিত করেছিল। এই দুশো বছর ছিল ভারত ইতিহাসে ব্রিটিশ আধিপত্যের যুগ, যে আধিপত্যের সূচনায় পূর্বোক্ত নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক থেকেই বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ব্যান্ডেলে পোর্তুগীজ, হুগলিতে ইংরাজ, চুঁচুড়ায় ডাচ বা ওলন্দাজ, চন্দননগরে ফরাসি, ভদ্রেশ্বরে জার্মান, শ্রীরামপুরে দিনেমার বা ডেন এবং রিষড়ায় গ্রীকরা বাণিজ্যকুঠি গড়ে তোলে। এদের মধ্যে কারো কারো লক্ষ্য ছিল নিছক বাণিজ্য, আবার কোন কোন দেশের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য ছাড়াও স্থানীয় রাজনৈতিক বিষয়ে নাক গলানো পছন্দ করত। ইংরাজ, ফরাসি ও ডাচদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনীও ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় ইংরাজরাই সাফল্য লাভ করে। অবশ্য ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা তাদের ছিল না, থাকা সম্ভবপরও ছিল না, তথাপি ঘটনাচক্রে অসম্ভবও সম্ভব হল। পরস্পর বিবদমান ভারতীয় শক্তিগুলি নিজেরাই ইংরাজদের নিজেদের মাথায় বসিয়ে দিল । সেই জাতিগত অপদার্থতা ও নির্বুদ্ধিতার কাহিনী বলার স্থান এটা নয়।

হুগলি জেলা সম্পর্কে মোটামুটি তিন ধরণের বৈদেশিক বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমটি সেই ধরণের রচনা যেখানে তৎকালীন বিদেশী অনুসন্ধিৎসুদের চোখে এই জেলার ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। ঐতিহাসিকদের কাছে এই জাতীয় রচনা খুবই মূল্যবান হলেও এগুলির সেইরকম সাহিত্যগত মূল্য নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাসমূহ মূলত তাঁদের লেখা যাঁরা বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের এখানে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এঁরা মূলত নিজেদের কোম্পানীর এই জেলায় বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নিয়ে লিখেছেন, এবং নিজেদের কাজকর্ম চালাতে গিয়ে কি ধরণের সুবিধা-অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন সে কথা বলেছেন। বলা বাহুল্য এই রচনাগুলিরও ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর এবং তদুপরি এগুলির অধিকাংশই ইংরাজী ছাড়া অপরাপর ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত। এই সকল রচনার অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে বর্তমান, এখানকার মহাফেজখানাসমূহে হয়ত কিছু কিছু পাওয়া যেতে পারে, তবে হুগলি জেলায় কোন বিশেষ বিদেশী কোম্পানীর কাজকর্মের উপর গবেষণা করার মত আগ্রহ এদেশে বা বিদেশে কোথাও দেখা যায় নি। তৃতীয় ধরণের রচনা হচ্ছে সেই সব বিদেশীদের যাঁরা হুগলি জেলার নানাস্থানে এসেছিলেন বা বাস করেছিলেন। এই সকল রচনায় এই জেলা সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায় যেগুলি একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক অপরদিকে তেমনই সাহিত্যগুণসম্পন্ন। বর্তমান রচনায় আমরা মূলত এই তৃতীয় ধরণের বিবরণসমূহের উপরই বেশি নির্ভর করব, যদিও প্রথম দুটি শ্রেণীকে একেবারে অবজ্ঞা করব না।

হুগলি জেলার নাম উল্লেখ করতে গিয়েও বিদেশীরা নানা কথা বলেছেন। পোর্তুগীজরা হুগলিকে বলত পোর্তো পেকিনো। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে রচিত জাও দে বারোজের মানচিত্রে হুগলি নামক কোন স্থানের উল্লেখ নেই। কিন্তু ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে রালফ ফিচ সুস্পষ্টভাবেই হুগলিকে পোর্তুগীজ অঞ্চল বলে উল্লেখ করেছেন। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত পোর্তুগীজ লেখক ফারিয়া সোউজার গ্রন্থে 'গোলিন' নামটি হুগলিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে রচিত হিউগেস ও পার্কারের পত্রাবলীতে হুগলিকে 'গোল্লিন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে মানওয়েল 'গোলিম' নামটি ব্যবহার করেছেন। ১৬১৬ এবং ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগীজ লেখক বোকাররো হুগলিকে যথাক্রমে 'ওগোলিম' ও 'উগোলিম' নামে অভিহিত করেন। পক্ষান্তরে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজ লেখক মাথুজ ফান দেন ব্রুক এই অঞ্চলটিকে 'ওয়েগলি' এবং 'হোয়েগলি' নামে আখ্যাত করেছেন। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ের হুগলিকে 'ওগৌলি' বলে উল্লেখ করেছেন। 'হুগলি' নামটি বাজারচালু হয়ে যাওয়ার পর এই নামটি লেখার ক্ষেত্রে হেজ, হ্যামিলটন, আইভ্স, স্টাভোরিনাস, ফ্রান্সিস, সীটন কার, জেমস লঙ প্রভৃতি যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন।

১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে দ্য' আনভিলে চুঁচুড়ার ডাচ, চন্দননগরে ফরাসি, শ্রীরামপুরে ডেনীর ও বাঁকিবাজারে (ভদ্রেশ্বর-বৈদ্যবাটি ও তার গঙ্গার অপর তীরবর্তী এলাকায়) জার্মান অস্টেন্ড কোম্পানীর অধিকারের কথা লিখেছেন। আলেকজান্ডার হ্যামিলটন লিখেছেন যে অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার মিলিত উদ্যোগে গঠিত অস্টেন্ড কোম্পানী সৎ ও ভদ্র ব্যবসা করত, কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ ইংরাজ ফরাসী ও ডাচ কোম্পানীর ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে হুগলির ফৌজদার তাদের এখান থেকে উৎখাত করে। এই ঘটনাটা ঘটেছিল ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে। অস্টেন্ড কোম্পানীর কর্মচারীদের পরিবারবর্গ ফরাসী চন্দননগরে আশ্রয় পেয়েছিল। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে হেজেস তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন যে তিনি চুঁচুড়ায় বাস করে কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের মারফৎ যোগযোগ রাখতেন। সে-আমলেও অনেক বিদেশী হুগলি শহরের সঙ্গে চুঁচুড়াকে গুলিয়ে ফেলতেন। তাই ডাচ লেখক ভ্যালেন্টাইন লিখেছেন "আমাদের কুঠি যেখানে অবস্থিত সেই শহরের নাম সিন্সুর্ (চুঁচুড়া), হুগলী নয়।" ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্বোক্ত হ্যামিলটন লিখেছেন : 'চিন্সুরা শহরে ডাচ কুঠি অবস্থিত। কুঠিয়ালগণ নদী তীরবর্তী অঞ্চলে সুন্দর সুন্দর বাড়িতে বাস করেন। প্রতিটি বাড়ির সঙ্গেই বাগান আছে।'

চাঁপদানী ও ভদ্রেশ্বরের মধ্যে অবস্থিত গরুটি নামক স্থানে ফরাসিদের একটি পকেট ছিল। রেনেলের মানচিত্র ও জোসেফের সার্ভে মানচিত্রে স্থানটিকে ফ্রেঞ্চ গার্ডেন বলে উল্লেখ করা হয়। এখানে দুপ্লের একটি বাগানবাড়ি ছিল যেখানে ফরাসিদের শত্রু মিত্র সকল ইউরোপীয় আনন্দ করতে আসতেন, এমন কি লর্ড ক্লাইভ কয়েকবার এসেছিলেন। রেভারেন্ড ড্যানিয়েল কুরি এই বাগানবাড়িটিকে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় ধরণের ভবন বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক মার্শম্যান এই ভবনটির জীর্ণদশা দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম হেজেস লিখেছেন যে জলপথে কাশিমবাজার যাওয়া আসার সময় তিনি ত্রিবেণীতে অবতরণ করতেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রবার্ট হেজেস লিখেছেন যে ফারুখশিয়ারের রাজসভায় যে সকল ইংরাজ দূত হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের তিনি ত্রিবেণীতে অভ্যর্থনা করেন। বিশপ হেবার শ্রীরামপুর সম্পর্কে লিখেছেন যে এই শহরটি কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি ইউরোপীয়। অবশ্য বিদেশী লেখকদের ক্ষেত্র ছিল সমগ্র হুগলি জেলা নয়, শুধুমাত্র নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল। তাঁদের পর্যবেক্ষণও খুব অন্তরঙ্গ নয়, আরও পাঁচটা বিষয়ের সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত।

চুঁচুড়া শহর সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায় তৎকালীন বিখ্যাত ফরাসি পর্যটক



হুগলি : বিদেশীর চোখে

নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য

এ কথা বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না যে হুগলি জেলার নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকাই অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী কাল থেকে বিশ শতকের মধ্যবর্তী কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস নির্ধারিত করেছিল। এই দুশো বছর ছিল ভারত ইতিহাসে ব্রিটিশ আধিপত্যের যুগ, যে আধিপত্যের সূচনায় পূর্বোক্ত নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক থেকেই বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ব্যান্ডেলে পোর্তুগীজ, হুগলিতে ইংরাজ, চুঁচুড়ায় ডাচ বা ওলন্দাজ, চন্দননগরে ফরাসি, ভদ্রেশ্বরে জার্মান, শ্রীরামপুরে দিনেমার বা ডেন এবং রিষড়ায় গ্রীকরা বাণিজ্যকুঠি গড়ে তোলে। এদের মধ্যে কারো কারো লক্ষ্য ছিল নিছক বাণিজ্য, আবার কোন কোন দেশের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য ছাড়াও স্থানীয় রাজনৈতিক বিষয়ে নাক গলানো পছন্দ করত। ইংরাজ, ফরাসি ও ডাচদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনীও ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় ইংরাজরাই সাফল্য লাভ করে। অবশ্য ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা তাদের ছিল না, থাকা সম্ভবপরও ছিল না, তথাপি ঘটনাচক্রে অসম্ভবও সম্ভব হল। পরস্পর বিবদমান ভারতীয় শক্তিগুলি নিজেরাই ইংরাজদের নিজেদের মাথায় বসিয়ে দিল । সেই জাতিগত অপদার্থতা ও নির্বুদ্ধিতার কাহিনী বলার স্থান এটা নয়।

হুগলি জেলা সম্পর্কে মোটামুটি তিন ধরণের বৈদেশিক বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমটি সেই ধরণের রচনা যেখানে তৎকালীন বিদেশী অনুসন্ধিৎসুদের চোখে এই জেলার ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। ঐতিহাসিকদের কাছে এই জাতীয় রচনা খুবই মূল্যবান হলেও এগুলির সেইরকম সাহিত্যগত মূল্য নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাসমূহ মূলত তাঁদের লেখা যাঁরা বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের এখানে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এঁরা মূলত নিজেদের কোম্পানীর এই জেলায় বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নিয়ে লিখেছেন, এবং নিজেদের কাজকর্ম চালাতে গিয়ে কি ধরণের সুবিধা-অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন সে কথা বলেছেন। বলা বাহুল্য এই রচনাগুলিরও ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর এবং তদুপরি এগুলির অধিকাংশই ইংরাজী ছাড়া অপরাপর ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত। এই সকল রচনার অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে বর্তমান, এখানকার মহাফেজখানাসমূহে হয়ত কিছু কিছু পাওয়া যেতে পারে, তবে হুগলি জেলায় কোন বিশেষ বিদেশী কোম্পানীর কাজকর্মের উপর গবেষণা করার মত আগ্রহ এদেশে বা বিদেশে কোথাও দেখা যায় নি। তৃতীয় ধরণের রচনা হচ্ছে সেই সব বিদেশীদের যাঁরা হুগলি জেলার নানাস্থানে এসেছিলেন বা বাস করেছিলেন। এই সকল রচনায় এই জেলা সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায় যেগুলি একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক অপরদিকে তেমনই সাহিত্যগুণসম্পন্ন। বর্তমান রচনায় আমরা মূলত এই তৃতীয় ধরণের বিবরণসমূহের উপরই বেশি নির্ভর করব, যদিও প্রথম দুটি শ্রেণীকে একেবারে অবজ্ঞা করব না।

হুগলি জেলার নাম উল্লেখ করতে গিয়েও বিদেশীরা নানা কথা বলেছেন। পোর্তুগীজরা হুগলিকে বলত পোর্তো পেকিনো। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে রচিত জাও দে বারোজের মানচিত্রে হুগলি নামক কোন স্থানের উল্লেখ নেই। কিন্তু ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে রালফ ফিচ সুস্পষ্টভাবেই হুগলিকে পোর্তুগীজ অঞ্চল বলে উল্লেখ করেছেন। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত পোর্তুগীজ লেখক ফারিয়া সোউজার গ্রন্থে 'গোলিন' নামটি হুগলিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে রচিত হিউগেস ও পার্কারের পত্রাবলীতে হুগলিকে 'গোল্লিন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে মানওয়েল 'গোলিম' নামটি ব্যবহার করেছেন। ১৬১৬ এবং ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগীজ লেখক বোকার্‌রো হুগলিকে যথাক্রমে 'ওগোলিম' ও 'উগোলিম' নামে অভিহিত করেন। পক্ষান্তরে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজ লেখক মাথুজ ফান দেন ব্রুক এই অঞ্চলটিকে 'ওয়েগলি' এবং 'হোয়েগলি' নামে আখ্যাত করেছেন। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ের হুগলিকে 'ওগৌলি' বলে উল্লেখ করেছেন। 'হুগলি' নামটি বাজারচালু হয়ে যাওয়ার পর এই নামটি লেখার ক্ষেত্রে হেজ, হ্যামিলটন, আইভ্‌স, স্টাভোরিনাস, ফ্রান্সিস, সীটন কার, জেমস লঙ প্রভৃতি যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন।

১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে দ্য' আনভিলে চুঁচুড়ায় ডাচ, চন্দননগরে ফরাসি, শ্রীরামপুরে ডেনীয় ও বাঁকিবাজারে (ভদ্রেশ্বর-বৈদ্যবাটি ও তার গঙ্গার অপর তীরবর্তী এলাকায়) জার্মান অস্টেন্ড কোম্পানীর অধিকারের কথা লিখেছেন। আলেকজান্ডার হ্যামিলটন লিখেছেন যে অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার মিলিত উদ্যোগে গঠিত অস্টেন্ড কোম্পানী সৎ ও ভদ্র ব্যবসা করত, কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ ইংরাজ ফরাসী ও ডাচ কোম্পানীর ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে হুগলির ফৌজদার তাদের এখান থেকে উৎখাত করে। এই ঘটনাটা ঘটেছিল ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে। অস্টেন্ড কোম্পানীর কর্মচারীদের পরিবারবর্গ ফরাসী চন্দননগরে আশ্রয় পেয়েছিল। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে হেজেস তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন যে তিনি চুঁচুড়ায় বাস করে কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের মারফৎ যোগাযোগ রাখতেন। সে-আমলেও অনেক বিদেশী হুগলি শহরের সঙ্গে চুঁচুড়াকে গুলিয়ে ফেলতেন। তাই ডাচ লেখক ভ্যালেন্টাইন লিখেছেন "আমাদের কুঠি যেখানে অবস্থিত সেই শহরের নাম সিঙ্কের্নু (চুঁচুড়া), হুগলী নয়।" ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্বোক্ত হ্যামিলটন লিখেছেন : 'চিঙ্কুরা শহরে ডাচ কুঠি অবস্থিত। কুঠিয়ালগণ নদী তীরবর্তী অঞ্চলে সুন্দর সুন্দর বাড়িতে বাস করেন। প্রতিটি বাড়ির সঙ্গেই বাগান আছে।'

চাঁপদানী ও ভদ্রেশ্বরের মধ্যে অবস্থিত গরুটি নামক স্থানে ফরাসিদের একটি পকেট ছিল। রেনেলের মানচিত্র ও জোসেফের সার্ভে মানচিত্রে স্থানটিকে ফ্রেঞ্চ গার্ডেন বলে উল্লেখ করা হয়। এখানে দুপ্লের একটি বাগানবাড়ি ছিল যেখানে ফরাসিদের শত্রু মিত্র সকল ইউরোপীয় আনন্দ করতে আসতেন, এমন কি লর্ড ক্লাইভ কয়েকবার এসেছিলেন। রেভারেন্ড ড্যানিয়েল কুরি এই বাগানবাড়িটিকে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় ধরণের ভবন বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক মার্শমান এই ভবনটির জীর্ণদশা দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম হেজেস লিখেছেন যে জলপথে কাশিমবাজার যাওয়া আসার সময় তিনি ত্রিবেণীতে অবতরণ করতেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রবার্ট হেজেস লিখেছেন যে ফারুখশিয়ারের রাজসভায় যে সকল ইংরাজ দূত হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের তিনি ত্রিবেণীতে অভ্যর্থনা করেন। বিশপ হেবার শ্রীরামপুর সম্পর্কে লিখেছেন যে এই শহরটি কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি ইউরোপীয়। অবশ্য বিদেশী লেখকদের ক্ষেত্র ছিল সমগ্র হুগলি জেলা নয়, শুধুমাত্র নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল। তাঁদের পর্যবেক্ষণও খুব অন্তরঙ্গ নয়, আরও পাঁচটা বিষয়ের সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত।

চুঁচুড়া শহর সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায় তৎকালীন বিখ্যাত ফরাসি পর্যটক

তাভের্নিয়ের-এর রচনায়। তিনি চুঁচুড়ার ডাচ গভর্নরের অতিথি হন যিনি তাঁকে নৌকাবিহার সমেত যাবতীয় রাজকীয় আতিথ্য প্রদর্শন করেন। তিনি এখানকার ডাচ বাসিন্দাদের উদ্যানপ্রিয়তা ও নানা ধরণের সব্জী চাষের কথা উল্লেখ করেন, যে কথা ১৭২৭ সালে আলেকজান্ডার হ্যামিলটনও বলেছিলেন। কোঁৎ দে মোদাভে নামক জনৈক ফরাসি পর্যটক ১৭৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি লিখেছেন, "চন্দননগরের উত্তরে আধ লীগ দূরে, চুঁচুড়ায় হল্যান্ডবাসীদের (ডাচ) কুঠি। এটি একটি পুরাতন বসতি। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নেই। হল্যান্ডবাসীদের বাণিজ্যের কথা আমরা অন্যত্র বলব। চুঁচুড়া পুরাতন দুর্গ। সাবেককালে ইউরোপীয়রা ভারতে যে ধরণের ঘাঁটি তৈরি করত এটাও সেইরকম। চারটি প্রাকার দিয়ে সমকৌণিকভাবে ঘেরা ঘাঁটি। কোন পরিখা দ্বারা বেষ্টিত নয়। ছিদ্র এবং গবাক্ষই শত্রুদের গতিবিধি নিরূপণের পক্ষে পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয়। ডাচ নাগরিকরা বাণিজ্যকুঠির আশেপাশে উদ্যানযুক্ত গৃহে বাস করে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই নয়নমনোহর। হল্যান্ডবাসীরা ভারতবর্ষে উদ্যান রচনার পথিকৃৎ হিসাবে গণ্য।"

কোঁৎ দে মোদাভে চুঁচুড়ার ডাচদের ব্যবসাবাণিজ্যের কথা বলেছেন। তারা সব রকম পণ্য নিয়েই কারবার করত, তবে রঞ্জক কাঠ, সোরা এবং আফিম ছিল প্রধান। পাটনা থেকে তারা আফিম সংগ্রহ করত এবং গোটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চালান দিত। পলাশীর যুদ্ধের পর বঙ্গদেশ কার্যত ইংরাজদের অধিকারে এসে যাওয়ার পর ডাচদের আফিমের ব্যবসা মার খেতে শুরু করে। ডাচেরা আগে আফিমের ব্যবসায়ে যে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত ইংরাজরা তা খর্ব করে দেয়। কোঁৎ লিখেছেন, তিনি এমন গুজব শুনেছেন যে বাটাভিয়ার ডাচ কর্তৃপক্ষ গোটা বঙ্গদেশ থেকেই তাঁদের কারবার অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবেন। অবশ্য তিনি এই গুজবে বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু ডাচ জাহাজগুলির আনাগোনা যে কমে গেছে তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকি (ইনি সাংবাদিক জেমস অগাস্টাস হিকি নন) ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চুঁচুড়ায় আসেন। প্রথমে তিনি ফিটনে চেপে আসেন বারাকপুর। সেখান থেকে আসেন পলতায় তাঁর বন্ধু জন প্রিন্সেপের কাছে। সেখানে দু'দিন থেকে তিনি নদীপথে চন্দননগরে আসেন এবং সেখানকার গভর্নরের বাড়িতে ওঠেন। তখন ফরাসি গভর্নর ছুটিতে ছিলেন এবং তাঁর কাজ চালাচ্ছিলেন মঁসিয়ে শেভিলার্ড নামক একজন ফরাসি অভিজাত ব্যক্তি। চন্দননগর থেকে হিকি আসেন ডাচ উপনিবেশ চুঁচুড়ায়। চুঁচুড়ার তৎকালীন ডাচ গভর্নর মঁসিয়ে রোজ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে হল্যান্ডে জন্ম হলেও তাঁর পিতা ছিলেন স্কটল্যান্ডবাসী। তিনি নবাবের মতই রাজকীয় ভাবে বসবাস করতেন। তাঁর বাড়িতেই কাউন্সিলের সভা বসত এবং সভাশেষে কাউন্সিলের সদস্যগণ মাথা হেঁট করে হাত তুলে সেলাম করতে করতে ক্রমশ নীচু হয়ে নিষ্ক্রান্ত হতেন। অর্থাৎ গভর্নর সাহেবকে দেহের পিছন দিকটা দেখানো নিষিদ্ধ ছিল। হিকি লিখেছেন, "আমরা যেদিন প্রথম তাঁর কুঠিতে হাজির হলাম তখন দেখি যে হল ঘরে প্রকান্ড এক টেবিল পাতা হয়েছে, অর্থাৎ ভোজসভার পূর্বপ্রস্তুতি চলছে। ভোজ শুরু হওয়ার মুহূর্তে পিছনের দরজা দিয়ে গভর্নর রোজ হাজির হলেন। সামরিক কায়দায় ব্যান্ড বেজে উঠল এবং ভোজসভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা চলতেই লাগল। সন্ধ্যার সময় আমরা দুর্গ ও বিভিন্ন প্রাসাদ ঘুরে ঘুরে দেখলাম। তিনদিন পরম আনন্দে চুঁচুড়ায় কাটিয়ে আমরা পলতায় ফিরে গেলাম।"

চুঁচুড়া শহরটি হিকির খুবই ভাল লেগেছিল। পরে তিনি এখানেই বাড়ি করেন। তিনি লিখেছেন "গঙ্গার তীর থেকে চুঁচুড়া শহরের শোভা দেখে জমাদারনী (তাঁর রক্ষিতা) আনন্দে চোখ উজ্জ্বল করে বলল কী সুন্দর! আমি এখানেই থাকব। আর কোথাও যাব না।........ জায়গাটা স্বাস্থ্যের দিক থেকে আমাদের পক্ষে বেশ ভালই। গার্ডেনরীচের বাড়ির জন্য যে সব

আসবাবপত্র কেনা হয়েছিল সেগুলি চুঁচুড়ায় পাঠিয়ে দিলাম। .... কলকাতার চেয়ে চুঁচুড়ায় আমার শরীর ভাল থাকত। প্রত্যহ সকালে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতাম। সাধারণত শুক্রবার রাতে চুঁচুড়া যেতাম না হলে শনিবার ভোরে রওনা হয়ে প্রাতরাশের সময় পৌঁছাতাম। এবং সোমবার সকালে কলকাতায় ফিরে আসতাম। ..... মাঝে মাঝে ডাচ সাহেবদের ভোজে নিমন্ত্রণ করতাম। শ্যাম্পেন, বার্গান্ডি প্রভৃতি পানীয়ের জন্য প্রচুর খরচ হত।..... পলতার ফেরিঘাটে নৌকায় পার হতাম। সেখান থেকে আমার নিজের ফিটনে চুঁচুড়া যেতাম। কলকাতা থেকে চুঁচুড়া যেতে প্রায় চার ঘন্টা সময় লাগত। .... ক্রমশ চুঁচুড়া শহরকে এত ভাল্ লেগে গেল যে সেখানে বসবাস করব স্থির করলাম। ..... নদীর তীর থেকে শ'খানেক গজ দূরে ডাচ গভর্নরের বাড়ির পার্কের পাশে জমি কিনলাম। আর্কিটেক্ট আমাকে তিন রকমের তিনটি নকশা দিলেন। তার মধ্যে একটি আমার কলকাতার বাড়ির অনুরূপ...... সেইটাই আমি গ্রহণ করলাম। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি বাড়ির ভিত শুরু হল। ১৫ জুন থেকে সেখানে থাকতে শুরু করলাম। বাড়িটি ছোট কিন্তু তিনতলা। বাড়িটি এত সুন্দর হয়েছিল যে চুঁচুড়ার লোকেরা খুব প্রশংসা করেছিল। আমি নিজেও চমৎকৃত হয়েছিলাম। জমাদারনী দারুণ খুশি হয়েছিল। এই বাড়িটি তৈরি করতে এবং সাজাতে আমার চল্লিশ হাজার টাকার মত ব্যয় হয়েছিল।"

১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীমতী এলিজা ফে চুঁচুড়ায় এসেছিলেন। এক বান্ধবীকে তিনি যে চিঠিপত্র লিখেছিলেন তা থেকে জানা যায় যে ওই বছরেই হঠাৎ ইংরাজরা একবার চুঁচুড়া দখল করে নেয়। কলকাতায় হঠাৎ একটা গুজব রটে যায় যে ডাচেরা ইংরাজদের আক্রমণ করেছে। এই খবর পেয়ে কোম্পানীর একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন নিজ উদ্যোগে লোকলস্কর নিয়ে চুঁচুড়া আসেন এবং রাত দুটোর সময় গভর্নরকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অপ্রস্তুত গভর্নর তাঁর হুকুম মেনে নিতে বাধ্য হন। পরে ব্যাপারটা মিটে যায়। ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও একজাতীয় 'বেরাদরি' তাদের মধ্যে বর্তমান ছিল। বিভিন্ন সামাজিক ব্যাপারে তারা পরস্পর মিলিত হত। আমোদপ্রমোদের ক্ষেত্রেও ভেদাভেদ ছিল না। এমনকি, শ্রীমতী ফে-র পত্র থেকে জানা যায় যে ডাচ অধিকৃত চুঁচুড়ায় কিছুকালের জন্য কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্যার রবার্ট চেম্বার্স প্রধান বিচারপতি হয়ে কাজ করেছিলেন। চুঁচুড়া শহর সম্পর্কে শ্রীমতী ফে লিখেছেন যে " শহরের ঘরবাড়িগুলি খুবই সুন্দর ও সাজানো। শহরবাসীরা হয়ত খুব আনন্দে দিন কাটায় না। কিন্তু শাসকেরা তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে। জনসাধারণের সম্পত্তি রক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে ডাচ শাসকেরা খুবই সজাগ ছিল।"

ভিকতর জাকর্মঁ ছিলেন ফরাসি প্রকৃতি-বিজ্ঞানী যিনি ১৮২৯-এ কলকাতায় আসেন। তিনি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আনুকূল্য লাভ করেন। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। ভারতবর্ষের উদ্ভিদবিদ্যা ও ভূমিবিদ্যাসহ নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সংগৃহীত তথ্যাবলী ও মন্তব্য সম্বলিত রোজনামচা ছয় খন্ডে প্রকাশিত হয় ১৮৩৪-৪১ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর মূল রোজনামচার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয় দুই খন্ডে ১৯৩৩-৩৪ সালে। জাকর্মঁর রোজনামচায় চন্দননগর ও শ্রীরামপুর সংক্রান্ত কিছু তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জাকর্মঁ চন্দননগরে এসেছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ও লেডি বেন্টিঙ্ক সহ একটি ছোটখাট বাহিনী সহ। তাঁদের আগমনের খবর পেয়ে চন্দননগরের ফরাসি গভর্নর মঁসিয়ে কর্দিয়ে খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তিনি জাকর্মঁকে দুঃখ করে বললেন যে বেন্টিঙ্ককে সম্মান জানানোর মত কামানও তাঁর নেই। জনা তিরিশ সৈন্য একটু চকচকে পোষাক পরে সারবন্দী দাঁড়িয়ে বিশিষ্ট অতিথিদের মান রাখল। গভর্নরের কুঠিও সাদামাটা, বসার ঘরেও বিশেষ আসবাবপত্র নেই, ফলে

আলোচনাটা সরল জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তা নিয়েই হল। লেডি বেন্টিঙ্ক কলকাতার হৈ-হট্টগোলের নিন্দা করলেন, বারাকপুরের জলহাওয়াকে শাপমণ্যি করলেন। এবং চন্দননগরের অপার শান্তির প্রশংসা করলেন। চন্দননগর সম্পর্কে জাকমঁর ধারণা অবশ্য মোটেই ভাল নয়। গঙ্গার তীরবর্তী রাস্তা আর দু'একটা সরকারী বাড়ি ছাড়া তাঁর কাছে সমগ্র চন্দননগর একটি অরণ্যবেষ্টিত গ্রাম মাত্র, যেখানে শুধুই গরীব ভারতীয়ের বাস। তিনি চন্দননগরে গাড়ি ঘোড়ার কোন চিহ্ন দেখেন নি। এমন কি পাল্কী পর্যন্ত অনুপস্থিত। তেমন কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিচয়ও তিনি পান নি। এখানে তাঁর মতে শাসক ও শাসিত উভয়ই তাদের কষ্টকর অস্তিত্ব যেন কোনক্রমে টিকিয়ে রেখেছে।

ফেরার পথে লর্ড বেন্টিঙ্ক শ্রীরামপুরের ডেনীয় গভর্নর মঁসিয় হোহলেমবার্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার মনস্থ করলেন। এখানেও চন্দননগরের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটল। এত বড় অতিথির সম্মানরক্ষা বেশ কঠিন ব্যাপার। চন্দননগরের মত শ্রীরামপুরের ডেনীয় গভর্নরের প্রাসাদ সাদামাটা। শ্রীরামপুর চন্দননগরের চেয়ে ছোট হলেও এখানে শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য আছে, লোকেরাও কাজকর্ম করে। জাকমঁ লিখেছেন যে শ্রীরামপুর জার্মানি, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে আসা অ্যানাব্যাপটিস্টদের বড় ঘাঁটি, খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য তোলা চাঁদার টাকায় এখানে তাঁরা একটি অতি চমৎকার কলেজ গড়েছেন। তাঁরা একটি সুন্দর ছাপাখানা করেছেন যেখান থেকে সুসমাচারের অনুবাদ চলে যায় এশিয়ার নানা দেশে। একটি পৃথক অধ্যায়ে জাকমঁ উইলিয়ম কেরি ও শ্রীরামপুরের মিশনারি কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তবে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের প্রতি জাকমঁ বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। কলকাতার বেশির ভাগ দেউলিয়া দেনদাররা জেল এড়াতে শ্রীরামপুরে পালায়। ডেনীয়দের ভৌম অধিকার চন্দননগরের ফরাসিদের তুলনায় অনেক কম হলেও জাকমঁর মতে, তাদের ব্যবস্থা অনেক বেশি গোছালো। গভর্নরের বাড়ির আঙিনায় বন্দুক কাঁধে সান্ত্রীরা বিরাজমান এবং ভাল ব্যান্ড পার্টিও আছে যা দিয়ে বেন্টিঙ্কদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। শ্রীরামপুরে ইউরোপীয় ধরণের বেশ কয়েকটি বাড়ি জাকমঁ লক্ষ্য করেছিলেন। শ্রীরামপুর কলেজ ভবনটি পার হয়ে গেলে গঙ্গার দুদিকে বেশ কিছুটা অরণ্যময় অঞ্চল দেখা যায়। কয়েকটি মন্দিরও দৃশ্যমান হয়। জাকমঁ মাহেশ ও সেখানকার বিখ্যাত রথযাত্রার উল্লেখ করেছেন। এই রথের চাকার তলায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে কেউ কেউ পুণ্যলাভের প্রয়াস পেত। এই রকম একজন পুণ্যার্থীকে একজন সাহেব চাবুক মেরেছিল। রথের চাকার তলায় প্রাণ দিতে যে লোক পিছপা নয়, সে লোক কিন্তু সাহেবের চাবুক দেখে পালাতে দ্বিধাবোধ করে না। এই কাহিনী উল্লেখ করে জাকমঁ ভারতীয় চরিত্রের পরস্পরবিরোধিতার প্রসঙ্গ তুলেছেন।

বিদেশী পর্যটকেরা কেউই হুগলি জেলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেননি, যদিও বিভিন্ন কোম্পানীর কর্মচারীরা পণ্য ক্রয়ের জন্য সর্বত্রগামী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কাজ বিবরণ রচনার উপযোগী ছিল না। পর্যটকেরা মূলত ইউরোপীয় বসতিসমূহই পরিদর্শন করেছেন এবং সেই সকল স্থানেই যাতায়াত করেছেন জলপথে যা সহজেই যাওয়া যায়, কলকাতা থেকে বড় জোর ত্রিবেণী পর্যন্ত এলাকা। তাঁদের বর্ণনায় মোটামুটি এতদঞ্চলের ইউরোপীয় বাসিন্দাদের সমাজজীবন ধরা পড়েছে, এবং যে সকল স্থানীয় চরিত্রের পরিচয় এই সকল রচনায় পাওয়া যায় তারা মূলত খিদমৎগার শ্রেণীর লোক। ভিকতর জাকমঁ চন্দননগরের অবক্ষয়ী অবস্থা দেখেছিলেন। তার কারণ ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে দুপ্লে চলে যাওয়ার পর চন্দননগরের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ নামে। বারবার চন্দননগরের হাত বদল হয়। ১৮১৬ সাল থেকে পাকাপাকিভাবে এখানে ফরাসি অধিকার স্বীকৃত হয় এবং পন্ডিচেরী থেকে শাসক প্রেরিত হয়। জাকমঁ শ্রীরামপুরে যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখেছিলেন সেটাও আসলে খুব আশাব্যঞ্জক ছিল না। কেননা ১৮৪৫ সালেই ডেনীয়রা একলক্ষ কুড়ি হাজার

পাউন্ডের বিনিময়ে শ্রীরামপুর শহরটি ইংরাজদের নিকট বিক্রয় করে দেয়। ভাকর্ম এদেশে আসা মাত্র কয়েক বছর আগেই (১৮২৫) যে চুঁচুড়া ইংরাজদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছিল সে কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করে গেছেন।

🕮 গ্রন্থপঞ্জী

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য — 'হুগলি জেলার পুরাকীর্তি', কলিকাতা ১৯৯৩, এবং তৎসহ ১৯৮৮ থেকে শারদীয় 'পরিস্থিতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হুগলি জেলা সংক্রান্ত নিবন্ধাবলী; সুধীর কুমার মিত্র — 'হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ', তিন খণ্ড, কলিকাতা ১৯২৩; উইলিয়ম হিকির 'স্মৃতিকথা' চারখণ্ডে রচিত, সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য বিনয় ঘোষ বিরচিত 'সুতানুটি সমাচার', কলিকাতা ১৯৬৩ দ্রষ্টব্য। ভিকতর জাকর্মর রোজনামচার জন্য দ্রষ্টব্য 'প্রতিক্ষণ', সংকৃতি সংখ্যা ১৩৯৪-তে প্রকাশিত অবন্তীকুমার সান্যালের অনুবাদ। ইংরাজী গ্রন্থসমূহের মধ্যে দ্রষ্টব্য : জে. কাম্পোস — হিস্ট্রি অব দ্য পোর্তুগীজ ইন বেঙ্গল, কলিকাতা ১৯১৯; শম্ভু চন্দ্র দে — হুগলি পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট, কলিকাতা ১৯০৬; এস. পি. সেন — দ্য ফ্রেঞ্চ ইন ইন্ডিয়া, কলিকাতা ১৯৫৮; জি. টয়েনবি — এ স্কেচ অব দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেসন অব দ্য হুগলি ডিস্ট্রিক্ট, কলিকাতা ১৮৮৮; ওমপ্রকাশ — দ্য ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ইন বেঙ্গল, ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোস্যাল হিস্ট্রি রিভিয়ু, নবম খণ্ড, ১৯৭২; এইচ ইউল — দ্য ডায়েরি অব উইলিয়ম হেজেস, তিন খণ্ড, লন্ডন ১৮৮৭-৮৯।

হুগলি : শিক্ষাভাবনা

ঋতুরাজ সেনাপতি

হুগলি জেলার শিক্ষাভাবনার কথা সংক্ষেপে লেখার আগে এই জেলা সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু তথ্য আমাদের জানা দরকার। এদেশে ইংরেজ কোম্পানী সরকারের রাজত্ব পত্তনের প্রথম যুগে তাদের দখলীকৃত এলাকাকে শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে জেলায় ভাগ করা হচ্ছিল, তখন এক পর্যায়ে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রধানত বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে হুগলি জেলার উদ্ভব হল। নূতন জেলার নামকরণ হয়েছিল তার কেন্দ্র জনপদ হুগলির নামে। বড় মাপের সেই জেলার অঙ্গচ্ছেদ করে আরও ৪৮ বৎসর পরে হাওড়া জেলা গড়ে উঠেছিল। এই ঘটনার আগে ও পরে আরও কিছু ভূভাগ যোগ ও বিয়োগ করে অবশেষে হুগলি জেলা বর্তমান আকার পেয়েছে।

একথা মনে রাখা দরকার যে অতীতে এদেশে শিক্ষাধারা বহমান ছিল পাঠশালা, টোল-চতুষ্পাঠী ও মক্তব-মাদ্রাসা মারফৎ। লোকশিক্ষার জন্য ছিল কথকতা, কবিগান, পাঁচালি, তর্জা, যাত্রা প্রভৃতি নানা লোকরঞ্জক মাধ্যম। কোম্পানী সরকার যখন তাঁদের রাজত্ব শুরু করেছিল তখন শিক্ষা বিস্তারকে কোন সরকারী দায়িত্বের মধ্যে রাখা হয় নি। বরং অর্থনৈতিক শোষণের জেরে গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা নষ্ট হল, — ফলে গ্রাম্য শিক্ষায়তন পাঠশালা ও মক্তবগুলির অবনতি ঘটল। তবে দীর্ঘকালের ঐতিহ্যপায়ী সংস্কৃত চর্চার এবং ফারসী ও উর্দুর পঠন পাঠনের বিশেষ কেন্দ্রগুলি তাদের শিক্ষাধারার অনেকটাই বজায় রাখতে পেরেছিল। হুগলি জেলার ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়া, গুপ্তিপাড়া, খানাকুল-কৃষ্ণনগর, ইলছোবা-মন্ডলাই প্রভৃতি অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার এবং ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, জাঙ্গিপাড়ার ফুরফুরা, পোলবা থানার কাশশেওড়া, সীতাপুর, ধনিয়াখালি প্রভৃতি স্থানে ফারসী ও উর্দুভাষা চর্চার ব্যবস্থা দীর্ঘকাল বজায় ছিল। পাঠশালা ও মক্তবগুলির মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় যে দেশীয় শিক্ষাধারা বহমান ছিল তা খুব কম লোকেরই কাজে লাগত। দরিদ্র জনগণ, সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষেরা ও ব্যাপকতম ভাবে স্ত্রীলোকরা প্রায়ই শিক্ষার কোন সুযোগ পেতেন না। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকার ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সংশোধিত সনদে তাদের শাসিত এলাকায় শিক্ষায় উৎসাহদান-কল্পে উদ্বৃত্ত রাজস্ব থেকে বাৎসরিক মাত্র এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল। এই সামান্য টাকার কোন অংশও হুগলি জেলায় ব্যয়িত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

তবে কোম্পানী সরকার না ভাবলেও কয়েকজন মিশনারি সাহেব ও ভারতবন্ধু ইংরেজ সীমাবদ্ধ এলাকায় শিক্ষাদান-কর্ম শুরু করেছিলেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে অনেকের শিক্ষার সুযোগ এনে দিয়েছিলেন লন্ডন মিশনারি সোসাইটির যাজক রবার্ট মে। ইনি ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে চুঁচুড়া শহরে নিজের আস্তানায় একটি অবৈতনিক বালক বিদ্যালয় স্থাপন করে চার বৎসরের মধ্যে উক্ত বিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তন হিসাবে রেখে আরও ৩৬টি বিদ্যালয় চালু করেছিলেন। তাদের অনেকগুলির অবস্থান ছিল হুগলি জেলায়। ১৮১৮ সালের শুরুতে মে সাহেব চুঁচুড়ায় যে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, উইলিয়াম অ্যাডামের মতে সেটি বঙ্গের সম্ভবত ভারতের প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়। শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট

মিশন সোসাইটির কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের উদ্যোগে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ২১টি বালক বিদ্যালয় এবং বিশেষ করে মার্শম্যান-পত্নী হানা মার্শম্যানের সাহায্যে ১৮২৪ -এর মধ্যে চালু হয়েছিল ১৩টি বালিকা বিদ্যালয়।

উইলিয়াম অ্যাডাম দীর্ঘ অনুসন্ধান করে ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ এর মধ্যে তিনটি পর্যায়ে তখনকার প্রচলিত দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারকে মূল্যবান 'রিপোর্ট' দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে জনশিক্ষার ক্ষেত্রে কোম্পানী সরকারের আর্থিক দায়িত্ব ও প্রাথমিক কর্তব্যের কথা জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে — যাদের জন্য তিনি আবেদন রাখছেন, তাদের অস্থি-মজ্জা ও ঘর্মাক্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে রাজস্ব খাতে সরকারের যে অর্থাগম হয়, অন্য সব খাত ব্যর্থ হলেও সেই সাধারণ রাজস্বের উপর দেশের দরিদ্র ও অজ্ঞ মানুষের প্রাথমিক অধিকার বর্তমান। দু'কোটি পাউন্ড রাজস্ব খাতে আয়ের মধ্যে প্রায় দশ কোটি অধিবাসীর শিক্ষার জন্য মাত্র দশ হাজার পাউন্ড কি বরাবরের বরাদ্দ থাকবে? তা ছাড়া, তিনি দেশীয় শিক্ষায়তনগুলির উন্নতি সাধনের ও মাতৃভাষার সাহায্যে জনশিক্ষা চালু রাখার কথা বলেছিলেন। কোম্পানী সরকার জনশিক্ষার প্রসার চায়নি তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার স্বার্থে। তাই তদানীন্তন বড়লাট লর্ড অকল্যান্ড দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত পাঠ্য বই নেই — প্রধানত এই কারণ দেখিয়ে অ্যাডামের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নি।

এদিকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠশালা ও মক্তবের দিকে তেমনভাবে দৃষ্টি না দিলেও সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী সরকার ইংরজি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য আগ্রহী হয়েছিল। তার মূল কারণ ছিল এদেশে শাসন কার্য ঠিক মতো চালানোর জন্য দরকার ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ভদ্রলোক। শাসক শক্তি চেয়েছিল 'দেশী সাহেব' তৈরি করতে, যারা সুবিধাভোগী বশংবদ শ্রেণী হিসাবে তাদের রাজত্বকে স্থায়ী করার ক্ষেত্রে স্তম্ভের কাজ করবে। তাদের সে উদ্দেশ্য অংশত সিদ্ধ হয়েছিল। তবে ভারতের চিন্তানায়কগণের অনেকেই চেষ্টা করলেন যাতে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা শুরু করা যায় এবং দেশকে আধুনিক যুগের আলোয় আনা সম্ভব হয়।

অবশ্য কোম্পানী সরকার জনসাধারণের কাছে জনকল্যাণ মূর্তি স্পষ্ট করার লক্ষ্যে দেশীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সামান্য কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, বড়লাট স্যর হেনরি হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিকশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ১০১টি বঙ্গবিদ্যালয় ('হার্ডিঞ্জ পাঠশালা' নামে সমধিক পরিচিত) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে হুগলি জেলায় স্থাপিত হয়েছিল তিনটি — বৈঁচি, কোন্নগর ও মানকুণ্ডুতে। এই বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে মাসিক ২৫ টাকা, ২০ টাকা ও ১৫ টাকা।

এ সময়ে পাঠশালাগুলির অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষাব্রতী রাজনারায়ণ বসু ১৮৪৮ -এর ১লা জুন তারিখে বলেছিলেন — "বিষয় কর্মোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক শিক্ষা যে বিদ্যালয়ের প্রধান বা সমস্ত বিদ্যাই হইয়াছে, কতিপয় অশুদ্ধ চিরনিরূপিত পত্র লেখার অভ্যাস যাহার সম্যক লিপিবিদ্যা হইয়াছে, এবং অল্পজ্ঞ অঙ্কগুরু শুভঙ্করের আর্য্যা এবং সরস্বতী বন্দনা, গুরুবন্দনা, গঙ্গাবন্দনা ও দাতা কর্ণাদি যাহা সমুদয় পাঠগ্রন্থ হইয়াছে, সে বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের যে বুদ্ধি স্ফূর্তি হইবে তাহার কি সম্ভাবনা? ...... যদ্রূপ সন্তানকে স্নেহের সহিত পালন করা উচিত, তদ্রূপ শিষ্যকে প্রীতির সহিত উপদেশ কর্ত্তব্য, কিন্তু গুরু মহাশয়ের ব্যবহার এ রীতির কি বিপরীত ? তিনি নিয়ত ক্রোধেতে পরিপূর্ণ এবং ছাত্রেরা ভয়েতে সর্ব্বদাই শঙ্কিত। ....তাহারা শিক্ষাগুরুকে যম স্বরূপ দেখে, এবং বিদ্যালয়কে যমালয় জ্ঞান করে।" (১)

হার্ডিঞ্জ পাঠশালাগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ব্যক্তিগত, মিশনারি বা সরকারী প্রচেষ্টায় হুগলি জেলায় বেশ কয়েকটি বালক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। যেমন, হুগলি-চুঁচুড়া শহরে চুঁচুড়া ফ্রি স্কুল,

হুগলি মাদ্রাসা (১৮১৭), ইমামবাড়া স্কুল (১৮১৭), মল্লিকবাটি পাঠশালা (১৮৩০), সাবস্ক্রিপশন স্কুল বা জমিদারী স্কুল (১৮৩৪)*, ইনফ্যান্ট স্কুল (১৮৩৯), বড়বাজারের একটি স্কুল, চুঁচুড়া সেমিনারি (১৮৪৪), চুঁচুড়া প্রিপারেটরী স্কুল, চুঁচুড়া গ্রামার স্কুল, হুগলি মডেল স্কুল, অমরপুর গ্রামে কালীকিঙ্কর পালিত বেনেভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন (১৮৩৭), চন্দননগরের 'রিসি সাহেবের' স্কুল (১৮৩৫), বাঁশবেড়িয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা (১৮৪৩), ত্রিবেণী স্কুল (১৮৩৯), সীতাপুর স্কুল (১৮৩৯), ঝিকরা স্কুল (১৮৪০) ইত্যাদি। এই স্কুলগুলিতে তখনকার রীতি অনুসারে বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হত। (আদালতে ও কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠানে ফারসি ১৮৩৫ পর্যন্ত চালু থাকলেও ইংরেজ শাসনে ইংরেজি শিক্ষার দিকে আগ্রহ বাড়ছিল।) তবে চন্দননগরে ইংরেজির বদলে ছিল ফরাসি ভাষা। পরে সেখানেও জনসাধারণের বিশেষ আগ্রহে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করতে হয়েছিল। এ ছাড়া, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে হুগলি জেলাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮) ও হুগলি কলেজ (১৮৩৬) — যার স্কুল অংশকে পরে বলা হয়েছে 'হুগলি কলেজিয়েট স্কুল'। তবে স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা যায় যে চুঁচুড়ায় মে সাহেবের স্বল্পজীবী বালিকা বিদ্যালয়টি ও শ্রীরামপুর অঞ্চলে মিশন-পরিচালিত তেরটি স্ত্রী বিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোন বালিকা বিদ্যালয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হুগলি জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

হার্ডিঞ্জ পাঠশালাগুলি উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে ও পরিদর্শনের স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকায় ক্রমে অচল হয়ে পড়ছিল। এতদিন এই সব বিদ্যায়তনের দায়িত্বে ছিল 'সদর বোর্ড অফ রেভেনিউ'। ১৮৫২ সালের ১৯ শে এপ্রিল থেকে এ গুলির দায়িত্ব নিল শিক্ষা সংসদ। উইলিয়ম অ্যাডাম তাঁর ১৮৩৮ সালের রিপোর্টে 'পাঠশালাগুলির সংস্কার করে তারই উপর জাতীয় শিক্ষার সৌধ গড়ে তোলার জন্য যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন তা উপেক্ষিত হয়েছিল। তবে তা থেকে সূত্র নিয়ে শিক্ষা সংসদের সদস্য ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মার্চ বলেছিলেন — "বঙ্গদেশে অসংখ্য দেশীয় ধরণের পাঠশালা আছে, ইউরোপীয় ও এদেশীয় উভয় শ্রেণীর ভদ্রলোকের কাছে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, পাঠশালাগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়, কারণ শিক্ষকের কার্য অতি অযোগ্য লোকের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এই পাঠশালাগুলিকে যথাসম্ভব উন্নত করিয়া তোলা আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। পাঠশালাগুলির আদর্শস্বরূপ কতকগুলি মডেল স্কুলের ব্যবস্থা করা দরকার।" [২] এই সঙ্গে তিনি মডেল স্কুল সমূহের জন্য যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন ও সেগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখার কথা বলেছিলেন।

এই ঘটনার আগেই বিদ্যোৎসাহী জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শিক্ষাসংসদের সম্মতি পেয়ে ১৮৪৬ এর মে মাসে উত্তরপাড়ায় যে বালক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, সেটি বর্তমানে উত্তরপাড়া সরকারী বিদ্যালয়। একই সময়ে এই জনপদে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তাঁর আবেদন শিক্ষা সংসদ গ্রহণ করে নি। পরে সরকারের গৃহীত শিক্ষাপ্রসার নীতিকে সফল করতে জয়কৃষ্ণ ১৪টি বঙ্গ বিদ্যালয় ও ১০টি ইঙ্গ-বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এগুলির অধিকাংশ ছিল হুগলি জেলায় এবং বিদ্যালয়গুলির জন্য তাঁর মাসিক ব্যয় ছিল ১৪২৯ টাকা। তা ছাড়া, তাঁর চেষ্টায় ও অর্থসাহায্যে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলের মধ্যভাগে অসাধারণ একটি সাধারণ গ্রন্থাগার এবং ১৮৮৭ -এর জুলাই মাসে একটি কলেজ উত্তরপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

---

* মে সাহেবের বালক বিদ্যালয়গুলির একটি ছিল হুগলি শহরে। এক সময়ে লণ্ডন মিশনারি কর্তৃপক্ষ তাদের যে কয়েকটি স্কুল ছিল সেগুলি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। তখন স্থানীয় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ডি.সি.স্মিথ জমিদারদের চাঁদার সাহায্যে হুগলির স্কুলটির দায়িত্ব নেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সেটি ১৮৩৪ সালে 'জমিদারি স্কুল' বা 'সাবস্ক্রিপসন স্কুল' নামে পরিচিত হয়ে পরে সুপণ্ডিত ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ভালভাবে চলেছিল। ১৮৩৬ সালে 'হুগলি কলেজ' স্থাপিত হওয়ার পরে ব্যবস্থাক্রমে এটি ১৮৩৭ এর ডিসেম্বর থেকে কলেজের শাখা বিদ্যালয় হিসাবে 'হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল' নামে চালু হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান হুগলি-চুঁচুড়ার অন্যতম সরকারী বিদ্যালয় হিসাবে আজও চালু আছে। হুগলি কলেজিয়েট স্কুল এতদঞ্চলের আর একটি সরকারী বিদ্যালয়। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়, হুগলি কলেজিয়েট স্কুল ১৮১২ সালে প্রতিষ্ঠিত বলে প্রবেশদ্বারের ফলকে যে কথা লেখা হয়েছে তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

জেলার প্রাতঃস্মরণীয় সন্তান ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর* সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকা কালে বঙ্গের ছোটলাট পূর্বোক্ত হ্যালিডে সাহেবের অনুমতি পেয়ে ১৮৫৫-৫৬ সালে মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলি ও নদীয়াতে প্রতি জেলায় ৫টি হিসাবে মোট ২০টি বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। হুগলি জেলার ৫টির অবস্থান ছিল হারোপ, শিয়াখালা, কৃষ্ণনগর, কামারপুকুর, ক্ষীরপাই-এ৺। এর দু'বৎসর আগে স্বগ্রাম বীরসিংহে একটি অবৈতনিক বালক বিদ্যালয় ও কর্মরত মানুষদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় চালু করেছিলেন।

১৮৫৪ সালের 'উডস্ ডেসপ্যাচ'-এ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে সরকারের সমর্থন ছিল। হ্যালিডে সাহেবের মৌখিক অনুমতি পেয়ে ১৮৫৭-৫৮ বর্ষে ছ'মাসেরও কম সময়ে বিদ্যাসাগর পূর্বোক্ত চারটি জেলায় মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন যাদের মধ্যে ২০টি ছিল হুগলি জেলায় — পোলবা, দাসপুর, বৈঁচি, দিগ্‌সুই, তালাণ্ডু, হাতিনা, হয়েরা, ন-পাড়া, উদয়রাজপুর, রামজীবনপুর, আকাবপুর, শিয়াখালা, মাহেশ, বীরসিংহ, গোয়ালমারা, দণ্ডীপুর, দেপুর, রাউছাপুর, মলয়পুর ও বিষ্ণুদাসপুর। তা ছাড়া পরে তাঁর চেষ্টায় আরও ১১/১২টি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল, যাদের মধ্যে ৭টির অবস্থান হুগলি জেলায় — গোপালনগর, দ্বারহাটা, রিষড়া, কুরান, উদয়গঞ্জ, বুরুল ও পাতুলে।

পরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে জেলায় আরও কিছু শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দুই ভাই রাধাকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের চেষ্টায় ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয়। ডিরোজিও-র ছাত্র শিবচন্দ্র দেব স্বগ্রাম কোন্নগরে বালক বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ও সাধারণ গ্রন্থাগার (১৮৫৮) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইভাবে জনাই, ইটাচুনা, ভাস্তাড়া, দশঘরা প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৪৯-এ চুঁচুড়া শহরে আলেকজান্ডার ডাফের চেষ্টায় ফ্রি চার্চ মিশন ইনস্টিটিউশন (বর্তমান ডাফ স্কুল) গড়ে উঠেছিল।

১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা' নামে একটি অসাধারণ প্রতিষ্ঠান** স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের জন্য দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী তিনটি ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষার সঙ্গে অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা প্রবর্তন করেছিল। তা ছাড়া, জন্ম বৎসরেই সভা পার্শ্ববর্তী মাখলা অঞ্চলে একটি কৃষি বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিল। সে যুগে কৃষি শিক্ষার প্রতি অনীহার কারণে স্বল্পজীবী হলেও এটি ছিল ভারতের এ-জাতীয় প্রথম প্রতিষ্ঠান। শিক্ষক শিক্ষণের জন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অধ্যক্ষতায় হুগলি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৬ সালের ২২শে জুন।

সমাজে দরিদ্র শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে চুঁচুড়া হিন্দু স্কুলের পত্তন হয়। এই বালক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি বালিকা বিভাগ খোলা হয়েছিল। ছাত্রী সংখ্যা খুবই কম হওয়ায় এই বিভাগ তুলে দেওয়া হলেও হিন্দু স্কুল চলেছিল ১৮৮০ সাল পর্যন্ত। এই স্কুলের আসবাবপত্র কিনে নিয়ে সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার এখানে যে 'সাধারণী হাই ইংলিশ স্কুল' স্থাপন করেছিলেন সেটি ১৮৮৪ পর্যন্ত চলেছিল।

বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় হুগলি জেলায় ২৭টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও জেলার কেন্দ্র-জনপদ হুগলি-চুঁচুড়ায় কোন বালিকা বিদ্যালয় দীর্ঘকাল স্থাপিত হয় নি। অবশেষে হুগলির বালি অঞ্চলে ১৮৭৬

---

* ঈশ্বরচন্দ্র যখন বীরসিংহ গ্রামে জন্মেছিলেন, তখন সেটি ছিল হুগলি জেলায়। যতদিন পর্যন্ত তিনি গ্রামে গিয়েছেন ততদিন গ্রামটি হুগলি জেলাতেই ছিল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বীরসিংহ সমেত ঘাটাল অঞ্চল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হয়েছিল।

৺ ক্ষীরপাই তখন ছিল হুগলি জেলায়।

** উত্তরপাড়া হিতকরী সভা'র বিবিধ কর্মপ্রবাহ, বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে সভার অসাধারণ ভূমিকা সম্পর্কে জানা যাবে ড. বসন্ত কুমার সামন্ত লিখিত 'হিতকরী সভা : স্ত্রীশিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থ (সাহিত্যলোক প্রকাশিত) থেকে। এই সভা এখনও সীমিতভাবে কাজ করে চলেছে।

খ্রিস্টাব্দের ২রা জুন স্থানীয় উদ্যোগে যে স্ত্রী-বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল তার পরিচালনায় অসুবিধা দেখা দিলে দু'বৎসর পরে সেটি বিদ্যোৎসাহিনী মিশনারি মহিলা মিস্ এলিস রেক্সের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। মিস রেক্স হুগলির চকবাজারে থাকতেন এবং নিজের বাড়িতে, ঘুটিয়া বাজার ও শুঁড়িপাড়াকে বালিকাদের স্কুল (এগুলিকে 'মেমের স্কুল' বলা হত) চালাতেন। বালক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ব্যান্ডেল স্কুল (বর্তমান নাম সেন্ট জন হাই স্কুল) ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ও চুঁচুড়া ট্রেনিং একাডেমী (বর্তমান নাম শিবচন্দ্র সোম ট্রেনিং একাডেমী) ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ওলন্দাজ শহর চুঁচুড়া বিনিময় সূত্রে স্থায়ীভাবে ইংরেজদের হাতে এসেছিল ১৮২৫ সালে।

ফরাসি শহর চন্দননগরে ১৮৬১তে সেন্ট জোসেফ্‌স কনভেন্ট ও পর বৎসরে 'একল দ্য স্যাঁৎ ম্যারি' (সেন্ট মেরিজ ইনস্টিটিউশন) নামে একটি ফরাসি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান ক্রমোন্নতির পথে 'দ্যুপ্লে কলেজ' নামে পরিচিত হয়েছিল। জনসাধারণের আগ্রহে এখানে ইংরেজি পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। ১৯০৮ সালে বিপ্লবী আন্দোলনের জেরে এই শিক্ষায়তনের কলেজ অংশ বন্ধ হয়েছিল এবং সেটি নূতন অবস্থানে ১৯৩১-এ কলেজ হিসাবে কাজ শুরু করেছিল। চন্দননগর পরে স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভূত হয়। এখন কলেজটি চন্দননগর কলেজ ও পূর্বতন বিদ্যালয় অংশ কানাইলাল বিদ্যামন্দির নামে পরিচিত। ফরাসি ভাষায় সাম্মানিক পাঠক্রম পর্যন্ত কলেজে পড়ানো হয়। স্থানীয় 'ইনস্টিটিউট দ্য চন্দননগর'-এ এই ভাষায় সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাব্রতী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জড়িত 'চন্দননগর সেমিনারি' নামে অল্পজীবী এবং ইংরেজী স্কুলের কথা ইতিহাসের প্রয়োজনে উল্লিখিত হল।

বাঁশবেড়িয়ায় 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' বন্ধ হওয়ার পর আলেকজান্ডার ডাফ সেখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। স্থানীয় জমিদার পূর্ণেন্দুদেব রায়ের প্রয়াসে ১৮৮০ সালে একটি নূতন বিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল। ১৮৯১-এ এখানে যে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল, গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার বিশেষ ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

দিনেমার শহর শ্রীরামপুর ক্রয়সূত্রে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের হাতে এসেছিল। এখানকার শ্রীরামপুর কলেজে খ্রিস্টান ধর্মশাস্ত্র-সংক্রান্ত পড়াশুনার সঙ্গে পরে কলাবিজ্ঞান নিয়ে কলেজী পাঠক্রম চালু হয়েছিল। ১৮৮৪ সালে স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন।

পাঠশালার গুরুমহাশয়দের শিক্ষণপদ্ধতি জানার জন্য জেলার এক সময়ে ছ'টি গুরু ট্রেনিং স্কুল ছিল। সেগুলির বদলে পরে এসেছে বেসিক ট্রেনিং স্কুল। ভূদেব বাবুর নর্ম্যাল স্কুলের শেষ অবস্থানে বেসিক ট্রেনিং কলেজ চালু হয়েছিল। পরে সেখানে স্থাপিত হয়েছে হুগলি সরকারী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। মহিলাদের জন্য চন্দননগরে একটি সরকারী বি.এড. কলেজ আছে। তা ছাড়া, আনুরে রামকৃষ্ণ সারদা শিক্ষা মন্দিরে বি.এড. পড়াবার ব্যবস্থা বর্তমান। ১৯৮৪ থেকে হুগলিতে চালু হয়েছে সরকারী মহিলা শারীর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়।

ভিন্ন ধরণের পড়াশুনার ক্ষেত্রেও এ-জেলা ছিল বেশ অগ্রসর। হুগলি জেলায় সর্বপ্রথম স্যার জর্জ ক্যাম্বেল একটি সিভিল সার্ভিস কলেজ এবং স্যার রিচার্ড টেম্পল একটি সার্ভে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান দুইটি উঠিয়া যায়। ১৮৯৫ এর ফেব্রুয়ারি মাসে হুগলিতে পুলিশ ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে উহা ভাগলপুরে স্থানান্তরিত হয়।[৫] ১৯০৮ সালে শ্রীরামপুর স্কুল অফ ইনস্ট্রাকশন (বর্তমান নাম কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনোলজি) স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৯৪ থেকে এখানে এম.এস.সি (টেক) কোর্সও চালু হয়েছে। হুগলি বালির মোড়ে এক সময়ে যে মোবার্লি টেকনিক্যাল স্কুল শুরু হয়, তা ১৯৫১ সালে হুগলি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে পরিণতি লাভ করে। এর বর্তমান অবস্থান পিপুলপাতিতে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছে হুগলি জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল। তা

ছাড়া আছে সাহাগঞ্জ আই. টি. আই., পাশে বেসিক ট্রেনিং সেন্টার (কেমিক্যাল), আরামবাগ মহকুমার বেঙ্গাইতে সুভাষনগর জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল। ১৯৯৪ সালে চন্দননগরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহিলাদের জন্য পলিটেকনিক। ব্যান্ডেলে সার্ভে ইনস্টিটিউট-এর কাজ চলেছে ১৯৪৮ থেকে। চুঁচুড়ায় কৃষিপ্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ধান্য গবেষণা কেন্দ্র প্রশংসনীয় ভাবে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে সার্বিক গ্রামোন্নয়নের প্রয়োজনে হুগলি ও চন্দননগরে কমিউনিটি পলিটেকনিক্যাল সেল স্থাপিত হয়েছে। এ-ছাড়া, নাচ-গান-ছবি আঁকার, হস্তশিল্প শিক্ষার, শর্টহ্যান্ড টাইপিং প্রভৃতি শিক্ষার বহু প্রতিষ্ঠান হুগলি জেলায় আছে।

ছোট মাপের এই জেলায় স্নাতক কলেজের সংখ্যা এখন ২৩,.সেগুলি হল — শ্রীরামপুর কলেজ, হুগলি মহসীন কলেজ, রাজা পিয়ারীমোহন কলেজ (উত্তরপাড়া), চন্দননগর কলেজ, নেতাজী মহাবিদ্যালয় (আরামবাগ), হুগলি উইমেন্স কলেজ, বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয় (ইটাচুনা), নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ, বিধানচন্দ্র কলেজ (রিষড়া), শ্রীগোপাল ব্যানার্জি কলেজ (বাগাটি), অঘোরকামিনী প্রকাশ চন্দ্র মহাবিদ্যালয় (বেঙ্গাই), শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ (কামারপুকুর), রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয় (রাধানগর), বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয় (হরিপাল), খলিসানি মহাবিদ্যালয়, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় (চাঁপাডাঙ্গা), শরৎ সেন্টিনারি কলেজ (ধনিয়াখালি), স্বামী নিঃস্বলানন্দ বালিকা মহাবিদ্যালয় (ভদ্রকালী), শ্রীরামপুর গার্লস কলেজ, বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় (বলাগড়), তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ, কবি সুকান্ত মহাবিদ্যালয় (ভদ্রেশ্বর) ও আরামবাগ বালিকা মহাবিদ্যালয়। এগুলির মধ্যে হুগলি মহসীন কলেজে রাজনীতি বিজ্ঞানে এম.এ. ও তিন বৎসরের আইন পাঠক্রম পড়ানো হয়। স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের কারণে এটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি 'কনস্টিটুয়েন্ট কলেজ'। এখন এখানে ফিজিওলজিতে এম. এস. সি ও উর্দুতে এম. এ. খোলার প্রচেষ্টা চলেছে।

উচ্চ বিদ্যালয় প্রসঙ্গে একথা বলা যায়, ১৮৫৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত যত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, নানা কারণে তাদের সবগুলি টিকে থাকে নি। ১৯৪৭-এর পর মানুষের আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে অবলম্বন করে বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; তার সঙ্গে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া আছে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পড়ার জন্য নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। পাশাপাশি আছে উচ্চ মাদ্রাসা ও নিম্ন মাদ্রাসা। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাক্‌প্রাথমিক, প্রাথমিক ও জুনিয়র বেসিক স্কুল চালু রয়েছে। জেলা শিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয় থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষায়তনগুলির সংখ্যা জানা গেছে। যথা : উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় — ১০৭ (এই পাঠক্রম অবশ্য মহাবিদ্যালয়েও পড়ানো হয়), উচ্চ মাদ্রাসা — ২৩, নিম্ন মাদ্রাসা — ১৩, প্রাথমিক বিদ্যালয় — প্রায় ৩০০০। এই তালিকার মধ্যে অন্য বোর্ডের অন্তর্গত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলি অবশ্য ধরা হয় নি।

এখন বিশেষ ধরণের কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্রের কথা উল্লিখিত হচ্ছে যেখানে প্রতিবন্ধীদের আরোগ্য ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করানোর সাধনা চলেছে। হুগলি জেলায় এ-জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান হুগলির প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্র। ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে ছ'টি বধির শিশু ও একজন শিক্ষিকা নিয়ে যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যাত্রা শুরু করেছিল যেখানে ছ'শ প্রতিবন্ধী শিশুর দায়িত্বে আছে একষট্টি জন সেবাব্রতী কর্মী। এই কেন্দ্রে কাজ চলেছে শ্রবণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও মানসিক প্রতিবন্ধী নিয়ে। এখানে প্রাপ্ত বয়স্ক বধিরদের জন্য আছে কারিগরী প্রশিক্ষণ বিভাগ। জেলার পাঁচটি ব্লকে পাঁচটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সমাজ ভিত্তিক পুনর্বাসনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে : মামুদপুর উন্নয়ন পরিষদ (চুঁচুড়া-মগরা ব্লক), প্রতিবন্ধী সহযোগী সমিতি (পোলবা-দাদপুর ব্লক), গ্রাহাম বেল সেন্টার ফর দি ডেফ (পাণ্ডুয়া ব্লক), সুলতানপুর জনকল্যাণ সমিতি (হরিপাল ব্লক) ও কল্যাণ ভারতী (সিঙ্গুর ব্লক)।

এ ছাড়া উত্তরপাড়ার মাথলা অঞ্চলে দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য লুই ব্রেল মেমোরিয়াল স্কুল

ফর দ্য সাইটলেস' নামক প্রতিষ্ঠানে ব্রেল স্পর্শ বর্ণমালার মাধ্যমে তারা লেখাপড়া শিখতে পারে। ভদ্রেশ্বর 'সেন্টার'-এ বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিগত শিক্ষা দেওয়া হয়। মানসিক প্রতিবন্ধীদের এ-জাতীয় শিক্ষার সুযোগ আছে চন্দননগর প্রবর্তকে, শ্রীরামপুরের চাইল্ড গাইড্যান্স সেন্টারে এবং হিন্দ মোটরের অ্যানি সুলেভান বিদ্যালয়ে।

জনশিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির বিশেষ ভূমিকা আছে, এই সব প্রতিষ্ঠান হল জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়। গণমুখী শিক্ষা ও জনচেতনা বিকাশের প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের অবদান অবশ্যম্ভাবী কার্য। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলেছেন — "মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গায় বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।" গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান হুগলি জেলায় এমন বহু পরিত্রাণ - মন্দির আছে। গত শতকে এই জেলায় ১১টি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল, যে সংখ্যা অন্য জেলাগুলির তুলনায় অনেক বেশি। জেলার প্রথম গ্রন্থাগার (বঙ্গের তৃতীয়) হুগলি পাবলিক লাইব্রেরি ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তত্ত্বাবধানের অভাবে এখন সেটি মৃতপ্রায় অবস্থায় চুঁচুড়া আদালত এলাকায় 'বার লাইব্রেরি'-র পাশে একটি কক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। পরবর্তী দশটি গ্রন্থাগার হল — কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৫৮), উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৫৯), জনাই পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৬০, মতান্তরে ১৮৬৯), শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৭১), চন্দননগর পুস্তকাগার (১৮৭৩), বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯১), শ্রীরামপুর কল্যাণ সমিতি লাইব্রেরি (১৮৯১), মণ্ডলাই পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯৪), জামগ্রাম নন্দী পাবলিক লাইব্রেরি (১৩০১) বঙ্গাব্দ, এবং বিশ্বেশ্বরী লাইব্রেরি, কৈকালা (১৮৯৭)। লক্ষণীয় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি ভারতের প্রথম নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার এবং সে-যুগের বৃহত্তম নির্দেশক লাইব্রেরি।

পরবর্তীকালে শিক্ষানুরাগী মানুষেরা জেলায় আরও গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। পরে সরকারও এবিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে। সরকারী তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে — জেলার হুগলি-চুঁচুড়া পৌর এলাকায় জেলা গ্রন্থাগার (হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার) -১, বিশেষ গ্রন্থাগার (উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার) - ১, শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার - ১২, উন্নীত শহর গ্রন্থাগার - ১৩৩। তা ছাড়া জেলায় প্রায় আটশ' বেসরকারী গ্রন্থাগার আছে। কাজেই হুগলি জেলার গ্রন্থাগারের সর্বমোট সংখ্যা প্রায় সাড়ে ন'শ।

হুগলি জেলাতেও সাক্ষরতা প্রসারের কাজ চলেছে। তার ফলে ১৯৯২-এর ৩০ মার্চ এই জেলা 'পূর্ণ-সাক্ষর' জেলার মর্যাদা লাভ করেছে। তবে নানা কারণে এখন সাক্ষরতা আন্দোলনের কাজে শিথিলতা দেখা যাচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে পড়াশুনার ধারা বজায় না রাখায় 'সাক্ষর' মানুষ আবার 'নিরক্ষর' হয়ে পড়ছেন। তা ছাড়া, সকল শিশুকে বিদ্যায়তনের শিক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থার মধ্যে আনা সম্ভব না হওয়ায় নিরক্ষরতার উৎসমুখ বন্ধ হচ্ছে না। তাই সাক্ষরতা আন্দোলনকে আরও প্রসারিত করে সমাজের সর্বত্র নিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক-সমাজ ও গ্রন্থাগার কর্মী একটি বড় ভূমিকা নিতে পারেন। মূল কথা 'শিক্ষা'কে অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মনে রেখে অগ্রসর হতে হবে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বহুক্ষেত্রে অগ্রণী হুগলি জেলা এ-বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করুক।

❑ তথ্যসূত্র

(১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৭৭০ শক, পৃ. ৬৪ (বর্তমান লেখকের 'বিদ্যাসাগর : প্রসঙ্গ হুগলি জেলা' গ্রন্থে উদ্ধৃত : পৃ. ২০-২১)
(২) হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ - ১ম খণ্ড - সুধীর কুমার মিত্র, প্রথম মণ্ডল বুক হাউস সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৬৬৫
(৩) হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ - ১ম খণ্ড - সুধীর কুমার মিত্র, প্রথম মণ্ডল বুক হাউস সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৬৬৮

হুগলি : খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদান

শিশির দে

হুগলি : জেলা, শহর, নদী ও বন্দর

অপরাপর বঙ্গ জনপদের ন্যায় বাংলার অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ হুগলি। হুগলি বন্দর তথা বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠবার পিছনে ভাগীরথী তথা হুগলি নদীর অবদান অনস্বীকার্য। ষোল'শ থেকে উনিশ'শো অর্থাৎ মোটামুটি চারটি দীর্ঘ শতাব্দী অতিক্রান্ত বাংলার প্রধান নদীপ্রবাহ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিশেষত নদীপথের গতি প্রকৃতির রূপ বর্তমান দেড়'শ বছর আগেও ছিল কিনা সন্দেহ। অবশ্য তারও আগে এই জনপদ-এর অর্থাৎ হুগলি অঞ্চলটি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে জেস্যুইট পাদ্রি Farnandus (1598) হুগলি থেকে শ্রীপুর (বর্তমান ইছামতী নদী তীরবর্তী টাকির বিপরীতে) সমস্ত পথটাই ব্যাঘ্রসঙ্কুল বলেছেন। তারও আগে Ralph Fitch (1583-91) এই পথ পরিক্রমা সম্বন্ধে লিখেছেন, "We found but few villages but almost all wilderness, and saw many buffes, buffaloes, swine and deers, grasses longer than a man, and very many tigers ..." আবার Fonseca (1599) বাকলা থেকে সপ্তগ্রামের (সাতগাঁ বা Chandecean) পথটি বানর ও হরিণ অধ্যুষিত বনভূমি বলে উল্লেখ করেছেন।

ষোল'শ থেকে আঠারো শতকের মধ্যে Jao de Barros (1550), Gastaldi (1561), Hondivs (1614), Cantelli da Vignolla (1683), Van den Broucke (1660), G. Delisl (1720-1740), Izzak Tirion (1730), F.de Witt (1726), del'Auville (1752), Thornton Rennel (1764-1776) প্রমুখ পর্তুগীজ, ডাচ ও ইংরেজ বণিক, কর্মচারি ও পণ্ডিতেরা বাংলার নদীমাতৃক ভূখণ্ডসমূহের যে নক্শা তৈরি করেছিলেন, সেসব নকসা অনুসরণ করলে গঙ্গা-ভাগীরথী-বিধৌত (কবি কৃত্তিবাসের ভাষায় 'দক্ষিণ পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী), জনস্থানের অন্যতম হ'ল হুগলি। Van den Broucke -এর সময়কালের অন্তত দেড়'শ বছর আগে বিপ্রদাস পিপলাই (১৪৯৫) তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে গঙ্গা-ভাগীরথী প্রবাহপথের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, সেখানে উল্লেখ আছে, চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যতরী রাজঘাট, রামেশ্বর পার হয়ে সাগরপথে প্রবাহিত হওয়ার পথে অজয় নদী, উজানী, শিবানদী, কাটোয়া, ইন্দ্রাণী নদী, ইন্দ্রঘাট, নদীয়া, ফুলিয়া, গুপ্তিপাড়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম (গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমে যার অবস্থান), কুমার হাট, ডাইনে হুগলি, বামে ভাটপাড়া, পশ্চিমে বোরো, পূর্বে কাঁকিনাড়া, পরে মুলাজোড়, গারুলিয়া, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ডাইনে চাঁপদানি, বামে ইছাপুর, বাঁকিবাজার, ডাইনে নিমাইতীর্থ (বর্তমান বৈদ্যবাটি), চানক, মাহেশ, বামে খড়দহ, শ্রীপাট, ডাইনে ঋষিড়া বা রিষিড়া, বামে সুখচর, পশ্চিমে কোন্নগর, ডাইনে কোতরং,

বামে কামারহাটি, পূর্বে আড়িয়াদহ, পশ্চিমে ঘুসুড়ি, পূর্ব কূলে চিত্রপুর, কলিকাতা, পশ্চিমকূলে বেতড় (দ্বাদশ শতকী লিপির বেতড্ড-চতুরক) পরে বামে কালীঘাট, চূড়াঘাট, বারুইপুর, ছত্রভোগ, বদ্‌রিকাকুণ্ড, হাথিয়াগড়, চৌমুখী, শতমুখী এবং সবশেষে 'সাগরসঙ্গমতীর্থ' যেখানে 'তীর্থকার্য শ্রাদ্ধ কৈল পবিত্র তর্পণ। তাহার মেলান ডিঙা সংগমে প্রবেশে। তীর্থকার্য কৈল রাজা পর (ম) হরিষে'। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিপ্রদাসের উপরোক্ত বর্ণনার সঙ্গে Van Den Broucke নকশার বর্ণনা অনেকটাই মিলে যায়। নদীয়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী (Tripeni), সপ্তগ্রাম (সাতগাঁও) বা Coatgam অথবা Satigam, হুগলী (Oegli) পর্তুগীজ বণিকদের কথায় (Ogulium), কলিকাতা (Van den Brouck, Collecate এবং Calcutta নামে প্রায় সংলগ্ন দুটি বন্দরের নাম উল্লেখ করেছেন)। এর একটি বিপ্রদাস পিপলাই-এর বর্ণিত কলিকাতা ও অপরটি কালীঘাট বলে ধরা যেতে পারে। এখানে লক্ষণীয়, পনের শতকেই বিপ্রদাস হুগলি ও কলকাতার উল্লেখ করেছেন এবং এটিই হুগলি ও কলকাতার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ। ১৪৯৫-এর (বিপ্রদাসের) পরে এবং ১৬৬০ এর (Van den Broucke) আগে বরা(হ) নগর ও চন্দননগর বন্দর দুটি গড়ে ওঠে এবং Joa de Barros -এর নকশাতেও Satigam অর্থাৎ সপ্তগ্রাম-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইতিহাসের তথ্যও এরই সপক্ষে।

ইতিহাসের তথ্য এই যে, চতুর্দশ শতকের গোড়াতেই সপ্তগ্রামে মুসলমানদের অন্যতম প্রধান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবার আলিবর্দীর আমল থেকেই আদিগঙ্গার প্রবাহ পরিবর্তিত এবং পরিত্যক্ত হয়ে মধ্যযুগের উল্লিখিত সরস্বতী নদীপ্রবাহ অনুসরণ করে গঙ্গা-ভাগীরথীর নদীপথে প্রবাহিত হতে থাকে। বিপ্রদাসের 'চাঁদ সওদাগর' ত্রিবেণীর পরেই সরস্বতী নদীতীরে গড়ে ওঠা সপ্তগ্রাম বন্দরের এবং সংলগ্ন বাণিজ্য কেন্দ্রের এক বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে সপ্তগ্রাম যে এক সমৃদ্ধশালী বন্দর-নগর হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তবে বিপ্রদাসের 'চাঁদসওদাগর' বানিজ্যতরী সপ্তগ্রামের পরে সরস্বতী নদী প্রবাহ অনুসরণ না করে বর্তমানের ভাগীরথী নদীর প্রবাহ পথ অনুসরণ করেছেন। এই সময় সপ্তগ্রামের পরই কুমারহাট এবং হুগলির উল্লেখ দেখা যায়। আবার Caeser Fredrich (1565) নামে এক ফ্লেমিশ ভূবিদ্যাবিশারদ তথা পর্যটকের গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে সরস্বতীর প্রবাহপথ ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হওয়ার জন্য ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ বণিকেরা সপ্তগ্রাম ছেড়ে হুগলিতেই তাঁদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন।

হুগলি বন্দরের অবস্থান ও গুরুত্ব সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে অনুমান করা সম্ভব যে, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য গড়ে তোলার প্রয়োজনে এই বন্দরটিকে ঘিরে কেবল ইংরেজ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ বা ফরাসিরাই নয় ,ভদ্রেশ্বর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এবং নদীর পূর্বকূলে বাঁকীবাজার অঞ্চলে ফ্লেমিশ বা বেলজিয়ান বণিক, প্রুশিয়ান বা জার্মানি বণিক সম্প্রদায়ও অল্প কিছুদিনের জন্যে হলেও কুঠীবাড়ি স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া ঋষিড়া বা বর্তমান রিষড়া অঞ্চলে এবং কোন্নগর অঞ্চলে আর্মেনিয়ান এবং অস্ট্রিয়ানরাও বাণিজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হন।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের অন্যতম জেলা হুগলির ভূখণ্ডস্থিত অঞ্চল অথবা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দিয়ে বয়ে গেছে বহু নদী আর তার নানা শাখা প্রশাখা। এদেরই তীরবর্তী অঞ্চল সমূহে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন জনপদগুলি। সরস্বতী নদীর কূলেই গড়ে ওঠে বাণিজ্য বন্দর সমৃদ্ধ জনপদ সপ্তগ্রাম। ভূরীশ্রেষ্ঠীর পত্তন হয় দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে। একাদশ শতকে লিখিত কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকে এই গ্রাম তথা সমৃদ্ধ নগর রাঢ়দেশান্তর্গত 'ভূরিশ্রেষ্ঠিকা' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত মধ্যযুগ ধরে এই গ্রাম ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি বড় কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের বাঙালী কবি ভারতচন্দ্র রায়ের পিতা জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

অন্নদামঙ্গল ছাড়া ভারতচন্দ্রের 'সত্যপীরের কথা'তেও এই গ্রামের উল্লেখ আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকরা এই জনপদকে 'ভোসট' বলেছেন। হয়তো বর্তমান ভূরশুট নামটি এরই পরবর্তী রূপান্তর।

আবার যমুনা-সরস্বতী-ভাগীরথীর তিন 'মুক্তবেণী'-র সঙ্গমে অবস্থিত ত্রিবেণী প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রধান তীর্থনগরী। সেন রাজাদের আমল থেকে তুর্কী আমল পর্যন্ত তীর্থ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র ছিল ত্রিবেণী। ত্রিবেণীর তৎকালীন অবস্থান সম্বন্ধে ধোয়ী উল্লেখ করেছেন, 'গঙ্গাবীচিপ্লুত পরিসরঃ সৌধমালাবতংসো যাস্যত্যুচ্চৈস্তুয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।' অনুরূপ ভাবে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে সপ্তগ্রামের সুন্দর ও বিস্তৃত বর্ণনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ষোড়শ শতক পর্যন্ত সপ্তগ্রাম কেবল বৃহত্তম বাণিজ্য কেন্দ্র নয়, দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার রাজধানী, মুসলমান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রীয় শক্তির কেন্দ্রবিন্দু ও সুবৃহৎ বন্দর নগর হিসাবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

জেলা হুগলিতে নদনদীর সংখ্যা বিস্তর। যেমন :

১) ভাগীরথী বা হুগলি ২) দামোদর ৩) সরস্বতী ৪) ঘিয়া ৫) কানানদী ৬) কৌশিকী ৭) বেহুলা ৮) কান্তল ৯) বাঁশনদী ১০) রূপনারায়ণ ১১) দ্বারকেশ্বর ১২) কানা দ্বারকেশ্বর ১৩) কানা দামোদর ১৪) আমোদর ১৫) কাকীনদী ১৬) ঝুমঝুমি ১৭) মুণ্ডেশ্বরী।

আর এই নদনদীর উপকূলে অথবা সন্নিকটবর্তী স্থান সমূহে গড়ে উঠেছে বহু প্রাচীন ও নবীনতর অথচ সমৃদ্ধ জনপদগুলি। যেমন : বাঁশবেড়িয়া, হুগলি, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, কোন্নগর, হরিপাল, সিঙ্গুর, চণ্ডীতলা, জনাই, আঁটপুর, রিষড়া, উত্তরপাড়া, রাজবলহাট, ভাঙামোড়া, খানাকুল, কামারপুকুর, গোঘাট, আরামবাগ, গৌরহাটি, রাধাবল্লভপুর, পুরশুড়া, চাঁপাডাঙ্গা, জাঙ্গীপাড়া, রাধানগর, দশঘরা।

তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় এই অঞ্চলের ছোটবড় নদনদীগুলিই হুগলি জেলার ইতিহাস গড়ায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এদেরই কূলে কূলে মানুষের সৃষ্ট সভ্যতার, মানুষের বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম, নগর, গঞ্জ, বন্দর, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প-সাহিত্য, ধর্মকর্ম, শিক্ষা — সবেরই বিকাশ ঘটেছে। এইসব নদনদী বা শাখানদী অথবা উপনদীর গতিপথকে আশ্রয় করেই যেমন ওইসব সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠেছে আবার তেমন ভাবেই বিগত প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরে এইসব প্রধান ও অপ্রধান জলধারা কতবার গতিপথ পরিবর্তন করেছে, কত পুরাতন নদী বিলুপ্ত হয়েছে আবার নূতন জলধারার সৃষ্টি হয়েছে আর তারই সঙ্গে লুপ্ত হয়েছে কত মনুষ্য সৃষ্ট কীর্তি কাহিনী। দেশখণ্ডের প্রকৃতিও কোথাও বা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে, কোথাও বা দেখা দিয়েছে নূতন নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা। এইভাবেই জেলা হুগলির অজস্র জনপদের উত্থান এবং পতন আজ ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়ে কালের সাক্ষ্য বহন করছে।

নবদিগন্তের অন্বেষণে

'শতার্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের প্রতি বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা। পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। ..... যদ্যপিও যিশুখ্রীষ্টের [illegible] স্বধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্মের ঔৎকর্ষ্যের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা

জানা কর্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেইরূপ মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গলা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্বল ও দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না। যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তিরা দুর্বলের মনঃপীড়াতে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্মান্তিক কোনোমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। ...... পূর্বকালে গ্রীকরা ও রোমীরা যাহারা অতিনিকৃষ্ট পৌত্তলিক ও নানাবিধ অসৎকর্মে বিব্রত ছিল তাহারাও আপন প্রজা ঈশ্বর পরায়ণ ইহুদির ধর্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত অতএব এদেশে অধিকারপ্রাপ্ত ইংরেজ মিসনরিরা এরূপ ধর্মঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস যাহা করেন তাহা অসম্ভাবনীয় নহে, কিন্তু ইংরেজেরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায় সেতুকে উল্লঙ্ঘন করেন না ইহাতে তাঁহারা পূর্ব-পূর্ব অজ্ঞ দেশ আক্রমণ কর্তাদের ন্যায় ধর্মঘটিত উপদ্রব করিলে তাঁহাদের প্রসিদ্ধ মহিমার ত্রুটি আছে যেহেতু নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ধর্মসংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচারসহ হয় না ......"

('আদিবঙ্গ', রামমোহন রায়, ব্রাহ্মণ সেবধি পত্রিকা, ১৮২১)

হুগলি জেলার শিক্ষা-সংস্কৃতি নির্মাণ, সাহিত্য চর্চা অথবা সমাজ সংস্কারের সূত্র নির্ধারণে মিশনারিদের অবদান শীর্ষক আলোচনায় রাজা রামমোহন রায় লিখিত উদ্ধৃতিটি উপস্থাপনার স্বপক্ষে যুক্তি এই যে তাঁর আবির্ভাবকালের মধ্য দিয়েই তমসাচ্ছন্ন বাঙালী তথা ভারতীয় মানসে এক নতুন আলোকরেখা এবং মুক্তির নবদিগন্ত ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এই রামমোহন সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চারিত্রপূজা'য় লিখেছেন : "যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত, সৃষ্টিশক্তি আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের কোন প্রশ্নের নতুন উত্তর দেবার মত বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও দুর্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এদেশে আবির্ভাব।" ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি 'স্বদেশবাসীদিগের মুখ পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে ফিরাইয়া দিলেন।' "যে পথে অগ্রসর হয়ে অতীত ভারতবর্ষ বর্তমান ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছে সে পথের তিনিই হচ্ছেন সর্বপ্রথম দ্রষ্টা এবং পথ প্রদর্শক'। আমাদের জীবনে যে নবযুগ এসে পৌঁছেছে তিনিই হচ্ছেন সে যুগের আবাহক।"

(নানাচর্চা : প্রমথ চৌধুরী)

রামমোহনের কালেই বাঙালী মধ্যযুগীয়তা মুক্ত হয়ে আধুনিক যুগের সিংহদ্বারে উপস্থিত হতে সমর্থ হন। আর এই নূতন যুগের সূচনা হ'ল মুদ্রাযন্ত্র ও শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে। মানুষ এতকাল অন্ধের মত অন্যের কথা শুনে চলত, এখন সে দেখে শুনে চলতে আরম্ভ করল; অন্যের কথা যুক্তি দিয়ে বুঝতে চাইল; ক্রমাগত জ্ঞানানুশীলন তথা শিক্ষার মধ্য দিয়ে। মধ্যযুগের অবসান আর আধুনিক যুগের সূত্রপাত হ'ল সেইদিন যেদিন শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হ'ল আর নানা বিষয়ে পুস্তক পুস্তিকা ছাপার কাজ চলতে থাকল। সেই যুগের অন্ধকার দূরীকরণের কাজে যে অমর আলোর শিখা অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিল, আজকের যুগমানস সেই প্রতিবিম্বিত আলোয় সমান উদ্ভাসিত।

পলাশী যুদ্ধের পর প্রায় অর্ধশতাব্দী কালের মধ্যে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়নি এবং বিদেশী শাসকরাও এ বিষয়ে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া দূরের কথা, আদৌ

এ নিয়ে কোন চিন্তাই করেন নি। ১৮০০ সালে গভর্নর লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে মুখ্যত শাসক শ্রেণীর বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। এ বিষয়ে লক্ষণীয় যে ১৭৯৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত সনন্দ নবীকরণের সময় এদেশের অধিবাসীদের শিক্ষার জন্য কোন চেষ্টা বা অর্থব্যয় করা যুক্তিযুক্ত কিনা সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তবে শিক্ষার কাজ আরম্ভ না হয়ে পারেনি। এর কারণ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন :

> "সে সময়ে যে সকল সিবিলিয়ান পুরাতন হালিস্‌বারি কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে আসিতেন, তাঁহাদিগকে আসিয়াই দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিতে হইত এবং শাসন সংক্রান্ত বিবিধ গুরুতর কার্যের ভার গ্রহণ করিতে হইত। তাঁহারা যখন এদেশে পদার্পণ করিতেন তখন সম্পূর্ণরূপে এদেশীয় ভাষা, এদেশীয় রীতিনীতি, এদেশীয় লোকের স্বভাব চরিত্র, মনের ভাব প্রভৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতেন। এজন্য তাঁহারা অনেক সময় আপনাদের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না; অনেক সময় অজ্ঞতাবশতঃ উৎকোচজীবী নিম্নতম কর্মচারীদের আশ্রয় লইতেন। অনেক সময়ে বিচার কার্যে ভ্রম প্রমাদ করিয়া ফেলিতেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি এই অভাবটি দূর করিবার চেষ্টা করেন। ...... তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে কিছুদিন কলিকাতাতে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিয়া পরে রাজকার্যে প্রেরণ করিবেন। তদনুসারে ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নামে একটি কলেজ স্থাপন করিলেন। ......"

অন্যদিকে এদেশীয় প্রজাদের শিক্ষাদানের নূতন ব্যবস্থার পত্তন ইংরেজ কোম্পানির তত্ত্বাবধানে না হয়ে, হয়েছিল বিদেশাগত মিশনারিদের উদ্যোগে। শিক্ষাবিদ অনাথনাথ বসু 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,"মিশনারিগণই এদেশে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের আগমনের সঙ্গেই এদেশে মিশনারিগণের পদার্পণ ঘটে"। বসু মহাশয় আরও লিখেছেন: "দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর কোম্পানির ছিল না; বরং পাছে রাজ্য বিস্তারে বাধা ঘটে এই ভয়ে তখন কোম্পানিরাজ দেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাত দিতে অনিচ্ছুক ; এমন কি মিশনারিদের প্রতি তাহাদের নীতি পরিবর্তন ঘটিয়াছে; এককালে কোম্পানি যতদূর সম্ভব মিশনারিদের আনুকূল্য করিয়াছিল, কিন্তু রাজ্য প্রতিষ্ঠার এই সন্ধিক্ষণে পাছে মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের ফলে এই ধর্মপ্রাণ দেশের লোক উত্তেজিত হইয়া রাজ্য বিস্তারে বাধা ঘটায় এই জন্য কোম্পানি মিশনারিদের শাসন করিয়া দিয়াছে।"

তবে এইসব মিশনারিদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টান ধর্মের মহিমা প্রচার এবং সম্ভব হলে এদেশীয় 'নেটিভদের' খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা।

সেই সময় বাংলাদেশে শিক্ষার ব্যবস্থা কতটা শোচনীয় ছিল তার প্রামাণ্য তথ্য মেলে ডাক্তার ফ্রান্সিস্ বুকানন হ্যামিলটন নামে এক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারির অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদন থেকে। আলোচ্য বিষয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা অংশে বলা হয়েছে, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে বাখরগঞ্জ জেলার ৯২৬৭২৩ সংখ্যক প্রজাবৃন্দের জন্য একটিও পাঠশালা ছিল না। দেশের কোন কোন স্থানে সংস্কৃতের চর্চা কিছু ছিল বটে, কিন্তু তা'ও ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায়ের শিক্ষাতেই পর্যবসিত ছিল। যে জ্ঞানের দ্বারা হৃদয় ও মন সমুন্নত হয়, জগৎপ্রকৃতি, মানবজাতি বা মনুষ্যত্ব কি এসব বুঝতে সাহায্য করে, তার চিহ্নমাত্র ছিল না। এমন কি বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি সম্পর্কে অনেক পণ্ডিত(!) ব্যক্তিও অজ্ঞ ছিলেন। শিক্ষা সম্পর্কে এই দুরবস্থা যখন এদেশে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন দেশের কতিপয় মানুষের জাগ্রত দৃষ্টি ও আগ্রহ স্থাপিত হ'ল ইংরেজ ও ইংরেজি শিক্ষা চর্চার দিকে।

মোটামুটি এইরকম যুগসন্ধিক্ষণে নগর কলকাতার সদ্য নাগরিক প্রতিষ্ঠা আর তারই কয়েক মাইল উত্তরে শ্রীরামপুরে উইলিয়ম কেরী, জোসুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড নামে তিন খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক ইউরোপবাসীর আগমন ঘটে। শ্রীরামপুর তখন ডেনমার্কের অধীন। আর সদ্য অধিকারপ্রাপ্ত ইংরেজ বণিক সমাজ, শাসকবর্গের সহযোগিতা সত্ত্বেও তখনও নিজেদের ধনগর্ব, শক্তিমত্তা বা প্রভুত্ব প্রদর্শনের উপযুক্ত শক্তি অর্জনে অসমর্থ হওয়ায়, স্বদেশাগত ধর্মপ্রচারকদের কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্বধর্ম প্রচারে বাধা দেন। কারণ তখনও দেশীয় ধর্মপ্রাণ প্রজাবৃন্দের যে কোন উপায়ে ধর্মান্তরকরণের প্রবল বিরোধীভাবাপন্ন এমন কি বিদ্রোহভাবাপন্ন হয়ে ওঠার বিস্তর সম্ভাবনা বা আশঙ্কা উপস্থিত ছিল। সুতরাং এই খ্রিস্টান মিশনারিরা ডেনমার্ক অধিপতির অনুমতি নিয়েই কলকাতার পরিবর্তে শ্রীরামপুরে এসে বাস করতে থাকেন। সময় : ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর। ধর্মপ্রচারক হিসাবে এই মিশনারিদের প্রথম সাফল্য আসে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে। এই শ্রীরামপুর মিশনারিরা হুগলির পীতাম্বর সিং(সিংহ) নামে এক কায়স্থ সন্তানকে সর্বপ্রথম খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। এরপর থেকেই ধীরে ধীরে খ্রিস্টধর্মগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এরই সঙ্গে মিশনারিদের সামনে সেইসব সদ্যধর্মান্তরিত দেশীয় প্রজাবৃন্দকে উপযুক্ত এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলার এক অলিখিত দায়িত্ব উপস্থিত হয়। এর ফলে ভবিষ্যতে কেবল বাংলাদেশই নয় সমগ্র ভারতবর্ষই উপকৃত হয়েছিল।

উদ্যোগ পর্ব : খ্রিস্টধর্ম প্রচার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যানুশীলন

"খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করা যদিও ঐ সাহেবদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গলাভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যেরূপ চৈতন্য সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গালা পদ্য রচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী পাদরী সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গালা গদ্যরচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।"

— রামগতি ন্যায়রত্ন, 'বাঙ্গালাভাষা ও বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' ১ম সংস্করণ, সংবৎ ১৯৩০।

খ্রিস্টিয় ধর্মপ্রচারের কাজ নিয়ে যেসব ইউরোপীয় এদেশে আসেন তাঁদের অগ্রপথিক ছিলেন জন টমাস। ইনিই বঙ্গদেশে প্রথম ব্যাপ্টিস্ট পাদরি। অবশ্য পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ১৭৫৮ সালে লর্ড ক্লাইভ ট্রাঙ্কেবর মিশনের ডেনিশ পাদরি কিয়ারনাণ্ডারকে বাংলাদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য আনিয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেশীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিশেষ যোগ ছিল না। তিনি মূলত পর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান ও ফিরিঙ্গিদের মধ্যে ধর্ম ও শিক্ষা বিতরণ করতেন। কলিকাতা মিশন স্কুল ও মিশন চার্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কিয়ারনাণ্ডার যদিও ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, ধর্মপ্রচারক হিসাবে জীবনের শেষ কুড়িটা বছর তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। চারিত্রিক নানা দৌর্বল্যের কারণে শেষ জীবনে চরম লাঞ্ছনা ও দারিদ্রের সম্মুখীন হন। পরে তিনি ব্যাণ্ডেলে গিয়ে বসবাস করেন এবং সম্ভবত সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। *

* "In 1759 he opened an English School for Armenians, Bengalis, English and Portuguese, in a year, it contained 135 scholars, some of whom were Brahmans, and made no objection to be taught the Christian doctrines - he (Kaernander) also took charge of the Charity School (the present Free School). One of his first converts was a Brahman ... In seven years he had about

জন টমাস এদেশে আসেন ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ইংলন্ডের গ্লশেস্টারসায়ারের ফেয়ারফোর্ডে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : 'যদিও গ্লশেস্টারসায়ারের ফেয়ারফোর্ড অঞ্চলের ব্যাপ্টিস্ট চার্চের প্রধান আমার পিতা আমাকে প্রভুর পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করতে এবং একান্ত আশ্রয়স্থল বলে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন, তবুও আমি তাঁকে সম্পূর্ণ হতাশ করে ফেলেছিলাম। অন্তত ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমার পাপের ভার কমাতে ঈশ্বরের কোন সহায়তাই আমি লাভ করিনি। এমন কি যথেষ্ট বেশি বয়সে বিবাহ করেও আমার স্ত্রী ও আমি এক বিভীষিকাময় জীবনযাপনে বাধ্য হই। তখন আমি গ্রেট নিউ পোর্ট স্ট্রীটে শল্যচিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যার কাজ করতে থাকি, কিন্তু সাফল্যের চাইতে অসাফল্যই বড় হয়ে ওঠে আমাদের জীবনে। তখন যাবতীয় পার্থিব সম্পদের হাত থেকে রেহাই পেতে স্থাবর যা কিছু ছিল সবই বিক্রি করে দিই আর ১৭৮৩ সালেই 'অক্সফোর্ড ইন্ডিয়াম্যান' জাহাজে ডাক্তারের চাকরি নিয়ে বাংলাদেশে পাড়ি দিই। কলকাতায় এসেও কোন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সাক্ষাত পাইনি' [Periodical Accounts relating to Baptist Missionary Society.] কারণ তখনকার কলকাতার ইংরেজ সমাজ ধর্ম ও নীতিবিজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইত না। তারা তখন নারী, সুরা, ভুয়েল ও জুয়ার মোহে অন্ধ; দেশীয় পোদ্দার ও ধনীদের হাতে ঋণভারে জর্জরিত ; তাদের কাছে ঈশ্বর আর শয়তান শব্দ যুগল একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত; কালীঘাটের মন্দির আর হিন্দু পূজাপার্বণে তাদের তখন নিয়মিত উপস্থিতি। অন্তরে জাগ্রত ধর্মবোধে আচ্ছন্ন এবং মর্মাহত জন টমাস 'রিলিজিয়াস সোসাইটি' নাম দিয়ে তৎকালীন সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজদের কাছে যীশু খ্রিস্টের বাণী প্রচার এবং স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে 'গস্পেল' প্রকাশের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে এক 'আবেদনপত্র' বিজ্ঞাপন হিসাবে প্রকাশ করলেন। বিজ্ঞাপনটি বেনামিতে ইন্ডিয়া গেজেটে প্রকাশের তারিখ ১লা নভেম্বর ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ। (Periodical Accounts...) প্রত্যুত্তরে টমাস দুটি চিঠি পান 'ইন্ডিয়া গেজেট' মারফৎ। একটির লেখক ছিলেন কলকাতা প্রেসিডেন্সী চার্চের তৎকালীন চ্যাপলেন রেভারেন্ড ডব্লিউ. জনসন, অপরটি বেনামি চিঠি—পরে জানা যায় সে'টি উইলিয়ম চেম্বার্সের লেখা। চেম্বারস্-এর জবাব ছিল : If A.B.C. will open a subscription for a translation of the New Testament into the Persian and Moorish languages (under the direction of proper persons), he will meet with every assistance he can desire, and a competent number of subscribers to defray the expense" এই উইলিয়ম চেম্বারস ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব্ ডিরেকটরস-এর চেয়ারম্যান চার্লস গ্রান্ট -এর ভগ্নীপতি আর রামরাম বসু ছিলেন চেম্বার্সের খাশ মুনশী।

ইতিমধ্যে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ জন টমাস আর্ল অব্ অক্সফোর্ড জাহাজেই স্বদেশে ফেরেন। তবে তার আগে তিনি মালদহের রেসিডেন্ট চার্লস গ্রান্টের অসাধারণ ধর্মপ্রীতি ও সাহিত্যচর্চার কথা শুনেছিলেন। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ অক্সফোর্ড জাহাজে চেপেই টমাস ১৪ জুলাই বাংলাদেশে

---

60 converts from Hinduism."- "The History of Christianity in India,; From the Commencement of the Christian Era - By Rev. J. Hough, 1845, Vols. 3rd, 4th পুস্তকের আলোচনা প্রসঙ্গে — The Calcutta Review, Vol V No.9 (Jan-June 1846)-এ লিখিত। তবে এই উক্তির সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই। বরং কেরী প্রমুখের জীবনচরিত রচয়িতা জে.সি. মার্শম্যান বিপরীত কথাই বলেন। উক্ত The Calcutta Review -তেই লেখা হয়েছে "Mr. Hough next gives an account of the missionary labours of the Rev. D.Browne, who established a school for Hindu orphans, and forsook the lucrative appointment of Chaplain to the Military Orphan Asylum ... in 1789 the Rev. T. Clark arrived as Missonary but within a year he proved to be a renegade ...."

প্রত্যাবর্তন করেন। তখনও তিনি ওই জাহাজের ডাক্তার।

সেই বছরেই কিয়ারনান্ডারের পতন এবং কলকাতা অরফ্যান্ স্কুলের দায়িত্বভার অর্পিত হয় রেভারেন্ড ডেভিড ব্রাউনের হাতে। এই সময়েই টমাস পরিচিত হন উইলিয়ম চেম্বার্স, জর্জ উড্‌নী এবং স্বয়ং চার্লস গ্রান্টের সঙ্গে। আর ১৭৮৬-র ডিসেম্বর মাসে টমাস লিখে ফেলেন "A Word of Comfort and Encouragement to the Poor Afflicted People of God" নামে পুস্তিকাটি সাধারণের কাছে বিতরণের জন্য। মালদহ প্রত্যাগত চার্লস গ্রান্টের পরামর্শেই জন টমাস ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারী 'অক্সফোর্ড' জাহাজের চিকিৎসকের চাকরী ছেড়ে এদেশে বসবাস শুরু করেন এবং হিন্দুদের মধ্যে বাংলা অনুবাদে 'গস্‌পেল' প্রচারে নিজেকে নিযুক্ত করেন। *ডাক্তার জন টমাস হলেন পাদরি টমাস।

নতুন কাজে ব্রতী হবার জন্যই টমাস বাংলা ভাষা এবং দেশীয় লোকের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম ও শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার রপ্ত করেন। তবে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ সংগ্রহ করেও তিনি বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। তবুও চার্লস গ্রান্টের উৎসাহে বাংলা ভাষা যৎকিঞ্চিৎ আয়ত্ত করে টমাস মালদহ অঞ্চলের কালা আদমিদের মধ্যে প্রচার কার্য চালালেন৺ — এইরকমই সাময়িকভাবে স্থির হয়। কিন্তু আসল সমস্যা তখনও সমাধান না হওয়ায় টমাস পুনরায় গ্রান্টেরই শরণাপন্ন হলেন। গ্রান্ট তখন ভগ্নীপতি উইলিয়ম চেম্বারসের কাছে অনুরোধ জানালেন, টমাসকে বাংলা শেখানোর দায়িত্ব যেন তিনি তাঁর মুনশী রামরাম বসুর উপর ন্যস্ত করেন। রামরাম বসু ততদিনে ইংরেজি বলতে শিখেছেন কিন্তু পড়তে শেখেননি। অতএব মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই চেম্বার্স নিজের মুনশীকে এই কাজের দায়িত্ব নিতে বললেন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ জন টমাস এবং রামরাম বসুর যোগাযোগ ঘটে। এই সময়েই আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের গোড়াপত্তন ঘটে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারক প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির পত্তন হয় ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে, লন্ডন মিশনারি সোসাইটি ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে এবং চার্চ মিশনারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে। এছাড়া ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় স্কটিশ মিশনারির কাজও শুরু হয়েছিল।

বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসারে মিশনারিদের অবদান

অনাথনাথ বসু লিখেছেন : "মিশনারিরা যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই মুদ্রাযন্ত্র লইয়া গিয়াছেন, স্থানীয় ভাষা শিখিয়াছেন, সেই ভাষায় বাইবেল ও অন্যান্য গ্রন্থ ছাপিয়াছেন, খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করিয়াছেন, দেশের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার নিন্দা করিয়াছেন, যাহারা তাঁহাদের প্রলোভনে, প্ররোচনায়, বা শিক্ষায় স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছে তাহাদের আশ্রয় দিয়াছেন, তাহাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় করিয়াছেন। কোথাও বিদ্যালয় আগে হইয়াছে এবং বিদ্যালয়ের

* "......after a few weeks I became greatly concerned at heart for the condition of these perishing multitude of Pagans, in the darkness, and was inflamed with fervent desires to go and declare the glory of Christ among them. Waters enough have risen since to dampen, but will never utterly extinguish what was lighted up at the time. After much prayer and many tears, I gave myself up to this work, and the Lord removed difficulties out of the way ...." [Periodical Accounts relating to the Baptist Missionary Society, Vol]

৺ "to teach to the black fellows at Malda".-['The Life of John Thomas' by C.B.Lewis]

ভিতর দিয়া ধর্মপ্রচারের চেষ্টা পরে হইয়াছে ; কোথাও বা প্রচার কেন্দ্র আগে হইয়াছে পরে বিদ্যালয় হইয়াছে। এইভাবে ইংরেজ আমলের প্রথমভাগে মিশনারিদের চেষ্টায় এদেশে এক নূতন শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত হইয়াছিল। মিশনারিরা যে ইস্কুলগুলি প্রতিষ্ঠা করেন ..... প্রথমত সেখানে খ্রীষ্টানধর্ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিত ; বস্তুত সেই শিক্ষা দেওয়াই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।" আবার শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন : "শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের দুইদিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হইতে লাগিল। প্রথম, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধান করা, দ্বিতীয়তঃ দেশীয় ভাষাতে বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন করা।"

তবুও কাজটা সহজে করা যায়নি, কারণ ইংরেজ কর্তৃক ভারতীয়দের শিক্ষাদান অথবা জনশিক্ষা প্রসারের অনুকূল নীতি গ্রহণের সমস্যা ছিল একদিকে, অপরদিকে ছিল মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান ব্যবস্থার সূত্রপাত করা — এ দুয়ের মধ্যে উপস্থিত ছিল সরকারী এবং মিশনারি শিক্ষানীতি সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব। এমন কি লর্ড ময়রার (১৮১৩-২২) আন্তরিকতাপূর্ণ আবেদন সত্ত্বেও জনশিক্ষার প্রচারে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ বরাবর উদাসীনই ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ একদল মুখ্য এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারির প্রভাবে কোম্পানি প্রাচ্যবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতায় সম্মত হন। মিশনারিদের ভূমিকাই সমর্থন লাভ করে এবং কোম্পানির সনন্দ ও পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করার পর এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। এই বিশাল দেশে প্রাচীন শিক্ষাধারার পরিপোষণ এবং ইউরোপীয় ধারার বিদ্যা প্রবর্তনের ব্যবস্থা হয়। তবে ওইসব উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিদের অনেকেই তখন সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ভাষা আয়ত্ত করে নবাবিষ্কৃত প্রাচ্যভাষায় লিখিত পুস্তকাদি অনুশীলন করতে শুরু করেন। এবং এদেশীয় তথা প্রাচ্যবিদ্যার জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রী, তিনি লিখেছেন, "স্যার উইলিয়ম জোন্সের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কোলব্রুকের সময় পর্যন্ত ডাক্তার এইচ. উইলসন, জেমস, টোবি ও প্রিন্সেস ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অনেকে সংস্কৃতে গভীর বিদ্যা লাভ করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন, এদেশীয় পণ্ডিতগণ সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ; তাঁহারা সামান্য ব্যাকরণের সূত্র, সামান্য দুই-চারিখানি কাব্য, নব্য স্মৃতির দুই চারিটি ব্যবস্থা ও ন্যায়ের দুই চারিটি ফাঁকি লইয়া কালাতিপাত করিতেছেন; প্রকৃত বিদ্যা ও প্রাচীন গ্রন্থাবলী দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।"

এ পর্যন্ত আলোচনায় দেখা যায় ধর্মপ্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও মিশনারিদের শিক্ষাদান ব্যবস্থার মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনও একান্ত প্রণিধানযোগ্য। বিদেশাগত পর্তুগীজ, দিনেমার, গ্রীক, ইংরাজ, ফরাসি মায় অস্ট্রিয়ান অধ্যুষিত হুগলির বিস্তীর্ণ জনপদে আসীন খ্রিস্টান মিশনারিরা শিক্ষাসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। উল্লেখ্য, শ্রীরামপুর মিশনারিদের প্রধান উইলিয়ম কেরী ও তাঁর সহকর্মীরা ধর্মপ্রচারের পাশাপাশি এদেশে প্রায় ১২৬টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং প্রায় দশ হাজার ছাত্রকে প্রাথমিক শিক্ষা ও খ্রিস্টধর্মের অনুশাসন সম্পর্কে শিক্ষাদান এবং খ্রিস্টের জীবনী সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি পরিবেশন করেছিলেন।

মিশনারি প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা, সংগঠন ও শিক্ষা সম্প্রসারণের ইতিহাস ও উপাদান সমৃদ্ধ তথ্যাদি অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। অন্যদিকে বাংলাদেশে নারী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই মিশনারিরা যে সুস্পষ্ট এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন সে বিষয়ের আলোচনা, বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে, যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বোধহয়।

ইতিহাসের ক্রমানুসন্ধানে জানা যায়, ১৮১৪ সালে চুঁচুড়াতে রেভারেন্ড রবার্ট মে নামে এক মিশনারি সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টাতে ১৪টি বালিকা নিয়ে একটি ইংরাজি বিদ্যালয় শুরু করেন। ভারতবর্ষে

এটিই সম্ভবত প্রথম এবং স্বতন্ত্র ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয়, যা পরে লন্ডন মিশনারি সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত হয়।*

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ উল্লেখ করা হয়েছে, শ্রীরামপুরের মিশনারিরা বাংলাদেশে (যুক্তবঙ্গ) বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। বিদ্যালয়গুলির নাম ইংরেজী ঘেঁষা। হয়তো সেইসব বিদ্যালয়ে স্থানীয় ভাষাভাষী মেয়েদের সঙ্গে ইংরেজ বালিকারাও পড়ত। তবে বেশির ভাগ ছাত্রীই যে বাঙালী ছিল তার কারণ ওইসব জায়গায় অনেকগুলিতেই হয় ইংরেজ বাসিন্দা একেবারেই ছিল না অথবা তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল খুবই কম। বিদ্যালয়গুলির নাম এবং ছাত্রীসংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

বিদ্যালয়ের নাম		ছাত্রীর সংখ্যা
লিভারপুল স্কুল	—	১৮
চ্যাটহ্যাম ইউনিয়ন (বল্লভপুর)	—	৩১
উইলিয়ম স্কুল (ঢোলিপুর)	—	১৪
রস্ স্কুল (মালোপাড়া)	—	১৪
কার্ডিফ্ স্কুল (বর্গীবাগান)	—	২০
পো ব্রী টোল্লা স্কুল	—	১৪
চ্যাটহ্যাম স্কুল (প্রথম মাহেশ)	—	২০
গ্লাস্‌গো স্কুল (দ্বিতীয় মাহেশ)	—	২২
ডান্‌ফার্মলিন্ স্কুল (প্রথম এসেরা)	—	১৬
স্টারলিং স্কুল (দ্বিতীয় এসেরা)	—	২০
এডিনবরা স্কুল (নবগ্রাম)	—	২৬
এক্সটার স্কুল (ছাতেরা)	—	২২

'সমাচার দর্পণ'-এ পরিবেশিত সংবাদ থেকেই আরও জানা যায় শ্রীরামপুর মিশনারিরা কেবলমাত্র মুসলমান মেয়েদের জন্যই পাঁচটি স্কুল খোলেন।

বিদ্যালয়ের নাম		ছাত্রীর সংখ্যা
শিউড়ি স্কুল	—	১০
তিলপাড়া স্কুল	—	৬

* শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আকর গ্রন্থ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন রবার্ট মে স্থাপিত ইংরাজী স্কুলে প্রথম দিন ১৬টি মাত্র বালক উপস্থিত হয়। কিন্তু ত্বরায় ছাত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে হুগলীর কমিশনার মি. ফর্বস্ ওলন্দাজদিগের পরিত্যক্ত পুরাতন কেল্লাতে স্কুলের জন্য একটি প্রশস্ত ঘর দিলেন। রেভারেন্ড মে সেখানে স্কুল করিতে লাগিলেন। দুই এক বৎসরের মধ্যে আরও কয়েকটি শাখা স্কুল স্থাপিত হইয়া ঐ সকল স্কুলে প্রায় ৯৫১ জন বালক শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। মি. ফর্বস্ স্কুলগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি দর্শনে 'প্রীত হইয়া গভর্নমেন্টের নিকট হইতে মাসিক ছয়শত টাকা সাহায্য দেওয়াইয়া দিলেন। রেভারেন্ড মে'র চুঁচুড়া স্কুলগুলির উন্নতি দর্শনে উৎসাহিত হইয়া বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর আপনার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাটিকে ইংরেজী স্কুলে পরিণত করিলেন।'

তেহেরা স্কুল	—	৭
অন্নদাপুর স্কুল	—	৬
হাসনাবাদ স্কুল	—	৫

'সমাচার দর্পণ' আরও খবর দিয়েছে যেমন মোটামুটি উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে শ্রীরামপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তেরটি স্কুল থেকে শ্রীগোপাল মল্লিকের বাড়িতে ২৩০ জন ছাত্রী প্রাথমিক পরীক্ষায় বসবার পুরস্কার স্বরূপ মিশনারিদের কাছ থেকে মাথাপিছু চার আনা পয়সা, জামাকাপড় এবং ছবি পেয়েছিল। এইসব স্কুলে বাইবেল পড়ানো আবশ্যিক ছিল। তবে কি ধরে নিতে হবে স্ত্রী শিক্ষায় এদেশে পথিকৃৎ ছিল অনুচ্চবর্ণের মেয়েরা ? কারণ উচ্চবর্ণের মেয়েদের লেখাপড়া সম্বন্ধে ছিল নানা কুসংস্কার। বাইবেলের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে গিয়ে তারাই কি হয়ে পড়েছিল পশ্চাৎপদ?

১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন তাদের চারটি শাখা বিদ্যালয় স্থাপন করেন :

চুঁচুড়াতে ৫৬টি ছাত্রী নিয়ে একটি ; বাঁশবেড়িয়াতে ৬০টি ছাত্রী নিয়ে দ্বিতীয়টি — এখানে গুরুদাস মৈত্র এবং ঈশানচন্দ্র ঘোষ শিক্ষকতা করতেন; ১০০টি ছাত্রী নিয়ে কালনাতে তৃতীয়টি — এখানে হেডমাস্টার ছিলেন স্বনামধন্য রেভারেন্ড লালবিহারী দে এবং কৈলাশচন্দ্র ঘোষ ও দীননাথ আঢ্য ; আর কালনা স্টেশনের কাছে মহানাদ গ্রামে ২০ জন ছাত্রী নিয়ে চতুর্থটি — এখানে জগদীশ্বর ভট্টাচার্য ও গোলাবচন্দ্র বিশ্বাস শিক্ষকতা করতেন। সমকালীন পূর্ববঙ্গেও শ্রীরামপুর মিশনারিরা বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। এই তথ্যটি শ্রীমতি চার্লস লেনার্ডের রিপোর্ট থেকে জানা যায়। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতি লেনার্ড ঢাকাতে 'দি খ্রিস্টান ফিমেল স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করেছেন। তাঁরই লিখিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে শ্রীরামপুর মিশনারিরা ৩০ জন ছাত্রী নিয়ে চালাতেন 'নারানদিয়া স্কুল'। এখানে ৯জন মেয়ে অন্তত পড়তে ও বানান করতে শিখেছিল। চট্টগ্রামের 'মুদ্দারবাড়ি' স্কুলে ৫০টি ছাত্রীর মধ্যে ৪৬টি বাৎসরিক পরীক্ষায় বসেছিল। স্কুলটিতে চারটি ক্লাস ছিল। শ্রীমতি জোহানেস্ পরীক্ষা নিতেন। এখানে প্রথম শ্রেণীতে যীশুখ্রিস্টের বাণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে নীতিকথা পড়ানো হ'ত। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠ্যসূচী ছিল বানান ও হাতের লেখা। বই ও কাগজ স্কুল থেকেই দেওয়া হত। স্কুলের ছাত্রীদের বেশির ভাগেরই বয়স ছিল ছয় বৎসরের নীচে। 'মোরাদপুরে'র মিশনারি স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১০ থেকে ১৭ জন। এখানে পড়ানো হ'ত 'মা ও মেয়ের কথোপকথন'। ভালুয়াডিগিতে ৩২ জন ছাত্রী নিয়ে মিশনারিরা যে স্কুল চালাতেন সেখানে পরবর্তী বছরগুলোতে ছাত্রীসংখ্যা বাড়লেও তাদের অনেকেই তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাবার জন্য স্কুল ছাড়তে বাধ্য হত। যশোহর জেলাতেও এইরকম মিশনরি চালিত স্কুলের বিবরণ পাওয়া গেছে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের Missionary Intelligence পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে। *

---

* আলোচ্য অধ্যায়ে যেহেতু মিশনারিগণ কর্তৃক বিদ্যালয় স্থাপন এবং শিক্ষাদান প্রসঙ্গ মুখ্য স্থান পেয়েছে, সেজন্য ১৭৫৭ সালে লর্ড ক্লাইভ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত 'ক্যালকাটা ফ্রি স্কুল', খিদিরপুরের মেজর জেনারেল বার্ক প্যাট্রিক স্থাপিত এবং কর্নেল অসবর্নের স্ত্রী পরিচালিত 'আপার অরফ্যান্ স্কুল', আলিপুরের 'লোয়ার অরফ্যান্ স্কুল', বৌবাজারে 'বেনেভোলেন্ট ইন্সটিটিউসন', জানবাজারের 'ফ্রি স্কুল ইন্সটিটিউশন', সুকিয়া লেনের 'নিউ স্কুল', কলকাতার 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি স্থাপিত স্কুলগুলি ; 'লেডিস্ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন ইন ক্যালকাটা অ্যান্ড ইট্স্ ভিসিনিটি পরিচালিত স্কুলগুলি, রাজা বৈদ্যনাথ রায় কর্তৃক ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত সেন্ট্রাল 'ফিমেল স্কুল', ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে নিমতলা স্ট্রীটে স্থাপিত 'ফ্রি চার্চ ইন্সটিটিউশন বা ভবানীপুরের ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত 'লন্ডন মিশনারি সোসাইটি'র স্কুলগুলি, বৈঠকখানা বাজার অঞ্চলের ফ্রি চার্চ ফিমেল ইন্সটিটিউশন অ্যান্ড অরফ্যান্ হোম', লোয়ার সার্কুলার রোডের কুমারী হেলেনের পরিচালনায় 'স্কটিশ লেডিস্ অ্যাসোসিয়েশনের স্কুলগুলি বা এটালীর 'এটালী খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশন', বৌবাজার ফিমেল ডে অ্যান্ড ফ্রি স্কুল', কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের 'ক্যালকাটা নরমাল, সেন্ট্রাল অ্যান্ড ব্রাঞ্চ স্কুল'গুলি সম্পর্কে তথ্যাদি এখানে পরিবেশন করা গেল না।

শ্রীরামপুর মিশনারি ও শ্রীরামপুর কলেজ

ইংলন্ডের ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির ধর্মপ্রচারকরা যখন কোম্পানির রাজত্বের সীমানায় ধর্মপ্রচারের প্রতিকূলতা উপলব্ধি করে দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে আশ্রয় নেন তখন থেকেই তাঁরা স্থানীয় গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মপ্রচার করতে গিয়ে সমকালীন সংস্কৃতি ও শিক্ষার অন্ধকার দিক, বিশেষত একাধিক সামাজিক অনগ্রসরতার কুনিদর্শনের সঙ্গেও পরিচিত হন। মিশনারিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন স্থানীয় মানুষদের সামনে ধর্ম নয়, শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বালাতে চাইলেন। আগ্রহ দেখা দিল উভয় পক্ষেই, এই আগ্রহবোধ সৃষ্টির পশ্চাতে কোন সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক চৈতন্যের উদ্বোধন হয়েছিল কিনা সে'টি সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, সুদূর গ্রাম থেকে আগত কৃষিজীবী মানুষ তাদের পণ্য নিয়ে স্থানীয় হাটে বিক্রয়ের পর ফিরে যাবার সময় সাহেব-মেম মিশনারি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করতে সক্ষমই শুধু হ'ল না, ফেরবার আগে দু'চারটি সাধারণ ইংরেজী শব্দ এবং তার বাংলা রূপান্তর অথবা বাংলা গ্রামীণ ভাষা ইংরেজীতে কেমন করে বলতে হয় তাও শিখে গেল। আধুনিক প্রচার ব্যবস্থার চেয়ে বহুগুণ বেগে প্রসারিত হয়ে ইংরাজি শিক্ষার স্রোতধারা গ্রাম বাংলার গভীর অন্দরে বাহিত হল।

ইতিমধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস সদ্যরাজ্যভ্রষ্ট মুসলমানদের সংস্কৃতি অভিমানী মনকে কতকটা অনুরাগী করার জন্য এবং তাদের সামনে উপার্জনক্ষম বৃত্তির নিদর্শন স্থাপন করার জন্য ১৭৮১ খ্রি: কলকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন; উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার জন্য স্থাপিত হল সংস্কৃত কলেজ। স্থান উত্তরভারতের কাশী, সময় ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ। উদ্দেশ্য যাই থাক, প্রসারিত হতে থাকল নূতন শিক্ষার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। ইতিমধ্যে কলকাতায় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ সরকারী আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠা হয়েছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। লর্ড ওয়েলেসলির একান্ত উৎসাহে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার নামক ওড়িশাবাসী পণ্ডিত, উইলিয়ম কেরীরা যোগ দিলেন শিক্ষক হিসাবে। আর রামরাম বসু, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখেরা ওঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন গ্রন্থপ্রণেতা হিসাবে। তবে সেই গ্রন্থাদির অধিকাংশই ছিল ফারসি সমৃদ্ধ এবং দুর্বোধ। এই পটভূমিকায় শ্রীরামপুরে কলেজ স্থাপনের স্বপ্ন দেখলেন মিশনারিদের অন্যতম প্রধান জোশুয়া মার্শম্যান ও তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনী হান্না মার্শম্যান।

মুখ্যত এই অনন্যগ্রাহী দম্পতির সার্বিক প্রচেষ্টায় এখন থেকে ১৮২ বছর আগে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই প্রতিষ্ঠা হল শ্রীরামপুর কলেজ। শ্রীরামপুর মিশনারি গোষ্ঠীপতি উইলিয়ম কেরী এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এতদিনে তা বাস্তবে রূপায়িত হল। সমগ্র এশিয়ার এইটিই প্রথম খ্রিস্টান কলেজ। মোট ৩৭ জন ছাত্র নিয়ে কলেজটি শুরু হয় অ্যার্ল্ডিন হাউস নামক একটি ভবনে এবং ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে নূতন ভবন নির্মিত হলে সেখানে স্থানান্তরিত হয়।

মিশনারিদের তত্ত্বাবধানে কলেজে শিক্ষাদান এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি পরিচালিত হত কিন্তু তখনকার কলেজ কর্তৃপক্ষের ছাত্রছাত্রীদের, স্নাতক বা ডিগ্রী দানের কোন অধিকার ছিল না। এমন কি প্রচলিত অধিকারের কোন ভিত্তি ছিল না কারণ শ্রীরামপুর তখন ডেনমার্করাজের অধীন।

সে কারণেই ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে জোশুয়া মার্শম্যান ইউরোপে যান এবং ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহাগেন-এ গিয়ে রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিকের অনুমোদিত এবং স্বাক্ষরিত সনন্দপত্র সংগ্রহ করেন। এই রাজকীয় সনদের বলে প্রাপ্ত অধিকার অনুসারে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রী প্রদানে সক্ষম হন। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ডেন-অধিকৃত শ্রীরামপুর অঞ্চল ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ক্রয় করার পরেও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীরামপুর কলেজটির অনুমোদন কাল পর্যন্ত

ডেনমার্ক রাজ প্রদত্ত সনন্দ ও সংশ্লিষ্ট শর্তাদি মেনে চলা হত।

শিক্ষানীতি প্রবর্তন সংক্রান্ত সরকারী এবং বেসরকারী মতের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব যদিও এই সময় এক ধরণের সমাধানের পথ প্রশস্ত করেছিল কিন্তু প্রাচীন ও নবীন শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে নূতন দ্বন্দ্ব দেখা দিল। ইতিমধ্যে রামমোহনের আবির্ভাব এবং ডেভিড হেয়ারের আগমন—এই দুয়ের সম্মিলিত যোগফল হল—এদেশে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করার প্রয়োজনীয়তার একান্ত উপলব্ধি। এরই ফলশ্রুতি ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ এবং স্কুলবুক সোসাইটি এবং কলকাতায় বেশ কয়েকটি নূতন বিদ্যালয় স্থাপন। অন্যদিকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল, যথাক্রমে শ্রীরামপুর কলেজ ও বিশপস্ কলেজ। শেষ পর্যায়ের দ্বন্দ্বে মিশনারিদের প্রাধান্য ও সাংগঠনিক শক্তির জয় হয়ে উঠল অনিবার্য।

শ্রীরামপুর মিশনারি ও সমাজ সংস্কার

'তাঁহারা (শ্রীরামপুরের মিশনারিরা) ১৮০৪ অব্দে চারিজনকে কলিকাতা ও চতুঃপার্শে পঞ্চদশ ক্রোশ মধ্যে সহমরণ সংখ্যা গ্রহণ করিতে প্রেরণ করিলেন। - - - কেরী সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণকে উক্ত প্রথা শাস্ত্রসম্মত কিনা তাহার প্রমাণ পঞ্জী প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতঃ লর্ড ওয়েলেসলি বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। তন্মধ্যে তিনি ইহা উল্লেখ করিলেন যে, এই জঘন্য নৃশংস প্রথা রহিত করণার্থে গভর্নর জেনারেলকে একটি আইন বিধিবদ্ধ করিতে বিনয়পূর্বক নিবেদন করিলেন; গভর্নমেন্টের কাগজে সহমরণ প্রথা বিষয়ে এই প্রথম উল্লেখ। কিন্তু গভর্নর জেনারেল বাহাদুর স্বল্পকাল মধ্যে স্ব পদ পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া এই গুরুতর চিরপ্রচলিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পরামর্শ সিদ্ধ ও বিহিত বলিয়া বোধ করিলেন না।'

— মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী : 'আদর্শ চরিত, কিম্বা কেরী, ওয়ার্ড এবং মার্শম্যান চরিত', ১৮৮০

'হুগলি এবং সন্নিহিত অঞ্চলে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে শ্রীরামপুর মিশনারিদের অবদান' বিষয়ে আলোচনায় পাদরিদের সম্পর্কে জনসাধারণের মনে এক প্রকার বিরূপ মনোভাব প্রদর্শনের বিষয়টি স্বতঃই বিশেষ মূল্যবান মনে হয়। এখানে জনসাধারণ অর্থে সাধারণভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনসাধারণকেই বোঝানো হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্র ও ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে শ্রীরামপুর মিশনারিরা বিলাতে তাঁদের বন্ধুদের কাছে লিখিত পত্রে এবং তাঁদের দিনলিপিতে যে কুৎসিত এবং বিরুদ্ধ মতবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, সেই মিশনারিরাই কেমন করে ভারতীয় সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলি নিয়ে ভেবেছেন; সংস্কারের জন্য সম্ভাব্য পদ্ধতি- প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন, সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে কুসংস্কার রোধের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন—এসব ভাবলে বেশ অবাক বোধ হয়। এবং আরও আশ্চর্য বোধ হয় যখন দেখি সতীদাহ প্রথা বিরোধিতা ও নিবারণের জন্য রামমোহন রায়ের স্থায়ীভাবে কলকাতায় আগমন ও বসবাসের বেশ কয়েক বছর দেরি রয়েছে। সেইরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে শ্রীরামপুর মিশনারিরা এক সার্বিক বিরোধিতার ঝুঁকি নিয়েও গঙ্গাসাগরে শিশুসন্তান বিসর্জন এবং সতীদাহ নামক কুপ্রথা নিবারণের উদ্দেশ্যে অনলস প্রচেষ্টা করে গেছেন।

এখানে অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে তখন হেস্টিংস, জোনস, কোলব্রুক, উইলকিন্সদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। তাঁদের পরিত্যক্ত স্থান পূরণ করতে এগিয়ে এসেছেন ল্যাড্, ক্যানিংহাম, লিডেমান ও বোল্ট প্রমুখ ভাবুক লেখকরা। এঁরা এবং সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্ররা কুসংস্কার-বিরোধী লেখা দিয়ে 'ওরিয়েন্টাল স্টার' পত্রিকার পাতা ভরাচ্ছেন।

সুতরাং নিঃসন্দেহে একথা বলা সঙ্গত ঠেকে যে তৎকালীন বাংলায় যে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের

ধারা প্রবাহের শুরু তার একদিকে ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য, ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ পর্ব, যার সঙ্গে যুক্ত হয় খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টা এবং অপরদিকে সামাজিক তথা ধর্মীয় কুসংস্কারের হাত থেকে নারীমুক্তির জন্য অনলস প্রচেষ্টা। সে যুগে সমাজে-সংসারে নারীর স্থান ছিল নিতান্ত অসহায়, কুপ্রথা আর অমর্যাদার পঙ্কে নিমজ্জিত। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে শুরু থেকেই ইংরাজ রাজকর্মচারীরা এই অমানবিক প্রথা মেনে নিতে পারেন নি, তেমনই বিদেশাগত খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণও এই ভয়াবহ এবং নৃশংস প্রথাকে আর সহ্য করতে পারছিলেন না। ১৭৭২ সালে আলেকজান্ডার ডাফ তাঁর "The History of Hindustan" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন, "All religions must be tolerated in Bengal except in the practice of some inhuman customs. We must not permit younger widows, in their virtuous enthusiasm, to throw themselves on the funeral pyre, with their dead husbands, nor the sick, and aged to be drowned, when their friends despair of their lives."

এরও দীর্ঘ সময় পরে যখন শ্রীরামপুর মিশনারিদের দৃষ্টি এই নৃশংস এবং জঘন্য প্রথা সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে-তখন তাঁরা কেবল বঙ্গদেশই নয়, সমগ্র ভারতের যেখানে যেখানে এই নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত সেখানকার সহমরণ এবং গঙ্গাবক্ষে শিশুসন্তান বিসর্জন সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ করেছেন। এই ধরণের আগ্রহবোধ ও প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবেই শ্রীরামপুর মিশনারিদের গোষ্ঠীপতি উইলিয়ম কেরী ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন : "I consider that the burning of women, the burying them alive with their (dead) husbands, as in the case of many joggies, the exposure of infants (female), and the sacrifice of children at Sagar ought not to be permitted, whatever religious motives may be pretended, because they are all crimes against the State". এই ১৮০২ খ্রিস্টাব্দেই গভর্নর ওয়েলেস্‌লি ঘোষণা করেন, সাগর দ্বীপে কোন শিশু সন্তানকে জলে ফেলে দেবার জন্য (বলাই বাহুল্য, জীবিত সন্তান) দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের অত্যন্ত কঠিন শাস্তি পেতে হবে। এরপর থেকেই সাগরমেলা উপলক্ষে আগত পুণ্যার্থীদের মধ্যে সাগরে শিশুসন্তান বিসর্জনের ঘটনা উল্লেখজনক ভাবে কমে আসে।

সহমরণ প্রথা নিবারণের চেষ্টা যে এদেশের কতিপয় রাজকর্মচারী তথা শাসকবর্গের মনে বলবতী ছিল সে সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন : "এদেশে ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ইংরাজ রাজপুরুষগণের দৃষ্টি এই নৃশংস প্রথার উপরে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম প্রথম এদেশের লোকে ধর্ম বা সামাজিক বিষয়ে হস্তার্পণ করিলে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় এই ভয়ে তাঁহারা সর্বদা সঙ্কুচিত থাকিতেন; সুতরাং তাঁদের চক্ষের সমক্ষে শতশত বিধবাকে মৃত পতির চিতানলে দগ্ধ করা হইত, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেন না। এমন কি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের কাশিমবাজারস্থ কুঠির সমক্ষেই রামচাঁদ পণ্ডিত নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের অষ্টাদশ বর্ষীয়া বিধবা পত্নী সহমৃতা হন। তখন সার ফ্রান্সিস রাসেল কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্নী ও পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ মিস্টার হলওয়েল সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। হলওয়েল স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় লেডী রাসেল (Lady Russel) নাকি ঐ রমণীকে বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ইংরাজ কর্মচারিগণ দাঁড়াইয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে সাহসী হইলেন না।

এইভাবে বহুদিন গেল। অবশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি একটা দৃঢ়তর রূপে স্থাপিত হইলেই এই প্রথা নিবারণের জন্য কিছু করা উচিত বলিয়া তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের

৫ই জুলাই গভর্নর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি উইলিয়ম বেইলী বিধবাদিগকে যাহাতে বলপূর্বক দাহ করা না হয় তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য তৎকালীন নিজামত আদালতকে এক পত্র লিখিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, তৎকালে গভর্নর জেনারেল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহার আইনাদি প্রণয়ন করিবার অধিকার ছিল না। দেওয়ানী আইনাদি প্রণয়ন করিতে হইলে তাঁহাকে সদর দেওয়ানী আদালতের সম্মতি ও ফৌজদারী কিছু করিতে হইলে নিজামত আদালতের অনুমতি লইতে হইত। কারণ উক্ত উভয় আদালত ইংলণ্ডাধিপতির অধীন ছিল এবং তাঁহাদের অনুমতি ইংলণ্ডাধিপতির অনুমতি বলিয়াই পরিগণিত হইত। তদনুসারে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ঐ প্রশ্ন নিজামত আদালতের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিজামত আদালতে ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য নামে একজন কোর্ট-পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাকে সহমরণ বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন করা হইল। ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন বিধবাকে পতির চিতার সহিত বাঁধিয়া দেওয়া শাস্ত্র ও সদাচার উভয়-বিরুদ্ধ। ইহার পরে বহুদিন পর্যন্ত এবিষয়ে আর কিছুই করা হইল না।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা আগষ্ট বুন্দেলখণ্ডের ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েকটি সহমরণের কথা নিজামত আদালতে গোচর করিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিবার ইচ্ছা করিয়া পত্র লিখিলেন। তদনুসারে ৩রা সেপ্টেম্বর নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার গভর্নর জেনারালকে বিধবাদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ প্রার্থনীয় বলিয়া পত্র লিখিলেন। ইহার পরেও কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গেল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এই প্রথা বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অনুসন্ধান কার্য্য শেষ হইলে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি রাজবিধি প্রণীত হইল। এই আদেশ প্রচার হইল যে, সহগমনার্থিনী বিধবাকে অগ্রে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা অন্য কোনও রাজকর্মচারীর নিকট অনুমতি পত্র লইতে হইবে। এই বিধি প্রচার হইলেই হিন্দুসমাজ মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল।"

দেশের এইরূপ যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভাব হল যুগপুরুষ মানবতন্ত্রী রামমোহন রায়ের; রঙপুরের বাস চুকিয়ে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে এসেই তিনি এই বিবাদের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন। এই রামমোহন, যিনি কেবলমাত্র নিজের চিত্তকে মুক্ত ও জ্ঞানোজ্জ্বল করার লক্ষ্যে স্থির থাকেন নি, তাঁর সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন চারদিকের অজ্ঞান অন্ধকারকে দূর করতে, চেয়েছিলেন হিন্দুসমাজকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর সমাজসেবার দিকে চালিত করতে। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন যে পুণ্যকর্ম বলতে হিন্দু প্রথমেই বোঝে যাগযজ্ঞ, পূজোআর্চা, আচার-অনুষ্ঠান- সমাজসেবা অথবা প্রতিবেশীর হিতসাধক কাজ তেমন নয়। তাই জন্য অদম্য ধর্মসংস্কারক রামমোহন শুধু ধর্মব্যাখ্যাতা হিসাবে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাধা অতিক্রম করেই লিখতে পেরেছিলেন, "Christians understand by works action of moral merit, whereas Hindus use the term in their theology only to denote religious rites and ceremonies".*

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত সতীদাহ নিবারণের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে রাজকীয় বিধি বিষয়ে সম্যক অবগত হয়েই রামমোহন সরকারী উদ্যোগের প্রশংসা করেন। এরই উল্লেখ করে 'ক্যালকাটা জার্নাল' এবং 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ লেখা হয় : "An eminent native philanthropist , who has long taken the lead of his countrymen on this great question of humanity and civilised government has been encouraged to submit his view of it in a written form, and has been subsequently honoured with an audience by the

* The English Works of Raja Rammohan Roy, ed. Kalidas Nag and Debajyoti Burman, Part II, p. 100)

Governor General who we learn has expressed his anxious desire to put an end to a custom constituting such a foul blot on the character of our native subjects, as well on that of the British Indian Government, which permits and sanctions it."

কিন্তু এই নৃশংস এবং লজ্জাজনক প্রথা সম্পূর্ণ নিবারণের জন্য বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়নে অতিরিক্ত টালবাহানা লক্ষ্য করেছিলেন রামমোহন। তাই তিনি স্থির করেন তাঁর আন্দোলন প্রসারের জন্য লেখনীধারণ বিশেষ প্রয়োজন। সতীদাহপ্রথার সক্রিয় বিরোধিতা করেই তিনি 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ', 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ', 'সহমরণ বিষয়' নামে কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন। এর ফলেই যেমন সহমরণ বিষয়ে তাঁর মতামত প্রচারের সুযোগ উপস্থিত হল, তেমনই প্রবল হয়ে উঠল তাঁর বিরুদ্ধবাদী আন্দোলনও। তবে মনে রাখা দরকার এখানে রামমোহনের ভূমিকা ছিল প্রধানত যুক্তিবাদী, শাস্ত্রবলে বলীয়ান লেখকের; বক্তা আলোচক ও আন্দোলনকারীর ভূমিকা তাঁর ছিল না। অপরদিকে ২৭শে মার্চ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের 'ইন্ডিয়া গেজেট'- এ একটি চিঠি প্রকাশিত হল। তার বয়ানের সংক্ষিপ্ত রূপ এইরকম :

"..... the practice of burning widows is still continued and in the manner which has been declared illegal and murderous. At this I cannot help astonishment, as I am at a loss to conceive how persons can reconcile themselves to the stigma of being accused of woman murder ..... I feel also both surprise and regret that European gentlemen, who boast of the humility and morality of their religion, should conduct themselves towards persons who submit quietly to the imputation of murder with the same politeness and kindness they would show to the most respectable persons ...." চিঠির লেখক রামমোহন রায়ের অন্যতম বিশ্বস্ত সুহৃদ স্বামী হরিহরানন্দ। এরপর থেকেই সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার আন্দোলন শক্তি সংগ্রহ করতে থাকে। *

---

*১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলকাতার কাছেই এক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সহমরণে বাধা করতে ব্যর্থ হওয়ার আক্রোশেই এই হত্যাকাণ্ড। এর বিবরণ পাওয়া গেছে লর্ড আমহার্স্টের বিদুষী পত্নীর ব্যক্তিগত দিনলিপি থেকে। শ্রীমতি আমহার্স্ট লিপিবদ্ধ করেছেন : "A young man having died of cholera his widow resolved to mount the funeral pile. The usual preparations were made, and the licences procured from the Magistrate. The fire was lighted by the nearest relations; when the flame reached her, however, she lost courage, and amid a volume of smoke and the deafening screams of the mob, tomtoms, drums etc., she contrived to slip down unperceived, and gained a neighbouring jungle. At first she was not missed, but when the smoke subsided, it was discovered she was not on the pile. The mob became furious and ran into the jungle to look for the unfortunate young creature, dragged her down to the river, put her into a dingy, and shoved off to the middle of the stream, when they forced her violently overboard and she sank to rise no more!" এই হত্যাকাণ্ড কলকাতাবাসী ইংরেজদেরই নয়, সমকালীন নিষ্ঠাবান হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমাজ সচেতন মানুষের মনেও এক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। শুধু তাই নয় রামমোহন রায়ের মত ও পথের অনুরাগী বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও নূতন উদ্যমে সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। তবুও পাছে এদেশের লোকের ধর্ম বা সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং তার ফলে যদি কোম্পানি সরকার বাহাদুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় তাই সেই বীরপুরুষেরা চোখের সামনে শতশত বিধবা তরুণীকে অকাল-মৃত পতির চিতায় তুলে ধর্মের নামে আগুনে পোড়ানো হচ্ছে দেখেও দেখতে চাইতেন না, ভয়ে সংকুচিত হয়ে থাকতেন। রাজ্য অধিকারের তীব্র বাসনা ইংরাজদের সংস্কার সাধন স্পৃহাকে পরাজিত করলেও, মিশনারি অথবা রামমোহনকে থামাতে পারেনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা থেকে।

আরও ক'টি মূল্যবান বৎসর অতিবাহিত হবার পরেই, ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা নিবারণ করে নিম্নোক্ত আদেশ প্রচার করলেন:

> "It is hereby declared, that after the promulgation of this regulation, all persons convicted of aiding and abetting in the sacrifice of a hindu widow by burning or burying her alive, whether the sacrifice be voluntary on her part or not, shall be deemed guilty of culpable homicide and shall be liable to punishment by fine or imprisonment or both by fine and imprisonment." *– Regulation of 4th December 1829.*

উপরোক্ত আলোচনায় একটি ঐতিহাসিক সত্য স্পষ্টতর হয়েছে যে 'সতী' প্রথা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই নয়, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও ব্যাপক ভাবে প্রচলিত এবং ধর্মবিধিসম্মত ছিল।

সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের সূত্রে শ্রীরামপুর মিশনারিদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় জানা যায় হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত এই সামাজিক কুপ্রথা এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোম্পানি-সরকার সচেতন হন ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে। কিন্তু শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারিরা যে এই বিষয়ে অনুসন্ধান এবং তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রচারের কাজে অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন — সে খবর তাঁরা রাখতেন বলেই এই অনুসন্ধান নিয়ে সরকারী তৎপরতা শুরুর দায়িত্ব দেওয়া হয় উইলিয়ম কেরীকে। প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর নির্ভর করে কেরী তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তে জানিয়েছেন যে, বছরে প্রায় পঁচিশ হাজার প্রাণকে এইভাবে হত্যা করা হয় কেবল ধর্মের নামে। কেরী তাঁর এই প্রতিবেদনের সাহায্যে লর্ড ওয়েলেসলিকে এতদূর প্রভাবিত করেন যে, ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষের শাসনভার পরিত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করলে হয়তো তাঁরই আমলে সতীদাহ প্রথা নিবারণী আইন জারি হতে পারত।

একথা সত্য, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের মতে সহমরণ প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত নয় এমন প্রচার সমাজে একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। আবার এ'ও সত্য যে, রামমোহন রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই 'সতী' প্রথা নিবারণ আইন চালু হয়, তবু এদেশে উইলিয়ম কেরীর এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় তারই সুযোগ্য সহকর্মী উইলিয়ম ওয়ার্ডের নিরবচ্ছিন্ন প্রচার-আন্দোলনের ফলেই ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর (মতান্তরে ৫ ডিসেম্বর) গভর্নর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এই বহুল প্রতীক্ষিত আইনটিতে স্বাক্ষর করেন। কেবল এখানেই শেষ নয়। কেরী তখন বৃদ্ধ, কিন্তু তাঁর এ বিষয়ে উদ্যম ও অধ্যবসায়কে সম্মান এবং স্বীকৃতি দিতেই লর্ড বেন্টিঙ্ক সেইদিনই অপরাহ্নে এক বিশেষ দূত মারফৎ ব্যারাকপুর থেকে নৌকা যোগে আইনের একটি কপি বৃদ্ধ কেরীর কাছে বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য পাঠিয়ে দেন। পরের দিনটি ছিল রবিবার। খ্রিস্টানদের পবিত্র উপাসনার দিন। কিন্তু সমাজ সংস্কারক, ভারতবন্ধু কেরী ধর্মপ্রচারকের কর্তব্য একপাশে সরিয়ে রেখে, সারাদিন একটানা পরিশ্রম করে অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেন। এখানেই শেষ নয়, এই অনুবাদটি সঙ্গে নিয়ে ডিঙ্গি নৌকায় চেপে স্বয়ং কেরী নদীর অপরপারে পৌঁছে সেটি বেন্টিঙ্কের হাতে অর্পণ করেন। কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠার এমন উদাহরণ বেশি মিলবে-এমন বোধ হয় না। ডিসেম্বরের শীত এবং সময় সন্ধ্যা, কিন্তু সেই পরম উদ্যমী ব্যক্তিত্ব কেরীর কাজে কোন বাধাই সৃষ্টি করতে পারেনি। এ কি কোন ধর্ম প্রচারকের কাজ মাত্র! এই সতীদাহ প্রথা নিবারণে কেরী তথা শ্রীরামপুর মিশনারিদের সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের কথা আজ ক'জনই বা স্মরণ করেন ! ঐতিহাসিকদের মতে, সত্য কথা বলতে গেলে বাংলায় তথা ভারতবর্ষে 'সতীদাহ' নামের বিভীষিকাময় কুপ্রথার বিরুদ্ধে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক বিদেশাগত উইলিয়ম কেরীই

Governor General who we learn has expressed his anxious desire to put an end to a custom constituting such a foul blot on the character of our native subjects, as well on that of the British Indian Government, which permits and sanctions it."

কিন্তু এই নৃশংস এবং লজ্জাজনক প্রথা সম্পূর্ণ নিবারণের জন্য বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়নে অতিরিক্ত টালবাহানা লক্ষ্য করেছিলেন রামমোহন। তাই তিনি স্থির করেন তাঁর আন্দোলন প্রসারের জন্য লেখনীধারণ বিশেষ প্রয়োজন। সতীদাহপ্রথার সক্রিয় বিরোধিতা করেই তিনি 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ', 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ', 'সহমরণ বিষয়' নামে কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন। এর ফলেই যেমন সহমরণ বিষয়ে তাঁর মতামত প্রচারের সুযোগ উপস্থিত হল, তেমনই প্রবল হয়ে উঠল তাঁর বিরুদ্ধবাদী আন্দোলনও। তবে মনে রাখা দরকার এখানে রামমোহনের ভূমিকা ছিল প্রধানত যুক্তিবাদী, শাস্ত্রবলে বলীয়ান লেখকের; বক্তা আলোচক ও আন্দোলনকারীর ভূমিকা তাঁর ছিল না। অপরদিকে ২৭শে মার্চ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের 'ইন্ডিয়া গেজেট' - এ একটি চিঠি প্রকাশিত হল। তার বয়ানের সংক্ষিপ্ত রূপ এইরকম :

"..... the practice of burning widows is still continued and in the manner which has been declared illegal and murderous. At this I cannot help astonishment, as I am at a loss to conceive how persons can reconcile themselves to the stigma of being accused of woman murder ..... I feel also both surprise and regret that European gentlemen, who boast of the humility and morality of their religion, should conduct themselves towards persons who submit quietly to the imputation of murder with the same politeness and kindness they would show to the most respectable persons ...." চিঠির লেখক রামমোহন রায়ের অন্যতম বিশ্বস্ত সুহৃদ স্বামী হরিহরানন্দ। এরপর থেকেই সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার আন্দোলন শক্তি সংগ্রহ করতে থাকে। *

---

* ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলকাতার কাছেই এক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সহমরণে বাধ্য করতে ব্যর্থ হওয়ার আক্রোশেই এই হত্যাকাণ্ড। এর বিবরণ পাওয়া গেছে লর্ড আমহার্স্টের বিদুষী পত্নীর ব্যক্তিগত দিনলিপি থেকে। শ্রীমতি আমহার্স্ট লিপিবদ্ধ করেছেন : "A young man having died of cholera his widow resolved to mount the funeral pile. The usual preparations were made, and the licences procured from the Magistrate. The fire was lighted by the nearest relations; when the flame reached her, however, she lost courage, and amid a volume of smoke and the deafening screams of the mob, tomtoms, drums etc., she contrived to slip down unperceived, and gained a neighbouring jungle. At first she was not missed, but when the smoke subsided, it was discovered she was not on the pile. The mob became furious and ran into the jungle to look for the unfortunate young creature, dragged her down to the river, put her into a dingy, and shoved off to the middle of the stream, when they forced her violently overboard and she sank to rise no more!" এই হত্যাকাণ্ড কলকাতাবাসী ইংরাজদেরই নয়, সমকালীন নির্বাচন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমাজ সচেতন মানুষের মনেও এক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। শুধু তাই নয় রামমোহন রায়ের মত ও পথের অনুরাগী বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও নূতন উদ্যমে সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। তবুও পাছে এদেশের লোকের ধর্ম বা সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং তার ফলে যদি কোম্পানি সরকার বাহাদুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় তাই সেই বীরপুঙ্গবেরা চোখের সামনে শতশত বিধবা তরুণীকে অকাল-মৃত পতির চিতায় তুলে ধর্মের নামে আগুনে পোড়ানো হচ্ছে দেখেও দেখতে চাইতেন না, ভয়ে সংকুচিত হয়ে থাকতেন। রাজ্য অধিকারের তীব্র বাসনা ইংরাজদের সংস্কার সাধন স্পৃহাকে পরাজিত করলেও, মিশনারি অথবা রামমোহনকে থামাতে পারেনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা থেকে।

আরও ক'টি মূল্যবান বৎসর অতিবাহিত হবার পরেই, ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা নিবারণ করে নিম্নোক্ত আদেশ প্রচার করলেন:

> "It is hereby declared, that after the promulgation of this regulation, all persons convicted of aiding and abetting in the sacrifice of a hindu widow by burning or burying her alive, whether the sacrifice be voluntary on her part or not, shall be deemed guilty of culpable homicide and shall be liable to punishment by fine or imprisonment or both by fine and imprisonment," – *Regulation of 4th December 1829.*

উপরোক্ত আলোচনায় একটি ঐতিহাসিক সত্য স্পষ্টতর হয়েছে যে 'সতী' প্রথা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই নয়, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও ব্যাপক ভাবে প্রচলিত এবং ধর্মবিধিসম্মত ছিল।

সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের সূত্রে শ্রীরামপুর মিশনারিদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় জানা যায় হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত এই সামাজিক কুপ্রথা এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোম্পানি-সরকার সচেতন হন ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে। কিন্তু শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারিরা যে এই বিষয়ে অনুসন্ধান এবং তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রচারের কাজে অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন — সে খবর তাঁরা রাখতেন বলেই এই অনুসন্ধান নিয়ে সরকারী তৎপরতা শুরুর দায়িত্ব দেওয়া হয় উইলিয়ম কেরীকে। প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর নির্ভর করে কেরী তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তে জানিয়েছেন যে, বছরে প্রায় পঁচিশ হাজার প্রাণকে এইভাবে হত্যা করা হয় কেবল ধর্মের নামে। কেরী তাঁর এই প্রতিবেদনের সাহায্যে লর্ড ওয়েলেসলিকে এতদূর প্রভাবিত করেন যে, ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষের শাসনভার পরিত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করলে হয়তো তাঁরই আমলে সতীদাহ প্রথা নিবারণী আইন জারি হতে পারত।

একথা সত্য, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের মতে সহমরণ প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত নয় এমন প্রচার সমাজে একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। আবার এ'ও সত্য যে, রামমোহন রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই 'সতী' প্রথা নিবারণ আইন চালু হয়, তবু এদেশে উইলিয়ম কেরীর এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় তারই সুযোগ্য সহকর্মী উইলিয়ম ওয়ার্ডের নিরবচ্ছিন্ন প্রচার-আন্দোলনের ফলেই ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর (মতান্তরে ৫ ডিসেম্বর) গভর্নর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এই বহুল প্রতীক্ষিত আইনটিতে স্বাক্ষর করেন। কেবল এখানেই শেষ নয়। কেরী তখন বৃদ্ধ, কিন্তু তাঁর এ বিষয়ে উদ্যম ও অধ্যবসায়কে সম্মান এবং স্বীকৃতি দিতেই লর্ড বেন্টিঙ্ক সেইদিনই অপরাহ্নে এক বিশেষ দূত মারফৎ ব্যারাকপুর থেকে নৌকা যোগে আইনের একটি কপি বৃদ্ধ কেরীর কাছে বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য পাঠিয়ে দেন। পরের দিনটি ছিল রবিবার। খ্রিস্টানদের পবিত্র উপাসনার দিন। কিন্তু সমাজ সংস্কারক, ভারতবন্ধু কেরী ধর্মপ্রচারকের কর্তব্য একপাশে সরিয়ে রেখে, সারাদিন একটানা পরিশ্রম করে অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেন। এখানেই শেষ নয়, এই অনুবাদটি সঙ্গে নিয়ে ডিঙ্গি নৌকায় চেপে স্বয়ং কেরী নদীর অপরপারে পৌঁছে সেটি বেন্টিঙ্কের হাতে অর্পণ করেন। কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠার এমন উদাহরণ বেশি মিলবে-এমন বোধ হয় না। ডিসেম্বরের শীত এবং সময় সন্ধ্যা, কিন্তু সেই পরম উদ্যমী ব্যক্তিত্ব কেরীর কাজে কোন বাধাই সৃষ্টি করতে পারেনি। এ কি কোন ধর্ম প্রচারকের কাজ মাত্র! এই সতীদাহ প্রথা নিবারণে কেরী তথা শ্রীরামপুর মিশনারিদের সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের কথা আজ ক'জনই বা স্মরণ করেন ! ঐতিহাসিকদের মতে, সত্য কথা বলতে গেলে বাংলায় তথা ভারতবর্ষে 'সতীদাহ' নামের বিভীষিকাময় কুপ্রথার বিরুদ্ধে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক বিদেশাগত উইলিয়ম কেরীই

সর্বপ্রথম আন্দোলনের সূচনা করেন। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের বিবেককে জাগ্রত করার কাজে তিনিই পথিকৃৎ। (বঙ্গদেশের পরই ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস থেকেই মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে এই আইন চালু হল।)

বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তন, গ্রন্থপ্রকাশ ও মিশনারিগণ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ এক স্মরণীয় কাল। যদিও এর অন্তত দু'শো বছর আগে পর্তুগীজরা ভারতবর্ষের পশ্চিমে গোয়া অঞ্চলে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন তবু ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ এই কারণেই প্রয়োজন যে এই সময়েই বাংলাদেশের হুগলি শহরে ছেনিকাটা বাংলা হরফে মুদ্রণকার্যের সূত্রপাত ঘটে। একই বৎসরে হুগলিতে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণযন্ত্রে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড় প্রণীত—'A Grammar of the Bengal Language' সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। ইংরেজীতে লেখা এই ব্যাকরণ গ্রন্থটিতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যাংশের বিশেষ বিশেষ উদ্ধৃতি বাংলা অক্ষরে ছাপা হয়েছিল।*

হ্যালহেডের এই ব্যাকরণ গ্রন্থটি ছাপা হয় হুগলির পিপুলপাতির জন অ্যান্ড্রুসের ছাপাখানায়। প্রেসের নামটিও ছিল অ্যান্ড্রুস প্রেস। বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্রে এই যুগান্তর প্রবর্তনের মূলে ছিলেন ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড স্বয়ং। এছাড়া এই মহৎকর্মে সহায়তা দান করেছিলেন চার্লস উইলকিন্স্ (শ্রীমদ্ভাগবত গীতার ইংরেজী অনুবাদকারক), পঞ্চানন কর্মকার, ছাপাখানার মালিক জন অ্যান্ড্রুস এবং সর্বোপরি তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ সময়কালকে তাই বাংলা সাহিত্য ও মুদ্রণ শিল্পের ক্ষেত্রে দিক্‌দর্শক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কিন্তু ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারী তারিখে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যসাহিত্য এক নূতন যুগে পদার্পণ করে। এই ব্যাপ্টিস্ট মিশন পরিচালিত মুদ্রণযন্ত্রে খ্রিস্টান ধর্মপুস্তক, সাময়িক পত্রাদি ও শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তকাদি ছাপা হতে লাগল।[৮] উল্লেখযোগ্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস থেকেই ৪০টি ভাষায় ২৬১ খানি পুস্তকের ২লক্ষ ১২ হাজার কপি মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে অবাধ বাণিজ্য প্রথা প্রবর্তিত হবার পর ইংলন্ড থেকে বহু ব্যবসায়ী এসে মুদ্রণযন্ত্র, কাগজ নির্মাণ প্রভৃতি শিল্পে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেন। ফলে বহু গ্রন্থাদির মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্ভব হল। অজ্ঞানতার অন্ধকার ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হতে লাগল।

প্রসঙ্গত হুগলিতে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের উল্লেখ করার সময় চার্লস উইলকিনস্, পঞ্চানন কর্মকার, তাঁর সহকারী ও জামাতা মনোহর এবং তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রীর নামোল্লেখ অবশ্য কর্তব্য।

শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রবর্তিত মুদ্রণযন্ত্র এবং ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে স্বয়ং পঞ্চানন কর্মকার মিশন-প্রধান উইলিয়ম কেরী ও অন্যান্য মিশনারিদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলে শ্রীরামপুরে একটি হরফ কারখানা (টাইপ ফাউন্ড্রী) গড়ে ওঠে। কেরীর জীবনীকার জর্জ স্মিথ লিখেছেন,

* অবশ্য ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দেই ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড লিখিত হিন্দু আইন সম্পর্কিত বিখ্যাত অনুবাদ পুস্তক "A code of Gentoo Laws, or Ordinances of the Pundits, made from the Original written in the Sanskrit Language" প্রকাশিত হয়েছিল লন্ডন শহর থেকে। এরও পূর্বে ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন তাঁর "A Compendious Vocabulary; English and Persian, Compiled for the East India Company" নামে শব্দ সংগ্রহের কাজ শেষ করেছিলেন বটে, কিন্তু ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দেই এর প্রকাশ ঘটে মালদহ থেকে।

[৮] পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডে অর্থাৎ সমগ্র এশিয়াতে এমন কারখানা আর দ্বিতীয় ছিল না।

শ্রীরামপুর মিশনের ঢালাই কারখানা স্থাপনের পরই যেটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান, সে'টি হ'ল, এই অঞ্চলে যন্ত্রচালিত আধুনিক পদ্ধতিতে কাগজ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন। এর আগে দক্ষিণ ভারতের ট্রাঙ্কেবরে ভারতের প্রথম কাগজকল স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামপুর মিশন পরিচালিত এই কাগজ প্রস্তুত কেন্দ্রটি সমগ্র ভারতে আধুনিক যান্ত্রিক উপায়ে কাগজ নির্মাণের একমাত্র উৎস ছিল।

১১ জানুয়ারী ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর শহরে এক ভাড়াবাড়িতে এই মিশন প্রেসের কাজ শুরু হয়। মিশনারি উইলিয়ম ওয়ার্ড, স্বয়ং উইলিয়ম কেরী, ব্রান্সডন এবং কেরীর প্রথম পুত্র ফেলিক্স কেরী ছাপাখানার কাজে মন দেন। ওয়ার্ড ছিলেন সুদক্ষ মুদ্রাকর। ইতিমধ্যে মার্চ মাসের গোড়াতেই পঞ্চানন কর্মকার মিশনের মুদ্রণ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন। সুতরাং টাইপের অসুবিধাও অবিলম্বে দূরীভূত হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের গোড়ায় ম্যাথু কথিত নিউ টেস্টামেন্ট সমাচার বা 'মঙ্গল সমাচার ম্যাথু কথিত' শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত সর্ব প্রথম গদ্যগ্রন্থ। রামরাম বসু, জন টমাস ও উইলিয়ম কেরীর যৌথ উদ্যোগে রচিত এই পুস্তকটির (১২৫ পৃষ্ঠার ডিমাই আটপেজি) সম্পূর্ণ একটি মাত্র কপি শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরির কেরী আর্কাইভস্-এ সযত্নে রক্ষিত আছে। এই গদ্য গ্রন্থের প্রথম পাতাটি কম্পোজ করার পর মুদ্রণের জন্য যেদিনটি ধার্য হয় সেদিনটি কিন্তু ছিল ১৮ মার্চ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ। মিশনারি উইলিয়ম ওয়ার্ড তাঁর এদিনকার 'জর্নালে' লেখেন : The day brother Carey took an impression at the press of the first page in Mathew. সেদিন মিশন গোষ্ঠিভুক্ত সদস্যদের উৎসাহ আর আনন্দের সীমা ছিল না। বাংলার আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন করা কুসংস্কারের কালো মেঘ ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে, দিগন্তে উদ্ভাসিত হচ্ছে রূপোলী রেখা, মানস নেত্রে সেই সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করে তারা সেদিন উৎসব করেছিলেন।

"শ্রীরামপুর মিশনারি পরিচালিত এই প্রেস থেকেই ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে, জন টমাস ও উইলিয়ম কেরীর বাংলা শিক্ষক, বাংলা ভাষায় প্রথম খ্রিস্ট সঙ্গীত রচয়িতা, অখ্রিস্টিয় বাঙালী ইংরেজি নবিশ রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা গদ্যে প্রথম দীর্ঘ মৌলিক রচনার নিদর্শন এই গ্রন্থটি এবং সঙ্গত কারণেই এর ভাষাও বিচিত্র। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই নয়, প্রকাশনার ইতিহাসেও এই গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।"

তবে মিশন পরিচালিত প্রেস থেকে মুদ্রিত গ্রন্থের প্রচারের উপর, খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ইংরাজ কর্মকর্তাদেরই নিষেধাজ্ঞা আরোপে বাধ্য হতে হয়। অর্থাৎ খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের স্বীয় ধর্ম প্রচারের ফলে যদি প্রজাবিদ্রোহ হয় এই ভয়ে কলকাতা থেকে তাঁদের কর্মক্ষেত্র শ্রীরামপুরে সরিয়ে নিতে বাধ্য করার পরও এই আশঙ্কা দূর হয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখনীতে এই দিকটি সবিশেষ উল্লেখিত। তিনি লিখেছেন, "প্রসঙ্গ ক্রমে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই তাঁহারা কিরূপ ভয়ে ভয়ে থাকিতেন তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ১৮০৭ সালে শ্রীরামপুর হইতে পারস্য ভাষায় লিখিত একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তিকাতে মহম্মদীয় ধর্মের উপরে খ্রিস্টিয় ধর্মে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তিকা প্রচার বন্ধ করিবার জন্যে ডেনমার্কে গভর্নমেন্টের নিকট পত্র গেল। তদনুসারে শ্রীরামপুরের ডেন রাজপুরুষগণ অবশিষ্ট ১৭০০ কি ১৮০০ পুস্তক কেরী প্রভৃতি প্রচারকদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া কলিকাতাতে গভর্নর জেনারালের মন্ত্রিসভার হস্তে অর্পণ করিলেন। এইরূপ ভয়ে ভয়ে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা যে কেন হঠাৎ ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে কৃতসংকল্প হন নাই তাহা আমরা বুঝিতে পারি।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্তের পরও অপর একটি অনুমান-সিদ্ধান্ত আমাদের অন্তরে জাগ্রত হয়। তবে

কি শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস প্রচারিত খ্রিস্টান ধর্মমতের পরিপোষক পুস্তক প্রকাশ এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলেই, কেরী প্রমুখ প্রচারকবৃন্দ ধর্মপ্রচারে গোঁড়া মনোভাব ত্যাগ করে ধীরে ধীরে শিক্ষা, বিজ্ঞান, সমাজ সংস্কার ও দেশহিতৈষণার কাজে অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠেন। পরবর্তী সময়ে মিশন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকার 'বিষয়সূচী'র দিকে লক্ষ্য করলে হয়তো এর সমর্থন মিলবে।

শ্রীরামপুর মিশনারিগণ ও সাময়িক পত্রাদি প্রকাশ

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে যখন জেমস্ অগাস্টাস হিকি এদেশে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন, তখন বাংলার পুরাতন গ্রাম-সমাজ ক্লাইভ-মীরজাফরের আমল থেকে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে প্রায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ তখন পৈত্রিক ভিটেমাটি ছেড়ে নূতন নাগরিক সমাজ গড়বার উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে। দেশে নাগরিক স্তরে উচ্চশ্রেণী ও আভিজাত্যবোধের গোড়াপত্তন হচ্ছে। অপর দিকে আধুনিক বিত্তকেন্দ্রিক সমাজে একধরণের অনুভূমিক গতি বৃদ্ধির দরুণ আঘাতপ্রাপ্ত এবং দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সমাজ হয়ে উঠছে ঘটনাবহুল, জড়ত্ব গেল ঘুচে, জীবনধারা হ'ল নিত্য পরিবর্তনশীল ও রোমাঞ্চকর। এই পরিবর্তনের হাওয়ার খবর রাখতেই প্রবর্তন হ'ল সাময়িক পত্র বা সংবাদপত্রের।*

উনিশ শতকের সূচনা হ'ল যুগান্তকারী ঘটনার মধ্য দিয়ে। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ,

---

* জেমস্ অগাস্টাস হিকি-ই এদেশে প্রথম ব্যক্তি যিনি 'সংবাদ'-এর মূল্য কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে, তা উপলব্ধি করেন। কোম্পানী সরকারের রাজ্যশাসন পদ্ধতি এমন কি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সমালোচনায় তখন তিনি মুখর, প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ নির্ভীক। লেখক হিকি'র সংবাদ পরিবেশনার ধরণ, যেমন হেস্টিংসের ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি দিক, এমন কি ক্লাইভ-এর চারিত্রিক স্বভাব-দৌর্বল্য নিয়ে স্পষ্ট বাদিতা ইংরেজ সরকারের পছন্দ না হবারই কথা। তাই হিকিকে গ্রেপ্তার বা নির্বাসনে পাঠাতে তাদের বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয় নি। হিকি, প্রকৃত অর্থে সাহিত্যিকর বা সাংবাদিক কোনটাই ছিলেন না। কিন্তু সত্যোপলব্ধি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ তাঁকে সংবাদপত্র জগতে এক বিশিষ্টস্থানে উপনীত করেছে। জি. কে চেস্টারটন তাঁকেই উদ্দেশ্য করে বলেছেন : "Brother fire, God made you beautiful and strong and useful, I Pray you be courteous." কিন্তু হিকি রপ্ত করতে শেখেন নি। তাই সরকারের অমানবিক আচরণের সামনে দাঁড়িয়ে দৃঢ়ভাবে বলে ওঠেন : I have no propensity, I was not bred to a slavish life of hard work, Yet I take a pleasure in enslaving my body in order to purchase freedom for my mind and soul." বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক এক সময়ে হাউস অব্ কমনস্-এ বক্তৃতা-র সময়ে প্রেস গ্যালারির দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'Yonder sits the Fourth Estate'। সেই ফোর্থ এস্টেটের প্রতি ভারতে রাজত্ব করতে আসা ইংরেজরা খুব একটা সংবেদনশীল ছিলেন এমন কথা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে হিকি শারীরিকভাবে হয়েছিলেন পর্যুদস্ত কিন্তু মানসিক দিক থেকে ছিলেন স্বাধীন, আমৃত্যু।

আইরিশ বংশোদ্ভূত আমেরিকান উইলিয়ম ডুয়ান (William Duane) ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড'। কিন্তু তাঁর সুতীব্র সমালোচনা ফোর্ট উইলিয়মের মনিবদের পছন্দ না হওয়ায় তাঁকেও এদেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। এইভাবে ১৭৯১ থেকে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই রকমভাবে বেশ কয়েকজন সম্পাদককে সতর্ক করা হয় অথবা শাস্তিদানের ব্যবস্থা হয়। আর ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করেন। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মিন্টোর আমলে সেই আইন হয় আরও কঠোর। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে ডা. জেমস্ ব্রাইস নামে ভারতে আসা প্রথম প্রেসবাইটেরিয়ান মন্ত্রী ইংরেজদের গৃহীত সংবাদ পত্র নীতির প্রতিবাদে 'এশিয়াটিক জার্নাল' প্রকাশ করে তৎকালীন চীফ্ সেক্রেটারী জন অ্যাডামের বিরাগভাজন হন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'মর্নিং পোস্ট'-এর মালিক 'হিটলি'র হয় একই পরিণতি। তবে হিটলির বাবা ইংরেজ এবং মা ভারতীয় বংশজ হওয়ায় তাঁকে নির্বাসিত হতে হয় নি।

এরপরই মঞ্চে আবির্ভূত হন একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান তেজস্বী ব্যক্তিত্ব। তাঁর নাম জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম। ২২শে সেপ্টেম্বর ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'ল "The Calcutta Journal or Political, Commercial or Literary Gazette." সম্পাদকীয়তে বাকিংহাম জানালেন : as a sacred right to admonish Governors of their duties, to warn them furiously of their faults and to tell disagreeable truths. চিন্তাভাবনার সঙ্গে আচরণের সঙ্গতি রেখেই এই বাকিংহাম্ শাসকের চক্ষু উপেক্ষা করে তাদের দুর্নীতি সর্বসমক্ষে উপস্থিত করে প্রচণ্ড সাহসের পরিচয় রেখে গেছেন। তখন ভারতীয়দের জন্য স্থাপিত মেডিক্যাল স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ড. জেমিশন যে তাঁর সরকারী পদমর্যাদার সুযোগের অপব্যবহার করে অপরাধী আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদ গ্রহণ করে নৈতিক দিক থেকে অপরাধী একথা বাকিংহাম্ তাঁর ক্যালকাটা জর্নালে প্রকাশ করেন। সংবাদ পড়ে স্বভাবতই ড. জেমিশন ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর পরম সুহৃদ তৎকালীন অস্থায়ী গভর্নর জন অ্যাডামের সাহায্য চান। উদ্দেশ্য জেমস্ সিল্ক বাকিংহামের শাস্তি। তাঁরই অন্যায় সিদ্ধান্তের ফলে বাকিংহামকে, ড. জেমিশনের সঙ্গে 'ডুয়েল' লড়তে বাধ্য করা হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এতে কেউই হতাহত

শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান ব্যাপ্টিস্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা, নবজাগরণের প্রাণপুরুষ রামমোহন রায়ের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কলকাতায় আগমন, সামাজিক প্রথা ও সংস্কার নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ, পাশ্চাত্য তথা ইংরাজী শিক্ষাপ্রসারের জন্য দেশীয় গণ্যমান্যদের উদ্যোগে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান (হিন্দু) কলেজ স্থাপন আর যেন তারই সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে এল বাংলাভাষায় লিখিত সংবাদপত্র অথবা সাময়িক পত্র প্রকাশের শুভমুহূর্ত।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য চারটি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়, তিনটি বাংলাভাষায় এবং একটি ইংরেজীতে। মাসিক 'দিগ্‌দর্শন', সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' এবং মাসিক পত্র 'The Friend of India'। এই তিনটি পত্রিকাই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত ও মিশন কর্তৃপক্ষ পরিচালিত। চতুর্থটি 'বাঙ্গাল গেজেটি' দুই বাঙালী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায় সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। এই চারটি সাময়িক পত্রই ১৮১৮ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে প্রকাশিত। মিশন পরিচালিত ও মিশন প্রেসের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত তিনটি পত্রিকাই আমাদের আলোচ্য। তাছাড়া 'বাঙ্গাল গেজেটি'র* কোন কপি অদ্যাবধি সংগৃহীত না হওয়ায় এ বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা সম্ভব নয়।

'দিগ্‌দর্শন'-এর প্রকাশকাল এপ্রিল, ১৮১৮। বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্র। শ্রীরামপুর

হন নি। তখনকার দিনে সরকারী প্রশাসনের বিভাগীয় সচিবরা 'গ্রীন কোট' পরতেন। অথচ তাদের কাজকর্মের অনেকটাই ছিল নীতিবিগর্হিত। তাই বাকিংহাম তাঁর পত্রিকায় এদের "Gangrene of the State" আখ্যা দেন। এই অদম্য সংবাদপত্র সেবী সমাজহিতৈষী বাকিংহাম-এর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু করেন। ৬০০ শত পাউন্ড খরচ করার পর বাকিংহাম সেই মামলায় জয়ী হন এবং নূতন উদ্যমে কলম ধরেন। শেষ পর্যন্ত এই স্বাধীনচেতা ব্যক্তিটিকে কোনভাবে বশে আনতে না পেরে ১২ ফেব্রুয়ারী ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের আদেশ বলে বাকিংহামের এদেশে থাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার অনেক আগেই বাতিল ঘোষণা করা হয়। এদেশ ছেড়ে তিনি চলে যান ১৫ এপ্রিল ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি যখন এদেশ ছাড়তে বাধ্য হন তখন 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর প্রচার সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে গেছে। বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ৮০০০ হাজার পাউন্ড। দেশে ফিরেই বাকিংহাম প্রকাশ করেন 'ওরিয়েন্টাল হেরাল্ড'। আর পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে অবিরত প্রকাশ করতে থাকেন ভারতবর্ষের ইংরাজ শাসন যন্ত্র এবং শাসকশ্রেণীর অবাধ দুর্নীতির খবর।

ভারতের সংবাদপত্র জগতে সংবাদপ্রকাশ এবং সাংবাদিকের স্বাধীনতার স্বপক্ষে যাঁরা নিরন্তর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বা নিবর্তনমূলক আইনের বিরোধিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম নাম আধুনিক যুগের নবউদ্‌গাতা রামমোহন রায়। কিন্তু তাঁর পরেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি জেমস সিল্ক বাকিংহাম। জেমস্ অগাস্টাস হিকির পরেই জেমস সিল্ক বাকিংহাম দ্বিতীয় ইউরোপবাসী যাঁরা ভারতবর্ষে থেকে ভারতীয়দের স্বার্থে পূর্ণোদ্যমে সমাজসংস্কার কর্মে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের লেখা পড়ে এখনকার ইংরাজরা ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন এই ভেবে যে ভারতীয় প্রজা এবং ব্রিটিশ প্রজাবৃন্দের মধ্যে এক অলিখিত সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনসূত্র নির্মিত হবে। বাকিংহাম তো তাঁর পত্রিকায় রামমোহন রায়ের সংস্কার সাধনীবৃত্তিকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। এরই পাশাপাশি একথাও মানতে হয়, বাকিংহাম তাঁর 'ক্যালকাটা জার্নাল' মারফৎ হয়তো বাঙালী পাঠকের মন জয় করতে পারেন নি, কিন্তু রামমোহন রায় সম্পাদিত এবং জনপ্রিয় 'সম্বাদ কৌমুদী'র সাহিত্য সংস্কৃতি, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যবোধের উন্মেষ ঘটাতে যেসব মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হয়েছে, বাকিংহাম সেই লেখা সম্পর্কে কেবল আগ্রহ বোধই করেন নি, রামমোহনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, বাকিংহাম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁর লেখা বিশ্লেষণ করে ইংরেজী ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে হাজির করেছেন। 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকা নিয়েও বাকিংহাম তাঁর পত্রিকার ৩১ জানুয়ারী ১৮২২ সংখ্যায় সবিশেষ আলোচনা করেছিলেন। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী এবং অগণিত পাঠককুল বাকিংহামের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল থাকবেন। তাঁর সঙ্গে রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠতা ইংরাজ শাসকরা কোনদিনই ভালো চোখে দেখেন নি। আবার এর আগে অবশ্য আমরা দেখেছি 'এশিয়াটিক জার্নাল', 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল' ইত্যাদি পত্রিকাগুলিও ছিল রামমোহন বিরোধী। এমন কি 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পাদকীয় সহকারী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সতীদাহ' সংক্রান্ত রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামতের সঙ্গে একমত না হয়ে সমাজের রক্ষণশীল অংশের সক্রিয় সহযোগিতায় 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করে রামমোহনকে অপদস্থ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। বরং ১২ এপ্রিল ১৮২২-এ তিনি 'মিরাত-উল্-আখবর' নামে পার্সীভাষায় সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করে দেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের সামনে তাঁর উদারনৈতিক মতবাদ ও সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। সরকারের সংবাদপত্র নিবর্তন আইনের প্রতিবাদে রামমোহন 'মিরাৎ' প্রকাশনা বন্ধ করে দেন কিন্তু তার আগে সম্পাদকীয় হিসাবে পার্সীভাষায় ঘোষণা করেন "যে সম্মান হৃদয় থেকে ঝরানো শত সহস্র বিন্দু রক্ত দিয়ে পেয়েছি তাকে সামান্য অনুগ্রহ লাভের আশায় শাসকের দ্বাররক্ষীর হাতে প্রত্যর্পণ করব না।" এই ঘোষণা সংবাদ পত্র সম্পাদকের নয়, স্বাধীনতাকামী সমগ্র মানবজাতির শৃঙ্খলমোচনের।

* তবে 'বাঙ্গালা গেজেটি'র কোন সংখ্যায় নাকি রামমোহন রায়ের 'সতীদাহ প্রথা'-র বিরোধী প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয় বলেই অনুমিত। তবে তা প্রমাণসাপেক্ষ।

মিশন পরিচালিত। সম্পাদক : জে. সি. মার্শম্যান। বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্র। এই পত্রে সংবাদ,সম্পাদকীয় প্রভৃতির সঙ্গে সাহিত্যপত্র অর্থাৎ 'ম্যাগাজিন' অংশও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাথমিক পর্য্যায়ের বেশ কিছু রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'The Friend of India'-র প্রকাশকাল মে, ১৮১৮। সম্পাদক ত্রয়ী : উইলিয়ম কেরী, জে. সি. মার্শম্যান এবং উইলিয়ম ওয়ার্ড। এই পত্রিকাই বর্তমান কালের দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র 'The Statesman'-এর progenitor.

'দ্য ফ্রেন্ড অব্ ইন্ডিয়া' কেরী ও শ্রীরামপুর মিশনারিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল কেরী প্রমুখ সম্পাদকমণ্ডলী এই পত্রিকার জন্য যে 'প্রসপেকটাস্' রচনা করেন তার মর্মবাণী-সম্ভবত আজও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম। সম্পাদকরা তাঁদের আত্মপরিচয় প্রদানের সঙ্গে পরিবর্তনশীল সামাজিক ও ঐতিহাসিক চেতনাপ্রবাহের প্রতি যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরই সামান্য এবং নির্বাচিত অংশ এখানে উদ্ধৃত হল —

"Drawn from their native land wholly by the hope of thus promoting the welfare of India, one of them has spent nearly the one fourth of a century, and others a period of time fast approaching thereto, in studying its languages, and making themselves acquainted with the habits and ideas of its inhabitants, with the view of effectually promoting their highest interests and to this important objects they are desirous of devoting the remainder of their days .... With this view therefore, they propose to meet the wishes of those who encourage the work, by including in their small monthly publication, everything communicated to them either of a religious or literary nature which has any bearing on the future happiness of India .... In the important work of illuminating India, they cannot be insensible to the value of Literature ..... Without some idea of their literature, how can we become acquainted with the ideas and modes of expression common to them whose good we seek? Whatever imformation may be communicated therefore respecting the Languages of Eastern Asia, or the characters by which they are expressed, will be gratefully received. Books published in India too, which in any degree bear on its welfare, will be deemed fit subjects for notice."

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে 'The Friend of India'-র ত্রৈমাসিক সংস্করণে প্রচুর সংবাদ ও তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে সেইযুগে। এন. বি. হ্যালহেড, চার্লস উইলকিন্স্, পঞ্চানন কর্মকার, জোনাথান ডানকান, এন. বি. এডমন্ডস্টোন, হেনরি পিটস্ ফরস্টার, জন মিল্লার প্রমুখ কীর্তিমানদের সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনা করা হয় এই পত্রিকাতেই।

শ্রীরামপুর মিশনারিরা-ব্যাপ্টিস্ট অক্সিলিয়ারী মিশন সোসাইটির তরফে —'গসপেল ম্যাগাজিন' নামে অপর একটি দ্বিভাষিক সাময়িক পত্র প্রকাশ করতে থাকেন ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে। যেহেতু এই পত্রিকার বিষয়বস্তু খ্রিস্টিয় সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের উদ্দেশ্যেই লিখিত তাই এই সাময়িক পত্রের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক বোধ করছি।

১৮২২ খ্রিস্টাব্দের মে মাস থেকে শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত অপর যে দু'টি সাময়িক পত্রের খবর

পাওয়া যায় সেগুলি ছিল অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী। এর একটি 'দিগ্‌দর্শন'-এর হিন্দী সংস্করণ এবং অপরটি ফার্সীভাষায় প্রকাশিত 'আখবর-ঈ-শ্রীরামপুর।'

এছাড়া উইলিয়ম কেরীর প্রথম পুত্র ফেলিক্স কেরী 'বিদ্যাহারাবলী' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করে গেছেন তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে। 'বিদ্যাহারাবলী' সম্ভবত এদেশেই নয়, সমগ্র এশিয়া মহাদেশে প্রকাশিত প্রথম 'সায়েন্স ম্যাগাজিন'।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত এবং পরিচালিত আর একটি সাময়িকীর নাম ছিল 'খৃষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি'। এটিও ছিল মাসিক পত্র এবং অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল এর প্রকাশকাল।

শ্রীরামপুর মিশন : কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড

১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর রবিবার ইংলন্ড থেকে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের একটি দল শ্রীরামপুর এসে পৌছান। শ্রীরামপুর তখন ডেনমার্কের অধীন। গঙ্গার ধারে এখন যেখানে শ্রীরামপুর কলেজটি অবস্থিত তারই কাছাকাছি 'মায়ার্স ট্যাভার্ন' নামে একটি ডেনিশ সরাইখানা ছিল। মিশনারিদের ওই দলটি এই সরাইখানায় আশ্রয় নেন। উইলিয়ম ওয়ার্ড তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন :

> "প্রকৃতি এখানে সহজ সাজে সজ্জিত। তাঁর সম্পদের কুটীর ও কুঞ্জোদ্যানগুলি, নদীতরঙ্গে তিনি খেলা করেন, জীবধাত্রী হইয়া এখানে তিনি বিরাজ করেন। এখানে সব কিছুর উপর কে যেন মায়ার পরশ বুলাইয়াছে। হিন্দুর ধর্ম অবলম্বন করিতে ইতিমধ্যেই আমার বাসনা জন্মিয়াছে। এই সুন্দর নদীর তীরে কুটীর এবং কুঞ্জবনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিব, এই চিন্তায় আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই নদীতীরে সামান্য কুটীরগুলির যে সৌন্দর্য্য, ইংলণ্ডের পরম রমনীয় উদ্যানের সৌন্দর্য্য তাহার অর্দ্ধেকও নহে। স্থানীয় অধিবাসীরা উচ্চতায় নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, তাম্রবর্ণ এবং অনেকে দেখিতে সুন্দর। সম্পূর্ণ সমতল এই দেশ, স্থানে স্থানে অরণ্যসঙ্কুল। মাঝে মাঝে বাতায়ন শূন্য খড়ের ছাউনি দেওয়া, কাদামাটি দিয়ে গাঁথা কুটীরগুলি। গৃহপালিত পশুর প্রাচুর্য, যখন তারা দলে দলে চরে বেড়ায় তখন তাদের দেখলে চোখ জুড়ায়। মাথায় আর কোমরে জড়ানো এক এক টুকরো কাপড় এখানকার মানুষের পরিধেয়। ফলমূল, মৎস্য ও অন্ন এদের প্রধান আহার্য এবং ধূমপান হ'ল প্রধান বিলাস-এই দেশ আর এখানকার অধিবাসীদের দেখে আমরা সত্যই আনন্দ অনুভব করি। নয়ন মনোহর মূর্তির সংখ্যা ইংরাজদের অপেক্ষা ইহাদের মধ্যে অধিক।........"

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে খ্রিস্টান বা ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির পক্ষে শ্রীরামপুরে গঙ্গার কূলে কর্মকেন্দ্র তথা বাসভূমি নির্বাচনে খুব বিলম্ব হয় নি। বরং অনুকূল প্রকৃতি ও পরিবেশ উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়েছিল। এইসময়ে শ্রীরামপুরের ডেনিশ গভর্নর ছিলেন Colonel Bie। তিনি আবার ট্রাঙ্কেবরের বিশপ C.F.Schwarz কর্তৃক বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এই মিশন স্থাপনের কাজে মূল্যবান সাহায্য করেন।

বিষয় হিসাবে মিশনের জন্য স্থান নির্বাচনের কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও হুগলির জনপদ, বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট ধারার প্রকাশমুখীন প্রবহমানতা এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যত নির্ণায়ক ঘটনা হিসাবে ধরলে বোঝা যায়, এই বিষয়টিই এক যুগান্তকারী মর্যাদা পেয়েছে সমকালীন ইতিহাসে। ব্যাপ্টিস্ট মিশনের মূল উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছিল তার বিচার না করে বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর পরম্পরাগত ঐতিহ্যের স্বরূপ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ

মিশন পরিচালিত। সম্পাদক : জে. সি. মার্শম্যান। বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্র। এই পত্রে সংবাদ,সম্পাদকীয় প্রভৃতির সঙ্গে সাহিত্যপত্র অর্থাৎ 'ম্যাগাজিন' অংশও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাথমিক পর্য্যায়ের বেশ কিছু রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'The Friend of India'-র প্রকাশকাল মে, ১৮১৮। সম্পাদক ত্রয়ী : উইলিয়ম কেরী, জে. সি. মার্শম্যান এবং উইলিয়ম ওয়ার্ড। এই পত্রিকাই বর্তমান কালের দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র 'The Statesman'-এর progenitor.

'দ্য ফ্রেন্ড অব্ ইন্ডিয়া' কেরী ও শ্রীরামপুর মিশনারিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল কেরী প্রমুখ সম্পাদকমণ্ডলী এই পত্রিকার জন্য যে 'প্রসপেকটাস্' রচনা করেন তার মর্মবাণী-সম্ভবত আজও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম। সম্পাদকরা তাঁদের আত্মপরিচয় প্রদানের সঙ্গে পরিবর্তনশীল সামাজিক ও ঐতিহাসিক চেতনাপ্রবাহের প্রতি যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরই সামান্য এবং নির্বাচিত অংশ এখানে উদ্ধৃত হল —

"Drawn from their native land wholly by the hope of thus promoting the welfare of India, one of them has spent nearly the one fourth of a century, and others a period of time fast approaching thereto, in studying its languages, and making themselves acquainted with the habits and ideas of its inhabitants, with the view of effectually promoting their highest interests and to this important objects they are desirous of devoting the remainder of their days .... With this view therefore, they propose to meet the wishes of those who encourage the work, by including in their small monthly publication, everything communicated to them either of a religious or literary nature which has any bearing on the future happiness of India .... In the important work of illuminating India, they cannot be insensible to the value of Literature ..... Without some idea of their literature, how can we become acquainted with the ideas and modes of expression common to them whose good we seek? Whatever information may be communicated therefore respecting the Languages of Eastern Asia, or the characters by which they are expressed, will be gratefully received. Books published in India too, which in any degree bear on its welfare, will be deemed fit subjects for notice."

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে 'The Friend of India'-র ত্রৈমাসিক সংস্করণে প্রচুর সংবাদ ও তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে সেইযুগে। এন. বি. হ্যালহেড, চার্লস উইলকিন্স্, পঞ্চানন কর্মকার, জোনাথান ডানকান, এন. বি. এডমন্ডস্টোন, হেনরি পিটস্ ফরস্টার, জন মিলার প্রমুখ কীর্তিমানদের সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনা করা হয় এই পত্রিকাতেই।

শ্রীরামপুর মিশনারিরা-ব্যাপ্টিস্ট অক্সিলিয়ারী মিশন সোসাইটির তরফে —'গসপেল ম্যাগাজিন' নামে অপর একটি দ্বিভাষিক সাময়িক পত্র প্রকাশ করতে থাকেন ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে। যেহেতু এই পত্রিকার বিষয়বস্তু খ্রিস্টিয় সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের উদ্দেশ্যেই লিখিত তাই এই সাময়িক পত্রের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক বোধ করছি।

১৮২২ খ্রিস্টাব্দের মে মাস থেকে শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত অপর যে দু'টি সাময়িক পত্রের খবর

পাওয়া যায় সেগুলি ছিল অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী। এর একটি 'দিগ্‌দর্শন'-এর হিন্দী সংস্করণ এবং অপরটি ফার্সীভাষায় প্রকাশিত 'আখবর-ঈ-শ্রীরামপুর।'

এছাড়া উইলিয়ম কেরীর প্রথম পুত্র ফেলিক্স কেরী 'বিদ্যাহারাবলী' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করে গেছেন তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে। 'বিদ্যাহারাবলী' সম্ভবত এদেশেই নয়, সমগ্র এশিয়া মহাদেশে প্রকাশিত প্রথম 'সায়েন্স ম্যাগাজিন'।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত এবং পরিচালিত আর একটি সাময়িকীর নাম ছিল 'খৃষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি'। এটিও ছিল মাসিক পত্র এবং অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল এর প্রকাশকাল।

শ্রীরামপুর মিশন : কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড

১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর রবিবার ইংলন্ড থেকে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের একটি দল শ্রীরামপুর এসে পৌছান। শ্রীরামপুর তখন ডেনমার্কের অধীন। গঙ্গার ধারে এখন যেখানে শ্রীরামপুর কলেজটি অবস্থিত তারই কাছাকাছি 'মায়ার্স ট্যাভার্ন' নামে একটি ডেনিশ সরাইখানা ছিল। মিশনারিদের ওই দলটি এই সরাইখানায় আশ্রয় নেন। উইলিয়ম ওয়ার্ড তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন :

> "প্রকৃতি এখানে সহজ সাজে সজ্জিত। তাঁর সম্পদের কুটীর ও কুঞ্জোদ্যানগুলি, নদীতরঙ্গে তিনি খেলা করেন, জীবধাত্রী হইয়া এখানে তিনি বিরাজ করেন। এখানে সব কিছুর উপর কে যেন মায়ার পরশ বুলাইয়াছে। হিন্দুর ধর্ম অবলম্বন করিতে ইতিমধ্যেই আমার বাসনা জন্মিয়াছে। এই সুন্দর নদীর তীরে কুটীর এবং কুঞ্জবনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিব, এই চিন্তায় আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই নদীতীরে সামান্য কুটীরগুলির যে সৌন্দর্য্য, ইংলণ্ডের পরম রমনীয় উদ্যানের সৌন্দর্য্য তাহার অর্দ্ধেকও নহে। স্থানীয় অধিবাসীরা উচ্চতায় নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, তাম্রবর্ণ এবং অনেকে দেখিতে সুন্দর। সম্পূর্ণ সমতল এই দেশ, স্থানে স্থানে অরণ্যসঙ্কুল। মাঝে মাঝে বাতায়ন শূন্য খড়ের ছাউনি দেওয়া, কাদামাটি দিয়ে গাঁথা কুটীরগুলি। গৃহপালিত পশুর প্রাচুর্য, যখন তারা দলে দলে চরে বেড়ায় তখন তাদের দেখলে চোখ জুড়ায়। মাথায় আর কোমরে জড়ানো এক এক টুকরো কাপড় এখানকার মানুষের পরিধেয়। ফলমূল, মৎস্য ও অন্ন এদের প্রধান আহার্য এবং ধূমপান হ'ল প্রধান বিলাস-এই দেশ আর এখানকার অধিবাসীদের দেখে আমরা সত্যই আনন্দ অনুভব করি। নয়ন মনোহর মূর্তির সংখ্যা ইংরাজদের অপেক্ষা ইহাদের মধ্যে অধিক।.........."

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে খ্রিস্টান বা ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির পক্ষে শ্রীরামপুরে গঙ্গার কূলে কর্মকেন্দ্র তথা বাসভূমি নির্বাচনে খুব বিলম্ব হয় নি। বরং অনুকূল প্রকৃতি ও পরিবেশ উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়েছিল। এইসময়ে শ্রীরামপুরের ডেনিশ গভর্নর ছিলেন Colonel Bie। তিনি আবার ট্রাঙ্কেবরের বিশপ C.F.Schwarz কর্তৃক বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এই মিশন স্থাপনের কাজে মূল্যবান সাহায্য করেন।

বিষয় হিসাবে মিশনের জন্য স্থান নির্বাচনের কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও হুগলির জনপদ, বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট ধারার প্রকাশমুখীন প্রবহমানতা এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যত নির্ণায়ক ঘটনা হিসাবে ধরলে বোঝা যায়, এই বিষয়টিই এক যুগান্তকারী মর্যাদা পেয়েছে সমকালীন ইতিহাসে। ব্যাপ্টিস্ট মিশনের মূল উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছিল তার বিচার না করে বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর পরম্পরাগত ঐতিহ্যের স্বরূপ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ

করি যে, শ্রীরামপুর মিশনারির কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে আমাদের দেশজ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত ভাবনাকে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। কেরীর ভাষায় শ্রীরামপুর মিশনের Motto হ'ল: "Expect great things from God, attempt great things for God."*

১৮০১ খ্রিস্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে লেখা মার্শম্যানের জার্নাল থেকে জানা যায়, শ্রীরামপুর ডেনদের হাত থেকে ইংরেজরা অধিকার করবার পরই** উক্ত সরাইখানা সন্নিহিত অঞ্চল, বাগান ও সংলগ্ন জমি, যার পরিমাণ চার একরেরও বেশি, ১০,৩৪০ টাকায় মিশনারিরা ক্রয় করে নেন। ফলে এখানে মিশনের কাজ, দুটি বিদ্যালয় পরিচালনা, মিশনারিদের পরিবারবর্গ এবং বইছাপা ও বাঁধাই-এর জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সঙ্কুলান করা সম্ভব হয়। ১২ অক্টোবর তারিখে নির্দিষ্ট মূল্যে এই বাড়ী ও জমি কেনা হয়।

তবে মিশনারিদের যতই সুখ্যাতি করা যাক না কেন, প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনের মিশনারিরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে কটূক্তি ও কুপ্রচার করতে ছাড়েন নি। এমন কি স্বয়ং উইলিয়ম কেরীর দৃষ্টিভঙ্গী এবং কর্মপদ্ধতি একইভাবে সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট ছিল। অথচ এই কেরীই ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর ইংলন্ডবাসী অপর মিশনারি মি. ডায়ারকে লিখেছেন : "....... My heart is wedded to India, and though I am of little use, I feel it pleasure in doing to little I can ...." এই কেরীই বৃদ্ধবয়সে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় সর্বসমক্ষে স্বীকার করেছেন : "হিন্দুদের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি —বঙ্গীয় ভাষা আমার মাতৃভাষার মতই আয়ত্ত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘকাল এদেশবাসীদের সহিত এখানে (বঙ্গদেশে) এবং এই সাম্রাজ্যের অন্যত্র ঘনিষ্ঠতার ফলে আমার এমন সকল বিষয় জানিবার সুযোগ হইয়াছে যাহা ইতিপূর্বে কদাচিৎ কাহারও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আমি এখন নিঃসংশয়েই বলিতে পারি যে, এদেশের রীতিনীতি আচার ব্যবহার, সংস্কার এবং হৃদয়াবেগের সহিত আমি এমনই পরিচিত হইয়াছি যে, সময়ে নিজেকেই এদেশীয় বলিয়া সন্দেহ হয়।"

এরই পাশাপাশি উইলিয়ম কেরীর বরিষ্ঠ সহকর্মী ও ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি জন টমাস এদেশের

---

*কেরী তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'An Enquiry into the Obligations of Christians to use means for the conversion of the Heathen রচনা করেন ১৭৭৮-৭৮ খ্রিস্টাব্দে এবং সেটি প্রকাশিত হয় ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে এবং ওই বছরের ৩১ মে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আহুত নটিংহামের দ্বিতীয় সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে যে দুটি বিষয়কে বিশদ ব্যাখ্যার জন্য তিনি বেছে নেন, তার একটি ছিল 'That we should expect great things' এবং দ্বিতীয়টি ছিল 'that we should attempt great things'। সময়ের ব্যবধান এবং ভৌগোলিক অবস্থানও যে মানুষের মৌলিক চিন্তাভাবনাকে খুব একটা প্রভাবিত বা পরিবর্তিত করতে পারে না— এটি তার অন্যতম প্রমাণ।

** Ward's Journal - May 8, 1801. "This morning, when the inhabitants were in profound sleep the English from the other side [Barrackpore] of the river came and hoisted the English flag, and quietly took possession of Serampore, without a gun firing, or a drum beating. At ten o'clock we and others were desired to appear at the government house. In the Governor's hall, we found several British Officers, and in an adjoining room the new English Governor, with Col. Bie, etc, standing by his side. We presented ourselves." তবে মাত্র একবছর পর্যন্ত শ্রীরামপুর ইংরাজদের অধিকারে থাকার পর ডেনদের হাতে ফিরে যায়। শেষে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর-এর ড্যানিশ মালিকানা ২৫ টিরতরে ইংরাজদের হস্তগত হয়।

জনসাধারণের কাছে যে ব্যবহার পেয়েছেন সে সম্পর্কে বলেছেন :

> "But I can truely say, whenever I have been conversing or preaching among them, I have invariably found them willing to hear and they always behave with great decency and respect ....." [Rippon's Baptist Register, No V]

বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং হিন্দুজাতি সম্পর্কে অন্যত্র টমাস লিখেছিলেন :

> "As to the learning of the language it is as work attended with difficulties, but when the whole time is devoted to it, three or four months will bring a man through the greatest of them; and he will begin to converse with the natives, with great amusement and pleasure to himself and profit to them. And as to the barbarity of these people, it is not with them as it is with other Pagans, of whom we have read and heard: for the Hindoos are certainly distinguised from all people on the face of the earth, for their harmless and inoffensive behaviour; and the province of Bengal and its inhabitant are proverbially distinguished from all other parts of India, for their gentleness of manners, and harmless behaviour to their enemies, as well as their friends. I have known among them, men of considerable power and authority, who were highly offended with me, because they imagined my work affected, their interests; but I lived within a mile of them, in a lonely house, with my windows and doors wide open all night, without a sword or firearms, and free from the smallest apprehension of danger. [Periodical Accounts, Vol.I]

এই জন টমাস সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর মনে ধর্মপ্রচারের উৎসাহ ও উত্তেজনা যথেষ্ট ভাবেই থাকা সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন বলা যায়। দীর্ঘ পাঁচবৎসর বঙ্গদেশে অবস্থান কালে তিনি একজন হিন্দুকেও ধর্মান্তরিত করতে পারেন নি। বরং তাঁর মুনশী রামরাম বসু এবং পার্বতী ব্রাহ্মণ নামক অপর সঙ্গীর দ্বারা বারবার প্রতারিত হয়েছিলেন। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিত পদ্মলোচনের কাছে মুগ্ধবোধ পাঠ অসমাপ্ত রেখেই কলকাতায় আসেন। চার্লস গ্রান্ট তাঁর আর্থিক দুরবস্থার কথা জেনে সাহায্য দিতেন, উড্‌নিও তাঁকে কয়েকবার ঋণভারের হাত থেকে মুক্ত করেন; এমন কি স্বয়ং উইলিয়ম জোনস্ তাঁর রচিত পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে উৎসাহ দেখান। কিন্তু ভগ্নমনোরথ জন টমাস ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন।

এরপর উইলিয়ম কেরী ও তাঁর পরিবারবর্গ সহ একাকী টমাস কলকাতায় পৌছান ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর। অস্থিরচিত্ত টমাস এই সময় থেকে প্রায় আমৃত্যু উইলিয়ম কেরীর সঙ্গী ছিলেন। তবে তাঁর জীবনের সম্ভবত একমাত্র সান্ত্বনা ছিল এই যে, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর মিশনের সম্মুখস্থ গঙ্গার ঘাটে কৃষ্ণ পাল নামে একজন বাঙালীকে সর্বপ্রথম দীক্ষা দেন। এরপরই আনন্দে তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান এবং সেই অবস্থাতেই ১৩ অক্টোবর ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের জনৈক মোমবাতি ব্যবসায়ী জন ফার্নাণ্ডেজের গৃহে মৃত্যুবরণ করেন। ভারতে আগত প্রথম ব্যাপ্টিস্ট মিশনারির জীবনের

পরিণতি বড়ই ট্রাজিক্‌।

শ্রীরামপুর মিশনারিদের প্রধান কেরীর জীবন ও অনন্যকীর্তি কাহিনী আলোচনার পূর্বে মিশনের অন্যতম দুই প্রধান স্থপতি জোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়ম ওয়ার্ডের সংক্ষিপ্ত জীবনের মূল কর্মকাণ্ডের উল্লেখ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ হল।

জোশুয়া মার্শম্যান : জন্ম ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল উইন্টশায়ারের ওয়েস্টবারী লে-তে। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই তিনি মিশনের শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ শুরু করেন। সহধর্মিনী হান্না মার্শম্যানের সহযোগিতায় শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠাপর্বের প্রধান স্থপতি এই মার্শম্যান। চীনাভাষায় বাইবেলের অনুবাদ এবং উক্ত ভাষায় ব্যাকরণ অনুবাদ এবং চীনা-ইংরাজী-চীনা ভাষায় অভিধান রচনা তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি। চৈনিক দার্শনিক কুং ফুৎ সে-র রচনাবলীর বেশ কিছু অংশ ইংরাজিতে অনুবাদের কাজ করে মার্শম্যান এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর রচিত বাংলা গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ও পুরাবৃত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' বহুল প্রচারিত ও প্রশংসিত হয়েছিল।

মার্শম্যান, সংস্কৃত রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদ কর্মে কেরীর প্রধান সহযোগী ছিলেন। 'দ্য ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়ার' সহযোগী সম্পাদক জোশুয়া মার্শম্যান অবশ্য অন্য এক কুখ্যাতির অধিকারী। তিনি 'দ্য ফ্রেন্ড অব্‌ ইন্ডিয়ার' পাতায় বাংলার নবজাগরণের অগ্রপথিক রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে অহেতুক বিষোদ্‌গার করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক তর্কযুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। আবার এই মার্শম্যানই ধর্মপ্রচারক নয়, সমাজ-সচেতন ব্যক্তি হিসাবে হাওড়া-হুগলী অঞ্চলের রেল চলাচল ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছেন। তিনি ডেনমার্করাজ ষষ্ঠ ফ্রেডারিকের কাছ থেকে শ্রীরামপুর কলেজের সফল ছাত্রদের স্নাতক উপাধি প্রদানের অনুমতি আদায়ের জন্য ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীরামপুরে মার্শম্যানের মৃত্যু হয়।

উইলিয়ম ওয়ার্ড : ইংলন্ডের ডার্বিশায়ারে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২০শে অক্টোবর উইলিয়ম ওয়ার্ডের জন্ম। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে তিনি কিছুকাল ডার্বির মি. ডুরির ছাপাখানায় শিক্ষানবিশী করেন এবং পরে 'ডার্বিমার্কারি' নামে পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব পান। এইসময় তিনি ফরাসি বিপ্লব ও সাম্য-স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠেন। তবে শেষ পর্যন্ত 'হাল অ্যাডভারটাইজার' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু খুব শীঘ্রই জার্নালিজম ও রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন। পরে বিখ্যাত প্রচারক ডক্টর ফসেটের শিক্ষাধীনে থাকেন প্রায় এক বৎসর। হাল-এ অবস্থান কালেই ওয়ার্ড ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ব্যাপটিস্ট মিশনের অধীনে দীক্ষিত হন। ওয়ার্ড কোনদিনই বাংলা ভালো করে শেখেন নি। কিন্তু শ্রীরামপুরে প্রচারক হিসাবে যোগদানের পর মিশন প্রেসের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে বাইবেল মুদ্রণের কাজ ত্বরান্বিত হয়। উইলিয়ন ওয়ার্ডের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুরে কাগজ-প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়। এর পরিচালকও ছিলেন তিনি।

ওয়ার্ডের সাহিত্যকৃতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে তাঁরই রচিত, Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos including Translations from their Principal Works" (Four Vol. 1811) নামক গ্রন্থে। এছাড়া তিনি খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে কয়েকটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার লেখক। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ শ্রীরামপুর মিশনেই তাঁর মৃত্যু হয়।

"Asiatic Journal তাঁর সম্পর্কে লেখেন : "Ward ... excelled in a knowledge of Hindu life; of which he must be accounted to have been a thorough master.

from a continual study of the subject, he had insensibly acquired no inconsiderable share of the outward habits of the Hindus, ..."

উইলিয়ম ইয়েটস্ (Yates) : শ্রীরামপুর মিশনের প্রধান কেরীর কথা শুরুর আগে তাঁর প্রথম পুত্র ফেলিক্স কেরীর সমসাময়িক উইলিয়ম ইয়েটসের নাম শ্রীরামপুর মিশনারিদের মধ্যে অন্যতম এবং উল্লেখযোগ্য। ফেলিক্স কেরী যেমন শারীরতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা ও তথ্য সমূহ নথিভূক্ত করেন, তেমনই ইয়েটস্ রচনা করেন দুখানি মূল্যবান গ্রন্থ 'পদার্থবিদ্যাসার' এবং 'জ্যোতির্বিদ্যা'। ইনি মূলত মিশন কর্মী হয়েও ফেলিক্স কেরীর মত, বিজ্ঞানের নানা অজানা দিক নিয়ে মনস্ক চর্চা করেছিলেন। তাছাড়া ইয়েটস ছিলেন "Introduction to the Bengali Language (2 Vols)" এর লেখক। এই গ্রন্থটি J. Wenger কর্তৃক কলকাতা থেকে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

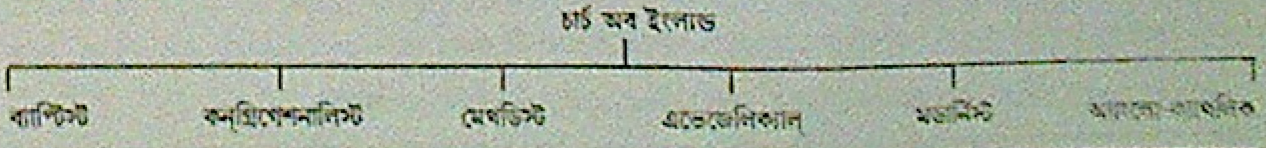
উইলিয়ম কেরী : প্রথমেই বলে রাখা দরকার এই রচনায় মিশনারি কেরীর জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু বঙ্গদেশে বিশেষত হুগলি-শ্রীরামপুর-কলকাতার বিস্তৃত জনপদের অন্যতম প্রধান খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক, সংস্কারক তথা শিক্ষাব্রতী হিসাবে তাঁকে স্মরণ করা অবশ্যই সমীচীন বোধ হয়। তাছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকর্মের বিস্তৃত পটভূমির আলোচনায় কেরী প্রসঙ্গ কোন মতেই পরিহার করা উচিত নয়। বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে মিশনারি কেরীর জীবন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, অসাধারণ পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী এবং সর্বপ্রকার জ্ঞানার্জনে অদম্য কৌতূহলী উইলিয়ম কেরী ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ আগস্ট নর্দাম্পটন্‌শায়ারের এক অখ্যাত গ্রাম পলার্সপিউরিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এডমন্ড ছিলেন তন্তুবায়, পরে অবশ্য তিনি স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে এবং স্থানীয় চার্চের কেরাণী নিযুক্ত হন। তাঁর মতে কেরী "was always attentive to learning when a boy, and was a very good arithmetician."

ধর্মপ্রচারকের সাধনীবৃত্তি অবলম্বনের পিছনে কেরীর জীবনে প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক এবং খ্রিস্টিয় নেতা জন রাইল্যান্ডের প্রভাব ছিল খুব বেশি। বহুভাষাবিদ, চার্চ মিনিস্টার জন কলেট রাইল্যান্ডের পুত্র উইলিয়ম কেরীকে নর্দাম্পটনশায়ারের মিশনারি কর্মী হিসাবে ব্রডমীড চ্যাপেলের ধর্মযাজকরূপে ও ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির স্থাপয়িতার ও সম্পাদকের কাজে উৎসাহিত করেন। কেরী চরিত্রের সঙ্গে রাইল্যান্ডের চরিত্রের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মত। কেরীর চেয়ে অল্পবয়সে রাইল্যান্ড বহু ইউরোপীয় এবং এশীয় ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং পরবর্তী জীবনে পণ্ডিত ভাষাবিদ, ঐতিহাসিক ও ধর্মসঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর অর্থাৎ কলকাতায় এসে পৌছবার দিন থেকে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুন অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত দীর্ঘ ৪১ বছরের জীবনেতিহাসে প্রাথমিক পর্যায়ের বাংলা গদ্যসাহিত্য নির্মাণের ইতিহাসের সঙ্গে পাদরী কেরীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতেই শ্রীরামপুরস্থিত ব্যাপটিস্ট* মিশন চার্চের অনান্য ধর্মপ্রচারক

---

*খ্রিস্টিয় ১৬১২ সালে ইংলন্ডের নিউগেট অঞ্চলে 'চার্চ অব ইংলন্ডের' অধীনে প্রথম ব্যাপ্টিস্ট চার্চ স্থাপিত হয়। তখন তার নাম ছিল 'জেনারাল'। ব্যাপটিস্ট চার্চ এর অন্তর্ভুক্ত যাজকমণ্ডলী ক্যালভীন মতবাদকে পরিহার করে জন স্মাইথ-এর প্রবর্তিত প্রায়শ্চিত্তবাদ বা মুক্তিবাদী আর্মিনিয়ন মত গ্রহণ করেন। এর ফলেই 'জেনারেল' ব্যাপটিস্ট চার্চ বিভক্ত হয়ে 'পার্টিকুলার' ব্যাপ্টিস্ট চার্চ গঠিত হয়। এই 'পার্টিকুলার' ব্যাপ্টিস্টরা আবার ক্যালভীন মতকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টানদের স্থাপিত চার্চ অব ইংলন্ডের অন্তর্ভুক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিন্যাস নিম্নরূপ।



সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হবার পূর্বে তিনি মুনশী রামরাম বসুর পিতৃব্যের সুন্দরবনের জমিদারিতে সামান্য কয়েকদিন অবস্থানের পরই কলকাতা, ব্যান্ডেল, নদীয়া, মালদহ, মদনাবাটি, কেদারপুর বা খিদিরপুর, দেবহট্ট, মহীপালদীঘি এবং কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলের বাগানবাড়িতে অবস্থান করেন।

বাংলা গদ্যের আবির্ভাবের আগে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে অকুণ্ঠ আহরণ এবং ব্যবহারই ছিল বাংলা গদ্য সৃষ্টির প্রস্তুতি ক্ষেত্র। তখন ভাষাটির রীতি ও প্রকৃতি দুই-ই ছিল অকৃত্রিম, সরল এবং গ্রাম্য। কিন্তু মুসলমান শাসকদের সময়ে এবং আমলাতান্ত্রিক অত্যাচারে সববিষয়ে ফার্সীর ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়ার ফলে বাংলা চলিত ভাষার শুদ্ধতা শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। ভাষার দেহে কৃত্রিমতার প্রবেশ ঘটে। ফলে কথ্যভাষাতেও অনেক দোষ প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এ বিষয়ে A Grammar of the Bengal Language গ্রন্থে ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন : "...... মুসলমান, পর্তুগীজ ও ইংরেজ পরপর সকলেই ধর্ম, আইন, কারুশিল্প ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত বহু শব্দসম্ভার বাংলাভাষার কাঁধে চাপাইয়া দিয়াছে।"

তবে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনের প্রধান হিসাবে এবং সন্নিহিত অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মগ্রন্থ প্রচার উপলক্ষ্যে উইলিয়ম কেরী বাংলাভাষার যে উন্নতি সাধন করেছিলেন তার উল্লেখ অবশ্যই প্রয়োজন। ডঃ সুশীলকুমার দে প্রণীত Bengali Literature* গ্রন্থে প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে এইভাবে: "To Carey belongs the credit of having raised the language from its debased condition of an unsettled dialect to the characters of a regular and permanent from of speech, capable, as in the past, of becoming the refined and comprehensive vehicle of a great literature in the future".

কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন তাঁর সুবিখ্যাত "A Dictionary in English and Bengalee"(1834) গ্রন্থের ভূমিকায় এই কেরী প্রসঙ্গ উত্থাপন করে স্পষ্টভাষায় লিখেছেন : "......I must acknowledge here that whatever has been done towards the revival of the Bengalee language its improvement, and in fact the establishing it as a language must be attributed to the excellent man Dr. Carey and his colleagues, by whose liberality and great exertions many works have been carried through the Press and the general tone of the language of this province so greatly raised."

এখানে স্বীকার করা দরকার, যখন কেরীর অবদান সম্পর্কে সচেতন হয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর অব ডিভিনিটি'তে ভূষিত করেন, তখন তাঁরই স্বদেশবাসী অথবা প্রাচ্যের যে

এর মধ্যে ব্যাপটিস্ট চার্চকে নন্‌কনফর্মিস্ট সম্প্রদায় অর্থাৎ সরকার অনুমোদিত গির্জা-বিরোধী সম্প্রদায়ভুক্ত ধরা হয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত টীকা অনুসারে ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ৩১মে'র সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ঐ বৎসরের ২রা অক্টোবর 'কেটারিঙ'এ আহুত সভায় ব্যাপটিস্ট মিশনারি সমিতি-গঠনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, জন রাইল্যান্ড, রেনল্ড হগ, এ. ফুলার, উইলিয়ম কেরী, অ্যাব্রাহাম গ্রীনউড, এডওয়ার্ড শার্ম্যান, জোশুয়া বার্টন, স্যামুয়েল পীয়ার্স, টমাস ব্লানডেল, উইলিয়ম হেটন, জন এয়ার্স এবং জোসেফ টিমস্। এই সভাতেই রাইল্যান্ড, হগ, কেরী, সাটক্লিফ ও ফুলারের উপর নবগঠিত সমিতির কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এরপর সমিতি, স্বদেশ প্রত্যাগত জন টমাসের 'অনুসন্ধান মূলক প্রতিবেদন' সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারী পুনরায় অধিবেশন আহ্বান করেন। সেই অধিবেশনেই স্থির হয় বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে জন টমাসকেই ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইবে। টমাস সম্মত হইলে তাঁর সঙ্গী নির্বাচনের প্রশ্নটিও সভায় বিবেচিত হয় আর সেই সভাতেই উইলিয়ম কেরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জন টমাসের সহকর্মী হিসাবেই ভারতে আসতে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

*History of Bengali Literature in the Nineteenth Century (1800-1825)

দেশটির মানুষের সারস্বত নির্মিতির জন্য আমৃত্যু কাজ করে গেছেন, যে বাংলাভাষাকে ভালবেসে তার উন্নতির জন্য আজীবন সাধনা করে গেছেন, কোন স্থান থেকেই তাঁকে কখনও উপযুক্ত মর্যাদা জ্ঞাপন করা হয়নি। এমন কি তৎকালীন বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও কেরীর অবদানকে তুলনামূলক বিচার দূরে থাক স্বীকৃতিও দেন নি বরং বলা চলে জেনেশুনে তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। একদল প্রাজ্ঞব্যক্তির মতই ছিল যে কেরী কেবল ব্যাকরণ রচনাকার অথবা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার অভিধান প্রণেতা মাত্র। কিন্তু বঙ্গদেশে কেরীর অপর সকল কীর্তিকলাপ সাধারণ মানুষ বিস্মৃত হতে চাইলেও, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় যাঁরা মননশীল তাঁদের হৃদয়ে কেরীর স্থান চিরদিন অম্লান থাকবে। কারণ অন্যান্য প্রমুখ শ্রীরামপুর মিশনারিদের সহায়তায় কেরীই প্রথম বাংলাভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিত করে ব্যবহার যোগ্য ভাষার মর্যাদা দান করেছিলেন। একদিক থেকে আরবী ও ফার্সী, অন্যদিকে সংস্কৃতের প্রসাদগুণে বাংলাভাষা যখন তার স্বকীয়তা অর্জনের ক্ষেত্র থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে, তখন কেরী তাঁর অত্যাশ্চর্য দূরদৃষ্টির সাহায্যে এই ভাষাকেই আশ্রয় করে নিজস্বতা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেন নি। অন্য প্রাদেশিক ভাষাসমূহ যার অধিকাংশই ছিল তাঁর অধিগত, এমন কি যিনি প্রচলিত বা লোকায়ত ভাষার প্রাধান্য অস্বীকার করে সংস্কৃত দুহিতা বাংলাকেই ভারতের প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য কেবল মৌখিক প্রচারের মধ্যেই সীমিত ছিল না। কারণ তিনি বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্যের সার্বিক উন্নতিকল্পে দীর্ঘ সময় ধরে যে সাধনা করে গেছেন, যে সৃজনী প্রতিভার অমিত স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার মধ্যেই তাঁর অন্তরোপলব্ধির প্রকৃত সত্য প্রমাণিত।

কেরীই প্রথম অনুভব করেছিলেন, "একটি বৃহৎ জাতির অন্তরের সর্ববিধ ভাব প্রকাশের পক্ষে এবং সাংসারিক ও ব্যবহারিক সর্ববিধ প্রয়োজন সাধনের পক্ষে বাংলাভাষার মাধ্যম যথেষ্ট; মাতা সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ভাষার উপর নির্ভর না করিলেও তাহার চলিতে পারে।" অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বিদেশাগত উইলিয়ম কেরী তাঁর এদেশে অবস্থানের স্বল্পকাল পরেই যা বুঝেছিলেন, বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা, নিত্যচর্চার উপকরণ তাঁদের এই সরল সত্যটি অনুভব করতে আরও সার্ধশতাব্দী অতিক্রম করতে হয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে, মিশনারিদের অবদান এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত।

যদিও বর্তমানে আলোচ্য বিষয়ের প্রেক্ষিতটি হুগলি জেলাতে অবস্থান করে বঙ্গীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ সংস্কার সাধনে যুক্ত মিশনারিদের অবদান বিষয়ের মধ্যেই সীমায়িত, তবু বিদগ্ধ পাঠককুলের পক্ষে সহজেই অনুমেয় যে, এরও দু'টি স্বতন্ত্র দিক রয়েছে। প্রথম দিক হইল বিদেশাগত মিশনারিদের ধর্মপ্রচার আন্দোলনের পাশাপাশি ইংরাজি শিক্ষা, পাশ্চাত্য ভাবনা প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ পর্ব এবং দ্বিতীয়ত, দেশজ শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার আচরণ এবং সর্বোপরি লেখ্য ও কথ্য ভাষাকে সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের স্বার্থে গ্রহণযোগ্য করে তোলার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। এই দুই প্রত্যয় আপাতদৃষ্টিতে Contradistinction- এর অন্যতম দৃষ্টান্ত বলে মেনে নিলেও এই দুটি স্বতন্ত্র-ভাবনার আন্দোলনের চারিত্রগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক ধরণের complimentarity-র লক্ষণাক্রান্ত। বিষয়টি সামান্য ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে।

"এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন হয়েছিল ইংরেজ শাসককুলের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবেই" — এই ধরণের অদ্ভুত বক্তব্য ভারতীয় গনমানসে স্থান পেয়েছিল আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষার প্রসার আসলে সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারেরই সংগঠিত রূপ। যদি এই সিদ্ধান্তকে সত্য এবং সঠিক বলে মেনে নিতে হয় তবে ১৯৫০ সালে ভারতীয়

সংবিধানে যে নির্দেশনামা লিপিবদ্ধ হয়, "১৯৬৫ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থা হইতে ইংরাজি ভাষার ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে হইবে" - এই গুরুত্বপূর্ণ সরকারী প্রস্তাবের সারবত্তা তো অর্থহীন হয়ে পড়ে। বাস্তবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়নি এবং স্বীকার করতে দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে, সিদ্ধান্তটি সম্ভবত কখনও কার্যকর হবেনা। বরং দেখা গিয়েছে যে ইংরাজী ভাষা ও শিক্ষার একান্ত প্রসাদগুণে এক নূতন বাঙ্গালী জাতির অভ্যুদয় ঘটেছে, আধুনিকতার জাগরণ হয়েছে সম্ভব, এর নামই কি নবজাগরণ নয়! এরই প্রত্যাশায় কি বাংলা তথা ভারতবর্ষ দীর্ঘ যুগ ধরে অপেক্ষা করে থাকেনি!

অন্যদিকে লর্ড ওয়েলেসলির ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার পরই ইংরেজ রাজকর্মচারীরা যাতে এদেশবাসীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে পারেন প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি, বিচার পদ্ধতি এবং আইন ব্যাখ্যার স্বার্থে ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাঁরা ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজ* স্থাপনের মত মহৎ কাজে ব্রতী হন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বর্তমানকালে বাঙালীর যে জাতীয় গৌরব ও নিজস্বতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান মাধ্যম, সেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ইংরাজ শাসনপর্ব কালেই সম্ভব হয়েছিল। আর ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজের বাংলা ভাষারই শিক্ষক ছিলেন মিশনারি উইলিয়ম কেরী।

যদিও আলোচ্য রচনার মৌল অনুসন্ধানী বৃত্তটির পরিধি কেরীর জীবনালেখ্য রচনা নয়, তবু একথা অনস্বীকার্য যে, হুগলি-শ্রীরামপুর তথা বঙ্গদেশের সংস্কৃতি নির্মাণে কেরীর সাহিত্যকৃতি তথা বাংলা ভাষা ও গদ্যরীতির গবেষণায় তাঁর বিস্ময়কর অবদান অনুল্লেখ্য থাকতে পারে না। অভিধানকার ব্যাকরণ রচয়িতা কেরীকে সংস্কৃত চর্চা এবং বেদগ্রন্থ বা রামায়ণের মত প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থের সম্পাদনা ও পুনর্মুদ্রণের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন দেখে তাঁর মূল অভিপ্রায় অনুমান করতে পারি। এবিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদি মোটামুটি এইরকম। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ কেরী কলকাতা থেকে ইংলন্ডে সাটক্লিফকে এক পত্রে লিখেছেন : "....An idea, however, of the advantage which the friends of Christianity may obtain by having these mysterious sacred notings (which have maintained their celebrity so long merely by being kept from the inspection of any but interested brahmins) exposed to view, has induced me, among other things to unite the Sanskrit Grammar, and to begin a dictionary of that language,.... and am now in hopes I shall be able to procure all that are extent..... If I succeed, I shall be strongly tempted to publish them with a translation, pro bono publico..

আবার ২রা জুন ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে কেরী, ফুলারের কাছে এক পত্রে লিখেছেন : "We have had many things to print for the College, and are now contemplating an edition of Vedas; if Government will indemnify us for a hundred copies of this, we have hopes. This work will make about twenty volumes, octavo, of five hundred pages each...." তবে এও সত্য এই বেদগ্রন্থ মুদ্রণের অন্তরালে বা রামায়ণের সানুবাদ সংস্করণের পিছনে এই মিশনারিদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল-ইউরোপে এই গ্রন্থসমূহের অসারতা প্রমাণ করা। সুখের বিষয় কেরী, মার্শম্যান বা ওয়ার্ডের মত প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী মিশনারিরা খুব বেশিদিন নিজেদের সংকীর্ণ মনোভাব বজায় রাখতে পারেন নি। এর বড় প্রমাণ হল, সংস্কৃত ভাষা ও

*ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সংক্রান্ত কোন উল্লেখ বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হয় নি।

সাহিত্যের চর্চা করতে করতে এবং এদেশীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার ফলে এঁদের মতের পরিবর্তন ঘটে। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে সেপ্টেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের Public Disputation-এর শেষে স্বয়ং কেরী ছাত্রদের সামনে যে বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি বলেন: ''Considered as the source of the colloquial tongues, the utility of the Shanscrit Language is evident; but as containing mumerous treatises on the religion, jurisprudence, arts and sciences of the Hindoos, its importance is yet greater; especially to those to whom is committed by this government, the province of legislation for the Natives, in order that being conversant with the Hindoo writings, and capable of referring to the original authorities, may propose, from time to time, the requisite modifications, and improvements, in just accordance with existing how and ancient institution.

Sanscrit learning, say the Brahmans, is like an extensive forest, abounding with a great variety of beautiful foliage, splendid blossoms, and delicious fruits; but surrounded by a strong and thorny fence, which prevents those who are desirous of plucking its fruits or flowers, from entering in.

The learned Jones, Wilkins, and others, broke down this opposing fince in several places; but by the College of Fort William, a high way has been made into the midst of the wood. আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও মাননীয় পরিদর্শক গভর্নর ওয়েলেসলিকে সম্বোধন করে কেরী সংস্কৃত ভাষায় বলেন - 'যেয়ং প্রাচীন ভাষা কুমারিকাখণ্ডীয় পূর্বকালীন সর্বাধ্যক্ষান্ প্রতি আত্মপ্রকাশং কর্তুম সম্মতাসীৎ সেয়ং ভাষা তবাজ্ঞয়া স্বকীয় সকলভাণ্ডারদ্বারং মুক্তা অতিপূর্বকালীন বিবরণবিধি-বিদ্যাভিঃ পৃথ্বীং ধনবতীং করোতি।' এই বক্তৃতা পর্বের শেষ দিকে কেরী অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেন : 'ইদানীং বৃদ্ধোহং কুমারিকা খণ্ডস্থানমধ্যে বহুদিনং বাসম্কার্যং দিনে দিনে অনেকলোকান্ প্রতি হিতোপদেশ করণায় ব্রাহ্মণৈঃ সহসর্ব্ববিষয়ক কথোপকথনায় কুমারিকা খণ্ডীয় বালকানাং খ্রীষ্টীয় ধর্মশিক্ষা করণনিমিত্তক সকল পাঠশালা কর্তৃত্বকরনায় চ প্রবৃত্তোহস্মি। বঙ্গীয়ভাষা স্বদেশীয়ভাষাবৎ প্রায়োময়া কথিতা আসতে অন্যের ন্যৈলৈকৈরেতেষাং বিষয়ে যদ্‌যজ্‌জ্ঞানং প্রাপ্তং বহুকালাবধি এতদ্রাজীয় নানা দেশ স্থলোকৈঃ সহ ধারাবাহিকপরিচয়েন মম তদনুনসর্ব্ববিষয়কজ্ঞানং প্রাপ্তুং প্রাপ্তকালোহভবৎ অহমন্যদপি কথয়ামি যদ্যস্মিন্ দেশে জাতো ভবেয়ং তদা যথা তেষাং ব্যবহারক্রিয়াধারা অনুভবঞ্চ ময়া জ্ঞাতো ভবেৎ তদবৎ ইদানীং তৎ সর্ব্বং প্রায়ো জ্ঞাতমাস্তে।'

উপরিলিখিত সংস্কৃত রামায়ণ অনুবাদের কাজ শুরু হয় ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে আর তার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮০৬-এ। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবার পর তৃতীয় খণ্ড মুদ্রণের প্রস্তুতি চলাকালীনই বন্ধ হয়ে যায় কারণ ১৮১২ খ্রিস্টাব্দেই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসভবনে আগুন লেগে সমস্ত পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হয়ে যায়। অনূদিত রামায়ণ খণ্ড ছাড়া আরও অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি এই আগুনে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

ভারতে আগত বিদেশী খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের অন্যতম প্রধান উইলিয়ম কেরীর সাহিত্য সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ না করলেও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট কেরী, মি. জন সাটক্লিফকে যে চিঠি লেখেন সেই চিঠির বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। ঐই

পত্রের এক অংশে তাঁর ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা বিষয়ক অনেক বক্তব্য বলা হয়েছে। "I have, therefore, published grammars of three of them, the Sanscrit, the Bengali and Mahratta, I intend also to publish grammars of the others, and have not in the press a grammar of the Telinga Language, and another of that of the Seeks (sikhsl), and have begun one of the Orissa language. To these I intend in time to add those of the Karnata, the Kashmeera, and Nepala, and perhaps the Assam languages ...... I am contemplating, and indeed have been long collecting materials for a Universal Dictionary of the oriental languages, derived from the Sunscrit, of which that language is to be the ground-work, and to give the corresponding Greek and Hebrew words. I wish much to do this, for the sake of assisting biblical students to correct the translation of the bible in the oriental languages, after we are dead, but which can scarcely be done without something of this kind; and perhaps another person may not , in the space of a century, have the advantages for a work of this nature than I now have."

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী উইলিয়ম কেরী এই ইউনিভার্সাল ডিক্সনারি প্রস্তুত করেছিলেন। হয়তো মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী এই অভিধানে হিব্রু ও গ্রীক প্রতিশব্দ যুক্ত করা সম্ভব হয়নি কিন্তু এতে মোট ১৩টি ভারতীয় ভাষা যেমন, (১) সংস্কৃত (২) কাশ্মীরি (৩) পাঞ্জাবের অন্তর্গত জালন্ধর ভাষা (৪) মধ্যদেশ ভাষা (৫) পার্ব্বতী ভাষা (৬) মিথিলা বা মৈথিলী ভাষা (৭) বাঙ্গালা ভাষা (৮) উৎকল ভাষা (৯) মহারাষ্ট্র ভাষা (১০) কর্ণাটক ভাষা (১১) গুর্জর ভাষা (১২) তৈলঙ্গী ভাষা এবং (১৩) দ্রাবিড় ভাষা, একত্রিত করে যে বিশাল শব্দকোষ রচিত হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি ১১ মার্চ ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের আগুনে অন্যান্য বহু পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ভষ্মীভূত হয়। এই ধ্বংসের ফলেই কেরী মানসিক ভাবে পর্য্যুদস্ত হয়ে পড়েন। তিনি সেই সময়ে নাকি প্রায় বালকের মত কান্নাকাটি করতেন। এরপর কেটে গেছে অনেক সময়, কিন্তু কেরীর মত আরও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি একাজে এগিয়ে আসেন নি আজও ।

উইলিয়ম কেরীর সাহিত্যকৃতি

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন ক্যাপ্টেন ক্রিস্‌মাস্ পরিচালিত ডেনিশ জাহাজ প্রিন্সেস্ মারিয়ার যাত্রী হয়ে উইলিয়াম কেরী সপরিবারে এবং পাদ্রী জন টমাস সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। সমুদ্রপথে ভ্রমণ কালেই কেরী, টমাসের কাছে বাংলা শিখতে শুরু করেন এবং ১১ নভেম্বর কলকাতায় পৌছবার আগেই বুক অব্ জেনেসিস্ - এর অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কেরী, মুন্সী রামরাম বসুর সহায়তায় বাংলা ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং সহযোগী ধর্মপ্রচারক ফাউন্টেনের সাহায্যে সমগ্র নিউ টেস্টামেন্ট ও ওল্ড টেস্টামেন্টের অধিকাংশই অনুবাদ করতে সক্ষম হন। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি পণ্ডিত কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত গোলোকনাথ শর্মার (মালদহ-মদনাবাটিস্থিত) সহযোগিতায় সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন, তাই নয়, মহাভারতের পাঠ শেষ করে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার কাজ শুরু করেন।

ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গে বাসকালে কেরী সেখানকার জীবজন্তু, গাছপালা, আচার-ব্যবহার, সংস্কার,

ধর্মাচরণ এবং তৈজস ও বাসনপত্রাদি সম্পর্কে লিখিত আলোচনা করেন এবং বাংলাভাষায় বেশ কয়েকটি সঙ্গীতও রচনা করেন। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসেই তিনি স্যামুয়েল পিয়ার্স-এর A Letter to the Laskars' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদের কাজ শেষ করেন। এটিই কেরীর প্রথম বাংলা পুস্তক রচনা।

জন টমাস, রামরাম বসু, কেরী ও ফাউন্টেন অনূদিত এবং কেরী সম্পাদিত সমগ্র নিউ টেস্টামেন্ট প্রকাশিত হয় ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারী। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড-এর অনুসরণে কেরীর বিখ্যাত 'ব্যাকরণ' গ্রন্থ ১৮০১ খ্রিস্টাব্দেই সংকলিত এবং আংশিক মুদ্রণ কার্য সম্পন্ন হয়। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্রে লেখা হয়েছে : "Grammar of the Bengalee Language, the Second Edition, with Additions by W. Carey. Teacher of the Fort William. Serampore, Printed at the Mission Press. 1805." ১৮৪ + ৮ পৃষ্ঠার এই ব্যাকরণে দশটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১। Of Letters, ২। Of Compounding letters, ৩। Of Words, ৪। Of Patronyms, gentiles, derivatives etc., ৫। Of Adjectives, ৬। Of Pronouns, ৭। Of Verbs, ৮। Of Indeclinable participles, ৯। Of Compounding words এবং ১০। Of Syntax, তাছাড়া Of Numerals, Of Money, Weights and measures, times, the days of the week, Hindoo months, Constructions ইত্যাদি এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ যে কেবল বেতনভুক কেরানীকুল সৃষ্টি করা নয়, কিংবা পরাধীন ভারতবাসীকে জোর করে মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্পর্কে অনবহিত রাখাই নয়- তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে কেরী-কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থের ভূমিকায়। তিনি লিখেছেন, বাংলা ভাষা জ্ঞান ও অধ্যয়ন ইংরেজদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, কারণ ইংরাজীর তুলনায় বাংলাভাষার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য সবিশেষ সমৃদ্ধ। তিনি লিখেছেন : "Bengal, as the seat of the British Government in India, and the centre of a great part of the commerce of the East, must be viewed as a country of very great importance. Its soil is fertile, its population great, and the necessary intercourse subsisting between its inhabitants and those of other countries who visit its parts, is rapidly increasing. A knowledge of the language of this country must therefore be a very desirable object. The pleasure which a person feels in being able to converse upon any subject with those who have occasion to visit him, is very great. Many of the natives of this country, who are conversant with Europeans, are men of great respectability, well informed upon a variety of subjects both commercial and literary, and able to mix in conversation with pleasure and advantage. Indeed husbandmen, labourers, and people in the lowest stations, are often able to give that information on local affairs which every friend of science world be proud to obtain........ Words may be compounded with such facility, and to so great an extent in Bengalee as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to its copiousness. On these, and many other accounts, it may be esteemed one of the most expressive and elegant languages of the East."।

কেরীর অপর উল্লেখযোগ্য রচনা সংকলন 'Dialogue' গ্রন্থ যার গুরুত্ব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। পণ্ডিতপ্রবর H.H. Wilson এর ভাষায় " ...... it presents in many respects a curious and lively picture of the manners, feelings and notions of the natives of Bengal." বাস্তবে কেরী সংকলিত ও সম্পাদিত এই 'Dialogue' গ্রন্থে কলকাতা - শ্রীরামপুর এবং সন্নিহিত অঞ্চলে সকল স্তরের স্ত্রী-পুরুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম ও আচার ব্যবহার প্রচলিত (মৌখিক) ভাষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। পুস্তকটি পরবর্তী কালের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের ক্ষেত্রে এক নূতন দিগ্‌দর্শক।

এই সংকলন গ্রন্থের বিষয়বস্তু অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যায় যে উনিশ শতকের শুরুতে একজন মিশনারি এই কাজে যে সাহস, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। এর চেয়ে বড় কথা একজন ধর্মপ্রচারক হিসাবে কেরীর যে পরিচয় আমরা পাই তার তুলনায় অনুসন্ধিৎসু, সমাজ সচেতন, পারিপার্শ্বিকতা বোধ, বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক-মানসিকতার বিবর্তন ও বিবর্ধন বিষয়ে আগ্রহী, সৃজনশীল কেরী চরিত্র অনেক বড়।

এই 'Dialogue' পুস্তকটি 'Colloquies' নামেও পরিচিত। এর প্রতিটি অধ্যায়ে তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, অন্ত্যজ শ্রেণী এবং দৈনন্দিন সংসারযাত্রার ও জীবনের অন্তর্নিহিত ভাষারূপ। এই পুস্তকে ব্যবহৃত ভাষাবর্ণনা ও গঠন-চাতুর্য ও রচনাশৈলী লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে কেরী যেন পরবর্তীকালের টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম বা দীনবন্ধু মিত্র-দের পূর্বসূরী হিসাবেই বাংলা মৌখিক ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগ কৌশলের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করে গেছেন। ডঃ সুশীল কুমার দে তাঁর History of Bengali Literature (1919) গ্রন্থে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১৮০২ থেকে ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উইলিয়ম কেরী, জন টমাস (সামান্য কয়েক মাসের জন্য) রামরাম বসু, জোশুয়া মার্শম্যান ও ফাউন্টেসের সহযোগিতায় ওল্ড টেস্টামেন্টের চারটি খণ্ড প্রকাশ করেন। প্রতিটি খণ্ডই শ্রীরামপুর প্রেসে ছাপা হয়। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দেই কেরীর সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানে এবং (অনুমান) পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের নির্দেশনায় কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের রামায়ণ ও মহাভারতের মুদ্রণকার্য শ্রীরামপুর মিশন প্রেসেই সম্পন্ন হয়। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে কেরী মহারাষ্ট্রীয় ধর্মগ্রন্থের অনুবাদের কাজ শুরু করেন কিন্তু মেজর কোলব্রুক* এই কাজটি হাতে নিয়েছেন জেনে, তখনকার মত প্রস্তাবিত অনুবাদ কার্যটি স্থগিত রাখেন। ১৮০৫-০৬ খ্রিস্টাব্দে কেরী-কৃত মারাঠীভাষায় ব্যাকরণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এর ফলে পাদরি কেরী মারাঠীভাষাভাষীদের কাছে সম্মানিত এবং স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব বলে গণ্য হন। জোশুয়া মার্শম্যানের সহযোগিতায় কেরী বাল্মিকী রচিত মূল 'রামায়ণ'-এর প্রথম খণ্ড ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশ করেন ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দেই ৩০ আগস্ট তারিখে কেরীর 'সংস্কৃত ব্যাকরণ' প্রকাশিত হয়। কোন বিদেশীর লেখা এটিই সর্বপ্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণের পূর্ণাঙ্গরূপ। এই গ্রন্থের ভূমিকায় কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামনাথ বাচস্পতির নিকট তাঁর ঋণ স্বীকার করেন।

১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত রামায়ণের দ্বিতীয় খণ্ড, ওই বৎসরের জুন মাসে ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথমাংশ এবং সংস্কৃত ভাষায় 'নিউ টেস্টামেন্টের' প্রথমাংশ প্রকাশের কৃতিত্ব পাদরি উইলিয়ম কেরীর। এই কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার এবং জোশুয়া মার্শম্যান। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে

---

*ইনি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ H.T. Colebrook নন।

'রামায়ণ'-এর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করা ছাড়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মারাঠী পণ্ডিত বৈদ্যনাথের সহযোগিতায় কেরী 'মারাঠী অভিধান' প্রকাশ করেন। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে 'ওড়িয়া ভাষার নিউ টেস্টামেন্টের' অনুবাদ ও ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারীতে কেরীর 'পাঞ্জাবী (শিখ) ব্যাকরণ' এবং তাঁরই সম্পাদিত 'ইতিহাস মালা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে। এই 'ইতিহাস মালা' সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন এবং ড: সুশীল কুমার দে মহোদয়গণ আলোচনাসহ উল্লেখ করেছেন।

১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই বিধ্বংসী আগুনে তেরটি ভারতীয় ভাষায় রচিত বহুভাষী শব্দকোষ ছাড়াও কেরীর প্রাণপ্রিয় সংস্কৃত অভিধানের পাণ্ডুলিপির অধিকাংশই ভস্মীভূত হয়। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের আগে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের এই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব হয়নি। তবে ওই বছরেই কেরী তাঁর তেলেঙ্গা ভাষার ব্যাকরণ এবং ওড়িয়া ভাষায় রচিত ওল্ড টেস্টামেন্টের একটা বড় অংশ প্রকাশ করেন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের শেষে কেরী 'মাগধীভাষায় ওল্ড্ টেস্টামেন্টের' অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করেন। ইতিমধ্যে অর্থাৎ ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দেই কেরী 'মাগধী ভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের' অনুবাদের কাজ শুরু করে দেন। আবার প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জানা যায় ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে কেরী তাঁর 'পাঞ্জাবী ভাষায় অনুদিত নিউ টেস্টামেন্ট' প্রকাশ করেছেন। কেরী তাঁর নিউ টেস্টামেন্টের অসমীয়া সংস্করণ' প্রকাশ করেন ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে।

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ উইলিয়ম কেরীর জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই সময়েই কেরীর যুগান্তকারী সৃষ্টি বাংলা-ইংরাজী অভিধানের* প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কেরীকৃত 'কর্ণাটকী ভাষার ব্যাকরণ' প্রকাশিত হয়[(১)]। এই ১৮১৭ তেই প্রতিষ্ঠিত কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি র মর্যাদাপূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেন উইলিয়ম কেরী এবং তিনি আমৃত্যু এইপদে আসীন ছিলেন।

এখন থেকে দু'শো বছর আগে ব্যাপ্টিস্ট মিশন এর ধর্মপ্রচারক হিসাবে কেরীর বাংলাদেশে আগমন। অথচ ধর্মপ্রচারের কাজ না করে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ঐকান্তিক নিষ্ঠা সম্বল করে তিনি একাকী যা করেছেন এর তুলনা পৃথিবীতে বিরল। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইউস্টেস কেরী লিখেছেন : In Dr. Carey's mind, and in the habits of his life, there is nothing of the marvellous to describe, there was no great and original transcendency of intellect, on enthusiasm and impetuosity of feeling; there was nothing in his mental character to dazzle or even to surprise. Whatever

---

*এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত দুটি পৃথকখণ্ডে এই বাংলা-ইংরাজী অভিধানের তারিখ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ লেখা আছে।

A Dictionary of the Bengalee Language in which the words are traced to their origin and their various meanings given Vol-1 by W. Carey, D.D., Professor of the Sungskrita, and Bengalee languages in the College of Fort William. Second Edtion, .. Correction and Additions, Serampore : Printed at the Mission Press, 1818 প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্র একই রূপ। তবে অবিক্রিত প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রের তারিখ পরিবর্তন করে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে করা হয়। এই কারণে দুটি খণ্ডের আখ্যাপত্রে ১৮১৮ এবং ১৮২৫ মুদ্রিত হয়। গ্রন্থদ্বয়ের আকার ডিমাই কোয়ার্টো, দুই কলমে মুদ্রিত প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৬১, ভূমিকা ৫ পৃষ্ঠা এবং সংস্কৃত ধাতুর তালিকা ৩৫ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা মোট ১৫৪৪। বাংলা ভাষায় এটিই কেরীর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ প্রীতি এবং এখন থেকে প্রায় একশ আশি বছরেরও আগে কেরী যে অধ্যবসায় সহকারে বাংলা ভাষাকে উর্দু-ফারসীর ভারমুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন, সেকথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

(১) ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে তাঁরই সক্রিয় সহযোগিতায় Gotthell Schroeter রচিত ভূটান অভিধান প্রকাশিত হয়।

of usefulness and of consequent reputation he attained to it, was the result of an unreserved and patient devotion of a plain intelligence and a single heart to some great, yet well defined, and withal practicable objects ....He had no genius, no imagination, He had nothing of the sentimental, the tasteful, the speculative, or the curious, in his constitution."

উইলিয়ম কেরীর বিজ্ঞানমনস্কতা

উইলিয়ম কেরীর জীবনীকার পিয়ার্স কেরী লিখেছেন : "Nature and he were sisters and brothers .... To watch things grow was his bare recreation ..... In the Paulerspury lanes and fields and forest, and in the moat between his father's school house and the rectory, little was hidden from his eyes. Bird-their forms, colours, changes, calls, songs, haunts, nests, flights, eggs .... And plants-their times and seasons, their leaves and buds and flowers, their soil and roots, their devices and their seeds-he eagerly and patiently discovered .... He became a recognized encyclopaedia amongst his Paulerspury mates on all things curious."

ছাত্র হিসাবে কেরী যে খুব একটা কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন, তেমন নিদর্শন না পেলেও তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক অনুসন্ধিৎসা যে শৈশবেই অঙ্কুরিত হয়েছিল তার পরিচয় পিয়ার্স কেরীর মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট। তাই বিজ্ঞানমনস্কতা পরিণত বয়সেও তাঁকে ত্যাগ করেনি। এর স্বপক্ষে বলা যায়, ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত Asiatic Researches or Transactions of the Society পত্রিকায় কেরীর বিখ্যাত প্রবন্ধ "Remarks on the State of Agriculture in the District of Dinajpur"-এর প্রকাশ। এতে উত্তরবঙ্গের ঋতু অনুসারে চাষের, উৎপন্ন বিবিধ শস্যের এবং লাঙল প্রভৃতি যন্ত্রাদির বিষয়ে যে গবেষণালব্ধ পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হয়েছে তাকে বিস্ময়কর এমন কি এদেশে সম্পূর্ণ নূতন বলা চলে। লাঙল, কোদাল, মই, ডাঙ্গা, কাস্তে প্রভৃতি যন্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়েছে এই প্রবন্ধে। কেবল দিনাজপুর জেলাতেই নয়, এতে সমগ্র বাংলাদেশের তৎকালীন কৃষিকার্য পদ্ধতির ইতিহাসও উপস্থিত। এই প্রবন্ধের শেষে কেরী লিখেছেন, [মনে রাখা দরকার সময়টা এখন থেকে ঠিক ১৯২ বছর আগে] "The improvement of livestalk, and introduction of dairies, the fencing and manuring of land, the introduction of wheel carriages, and a mumber of improvements of similar kind, have not been hinted at, because the present state of society seems to render them to a great degree impracticable. Yet the rapid progress to agricultural improvement on England, encourages, the hope, that a gradual improvement may also be effected in Hindoostan", বালক কেরীর কৃষি, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা এবং প্রাণীবিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতূহল তাঁর পরিণত বয়সেও ধর্মপ্রচারক অথবা ভাষাতত্ত্ববিদ কেরীর সদাব্যস্ত কার্যকলাপের অন্তরালে একেবারে লুপ্ত হয় নি। কারণ দেখা যাচ্ছে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের গোড়াতেই তিনি কলকাতার একটি কৃষিবিষয়ক সমাজ স্থাপন করেছেন। কলকাতার কোম্পানি বাগানের (পরে নাম হয় অ্যাগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি) সুপারিনটেনডেন্ট ডবলু, রক্সবার্গ-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ফলে তাঁর

অসুস্থতার সময়ে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কেরী সুবিখ্যাত 'Hortus Bengalensis, or a catalogue of the Plants of the Honourable East India Company's Garden in Calcutta' নামের গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন এবং শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকেই মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের বারো পৃষ্ঠা ব্যাপী কেরী লিখিত ভূমিকা সম্পর্কে অধ্যাপক জর্জ স্মিথ লিখেছিলেন, "His most characteristic writings on a scientific subject."

১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর সম্পাদনা ও সহযোগিতায় রক্সবার্গের 'Flora India' র দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে কেরী 'ভারতবর্ষে কৃষি' (On the Agriculture of India) নামে পরপর কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতামালা The Friend of India Quarterly - তে প্রকাশিত হয়। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কেরী বিখ্যাত লিলিয়ান সোসাইটি এবং ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন জিওলজিক্যাল সোসাইটি ও রয়্যাল অ্যাগ্রিকালচারাল সোসাইটির সম্মানজনক সদস্যপদ লাভ করেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দেই ভারতবর্ষে অ্যাগ্রি-হরটিকালচারাল্ সোসাইটি স্থাপন পাদ্রী কেরীর অন্যতম প্রধান কীর্তি। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই সোসাইটির সভাপতির পদে বৃত হন।

'প্রসঙ্গত, অ্যান এনকোয়ারি ইনটু দি ওবলিগেশ্যন্ অব্ ক্রিশ্চিয়ানস্ টু ইউজ্ মিনস্ ফর দ্য কন্‌ভারসন্ অব্ দ্য হিদেন' কেরীর প্রথম জীবনের রচনা এবং তাঁর ভারতের আসার অনেক আগেই এর কাজ শেষ করেন। এতে সেইসময়কার পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি-উপজাতিদের সম্পর্কে যথাসম্ভব নির্খুঁত পরিসংখ্যান সম্বলিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আবার এই উইলিয়ম কেরী তাঁর প্রথম জীবনে ক্যাপ্টেন জেমস্ কুকের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করে এতই প্রভাবিত হন যে ধর্মপ্রচারক হিসাবে সে সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরের তাহিতি দ্বীপেই যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসা জন টমাসের পরামর্শে এবং আগ্রহে ভারতবর্ষে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

এই বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী পাদ্রী উইলিয়ম কেরী ও তাঁর সহযাত্রী মিশনারিরা ধর্ম আন্দোলন, ধর্মান্তরিতকরণের কাজে প্রকৃত অর্থে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, তবুও কেন আমরা এইসব বিদেশী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের এই আলোচনার মূল বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছি, কেন আমরা তাঁদের অসামান্য অবদানের অভিঘাতের সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বঙ্গ সংস্কৃতি প্রসারের ইতিহাসের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করতে চাই, তার গূঢ় কারণ বর্ণনা অথবা যুক্তি স্থাপনার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য বোধ হয়। এই আলোচনার পটভূমি অন্বেষণে আমাদের কিছুটা পিছনে তাকাতে হবে।

এর সূত্রপাত স্যার উইলিয়ম জোনস্ ও কতিপয় ইংরাজ মনীষীর সমবেত চেষ্টায় Asiatic Society of Bengal স্থাপনের সময় থেকে। কাল: ১৫ জানুয়ারী ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে।

এরই সঙ্গে স্বীকার্য, ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম জোন্সের ভারত আগমন এবং পরে বছরেই এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর ও চার্লস্ উইলকিন্সের ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদে আগ্রহবোধ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এরই সঙ্গে স্মরণীয়, প্রতীচ্যের সামনে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যসংস্কৃতির পরিচয় ঘটানো এবং ইতিহাস চর্চা বিষয়ে মনোযোগী হয়ে ওঠেন জোন্স্ ও উইলকিন্সের পরবর্তী উত্তরসাধক হেনরী টমাস্ কোলব্রুক (১৭৬৫-১৮৩৭), হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ (১৭৮৬-১৮৬০), জেমস্ প্রিন্সেপ (১৭৯৯-১৮৪০), খ্রীশ্চিয়ান ল্যাজেন্ (১৮০০-১৮৭৬), ইয়ুজিন্ ব্যুর্য়েনুফ্ (১৮০১-১৮৫২), মনিয়ের উইলিয়ম্স্ (১৮১৯-১৮৮৯), আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম্ (১৮২৪-১৮৯৩), রুডলফ্ রোট্ (১৮২১-১৮৯৫), ফ্রীড্‌রিশ্ ম্যাক্সমুলার* (১৮২৩-১৯০০), ইভান পাভ্‌লোভিচ্

*নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর এক প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে প্যারিসে থাকাকালীন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছে যুবক ম্যাক্সমুলার কেবল বাংলা শিখেছিলেন তাই নয়, মৌখিক বাংলা ও লিখিত বাংলার পার্থক্যও বুঝেছিলেন।

মিনারেফ্ (১৮৪০-১৮৯০) প্রমুখেরা। এঁরা সকলেই যে ভারতে আগত মিশনারিদের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা পরে যুক্ত হতে চেয়েছেন এমন মোটেই নয়, কিন্তু ভারততত্ত্ব বা প্রাচ্যবিদ্যাকে প্রতীচ্যের কাছে তুলে ধরার মত মহৎ এবং ঐতিহাসিক দূরদর্শিতার নজীর সৃষ্টি করে গেছেন একথা অনস্বীকার্য।

সংস্কৃতির পুনর্নির্মাণ

বাংলাদেশে ইংরাজ শাসনের সূচনাপর্বে, মুসলিম যুগের শাসকদের মত বাঙালী চরিত্রের প্রতি কটূক্তি এবং অপবাদে এদেরও কোন ক্লান্তি ছিল না। বরং ইংরেজদের আমলে বাঙালীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপে দুষ্ট, অর্থাৎ মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক এবং অত্যাচারী বলেও নিন্দা করা হয়েছে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে মার্চ লর্ড ক্লাইভ, হাউস অব্ কমনস-এর বক্তৃতায় বলেছিলেন : "Indostan was always an absolute despotic government. The inhabitants, especially of Bengal, in inferior stations, are servile, mean, submissive and humble. In superior stations they are luxurious, effiminate, tyrannical, treacherous, venal, cruel." কিন্তু ইংরাজদের মধ্যে বাঙালী জাতির নিন্দায় রথ্লির প্রথম ব্যারন টমাস ব্যাবিংটন মেকলের (১৮০০-১৮৫৯) উক্তিই বিখ্যাত এবং আমাদের অধিক পরিচিত। তিনি লিখেছিলেন : "What horns are to the buffalo, what the paw is to the tiger, what the string is to the bee, what beauty, according to the old Greek song, is to woman, decit is to the Bengalee, large promises, smooth excuses, elaborate tissues of circumstantial falsehood chicanery, perjury, forgery, are the weapons, offensive and defensive, of the people of the Lower Ganges." এতে যে সমগ্র বাঙালী জাতির নিন্দা হয়েছে এমন নয়, বরং শাসনকার্যের জন্য যে সব বাঙালী ইংরেজদের সংস্রবে আসে তাদের সম্পর্কেই ছিল এই অভিমত। অন্যদিকে এই শাসক-ইংরাজ ছাড়া আরও ইংরাজ যাঁরা ছিলেন, তাদের পূর্বঅভিজ্ঞতা বলেই এদেশের শিক্ষা সংস্কারের কাজে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই যখন স্বাভাবিক ছিল তখনই দেখা গেল তাঁরা প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা, সংস্কৃত ও সাহিত্য-দর্শন চিন্তার সারবস্তু আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। এই ইংরেজরা কিন্তু অনায়াসেই ফরাসি উপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায়ের মত, বাঙালী প্রজাদের ওপর তাদের মাতৃভাষা, আচার-ব্যবহার এমন কি সংস্কৃতি চর্চার দায়ভার আরোপ না করে নূতন উদ্যমে শুরু করলেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্য আবিষ্কারের সাধনা আর বাঙালীর দিক থেকে আগ্রহ দেখা দিল দেশজ জ্ঞানভাণ্ডারের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেবার। এই উভয় পক্ষে নূতন প্রযত্নকেই পরবর্তীকালে ইতিহাসবেত্তাদের ভাষায় বলা হয়েছে **'Bengal Renaissance'**

স্যার উইলিয়ম জোনস্ সংস্কৃতকাব্যের পরিচয় বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবার জন্য 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করলেন। নাম দিলেন Sacontala, or the Fatal Ring। এই অনুবাদ গ্রন্থ পাঠ করেই জার্মান মহাকবি যোহান্ ভোলফ্গাঙ্ গোয়েটের স্মরণীয় উক্তি 'বসন্তের ফুল, ফল, সৌন্দর্য ও আনন্দ, শক্তি ও আশ্রয় যাহার কথাই বল না কেন, 'শকুন্তলা'—এই কথাটি বলিলেই সব বলা হইল — 'অয়ি শকুন্তলে!'

H.T.Colebrook হিন্দুর সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদের পরিচয় দিয়ে ইউরোপীয়দের জানালেন "On the Vedas or Sacred Writing of the Hindoos." গ্রন্থটির প্রকাশক ছিল, বলাবাহুল্য, 'এশিয়াটিক সোসাইটি'। এর আগে ফরাসী দার্শনিক, ভোলতেয়র্ অবশ্য লিখেছিলেন, 'L Egeur

Vedam' তবে সেই গ্রন্থটি বিদগ্ধ মহলে একটি হাস্যকর রূপকথা বলে মনে করা হয়েছিল।

এরপর সংস্কৃত থেকে প্রথম এবং সম্পূর্ণ অনুদিত ইংরেজী গ্রন্থটি হ'ল চার্লস উইলকিন্স্-কৃত 'শ্রীমদ্ভাগবদগীতা।' স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সক্রিয় সহযোগিতায় এই অনুবাদ গ্রন্থটি ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ড থেকে প্রকাশিত। গীতার অনুবাদ প্রকাশের জন্য 'বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্'-এর অনুমতি চেয়ে হেস্টিংস যে দীর্ঘপত্র লেখেন তাতে তিনটি কারণে কোম্পানির কর্মচারী ও অন্যান্য ইংরাজ প্রজাদের প্রাচ্য গবেষণার কাজে উৎসাহিত করেছেন :

I. [He believed] that the prominence of the company's dominion in India depended more on the virtue than the ability of its servants and that cultivation of language and science will form the moral character and habits of the services;

II. Every accumulation of knowledge .... is the gain of humanity ..... it lessens the weight of the chain by which the natives are held in subjection and it imprints on the hearts of our own countrymen the sense and obligation of benevolence;

III. Last of all, knowledge of Hindu culture was likely to bring a change in the attitude of the British people to Indians ...'গীতার মত গ্রন্থাদি সম্পর্কে হেস্টিংস বলেছেন,"These will survive when the British Dominion in India shall have ceased to exist and when the services of which it once yielded of wealth and power are lost to remembrance."

এই ঐতিহাসিক চেতনা ঐতিহ্যের গৌরবময় এবং চলমান অধ্যায়ের অপর নামই বাংলার সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রে হুগলীর শ্রীরামপুর মিশনারিদের অবিস্মরণীয় অবদান। সে দিক থেকে বিবেচনা করলে একথা বলা বোধহয় ভুল হবে না যে ইউরোপীয় নবজাগরণের এমন কি পুনর্জাগরণের জাজ্বল্যমান সংস্কৃতির অন্যতম উজ্জ্বল উত্তরাধিকার বাংলার রেনেঁসাসের অগ্রপথিক উইলিয়ম কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড এবং সহযোগী ধর্মপ্রচারকগণ।

ইউরোপীয় সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থাদি, পুরাণ, ইতিহাস বা ক্লাসিক কাব্য সাহিত্যের মেলবন্ধনের ফল বাঙালীর জীবনে আমুল পরিবর্তন এনে দেয়। এই পরিবর্তন সর্ববিষয়ে, যেমন বাহিরে, তেমনই অন্তরে, চিন্তায়, ভাবে, অনুভূতিতে, আবেগে, কার্যকলাপে ও আচরণে। এই পরিবর্তনের গভীরতা অনুভব করেই টমাস ব্যাবিংটন্ মেকলের-ই উত্তরসূরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ভাইস চ্যান্সেলর ও ভাইসরয়েজ কাউন্সিলর মাননীয় সদস্য স্যার হেনরী মেন্ ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কনভোকেশান্ বক্তৃতায় বলেছিলেন : "There is no one in this room to whom the life of a hundred years since would not be acute suffering if it could be lived again."

শিক্ষিত বাঙালীরা সেই সময়ের মধ্যে যা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, Sir Henry Maine এর ভাষায় : "Some of the knowledge and many of the suseptibilities of the nineteenth century-indeed perhaps too many of them," ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে যখন স্যার হেনরী কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত, তখনও বাঙালী মানস সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য হ'ল :

"I have had unusal opportunities of studying the mental condition of the educated class in one Indian Province [Bengal] though it is so strongly Europeanized as to be no fair example of native society taken as a whole, its peculiar stock of ideas is probably the chief source from which influences proceed and which are more or less of work everywhere. Here has been a complete revolution of thought, in literature, in taste, in moral and in law."

বাঙালীর মন কেন ইউরোপের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে স্যার হেনরী বলেছিলেন:

"Finding that their own systems of thought was embarassed in all its expressions by the weight of a false physics, elaborately inaccurate, careless of precision, of magnitude, number and time, the educated Bengalis were turning to Western thought especially, in the scientific form,"

আবার তাদের নিজস্ব মানসিকধর্মে ও পরিণত বোধের ফলে বাঙালী এই পদক্ষেপ যে সার্থকভাবেই নিয়েছিলেন, সেকথা বুঝে এবং তাকে স্বীকৃতি দিতেই স্যার হেনরী মেন বলেন :

"To a way quick and subtle minded people which has hitherto been denied any mental food but this mere accuracy of thought is by itself an intellectual luxery of the highest order." — এঁরাই 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর যথার্থ পূর্বসূরী।

শ্রীরামপুর মিশনারিদের সমূহ কর্মকাণ্ড, কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ ধর্মপ্রচারক তথা শিক্ষা সংস্কারকদের সমগ্র জীবন ক্ষুদ্রস্বার্থের উর্দ্ধে উঠে তৎকালীন বঙ্গভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি দৈনন্দিন জীবনচর্যা তথা সমাজ মানস সংস্কারের ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য যেভাবে ব্যয়িত হয় সেটা বুঝতে হ'লে উল্লিখিত প্রস্তাবাদির অন্তর্ভাবনা সম্পর্কে গভীর অনুধাবন একান্ত জরুরী ঠেকে।

যাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের অগ্রগমন সেই কেরী প্রমুখ শ্রীরামপুর মিশনারিদের অবদান আজও বাংলার তথা সমগ্র ভারতের বিদগ্ধ সমাজের পূর্ণ স্বীকৃতির অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে সীমায়িত আলোচনার পরিসরে সেই মহাপ্রাণ কেরী, যিনি বঙ্গজননীর আপন সন্তান না হয়েও একান্ত আপন, একাগ্রচিত্ত, নিষ্ঠাবান লেখক, গবেষক, সম্পাদক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক, ধর্মপ্রাণ, নীতিপরায়ণ, অনন্য প্রতিভা ও প্রজ্ঞার অধিকারী, দেবোপম উইলিয়ম কেরী এবং তাঁরই মর্মসহচর-সংগঠক মিশনারিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ হিসাবে নিবেদিত হল।

উইলিয়ম কেরীর অন্যতম জীবনীকার অধ্যাপক জর্জ স্মিথ লিখেছিলেন : "Carey was successful and often at the same time, a captain of labour, a school master, a printer, the developer of vernacular speech, the expounder of classical languages, the translator, the purifier of the society, the watcher philanthropist, the saviour of the widows and the fatherless. This given an idea of the vastness of the fields on which Carey ploded throughout his life."

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে 'Annals of Bengal' -এর রচনাকার স্যার উইলিয়ম হান্টার, এই কেরী সম্পর্কেই

লিখেছিলেন : "If memory of a great work and noble soul can hallow any spot, this earth contains no truer 'Campo Santo' than the Serampore Graveyard."

কেরীর সমাধিক্ষেত্রে প্রোথিত ফলকে উৎকীর্ণ :

> "A wretched, poor and helpless worm,
> On thy kind arm I fall."

সত্যকার মহান মানবসত্ত্বার অন্তর্লোকের সন্ধান পাওয়ার জন্য এই মন্ত্রের মত সামান্য কথা ক'টি স্মরণের মধ্য দিয়ে উইলিয়ম কেরীর প্রতি বঙ্গবাসী হিসাবে আমাদের যে অপরিসীম ঋণ রয়ে গেছে তার কিছুটা হয়তো পূরণ করা সম্ভব।

কালান্তরের ভাবনা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসে, তারপর আঠার শতকের শেষ ভাগে ভূমির রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার লাভ করে এবং উনিশ শতকে গড়ে তোলে সাম্রাজ্য। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আসে নতুন ধরণের আইন আদালত, সুরু হয়ে যায় নতুন শিক্ষাব্যবস্থা, তারই সঙ্গে গড়ে ওঠে নতুন শাসনযন্ত্র। অর্থাৎ ১৭৫৭-র পর অনেকদিন পর্যন্ত এদেশে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে, শাসন-বিধি প্রচলন বিষয়ে আইন-আদালত ব্যবস্থা প্রবর্তন এমন কি শিক্ষাবিস্তার বিষয়েও তাদের মনে দ্বন্দ্ব ছিল। এই দ্বন্দ্ব প্রাচীন এবং নবীনের। এতদিন পর্যন্ত তারা কিছুটা ভয়ে, কিছুটা লোকরঞ্জনের জন্য এবং কিছুটা প্রকৃষ্ট রাজনীতি বোধে আক্রান্ত হয়ে বহুবিষয়ে প্রাচীনকে রক্ষা করে চলার পর এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়। প্রাচীন না নবীন কোন প্রথা বর্জনীয় অথবা বরণীয় এই প্রশ্ন দীর্ঘ সময় ধরে প্রভাবিত করে রাখে ইংরাজমনকে। কিন্তু শাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাদের সামগ্রিক অনুভব যেন একটা নাড়া খেল। সংস্কারের কাজে পাশাপাশি ভারত নামক দেশটির শোষণ-প্রক্রিয়াও যথেষ্ট শক্তিঅর্জন করে। এতে অবশ্য বড় ধরণের বাধা আসে কলকাতা ও অন্যত্র নাগরিক-চেতনার এক বিশেষ প্রতিষ্ঠাপর্ব। বঙ্গদেশে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা, ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে কলকাতা শহরের উদ্ভব ও বিকাশ, মুখ্যত বাঙালি হিন্দু উচ্চবর্ণের পুরুষদের ইংরেজী শিক্ষায় এবং সম্প্রসারণশীল সরকারী ব্যবস্থায় এই শিক্ষিতজনের নিয়োগ—এসবই বাঙালীর মানস উজ্জীবনে এবং ভারতব্যাপী প্রভাব বিস্তারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।*

ইংরেজ যেমন এদেশকে নানাভাবে শোষণ করেছিল উনিশটি দশক ধরে, তেমনি ইংরেজদের মাধ্যমেই এদেশে নানা নূতন প্রয়োগিক এবং ভাবগত উপাদান প্রবর্তিত ও বিদিত হয়। মুদ্রণ যন্ত্রের উদ্ভাবন একদিকে যেমন ইউরোপের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের অন্যতম প্রধান সহায়ক হয়েছিল, এখানেও তেমনই তারই প্রবর্তনের ফলে নানা নূতন সাংস্কৃতিক সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। উনিশ শতকের শুরু থেকেই অসংখ্য পত্রপত্রিকার প্রকাশ এবং সেই সুত্রে জগৎ সম্পর্কে কৌতুহল বৃদ্ধি ও বৈকল্পিক ভাবনাচিন্তার প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ভিত্তিস্বরূপ বিবেচিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম জোনস্ ঘোষণা করেছিলেন : মানুষ এবং প্রকৃতির সবদিকই তাঁদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু। জোনসের এই ঘোষণা পশ্চিমাগত বটে, কিন্তু উনিশ শতকী

*'বাংলার রেনেসাঁস'—অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়। ইংরেজী উদ্ধৃতি আর্ল অব রোনাল্ডশের 'India' বিষয়ক কেমব্রিজ বক্তৃতার অংশবিশেষ।

বাংলার কিছু নূতন ভাবুক, অস্মিতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এটিকে তাঁদের নিজেদের ঘোষণা বলে মেনে নিয়েছিলেন।

ফলে একদিকে এই দেশের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনার সাধনী পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ ও আবিষ্কারের উদ্যম দেখা দিল তেমনি সেই তথ্যের সত্যতা নির্ণয় করবার আগ্রহ ও উপায় এবং সামর্থ্য, ঐতিহ্যকে নির্ভরযোগ্যভাবে বিচার বিশ্লেষণ, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত প্রভৃতির চর্চায় মনোনিবেশ শুরু হ'ল। অন্যদিকে তৎকালীন বাঙালী সমাজের কিছু অংশের মানুষ তার অভ্যস্ত জড়তা, কূপমণ্ডুকতা ও পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি পেয়ে মনন-চিন্তনের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা, তীক্ষ্ণতা ও গতিঅর্জনে সমর্থ হয়ে উঠল। ফলে, নাগরিক বাংলার মানস-জীবনে এক বিশেষ ধরণের ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হ'ল যার অভিঘাত হয়ে ওঠে সুদূর প্রসারী।

বাংলার সাংস্কৃতিক-সামাজিক তথা মননশীলতার চর্চায় মিশনারিদের অবদান নিয়ে গবেষণার সময় মনে রাখা প্রয়োজন যে 'উনিশ শতকী বাংলার সঙ্গে পূর্ববর্তী বাংলার তুলনাযোগ্য বৈষম্য খুবই প্রকট। মুষ্টিমেয় বহিরাগত ভাগ্যান্বেষীর প্রায় অপ্রস্তুত আক্রমণের সামনে আত্মরক্ষার অসামর্থ্যই নয়, অনুকূল নানা উপাদানের উপস্থিতি সত্ত্বেও বিকাশোদ্যমের অভাব পূর্ববর্তী শতকের মানসিক জাড্যতার করুণ প্রমাণ।*(১)

অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐক্যের পরিচায়ক ও ধারক বাংলা ভাষা কয়েক শতাব্দী নিজস্বতা অর্জন করা সত্ত্বেও তার বিষয়বস্তু, আকার, রীতি, পরীক্ষা নিরীক্ষা বা একঘেয়েমি বা পুনরাবৃত্তিসূচক গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল। বাংলার অধিকাংশ মানুষের বসবাস কিংবা জীবিকা কৃষিনির্ভর হলেও বাংলার নদীবিধৌত এই সমভূমিতে মানুষের জীবিকা অর্জনের আরো অনেক মাধ্যম বজায় থাকা সত্ত্বেও, শিক্ষাদান প্রণালীর স্তরের কর্মসূচী পালনের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, সে সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার উন্নত প্রস্তুত কিংবা সামাজিক সাংগঠনিক প্রায়োগিক উদ্যোগ, নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির অথবা বিকাশশীল উদ্যম বা গতির লক্ষণ ছিল একান্তই অনুপস্থিত। 'সর্বত্র নিষেধের পরে নিষেধ, উপর নির্ভরশীলতা ও আত্মপ্রত্যয়হীনতা, হৃতসামর্থ, প্রথাপ্রকরণের নির্বোধ-অনুসরণ', কিংবা প্রকৃতি সম্পর্কে উদাসীনতা, 'বিনিয়োগ বিমুখ অপচয়বৃত্তি, মানসিক জাড্য নিরভিযানী ভোগবৃত্তিই তৎকালীন বাংলার জীবনচর্যা ও পরম্পরাশ্রয়ী প্রতিন্যাস রচনায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল।**

---

*(১) বাংলা উদ্ধৃতি অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়-এর 'বাংলার রেনেসাঁস-এর অংশ বিশেষ।

*(২) একসময়ের বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডশে তাঁর ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতায় এ'র উল্লেখ করে বলেন: "I have myself visited the scene of the battle during the summer months and I can appreciate the feelings with which Clive and his little force of British and Indian troops, 3200 strong, must have been assailed on the morning of a reeking summer's day, as they ranged themselves up behind their guns a few hundred yards only from a vast concourse of 50,000 men with elephants, horses and oxen under the direct command of SurajahDowla. The amazing victory of this small force over the huge host of the Nawab was due in great measure to the demoralisation caused in his ranks by the treachery of one of his commanders, Mir Jaffar " ..... অন্যত্র রোনাল্ডশে লিখেছেন : "The battle of Plassey itself was fought and won by Clive with the approval of a considerable section of the people of Bengal themselves who were suffering from the tyranny and maladministration of the Provincial Governor, Nawab Surajah Dowla."

**'বাংলার রেনেসাঁস' অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় (শ্রীরামপুর, হুগলিতে মিশনারিদের আগমনের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে রচিত)

এরই পাশাপাশি আমরা দেখি, বিদেশী বণিক ও ধর্মযাজকের দল যখন এদেশের মাটিতে উপস্থিত তখন বিশ্বজগত এবং অপরাপর ধর্মমত ও ধর্মসমালোচনা আমাদের চৈতন্যের কাছে এমন একটা আঘাত পৌঁছে দিল যাতে ঐতিহাসিক নূতনত্ব তো ছিলই তারই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি এল নূতন সামাজিক, শিক্ষাগত এমন কি ধর্মীয় প্রতিন্যাস রচনার। পলাশী-যুদ্ধ পরবর্তী বাংলার ইতিহাস একটা মোড় নিল। নাগরিক প্রতিষ্ঠার আগ্রহজনিত চেতনা, বঙ্গবাসীর বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার স্তরে পরিবর্তন নিয়ে এল। এই যে নানাদেশের মানুষ ও তার সংস্কৃতি সম্পর্কে জাগ্রত চেতনা ও তুলনামূলক বিচারপদ্ধতি এবং যুক্তির ভিত্তিতে একটা সর্বমানবীয় সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার আকাঙক্ষার মধ্যেই আধুনিকতার লক্ষণ ধীরে ধীরে ফুটে উঠল। নারীর স্বাধীনতা, উচ্চবর্ণের অগ্রাধিকার, জাতি-প্রথা, সতীদাহ নিবারণ বা বিধবাবিবাহ আন্দোলন-এসবের মধ্য দিয়েই এই উনবিংশ শতক আমাদের সামনে ধর্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সমাজসংস্কারের যোগসূত্র নিয়ে এক মহা বিতর্ক উপস্থিত করল। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা পেলাম রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিংবা ডেভিড হেয়ার কিংবা ডিরোজিওকে।

এরই প্রাক্‌ভূমিকা রচনায়, বাংলার সারস্বত নির্মাণে অথবা মনস্বীতা রচনা-ক্ষেত্রের একপ্রান্তে যেমন ওয়ারেন হেস্টিংস, চার্লস্ উইলকিন্স, প্রিন্সেপ উইলিয়ম জোনস্, কোলব্রুক, উইলিয়াম চেম্বার্স, চার্লস গ্রান্ট, হ্যালহেড, জোনাথান ডানকান, এন.বি.এডমন্টন, হেনরি পিটস্, ফরস্টার, জন মিলার, জন টমাসকে পাই, অপর প্রান্তে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, উইলিয়ম অ্যাডাম, রামরাম বসু, পঞ্চানন কর্মকার, গোলোকনাথ শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিনীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুনশী, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি এবং হরপ্রসাদ রায়কে প্রত্যক্ষ করি — আর এই বিস্ময়কর চৈতন্যসত্তার মধ্যমণি হিসাবে প্রত্যক্ষ করি, জোশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, ফাউন্টেন গ্রান্ট, ব্রান্সডন, ফেলিক্স কেরী, ইয়েটস্ কে। আর এই উত্তুঙ্গ পর্বতশিখররাজি মধ্যস্থিত শিরোমণি রূপে বিরাজ করছেন স্বয়ং মহামতি উইলিয়ম কেরী — যিনি টমাস ব্যাবিংটন মেকলের উক্তিকে সম্পূর্ণ অসত্য প্রমাণ করে, আজও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যোগসূত্ররূপে সমুপস্থিত।

আধুনিক যুগের মর্তকাম বিবেকীতা এবং অপসৃয়মান মূল্যবোধ-আক্রান্ত সমাজ-মানসে বাংলার সারস্বত সাধনা ও সংস্কৃতি নির্মাণে শ্রীরামপুর মিশনারিদের ঐতিহাসিক অবদান সম্পর্কে আলোচনায় উপরোক্ত প্রেক্ষিতপর্বটি একান্ত বিবেচ্য।

পরিশিষ্ট

বিগত উনিশ শতকের শুরুতেই ১১ জানুয়ারী ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হয় এবং ওই বছরের ১৮ মার্চ তারিখে মুদ্রণের জন্য শিট্ কম্পোজ করে মেসিনে চাপানো হয়। এই মিশন প্রেস থেকে যেসব ভাষায় গ্রন্থাদি মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়েছিল তারমধ্যে কেবল ইংরাজি বা বাংলাভাষাই ছিল তাই নয়, এখানে আরবী, ফার্সী, নাগরি, গুরুমুখী, মারাঠী, ওড়িয়া, কন্নড়, হিন্দী, সংস্কৃত, বর্মী মায় চীনা ভাষাতেও মুদ্রণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এখানে বাংলা এবং ইংরাজি ভাষার মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা লেখকের নাম এবং প্রকাশের বৎসরটিরই উল্লেখ সম্ভব কারণ মুদ্রিত গ্রন্থাদির সম্পূর্ণ তালিকা কোথাও সংরক্ষিত নেই। সুতরাং বলা বাহুল্য যে কোন অর্থেই এটিকে পূর্ণাঙ্গ তালিকা বলা সম্ভব নয়।

সাল	লেখক	প্রকাশিত পুস্তকের নাম
১৮০০	রামরাম বসু উইলিয়ম কেরী এবং জন টমাস	মঙ্গল সমাচার মতিয়ের

১৮০০	রামরাম বসু	জ্ঞানোদয় ও হরকরা (কবিতা পুস্তক)
১৮০০	উইলিয়ম কেরী	লস্করদের উদ্দেশ্যে পত্র
১৮০০	উইলিয়ম কেরী	টেন কম্যাণ্ডমেন্টস্
১৮০০	উইলিয়ম কেরী	গসপেল অব সেন্ট ম্যাথু
১৮০১	উইলিয়ম কেরী	নিউ টেষ্টামেন্ট্ (১ম সং)
১৮০১	রামরাম বসু	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র
১৮০১	উইলিয়ম কেরী	বাংলা ব্যাকরণ
১৮০১	উইলিয়ম কেরী	কথোপকথন (Dialogueবা Colloquies)
১৮০১	উইলিয়ম কেরী	শিশুজ্ঞান পুস্তক
১৮০১	উইলিয়ম কেরী	শিশুদের সঙ্গীত
১৮০২	উইলিয়ম কেরী	ওল্ড টেষ্টামেন্ট্
১৮০২	রামরাম বসু	লিপিমালা
১৮০২	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	বত্রিশ সিংহাসন (১ম সং)
১৮০২	গোলোকনাথ শর্মা (মুখোপাধ্যায়)	হিতোপদেশ
১৮০২	উইলিয়ম কেরী	সংক্ষিপ্ত মঙ্গল সমাচার (অনুদিত) [A short summary of the Gospel]
১৮০২	উইলিয়ম কেরী	মঙ্গল সমাচার গীত
১৮০২	উইলিয়ম কেরী	খৃষ্টমণ্ডলীর উত্তর প্রত্যুত্তর
১৮০২	রামরাম বসু	ধর্মপুস্তকের দূত
১৮০২	উইলিয়ম কেরী (পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পরবর্তী সংস্করণে অবিশুদ্ধ মূল-কে শুদ্ধ করেন)	কাশীদাসী মহাভারত
১৮০২	উইলিয়ম কেরী	কৃত্তিবাসী রামায়ণ
১৮০৩	উইলিয়ম কেরী	ব্যাকরণ (২য় সং)
১৮০৩	উইলিয়ম কেরী	সলোমনের গীত
১৮০৩	উইলিয়ম কেরী	দাউদের গীত
১৮০৩	তারিণীচরণ মিত্র	ওরিয়েন্টাল ফেব্যুলিষ্ট (অনুদিত)
১৮০৪	উইলিয়ম কেরী	ওল্ড টেষ্টামেন্ট (অংশবিশেষ)
১৮০৪	উইলিয়ম কেরী (মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ও রামরাম বসুর সহযোগিতায়)	সংস্কৃত ব্যাকরণ (শ্রীরামপুর মির্নাভা প্রেসে মুদ্রিত ও মিশন প্রকাশিত)

১৮০৪	পীতাম্বর সিং	আশ্রয়-নিরাশ্রয়-খৃষ্টমণ্ডলীর গীত (The Sure Refuge-এর অনুবাদ)
১৮০৫	উইলিয়ম কেরী	ব্যাকরণ (২য় সং)
১৮০৫	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং
১৮০৫	চণ্ডীচরণ মুনশী	তোতা ইতিহাস বা তোতা কাহিনী
১৮০৫	উইলিয়ম কেরী	মারাঠী ব্যাকরণ
১৮০৫	উইলিয়ম কেরী	সাংখ্যদর্শন (ইং অনুবাদ - অপ্রকাশিত)
১৮০৫	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	দায় রত্নাবলী
১৮০৫	উইলিয়ম কেরী ও মিশনারিগণ যৌথভাবে লিখিত	খৃষ্টানদের মত কি?
১৮০৫	উইলিয়ম কেরী	The Missionary's Address to Hindoos
১৮০৬	উইলিয়ম কেরী (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতির সহযোগিতায়)	সংস্কৃত ব্যাকরণ (১ম খণ্ড - ইংরাজি অনুবাদ)
১৮০৬	উইলিয়ম কেরী	কথোপকথন (২য় সংস্করণ)
১৮০৬	উইলিয়ম কেরী	বাল্মিকী রচিত মূল রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদ ১ম খণ্ড
১৮০৬	উইলিয়ম কেরী	নিউ টেষ্টামেন্ট্ (২য় সংস্করণ)
১৮০৬	উইলিয়ম কেরী	ধর্মপুস্তকের ধারা
১৮০৬	পীতাম্বর সিং	উপদেশ নিস্তার (Good Advice & The Enlightner)
১৮০৬	রামরাম বসু (!)	রত্নাকর ধর্মপুস্তকের দূত
১৮০৭	উইলিয়ম কেরী	ল্যুক, অ্যাক্ট্স্, রোমান্স (!)
১৮০৭	উইলিয়ম কেরী	প্রফেটিক্ বুক
১৮০৭	জোশুয়া মার্শম্যান	ভেদাভেদ (ইং The Difference or Krishna & Christ compared)
১৮০৭	জোশুয়া মার্শম্যান	বাইবেল (চীনা ভাষায় অনুদিত)
১৮০৭	তারাচাঁদ তর্কবাচস্পতি	হিন্দুধর্মের প্রার্থনা
১৮০৭	রামরাম বসু	ধর্মপুস্তকের দূত
১৮০৭	সি. চেম্বারলেন	ওয়াটের উত্তর প্রত্যুত্তর (Watt's Historical Catechism- এর অনুবাদ)
১৮০৭(?)	জোশুয়া মার্শম্যান	কুং-ফুৎ-সে'র দর্শন (অংশ বিশেষ)

১৮০৭	উইলিয়ম কেরী	ওল্ড্ টেষ্টামেন্ট্ (৪র্থ ও শেষ খণ্ড)
১৮০৮	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	বত্রিশ সিংহাসন (২য় সং)
১৮০৮	গোলোকনাথ শর্মা (মুখোপাধ্যায়)	হিতোপদেশ (২য় সং)
১৮০৮	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	রাজাবলী (১ম সং)
১৮০৮	এইচ্. টি. কোলব্রুক	অমরকোষ অভিধান (কেরীর সহযোগিতায় সম্পাদিত)
১৮০৮	উইলিয়ম কেরী	নিউ টেষ্টামেন্ট (সংস্কৃত ভাষায়)
১৮০৮	উইলিয়ম কেরী	অনুশোচনা বিষয়ক
১৮০৮	উইলিয়ম কেরী ও জোশুয়া মার্শম্যান	নিবেদন
১৮০৮	উইলিয়ম কেরী	বাল্মিকী রামায়ণ (২য় খণ্ড)
১৮০৯	উইলিয়ম কেরী	ওল্ড টেষ্টামেন্ট (২য় খণ্ড)
১৮০৯	মোহনপ্রসাদ ঠাকুর	সংস্কৃত-বাংলা শব্দ সংগ্রহ
১৮০৯	উইলিয়ম কেরী	Historical Books
১৮০৯	উইলিয়ম কেরী	জোশুয়া এস্থার (জীবনী গ্রন্থ)
১৮১০	সি. চেম্বারলেন	গীত
১৮১০	উইলিয়ম কেরী	বাল্মিকী রামায়ণ (৩য় খণ্ড)
১৮১০	উইলিয়ম কেরী	মারাঠী অভিধান
১৮১০	শ্রীরামপুর মিশনারিগণ	যীশুখৃষ্ট সম্পর্কে পত্রাদি
১৮১০	রামরাম বসু	খৃষ্ট বিবরণীমৃতম্
১৮১০	উইলিয়ম কেরী (!)	ভার্জিলের ঈনিড (অনুদিত)
১৮১১	জোশুয়া মার্শম্যান	চীনাভাষায় ব্যাকরণ
১৮১১	উইলিয়ম ওয়ার্ড	Address to Hindoos (অনুবাদ)
১৮১১	উইলিয়ম ওয়ার্ড	A short Summary of the Gospel
১৮১১	উইলিয়ম ওয়ার্ড	The Best Gift on repentance
১৮১১	উইলিয়ম কেরী	নিউ টেষ্টামেন্ট (ওড়িয়া ভাষায়)
১৮১১	উইলিয়ম কেরী	Account of the Writing, Religion and Manners, of the Hindoos including Translations from their Principal Works (in 4 Vols)
১৮১১	জোশুয়া মার্শম্যান	চীনা-ইংরাজি-চীনা অভিধান
১৮১১	সি. চেম্বারলেন	ধর্মপুস্তকের নামের উত্তর প্রত্যুত্তর

১৮১১	সি. চেম্বারলেন	মনের চেতনা
১৮১১	সি. চেম্বারলেন	বালকের কারণ - উত্তর প্রত্যুত্ত'র
১৮১২	উইলিয়ম কেরী	পাঞ্জাবী (শিখ) ব্যাকরণ
১৮১২	উইলিয়ম কেরী	ইতিহাসমালা (সম্পাদিত)
১৮১৩	উইলিয়ম কেরী	দ্য পেন্টাট্যিউচ্ (২য় সং)
১৮১৩	উইলিয়ম কেরী	আশ্রয় নিরাশ্রয়
১৮১৪	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার*	হিতোপদেশ (২য় সং)
১৮১৪	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	রাজাবলী (২য় সং)
১৮১৪	উইলিয়ম কেরী	তেলিঙ্গা ব্যাকরণ
১৮১৪	উইলিয়ম কেরী	ওল্ড টেষ্টামেন্ট (ওড়িয়া ভাষায়)
১৮১৪	উইলিয়ম কেরী	নিউ টেষ্টামেন্ট (পাঞ্জাবী ভাষায়)
১৮১৪	উইলিয়ম কেরী	গীতমালা
১৮১৪	উইলিয়ম রক্সবার্গ (সম্পূর্ণভাবে কেরীকৃত)	Hortus Bengalensis or a Catalogue of the Plants of the Honourable East India Company's Garden in Calcutta.
১৮১৫	উইলিয়ম কেরী	ইংরাজী-বাংলা অভিধান (১ম)
১৮১৫	উইলিয়ম কেরী	বাংলা ব্যাকরণ
১৮১৫	হরপ্রসাদ রায়	পুরুষ পরীক্ষা (Moral Tales)
১৮১৪	উইলিয়ম কেরী	নিউ টেষ্টামেন্ট্ (পাঞ্জাবী ভাষায়) ২য় সং
১৮১৫	উইলিয়ম কেরী	ওল্ড টেষ্টামেন্ট (মাগধী ভাষায়)
১৮১৬	ফেলিক্স কেরী	জ্যোতিষ
১৮১৬	উইলিয়ম কেরী	নিউ টেষ্টামেন্ট্ (৪র্থ সং)
১৮১৭	উইলিয়ম কেরী	কথোপকথন (২য় সংশোধিত সং)
১৮১৭	উইলিয়ম কেরী	ইংরাজী-বাংলা অভিধান (২য় খণ্ড)
১৮১৭	উইলিয়ম কেরী	বাংলা ব্যাকরণ (২য় সং)
১৮১৭	উইলিয়ম ওয়ার্ড	হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (অনুবাদ কেরী কৃত)
১৮১৭	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	বেদান্ত চন্দ্রিকা
১৮১৭	মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় (!)	গুরুদক্ষিণা
১৮১৭	মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় (!)	মুগ্ধবোধ
১৮১৮	উইলিয়ম কেরী	বাংলা ব্যাকরণ (২য়)

* গোলোকনাথ শর্মা (মুখোপাধ্যায়) (!)

১৮১৮	উইলিয়ম কেরী	নীতিবাক্য (তিন খণ্ড)
১৮১৮	উইলিয়ম কেরী	ধর্মগ্রন্থের চুম্বক
১৮১৮	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (!)	শিক্ষাসার
১৮১৮	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	বত্রিশ সিংহাসন (২য় সং)
১৮১৯	উইলিয়ম কেরী	ওল্ড টেষ্টামেন্ট (ওড়িয়া ভাষায়)
১৮১৯	উইলিয়ম কেরী	নিউ টেষ্টামেন্ট (অসমীয়া ভাষায়)
১৮১৯	উইলিয়ম কেরী	ম্যাথু মার্ক
১৮২০	ফেলিক্স কেরী	বৃটিশ দেশীয়দের বিবরণ
১৮২০	রামকমল সেন	হিতোপদেশ
১৮২০	জোশুয়া মার্শম্যান	পুরাবৃত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১৮২১	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	হিতোপদেশ
১৮২১	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	বাক্যাবলী
১৮২১	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	পত্রধারা
১৮২১	কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়	পদার্থ
১৮২১	ফেলিক্স কেরী	যাত্রীদিগের অগ্রসরের বিবরণ
১৮২১	উইলিয়ম ইয়েটস্	পদার্থ বিদ্যাসার
১৮২১	কালিদাস বাচস্পতি	কর্মলোচন
১৮২১	উইলিয়ম কেরী	দ্য পেন্টাটিউচ্
১৮২৩	উইলিয়ম মেন্ডিস	বাংলা অভিধান
১৮২৪	উইলিয়ম কেরী	ম্যাথু মার্ক (২য় খণ্ড)
১৮২৫	উইলিয়ম কেরী	বাংলা অভিধান (২য় খণ্ড)
১৮২৫	নীলরতন তর্করত্ন	কবিতা রত্নাকর
১৮২৫	উইলিয়ম কেরী	দ্য পেন্টাটিউচ্ (৩য় সং)
১৮২৬	নীলরতন তর্করত্ন	বঙ্গদর্শন
১৮২৬	জন ফরস্টার	আইন (১ম খণ্ড)
১৮২৭	জোশুয়া মার্শম্যান	সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (১ম)
১৮২৮	জন ফরস্টার	আইন (২য় খণ্ড)
১৮২৮	জন ফরস্টার	দেওয়ানী আইন
১৮২৮	উইলিয়ম ইয়েটস্	জ্যোতির্বিদ্যা
১৮২৮	জোশুয়া মার্শম্যান	সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (২য়)
১৮২৮	উইলিয়ম কেনেথ (!) টাউন লে	কোন্ শাস্ত্র মান্য?

১৮২৮	উইলিয়ম কেরী	ম্যাথু (বাইবেলএর অংশ)
১৮২৯	উইলিয়ম কেরী	মার্ক (বাইবেলের অংশ)
১৮২৯	উইলিয়ম কেরী	ওল্ড টেষ্টামেন্ট্
১৮২৯	জোশুয়া মার্শম্যান	সদগুণ ও বীর্য
১৮৩০	জন ফরস্টার	নীলের আইন
১৮৩০	জন ফরস্টার	জমিদারী আইন
১৮৩০	জন ফরস্টার	ষ্ট্যাম্পের আইন
১৮৩০	জন ফরস্টার	দেওয়ানী খালসা
১৮৩০	জোশুয়া মার্শম্যান	ভারতবর্ষের ইতিহাস
১৮৩০	জন ম্যাক	কিমিয়া বিদ্যারসার
১৮৩০	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	পত্রধারা
১৮৩০	নীলরতন তর্করত্ন	কবিতা রত্নাকর
১৮৩০	উইলিয়ম কেরী	নিউ টেষ্টামেন্ট্ (৮ম সং)
১৮৩০	উইলিয়ম কেরী	ওল্ড টেষ্টামেন্ট্ (সংশোধিত)
১৮৩০	উইলিয়ম কেরী	সামস্ (ইংগীতমালা)
১৮৩২	উইলিয়ম কেরী	দ্য পেন্টাটিউচ্ (৭ম ও ৮ম)
১৮৩৩	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	প্রবোধ চন্দ্রিকা (রচনা কাল ১৮১৩)

* বিশেষ দ্রষ্টব্য : শ্রীরামপুর মিশনারি কর্তৃক সম্পাদিত এবং মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত কোনও সাময়িক পত্র এই তালিকায় যুক্ত করা হয়নি।

সহায়ক পাঠপঞ্জী

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সংবাদ পত্রের সেকালের কথা
বিনয় ঘোষ	সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র
দীনেশচন্দ্র সেন	বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গলা (১৮৮১)
বিপিনবিহারী গুপ্ত	পুরাতন প্রসঙ্গ
কেদারনাথ মজুমদার	বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য
ড. নীহাররঞ্জন রায়	বাঙ্গালীর ইতিহাস (দুই খণ্ড)
সুনীল রায়	বঙ্গ প্রসঙ্গ (সম্পাদিত) রামমোহন রচনাবলী
শিবনাথ শাস্ত্রী	রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ
অনাথনাথ বসু	আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা
যোগেশচন্দ্র বাগল	বাংলার জনশিক্ষা
শিবনারায়ণ রায়	বাংলার রেনেসাঁস্ (গ্রন্থ : স্রোতের বিরুদ্ধে)
সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী	নির্বাচিত সংকলন

অম্লান দত্ত	১। উনিশ শতকী বাংলা নবজাগরণের গৌরব ও অপূর্ণতা (গ্রন্থ : গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ) ২। রামমোহন রায়
অরুণ ভট্টাচার্য	সাময়িক পত্র ও বাংলা সাহিত্য (সম্পাদিত)
শিশির দে	বাংলার রেনেসাঁস : উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প ও বিজ্ঞানের বিকাশ (প্রবন্ধ)
John Clerk Marshman	The Life and Times of Carey, Marshman and Ward
Baptist Mission Press	Periodical Accounts 10 Vols [Only selective portions]
Baptist Mission Press	Carey Papers (Secular series Pamphlets)
Dr. Sushil Kumar Dey	History of Bengali Literature in the Nineteenth Century (1800-1825)
Prof. Shibnarayan Ray	A History of the Renaissance in Bengal (Edd.) Sir Roper Lethbridge, K.C.I.E.Introductory Chapter
Jamuna Nag	Raja Rammohan Ray India's great social Reformer
Amit Sen (Prof Susobhan Sarkar)	Notes on the Bengal Renaissance
Bijoy Bhhattacharya	Bengal Renaissance : A study in the Progress of English Education (1800-1858)
Sisir De	Advent of Modernism in Bengal under Eighteenth and Nineteenth centuries : A study [A Private Research Paper]

এবং বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সাময়িকীর অজস্র প্রবন্ধাদি।

সংযোজন : অমলেন্দ্রনাথ ঘটক

অবিস্মরণীয় স্থপতি পঞ্চানন কর্মকার

বটতলা। শহর শ্রীরামপুরের প্রাণকেন্দ্র। কর্মচঞ্চল শহরের কর্মব্যস্ত চারটি জনপথের সংগমস্থল। এখন আর বটগাছ নেই, তবু বটতলা নামটি আছে। এই চৌমাথার কাছেই ছিল সেই বাড়ি। এখনও লোকে বলে কোম্পানীর বাড়ি। সংলগ্ন আধবোজা পুকুরটাকে বলে কোম্পানীর পুকুর।

এখানে থাকতেন একজন নেপথ্যবিহারী মানুষ। নাম পঞ্চানন কর্মকার। বিরাট কর্মযজ্ঞের আরাধনায় শ্রীরামপুরত্রয়ী — কেরী, মার্শমান এবং ওয়ার্ড অমর হয়ে আছেন। পঞ্চানন এঁদের নেপথ্যে থেকে, প্রতিষ্ঠা এবং যশের মোহ ত্যাগ করে ত্রয়ীর স্বপ্নকে রূপায়িত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। পঞ্চাননের কাজের উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় মুদ্রণশিল্প এগিয়ে গেছে। কিন্তু এই ক্ষণজন্মা পুরুষটি তাঁর কাজের ফলশ্রুতি দেখে যেতে পারেন নি।

বাংলা ছাপার হরফ প্রথম মুদ্রিত হয় ১৭৭৮ সালে। পরবর্তী দশ বছর এই শিল্পের কোন উন্নতি হয় নি। স্যার চার্লস উইলকিন্স প্রথম এ দেশে প্রাচীন পুঁথির অক্ষর দেখে বাংলা হরফ মুদ্রণ করেন। একই বছর (১৭৮৮) হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। হ্যালহেডের ব্যাকরণ ইংরেজীতে লেখা হলেও বাংলা শব্দাবলীর জন্য বাংলা হরফের প্রয়োজন হয়। মুদ্রণের জন্য উইলকিন্স ছেনি কেটে বাংলা মুদ্রণযোগ্য অক্ষরের প্রথম পত্তন করেন। ব্যাকরণটি হুগলীতে মুদ্রিত হয়। স্বদেশে ফেরবার আগে উইলকিন্স পঞ্চাননকে অক্ষর প্রস্তুতের প্রণালী শিখিয়ে যান। সাহেব পঞ্চাননকে জটিল টাইপ নির্মাণের কাজ শেখান।

কালীকুমার রায় নামে এক ব্যক্তির হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল, অক্ষরগুলি ছিল সুঠাম। এই হস্তাক্ষরকে আদর্শ করে পঞ্চানন এগিয়ে চললেন হরফ নির্মাণের কাজে। পঞ্চানন-এর তৈরী বাংলা হরফ এত নিখুঁত ছিল, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এর প্রশংসা করেছেন। আঙ্গিক পরিবর্তন করতে প্রয়োজন মনে করেন নি।

এর আগে শ্রীরামপুরের ডেনিশ শাসনকর্তা জিজেনবারস মাদ্রাজ থেকে এক প্রেস আনিয়েছিলেন। এই প্রেস থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নথিপত্র সব মুদ্রিত হত। কিন্তু বাংলা টাইপের কাজ শ্রীরামপুর মিশনই প্রথম চালু করলেন।

কেরী যখন শ্রীরামপুর মিশনের কাজের জন্য কলকাতার সুবিধামত হরফ ঢালাই করবার সন্ধানে ব্যস্ত তখনই পঞ্চানন কর্মকারের সন্ধান পান। তিনি ছিলেন বংশবাটীর সন্তান। পঞ্চাননের আইডিয়া এবং কাজ দেখে কেরী বিস্মিত ও চমৎকৃত হন। কেরী পঞ্চাননকে শ্রীরামপুরে নিয়ে আসেন এবং মিশন প্রেসে নিয়োগ করেন।

পঞ্চাননের প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বেরুল বাংলাভাষার প্রথম ছাপানো বই 'ধর্মপুস্তক' তারপর 'টিউটন'।

লর্ড কর্নওয়ালিশের কোড বাংলায় ছাপবার প্রয়োজন হল। পঞ্চানন নোতুন এক সেট তামার হরফ কাটলেন। তাতেই বাংলার কোড মুদ্রিত হল।

কেরীর বাংলা বাইবেল বেরুল। মুদ্রণের কাজ করলেন পঞ্চানন আর তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকার।

শ্রীরামপুরের আশেপাশে আরও অনেক ছাপাখানা তৈরী হল। সকলেই পঞ্চাননের নির্মিত টাইপকে গ্রহণ করল। পঞ্চাননের টাইপ বিলেত পর্যন্ত চলে গেল। লন্ডন প্রেস থেকে বেরুল 'তোতা হিবাস'। 'বঙ্গাল গেজেট' ছাপা হল পঞ্চাননের টাইপ দিয়ে।

পঞ্চানন সর্বভারতীয় ভাষার হরফ নির্মাণ করলেন। চৌত্রিশটি ভারতীয় ভাষায় বাইবেল প্রকাশিত হল। সব হরফই নির্মাণ করেছিলেন পঞ্চানন আর তাঁর জামাই মনোহর। এঁদের হরফের সাজে সজ্জিত হয়ে 'সমাচার দর্পণ' এবং 'দিগদর্শন' কাগজ বের হল। অক্ষর ঢালাই-এর কাজে শ্রীরামপুর তখন প্রাচ্যের অক্ষর ঢালাই-এর প্রধান কেন্দ্র।

পঞ্চাননের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল — ধাতুর উপর প্রথম চৈনিক অক্ষর। চীনদেশেও তখন কাঠের ছাঁদ ব্যবহার হচ্ছে। পঞ্চানন শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মাত্র তিন বছর ছিলেন। এই অল্প সময়ে কেরী এবং শ্রীরামপুর মিশনকে তিনি যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, হরফ নির্মাণ-এর শিল্পকে আধুনিকতম করবার চেষ্টা করেছেন তা অবিস্মরণীয়। পঞ্চানন কর্মকারের সাহায্য ছাড়া কেরীর কাজ এত দ্রুত এবং সুন্দর হত না।

পঞ্চানন কর্মকারকে কেরী এক রকম ছিনিয়েই এনেছিলেন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ কোলব্রুকের কাছ থেকে। কোলব্রুক তখন পঞ্চাননকে দিয়ে দেবনাগরী হরফ নির্মাণ করাচ্ছিলেন।

পঞ্চাননকে সঙ্গে নিয়ে কেরী কলকাতার অনেক টাইপ ফাউন্ড্রি ঘুরেছিলেন। এতে পঞ্চাননের অভিজ্ঞতাই বাড়েনি — এ কাজের লোকেদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল।

পঞ্চানন ২/৩ ফাউন্ট বাংলা অক্ষর সুন্দরভাবে কেটেছিলেন। তাছাড়া ছোট এক ফাউন্ট বাংলা হরফও কেটেছিলেন। এতে কাজের অনেক সুবিধে হয়েছিল। কম কাগজে, আকারে ছোট বই প্রচুর পরিমাণে বের করতে অসুবিধে হয় নি। দেবনাগরী অক্ষরও এক ফাউন্ট কেটেছিলেন পঞ্চানন। তাছাড়া মারাঠী এবং ওড়িয়া হরফও কেটেছিলেন তিনি। সমসাময়িক বিশেষজ্ঞের মতে এগুলি যে কোন বিদেশী হরফের চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল। আগে শব্দের আদি মধ্য ও অন্তে ব্যবহৃত স্বর ও ব্যঞ্জনগুলি আলাদা কাটা হত। এর ফলে অক্ষরের সঙ্গে তাদের দূরত্ব থাকত বেশী। পঞ্চাননের নিপুণ হাতে কাটা অক্ষর এই ব্যবধান কমিয়ে দিয়েছিল এবং উৎকৃষ্ট ঢালাইয়ের জন্য বাংলা মুদ্রণ শিল্প নতুন জগতে প্রবেশ করেছিল।

পঞ্চাননের আকস্মিক মৃত্যুতে সবচেয়ে আঘাত পেয়েছিলেন কেরী। মাত্র তিন বছর তিনি মিশনে কাজ করেছিলেন। পঞ্চাননের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মিশন থেকে লেখা হয়েছিল — মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত উইলকিন্সের সহচর পঞ্চাননকে আমরা পেয়েছিলাম। তাঁর প্রচেষ্টাকে রূপায়িত করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন এবং তাঁর সহযোগিতায় আমরা আধুনিকতম ফাউন্ড্রি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর হরফ শিল্প যে কোন ইউরোপীয় শিল্পীকে লজ্জা দেবে।

পঞ্চাননের আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করেন তাঁর জামাতা মনোহর এবং পুত্র কৃষ্ণ কর্মকার। এই কর্মকার পরিবার দীর্ঘ সত্তর বছরকাল বাংলা হরফ নির্মাণ শিল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন।

পঞ্চানন কর্মকারকে সে যুগে বলা হত 'বাঙ্গালী ক্যাক্সটন'। কিন্তু আজ এই মহান স্থপতি পর্দার আড়ালে চলে গেছেন। তাঁর কর্মপ্রয়াস, সাধনা যথাযোগ্য সম্মানিত হল না। শুধু শ্রীরামপুরের সেই কোম্পানীর বাড়িটা আজও জেগে আছে অনেক ইতিহাসের জিজ্ঞাসা হয়ে।

হুগলি : ফরাসি সংস্কৃতির প্রভাব

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকেই চন্দননগরের পাশ দিয়ে হুগলী নদী ধরে বহমান বাণিজ্যপথ রচিত হয়েছিল। এযুগে বণিকদের মধ্যে দেবীচণ্ডীর উপাসনা ছিল প্রবল। সম্ভবতঃ এ সময়েই চন্দননগরের বোড় অঞ্চলে বোড়াইচণ্ডীর মন্দির নির্মাণ করে কোন বণিক। কেউ কেউ বলেন তিনি ছিলেন বিখ্যাত চাঁদসদাগর। ক্রমশ চাঁদসদাগর নামটির সঙ্গে চণ্ডীর মন্দিরের নির্মাণ কাহিনী জড়িয়ে যায়। চণ্ডীর মন্দির গঙ্গার ধারে নির্মিত হওয়ায় সব বাণিজ্য তরণী এখানে থেমে পূজো দিতে শুরু করে ফলে চণ্ডীদেবীকে ঘিরে নগর এই বিষয়টি চণ্ডীর নগর, অপভ্রংশে চন্দননগর এই নামে খ্যাত হয়। নতুবা "চাঁদের নগর" এই শব্দটি চাঁদসদাগর প্রতিষ্ঠিত নগর বোঝাতে ব্যবহৃত হতে থাকে। বসতি বিস্তারিত হতে থাকে। হারিয়ে যেতে থাকে বোড়কিষণপুর ও চক্‌নসীরাবাদের নাম, যে অঞ্চলকে কেন্দ্র করে উত্থিত হয়েছিল শহর চন্দননগর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই চন্দননগরের বুকে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো শান্ত নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবন বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। ফলে চন্দননগরের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য এখানে একটি নূতন মাত্রা পায়। ১৬৮৮ সালে ৯৪২ হেক্টর জমি ৪০,০০০ সিক্কা টাকায় কিনে ফরাসি কুঠি স্থাপন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল। ১৬৯৩ সালে দিল্লী থেকে অবাধ বাণিজ্যের ফর্মান পাবার পর চন্দননগরে একের পর এক কুঠি তৈরি করে জমি কিনে ফরাসীরা নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াতে থাকে। ১৬৯৬ সালে তৈরি হয় আর্লেয়াঁ দুর্গ। চন্দননগরে একদিকে প্রবেশ করে ফরাসি সংস্কৃতি অন্যদিকে ফরাসিদের কাছে চাকরীর প্রয়োজনে পর্তুগীজ, আরমানী, উর্দু ও আরবীভাষী মুসলমান, মালাচারী তেলেগী হাবসী প্রভৃতি বিশেষ ভাষাভাষী মানুষ চন্দননগরে আসতে থাকে। ফলে ফরাসি দপ্তরে গড়ে ওঠে একধরণের মিশ্র সংস্কৃতি। চন্দননগর ক্রমশ বাণিজ্যবন্দর হয়ে ওঠায় এবং বাণিজ্যই মুখ্য জীবিকা ও অর্থনীতির ভিত্তি হওয়ায় বাণিজ্যকেন্দ্রিক একটি সংস্কৃতির উত্থান হতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে চন্দননগরের সমাজজীবন ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠার পেছনে এখানকার নব্যভূস্বামী শ্রেণী, নবোদিত ব্যবসায়ীশ্রেণী ও ফরাসি উপনিবেশিক শক্তির ভূমিকা যেমন কাজ করেছে তেমনই কাজ করেছে বর্গীর আক্রমণ ও বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের অশান্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিণতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্গির হাঙ্গামা শুরু হলে বর্ধমান জেলা ও হুগলি জেলায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বর্গিরা লুঠপাঠ শুরু করে। ঐ সময় বিলকুলি, কাটোয়া, বর্ধমান, বাঁশবেড়িয়া, সর্পরাজপুর, দেবানন্দপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নানা বিত্তশালী পরিবার এসে চন্দননগরে আশ্রয় নেয়। কারণ এখানে ফরাসিদের উপস্থিতি তাদের সাহস ও নির্ভরতা জুগিয়েছিল। ফরাসিদের দুর্গের আওতায় থাকলে তারা আক্রান্ত হবে না, তাদের এমন বিশ্বাস ছিল।

কিন্তু ফরাসি শক্তি চন্দননগরে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ফরাসিরা কতখানি নিজস্ব সংস্কৃতি বিস্তারে যত্নবান ছিল? অথবা তাদের প্রভাব কতখানি পরিব্যাপ্ত হয়েছিল চন্দননগরের জনজীবন সংস্কৃতিতে,

এই প্রশ্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে চন্দননগরে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের ছায়ায় যে দেশীয় সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তার ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের পথে নানা পর্যায়কেও চিহ্নিত করা যায়।

১৬৯৩ সালে দিল্লী থেকে অবাধ বাণিজ্যের ফর্মান পাবার পরেই ১৬৯৫ সাল থেকে ফরাসীরা বেনামে তাদের জমিদারী বাড়াতে থাকে। বেনামে কেনার উদ্দেশ্য ছিল বিদেশীর ভূমিস্বত্ব ভোগের বিরুদ্ধে মুঘল সরকারী বাধা ও নিষেধাজ্ঞাকে ফাঁকি দেওয়া। তারা ফরাসি কোম্পানীর হিন্দু বা মুসলমান কর্মচারীর বেনামে এই জমিগুলি কিনে 'প্রজা' বসাতে থাকে। সুতরাং যে জনসমষ্টি চন্দননগরে আসছিল তারা বেনামা জমিতে পরোক্ষে ফরাসি প্রজা বনে যেতে থাকে। পরোক্ষে ফরাসিপ্রজা হয়ে তাদের সুবিধা হয়েছিল কারণ প্রথমত খেয়ালখুশীমত উৎখাত হবার ভয় ছিল না। দ্বিতীয়ত ফরাসিরা বাণিজ্যগত কারণে বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তিকে উৎসাহিত করেছিল, যে পেশা গ্রহণ করেছিল বাহিরাগতদের অনেকেই — ফলে সরকারী আশ্রয়ে দেশীয় মানুষদের সংস্কৃতি প্রাধান্য পেয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে দুটি উল্লেখযোগ্য কথা বলার আছে —

(১) চন্দননগরে ব্রাহ্মণ্য শ্রেণী প্রায় না থাকায় এখানে ব্রাহ্মণশাসিত সংস্কৃতি জন্ম নেয় নি এ সময়ে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা মানুষ গ্রামীণ সংস্কৃতিকে এখানে উল্লেখযোগ্য ভাবে তুলে ধরেছিলেন। বহিরাগতদের মধ্যে কৃষিজীবী ছিল কম। বেশীরভাগ ছিল শ্রমসাধ্যবৃত্তিজীবী। ধর্মগতভাবে এদের অনেকেই ছিল বৈষ্ণব ফলে আড়ম্বরহীন এক দেশীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠে ফরাসিদের নিরাপত্তার ছায়ায়। ফরাসিদের উন্নত সামরিক বল ও শৃঙ্খলার সংস্কৃতি সাহস জুগিয়েছিল সাধারণ মানুষকে।

(২) প্রথম পর্যায়ে চন্দননগরে গড়ে ওঠা নতুন সংস্কৃতিতে সরাসরি ফরাসি প্রভাব ছিল না। কারণ ফরাসিরা দেশীয় মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা এ পর্যায়ে এড়িয়ে চলতো। তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতো এ দেশের মানুষদের। ফরাসিদের উৎসবে প্রবেশাধিকার ছিল না সাধারণ মানুষের। তবে আদব কায়দা, কেতা, সবই তারা দেখতো দূর থেকে। চন্দননগরে এ সময় ইউরোপীয়ানদের আসা যাওয়া শুরু হয়েছিল। সমস্ত পৃথিবীর ডাক এসে পৌঁছেছিল চন্দননগরের কানে ফলে চন্দননগরের মানুষের সংস্কৃতি আর সেই নির্ভেজাল গ্রাম্য সংস্কৃতি ছিল না। সংস্কৃতির রূপায়ণ ঘটছিল অথবা বলা যায় নগরায়ন সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটাচ্ছিল। তথ্যগত বিচারে দেখা যায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টানদের ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক জগৎ চন্দননগরে গড়ে ওঠে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে। নিবিড় ও নিস্তরঙ্গ গ্রামীণজীবন ভেঙে গেলেও Cosmopolitan শহরের যে গুণ কলকাতা লাভ করতে পেরেছিল চন্দননগর তা পারে নি। এখানে প্রথম দিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উত্থান হয় নি এবং সমাজপতিরা যারা চন্দননগরের সমাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন তাদের অধিকাংশ ছিল সম্পূর্ণভাবে গ্রাম্য সংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ও ইংরাজি প্রভাবমুক্ত। ফরাসিরাও এখানকার জনজীবনের সঙ্গে সরাসরি মেশার চেষ্টা করে নি প্রথম থেকে। তারা চন্দননগরকে সাদা ও কালো দুটি অঞ্চলে ভাগ করে রেখেছিল ও বাণিজ্য এবং আইনসংক্রান্ত নানা ব্যাপারে সাদা মানুষদের সুযোগ সুবিধা অনেকাংশে বাড়িয়ে রেখেছিল। তাদের উৎসবে সাধারণ স্তরের প্রবেশাধিকার ছিল না বহুদিন ধরে। বাংলা শিখে বাঙালী সমাজে মিশে যাচ্ছেন এমন ফরাসি মিশনারিদের বা রাজপুরুষের উত্থান এখানে দেখা যায় নি। হিন্দু ও মুসলমান জনসমষ্টিও এই ক্ষুদ্র জনপদে নিজেদের ধর্মীয় সংস্কৃতিকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছিল গোষ্ঠীপতিদের কর্তৃত্বে।

লক্ষণীয় এই যে, চন্দননগরে ফরাসিদের রাজনৈতিক আধিপত্য শেষ হয়ে যাবার পর তারা এখানে ফরাসিভাষা ও ফরাসি সংস্কৃতি বিস্তারের সচেতন প্রচেষ্টা চালায়। বিদ্যায়তনকেন্দ্রিক এই সংস্কৃতি প্রচারের আগে অবশ্য ফরাসিরা নাগরিক সংস্কৃতির আমদানী ঘটিয়েছিল চন্দননগরে। তথাকথিত "মুজমনা

উদার ফরাসি সংস্কৃতির প্রভাব'' চন্দননগরে প্রথমদিকে মোটেই পড়ে নি। ফরাসিরা এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিল না সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথা ঠিক যে ১৭৪৪ সালের মধ্যে চন্দননগর হয়ে ওঠে 'Greater centre of Commerce than Calcutta' যাকে Clive স্বয়ং বলেছিলেন 'The granary of India' আফ্রিকা ও ইউরোপের নানা প্রান্তে চন্দননগর থেকে বাণিজ্য জাহাজ যেতে ও আসতে শুরু করে এবং চন্দননগরবাসী বাহিরবিশ্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহে ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠে ফরাসিদের কল্যাণে। কিন্তু ক্রমশ ফরাসি তত্ত্বাবধানে এখানে পুঁজিবাদী নগর সংস্কৃতির উত্থান ঘটে। কারণ পরবর্তীকালে ফরাসিরা এখানে ভাঁটিখানা, জুয়ার আড্ডা, ক্যাবারে, দাসব্যবসার ঘাঁটি প্রভৃতি বসিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক প্রমোদের কলুষিত অধ্যায়কেও ডেকে এনেছিল। প্রথমদিকে সাদা মানুষেরা পরে কালো মানুষেরাও এই নাগরিক প্রমোদে অংশ নিতে শুরু করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে চন্দননগরে নগরায়ণ ঘটতে থাকে দ্রুতগতিতে। চন্দননগর এ সময়ে ফরাসিদের তত্ত্বাবধানে বাণিজ্যের মূলকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। জনসংখ্যা বাড়ে, বহু পাকা বাড়ি তৈরি হয়। ইউরোপীয় বিশেষত ফরাসী স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বহু বাড়ি তৈরি হতে থাকে। অবশ্যই তা সাদা মানুষের এলাকায়। Bossa নামে মদ তৈরি শুরু হয় এখানে এবং ক্রমশ তা বিখ্যাত হয়ে ওঠে। পরে দেখা গিয়েছিল ফরাসি তত্ত্বাবধানে নাগরিক সংস্কৃতি গ্রহণ করে চন্দননগর প্রমোদভূমি হিসাবেও ইউরোপীয় তথা দেশী বড়লোকদের কাছে বিখ্যাত অঞ্চল হয়ে উঠছে। এই সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে চন্দননগরে একজন বাঙলা তথা ভারতপ্রেমিক ফরাসি মানুষের নাম পাওয়া যায়, তার নাম ওগুস্তাঁ ওসাঁ। ওসাঁর পরিচয় প্রথম পাওয়া যায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়। ভারতী পত্রিকায় ১৩৩০ সালের জৈষ্ঠ্য সংখ্যায় তিনি ''বাংলায় প্রথম : একখানি পুরাতন ফরাসি বাংলা অভিধান'' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে তিনি O.D.B.L. গ্রন্থেও ওসাঁ প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে ওসাঁর কীর্তি প্রসঙ্গ যা জানা যায় তাতে মনে হয় চন্দননগরের এই ফরাসি মানুষটি শুধু চন্দননগরের সংস্কৃতিতে নয় বাংলার সংস্কৃতি জগতের ইতিহাসেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন চন্দননগরে ফরাসি সরকারের দোভাষী। সমকালীন সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে ধারণা করা যায় যে তিনি ফরাসি, উর্দু ও বাংলাভাষায় দোভাষী ছিলেন। ১৭৮১ সালের ১০ মার্চ তিনি ইংরেজদের দ্বারা কারারুদ্ধ হন সম্ভবত রাজনৈতিক কারণে। ১৭৭৮ সালে ব্রিটিশ কোম্পানি ইউরোপীয় যুদ্ধের অজুহাতে চন্দননগর দখল করে নেয়। ওঁসা বন্দী হন ১৭৮১ সালে এবং কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। বন্দীজীবনের প্রথম দিন থেকে ওসাঁ তাঁর 'বাংলা ফরাসি' অভিধান সংকলন করতে শুরু করেন। ওসাঁর এই বাংলাচর্চা গুরুত্বপূর্ণ কারণ চন্দননগর ওসাঁর মাধ্যমে তার অবদান রাখে বাংলা ও বিদেশী ভাষার অভিধানের জগতে। আরো লক্ষণীয় এই যে যেসময় ওসাঁ বাংলা ও ভারতীয় ভাষা চর্চা শুরু করেন সে সময়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও বাংলা-চর্চা শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল হ্যালহেড সাহেবের কথা যিনি তার বাংলা ব্যাকরণ ছাপানো শেষ করেন ১৭৭৮ সালে। এর আগে আরও এক বিদেশী বাংলা-পর্তুগীজ অভিধান রচনা করেন। তিনি মানুএল-দ্য-আসাঁমপুসাম। মানুয়েল রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান। তিনিও চন্দননগরে আসতেন। অন্তত ১৭৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি চন্দননগরে এসেছেন। ১৭৪৩ সালে চন্দননগরের যখন রমরমা অবস্থা তখন তিনি বাংলা-পর্তুগীজ অভিধান প্রকাশ করেন। তাকে দেখে এবং হ্যালহেডকে দেখে হয়তো ওসাঁ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। যাই হোক চন্দননগরে ফরাসী সংস্কৃতির ইতিহাস লিখতে বসে ওসাঁ অধ্যায়টিকে বিস্মৃত হলে চলবে না। শুধু অভিধান নয় ওসাঁ বাঙলা চিঠি কিভাবে লেখা হয় তার বিবরণও প্রস্তুত করেছিলেন। ফরাসিদের পক্ষ থেকে এটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল। ওসাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে একটি সংগ্রহ 'বিব্লিওতেক নাসিওনেল' (ফরাসিদেশে) এ রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কালিকাপুরাণ, চণ্ডিকামঙ্গল, মহাভারত

হিন্দুদেবতাদের রঙ্গীনচিত্র প্রভৃতি। এ'থেকে বোঝা যায় চন্দননগরের এই ফরাসি মানুষটি কতটা চেষ্টা করেছিলেন বাংলা ও ফরাসি অথবা বলা যায় ভারতবর্ষ ও ফরাসি সংস্কৃতির মেলবন্ধনের। শ্রীযুক্ত প্রতাপ দে তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন Catalogue Sommaire des Manuscripts Indians Indo - chinois et Malayo – Polynesians (Paris 1912) নামে একটি সংগ্রহের কথা।

শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মতে এর মধ্যে ওসাঁর অবদান রয়েছে। যাই হোক লক্ষণীয় বিষয় হলো কাবার্তর তালিকাগ্রন্থ থেকে অন্তত চারটি উল্লেখযোগ্য পুস্তকের কথা পাওয়া যায় —

(১) ফরাসি-হিন্দুস্থানী অভিধান, যেখানে ১২৬০০ ফরাসি শব্দ এবং তার দ্বিগুণেরও বেশী হিন্দুস্থানী শব্দ ছিল। ১৭৮৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ওসাঁ সম্পূর্ণ করেন এটি।

(২) দ্বিতীয় অভিধানটিতে ছিল ১১২২৮ শব্দ যেটিতে উল্লেখ ছিল 'এটি বাংলা এবং করমণ্ডলে ব্যবহারের উপযোগী।

(৩) ফার্সি - হিন্দুস্থানী - ফরাসি, সাধারণ শব্দমালা, সঙ্গে সাধারণ ইতিহাস, গদ্যপদ্য, বাক্যমালা।

(৪) হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ সঙ্গে ফরাসি ও হিন্দুস্থানী ব্যাকরণের তুলনামূলক আলোচনা।

এরও আগে ১৭৭৪ সালে ওসাঁ আর একটি কাজ করেছিলেন চন্দননগরে বসে সেটি হল "বাংলা শব্দমালা ও নীতি" গ্রন্থটি তৈরি করা। ওসাঁ প্রসঙ্গে বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রইল।

এবার চন্দননগরে ফরাসিদের অন্যান্য সাংস্কৃতিক অবদান প্রসঙ্গে ফেরা যাক। যার মধ্যে শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টা একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। ফরাসি শিক্ষায় উনবিংশ শতাব্দীর চন্দননগরে এক নতুন সংস্কৃতি জন্ম নিয়েছিল। এই সংস্কৃতির মূল ধারক ও বাহক ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। তথ্যবিশ্লেষণে দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর চন্দননগর সর্বপ্রথম ফরাসি সংস্কৃতি গ্রহণ করতে থাকে। মলিয়রের নাটক অনুবাদিত হয়ে অভিনীত হয়। এরও আগে L' Avocat নামে একটি ফরাসি নাটক বাংলায় অনুদিত হয়ে অভিনীত হয়েছিল একথা শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ বলেছেন। একইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসি উৎসব ফ্যাস্তা বা Fe'te Nationale চন্দননগরের অধিবাসীদের উৎসব হিসাবে পরিগণিত হয়। এটি অনুষ্ঠিত হতো প্রতিবছর ১৪ জুলাই গঙ্গার ধারে। বাস্তিল দুর্গের পতনের স্মৃতিতে গণতান্ত্রিক ভাবনার প্রতীক ছিল এই উৎসব। এ ছাড়া 'ফ্যান্সি ফেয়ার' বলে একটি উৎসব শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে। ইউরোপীয় মহিলারা কুঠির মাঠে শৌখীন জিনিষ নিয়ে সখের বাজার খুলে বসতেন এবং এখানে এসে অনেকে জিনিসপত্র কিনতেন। এই মেলা চলতো কয়েকদিন। ক্রমশ শুধু উৎসব নয়, ফরাসি ভাষাও চন্দননগরের মানুষের প্রিয় ভাষা হয়ে উঠতে থাকে। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের ফলে এখানকার শাসন ব্যবস্থায় কিছুটা গণতান্ত্রিক চেতনার স্পর্শ লাগে। এখানে একদিকে ফরাসি শাসনগত বৈশিষ্ট্য যাতে সাম্য মৈত্রীর কিছুটা চেতনালোক লক্ষ্য করা গিয়েছিল অন্যদিকে ইংরাজী শিক্ষার চেতনালোক, এই দুইয়ের মিশ্রণে শিক্ষিত এক জনসমষ্টিকে সমাজের শীর্ষে রেখে চন্দননগরে নতুন সাংস্কৃতিক উত্থান শুরু হয় উনবিংশে শতাব্দীর শেষ থেকে। পাশাপাশি লোকসংস্কৃতির ধারাও বহমান থাকে।

চন্দননগর সব থেকে বেশী পরিমাণে ফরাসি সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যে বিষয়ে তা হল শিক্ষাক্ষেত্র। এ বিষয়ে খ্রিস্টান মিশনারিরা প্রথম পদক্ষেপ নেন। ১৮২৬ সালে ১৬ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে পুরনো চার্চের পর্তুগীজ কোরাস গায়ক দুক্রুস (Ducrux) ফরাসি ভাষা, অংক, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। পর্তুগীজ মিশনারিদের প্রচেষ্টায় শিক্ষাদানের কাজ কম বেশী চল্লিশবছর চন্দননগরে নিবিষ্ট ছিল। এরপর জেসুইট মিশনারিদের উদ্যোগে ১৮৬৩ সাল থেকে ফাদার বার্থের

আন্তরিক প্রচেষ্টায় সেন্ট মেরিজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমানে যা কানাইলাল বিদ্যামন্দির নামে খ্যাত) স্থাপিত হয়। এখানে প্রাথমিক শিক্ষাদান চলতো এবং বাংলা ও ফরাসি দু'ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হতো। ১৮৭২ সাল থেকে ইংরাজী শিক্ষাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ফরাসী শিক্ষায় চূড়ান্ত পরীক্ষা পণ্ডিচেরী শিক্ষা দপ্তরের দ্বারা পরিচালিত হতো এবং এন্ট্রান্স পরীক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা গৃহীত হতো। ১৮৯৭-৯৮ সালের মধ্যে চন্দননগরে চারটি সরকারী বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রাথমিক স্তর থেকে ফরাসি পড়ানো হতো এবং এর জন্য ফরাসি সরকার বিদ্যালয় গুলিকে অর্থসাহায্য দিতেন। ইংরাজী শিক্ষার পাশাপাশি সম্পূর্ণ ফরাসিভাষা ভিত্তিক ফরাসি শিক্ষা প্রচলিত ছিল এবং এই ফরাসি শিক্ষা অবৈতনিক ছিল। সেন্ট জোসেফ'স কনভেন্ট অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত ছিল। এটি খুব সম্ভব ফাদার দুক্রুসের পরিচালিত জেসুইট বিদ্যালয়টির উত্তরপুরুষ।

বস্তুত ফাদার বার্থে (Father Magloire Barthet) প্রতিষ্ঠিত একল্ দ্য স্যাঁৎ মেরি বা সেন্ট মেরিজ ইনস্টিটিউশনকে কেন্দ্র করে ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার প্রসার শুরু হয়। সার্ভিফিকা বা C.E.P.E. পর্যন্ত পড়ানো শুরু হয়েছিল এখানেই প্রথম তারপর ১৮৭২ সাল থেকে ইংরাজী দানের পাশাপাশি ১৮৮৩ সাল থেকে ফরাসি বিভাগে (Brevet Elementaire) পর্যন্ত পড়ানো শুরু হয়। ১৮৯১ সাল থেকে এখানে কলেজ বিভাগ এবং F.A ক্লাশ শুরু হয়। বিদ্যালয় বিভাগটির নাম হয় Ecole des Garcons এবং কলেজ বিভাগটির নাম হয় কলেজ দুপ্লে। ফরাসি শিক্ষাগ্রহণ অবৈতনিক হওয়ার ফলে চন্দননগরের বহু মেধাবী দুঃসহ পরিবারের সন্তানরা এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। পাশাপাশি আগ্রহীরাও ছিলেন। এ কথা বলা যায় যে নিম্নবিত্ত পরিবারের বহু মানুষ এ সময় রীতিমতো ফরাসিভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যান। চন্দননগরে উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ তীব্র ছিল। ফরাসিরা কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা চালু রাখলেও তা প্রসারের আগ্রহ দেখান নি। বরং ১৯০৮ সালে হঠাৎ পণ্ডিচেরী কর্তৃপক্ষ দুপ্লে কলেজ বিভাগটি বন্ধ করে দেন। কারণ এটি ছিল ইংরাজী ভাষা পঠনপাঠনের ক্ষেত্র। ফরাসি সরকার অবশ্য কারণ হিসাবে দেখিয়েছিলেন অর্থাভাব। দীর্ঘ তেইশ বছর পর রীতিমতো সংগ্রাম করে এই মহাবিদ্যালয় আবার চালু করতে হয়েছিল চন্দননগরবাসীকেই।

তথ্যগত বিচারে দেখা যায় ফরাসিরা আনুষ্ঠানিকভাবে উপনিবেশ পত্তনের প্রায় ১৪০ বছর পরে সর্বসাধারণের জন্য ফরাসি শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করে। এর আরও পরে ১৮৮০ সাল থেকে ফরাসি কর্তৃপক্ষ ফরাসি শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় শুরু করে এবং সামগ্রিক শিক্ষা বিস্তারে অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিকে অর্থ সাহায্য করতে শুরু করে।

চন্দননগরে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের গতিসূত্রের মধ্যে রয়েছে এই সংস্কৃতি চর্চা ও বিস্তারের ইতিহাস। চন্দননগরে উপনিবেশবাদ শাসন শুরু হয়েছিল, সরাসরি মধ্যবর্তী কোনো শক্তি এখানে ছিল না। ব্রিটিশ ভারতে এটা ছিল। এ ব্যাপারে রাজন্য ভাতা দিতে প্রচুর ব্যয়ও হতো ব্রিটিশদের। চন্দননগরে এই উপনিবেশবাদী শাসনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিচার করলে দেখা যায় এর প্রকৃতিও পাল্টে ছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হয় ফরাসিশক্তি। আগেই বলা হয়েছে উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার অনেক পরে ফরাসি ভাষা শিক্ষা প্রসার ও প্রচারে যত্নবান হয়েছিল ফরাসিরা। পক্ষান্তরে ইংরেজরা তাদের উপনিবেশে এ কাজ শুরু করেছিল আগেই। ক্রমশ ঠিক উল্টে যায় ব্যাপারটা; ইংরেজ শক্তি পরে অতীব যত্নবান হয়ে পড়ে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য। সরকারীস্তরে বেশীর ভাগ বড়লাটরা নিজেদের নিয়োজিত করে রেখেছিলেন সাম্রাজ্যবিস্তার করার জন্য। চন্দননগরে এ সময়েই সরকারী স্তরে ফরাসি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের পদক্ষেপ শুরু হয়। ১৭৮৯ সালের পর থেকে ক্রমশ বুর্জোয়াদের ক্ষমতা দখলও নীতি পরিবর্তনের একটি কারণ ছিল।

পরিশেষে বলা যায়, চন্দননগরে ফরাসি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলনের পাশাপাশি ফরাসি শাসনের প্রতিফলন ঘটেছিল। এই শাসন ব্যবস্থায় বৈষম্য ছিল ঠিকই কিন্তু নাগরিকবোধ চন্দননগরবাসীকে দিয়েছিল ফরাসি শাসন। চন্দননগরের সাদা মানুষদের অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল নাগরিক কাঠামো। বড় চওড়া পাকা রাস্তা, বড় বড় বাড়ী, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী তৈরি হয়েছিল। সমগ্র চন্দননগরে ফরাসি গভর্নরের শাসন নাগরিক মননকে বিস্তারিত করেছিল। শাসন ও বিচারব্যবস্থা এর একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। কালের বিচারে হিসাব করলে দেখা যায় চন্দননগরে ফরাসি সংস্কৃতির প্রভাব হয়তো অতিবিস্তারিত ছিল না কিন্তু চন্দননগরের নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছিল ফরাসি ভাষা শিক্ষা আর উচ্চবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ভাষা শিক্ষা ছাড়াও প্রভাবিত করেছিল ফরাসি সংস্কৃতি যার ছাপ রয়ে গিয়েছিল উচ্চবিত্তদের বাড়িঘরের আসবাব, চিত্র ও কখনো কখনো ভাস্কর্য্যের মধ্যে। এইজন্যই অন্তত দু'বার চন্দননগরের জনগণ ফরাসি অধীনে থাকবার জন্য আবেদন করেছিলেন কারণ ইংরেজদের কাছে তাঁরা চুঁচুড়ার অধিবাসীদের মতো হস্তান্তরিত হতে চান নি। ইংরাজী সভ্যতার পাশাপাশি ফরাসি সভ্যতার এই উন্মেষ চন্দননগরে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছিল। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এই শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করেছিল চন্দননগরবাসী। বহু ফরাসি পর্যটকের লেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল চন্দননগরের স্মৃতি, আর কেউ কেউ একে আদর করে নাম দিয়েছিলেন 'লিটল ফ্রান্স'। সেই ইতিহাসের স্মৃতি বুকে ধারণ করে প্রবাহমানা গঙ্গার তীরে আজও দাঁড়িয়ে আছে চন্দননগর। চন্দননগরবাসীর জননী।

তথ্যসূত্র

বই :

১) শেঠ, হরিহর — সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয়
২) Dey, S.C. — Hooghly Past & Present
৩) Mill, S.C. — Three Frenchmen in Bengal
৪) Crawford D.L — Brief History of Hooghly District
৫) মিত্র, সুধীরকুমার — হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ

প্রবন্ধ :

১) বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — প্রাচীন চন্দননগরের জনজীবনের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গতিপথ (চন্দননগর পুস্তকাগার স্মরণিকা ১৯৯৮)
২) বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — চন্দননগরের ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিসমাবাহার (আবিষ্কার, পত্রিকা সংকলন)
৩) বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — চন্দননগরের নামভূমিকার ইতিবৃত্ত (চন্দননগর কর্পোরেশন স্মরণিকা, ১৯৯৭)
৪) বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — চন্দননগরের সাদা কালো মানুষদের কথা (গোধূলিমন, জগদ্ধাত্রীপূজা সংখ্যা)
৫) রায়, চারুচন্দ্র — ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, প্রবর্তক
৬) বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, বিশেষত চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল।
৭) Biswanath Bandyopadhyay — Mistery of Urbanisation in Chandernagar, Published in Indian Geographical Foundation Journal 1997

সংযোজন : নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যক্ষেত্রে ফরাসি প্রভাব

সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চন্দননগরের সাম্প্রতিকতম 'স্তম্ভ' গঙ্গাতীরে স্ট্রান্ডে Quai Dupleix -এর উপর ফরাসি শাসনকর্তাদের বাসভবন 'The Residency'-তে নবপ্রতিষ্ঠিত L' Institut de Chandernagor। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্থা 'মৈত্রী' (যার উদ্বোধন করেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) এক স্মরণীয় নাট্যাভিনয় করে (৯ এপ্রিল, ১৯৬৭) যেটি ছিল Labiche এর La Poudre Aux yeux — বাংলায় ভাষান্তরিত রূপ 'চোখে ধুলো'। রূপান্তর করেন প্রবর্তক নারী মন্দিরের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ইন্দুমতী ভট্টাচার্য যিনি নিজে ফরাসি সাহিত্যের বেশ কিছু গ্রন্থ বাংলায় তর্জমা করেন। মঞ্চায়ন স্বার্থে নাটকটির প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করেন দুর্গাচরণ রক্ষিত বঙ্গবিদ্যালয়ের কবি-শিক্ষক নিমাই সিংহরায়, নাট্য- পরিচালনা করেন যশস্বী নট সুনীল চক্রবর্তী। সেদিনের সাফল্য কতোখানি উল্লেখ্য তার প্রমাণ ফ্রান্সের পার্লামেন্টের 'মিশন' ভারতে/কলকাতায় এলে তাঁদের সংবর্ধনায় নাটকটি পুনরভিনীত হয় 'Academy of Fine Arts' -এ (২১/৬/৬৮)। এই একটি মাত্র ঘটনা বুঝিয়ে দেয় উভয় দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কী স্তরে উন্নীত ও তার মূলে চন্দননগরের ফরাসি প্রেমী তরুণ-তরুণী হতে প্রবীণ প্রবীণারও ভূমিকা কী পর্যন্ত সক্রিয় কত দিকে কত মাত্রায় যথার্থই যা অনুধাবণীয়। এই সূত্রে শুরু করছি ফরাসিতে চন্দননগরের সাহিত্য-সাধনার কথা।

তার আগে অতীতের ফরাসিবিদদের কথা আপনা হতে আসে। অবিস্মরণীয় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও দুর্গাচরণ রক্ষিতের তেমন সাহিত্য সাধনার কথা জানা নেই, যদিও তাঁরা বেশ ভালই ফরাসি জানতেন। পরে বেশ কয়েকজন মেয়র (যেমন প্রথম বাঙালী মেয়র দীননাথ দাস পরবর্তীকালের প্রখ্যাত মেয়র তুলসী চরণ রক্ষিত ও জননেতা "সাধুচরণ মুখোপাধ্যায়," ভোলানাথ দাস ও" দেবেন দাস, ডা. হীরেন চট্টোপাধ্যায় ফরাসিপ্রীতির পরিচয় দিয়ে গেছেন; শেভালিয়ে দ্য লেজিয়োঁ দ্যন্যর' সম্মানেও ভূষিত হয়েছেন কয়েকজনই। তবে তাঁদের কোনো সাহিত্য-কৃতির কথা বিশেষ জানা নেই। এখানের অন্যতম সুসন্তান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসি বিভাগের প্রথম প্রধান "নগেন্দ্রনাথ চন্দ্রের নাম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। অমর কবি চণ্ডীদাসের পদাবলীর তিনি করেন সুললিত ফরাসি অনুবাদ। তিনিই এখানে প্রথম বেসরকারী ভাবে ইন্দোফরাসি সংস্কৃতি পরিষদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। সভাপতি হন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। অবশ্য ফরাসি শিক্ষার প্রবাদ-প্রতিম আচার্য শশাঙ্কশেখর বড়াল ও অধ্যাপক কালীচরণ কর্মকার প্রমুখও সঙ্গে ছিলেন। প্রসঙ্গত জানাই চন্দননগরের 'ভারতভুক্তির' সময় স্মরণীয় ভারতীয় প্রশাসক সুনীলবরণ রায়ও ফরাসি পদ্যে চণ্ডীদাসের বেশ কিছু পদাবলী পরিবেশন করেছেন। .... সাহিত্য সেবার কৃতিত্বে নগেন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গেই কিন্তু এখানে সর্বাধিক স্মরণীয় স্বর্গত শশাঙ্ক বড়াল, যিনি চন্দননগরের ফরাসি শিক্ষক রূপে যথার্থই কিংবদন্তী পুরুষ। তাঁর সাহিত্য কৃতি — 'বনফুলের' গল্পের অনুবাদ, তারাশঙ্করের উপন্যাসের অনুবাদ ও মৌলিক রচনা। এখানে প্রথম ফরাসিতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষোত্তীর্ণ অধ্যাপিকা মীরা রায়, তিনিও ফরাসিতে বিভিন্ন সাহিত্য রচনা ও অনুবাদ ইত্যাদি করেছেন।

বড়ালবাবুর অন্য কৃতী ছাত্রী স্বর্গীয়া ইন্দুমতী ভট্টাচার্য ফরাসি নাটক, গল্প ইত্যাদির নানা অনুবাদ করেছেন। তবে এই ভাষায় মৌলিক কবিতা রচনা করতে দেখেছি 'কানাইলাল' ফরাসি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও সাংবাদিক মনীন্দ্রনাথ কুণ্ডু এবং বড়ালবাবুর উত্তরসূরী 'কানাইলাল' ফরাসি বিভাগের অন্যতম প্রাক্তন প্রধান কার্তিক দাসকে। ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য এবং অধ্যাপনার কৃতিত্বে

ফরাসি সরকার 'শেভালিয়ে দ্য লদ্‌র্‌ দে পাম অকাদেমি' সম্মানে ভূষিত করেছেন; কার্তিক দাস কলকাতার 'আলিয়াস ফ্রাঁসেজ'র সঙ্গেও দীর্ঘদিন সংযুক্ত। বিখ্যাত ফরাসি উপন্যাস লা নুই বেঙ্গলী তাঁর অনুবাদ। মৌলিক সৃষ্টি ও গবেষণায় অধ্যাপক কালীচরণ কর্মকার খুবই স্মরণীয়। দুপ্লে (Dupleix) ও আঁকেতিল দুপেঁর-র (Anquetil Duperon) উপর তাঁর মৌলিক গবেষণা কালীবাবুকে ব্যাপক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। তাছাড়া একাধিক বার ফ্রান্সে ও অন্যান্য দেশে গিয়েও তিনি অনেক কিছু করেছেন যার জন্য আমরা গর্বিত। .... অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদ স্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক ভাষার উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও ভারতীয় ফরাসি শিক্ষক সংস্থার প্রাক্তন সম্পাদক অধ্যাপক তারাপ্রসাদ দাস শুধু চন্দননগর কেন, সারা ভারতের ফরাসি ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রের এক স্তম্ভ স্বরূপ। ফরাসি ভাষায় তাঁর মৌলিক রচনা - গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি আছে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বর্ষে রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর প্রবন্ধাবলী ফ্রান্সে অবস্থান কালে সে-দেশের সবিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে।

সুসন্তান, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ফরাসি অধ্যাপক নন্দদুলাল দে-কে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে তাঁর সুন্দর অনুবাদ-কর্ম যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (UNESCO থেকে প্রকাশিত) ও শরৎ চন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-র সাবলীল ফরাসি অনুবাদ। সম্প্রতি তিনি 'দেশ' পত্রিকায় বাংলার এক তরুণ প্রতিভা অকালমৃতা কবি তরু দত্তের ফরাসিতে লেখা নভেল 'মাদাম লেভীর ডায়েরী' বাংলায় পরিবেশন করে অধিকতর পরিচিতি ও খ্যাতিলাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নববর্ষা প্রভৃতি কবিতারও তিনি সুন্দর পদ্যানুবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ কবিদের কবিতার অনবদ্য ফরাসি অনুবাদ করেছেন। এখানের আর এক প্রবাদ প্রতিম ফরাসি শিক্ষক ('কানাইলাল' Institute ও Convent -এর সঙ্গে বিশেষ বিজড়িত) সাতকড়ি নন্দী। ফরাসি হতে বাংলায় তাঁর পদ্যানুবাদ কোন প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না।... আরও বেশ কিছু কৃতী অনুবাদক আছেন Institute -এর ছাত্র ছাত্রীরাও। — এঁরা ভিক্টর হুগো, বদ্‌লেয়ার এমন কি Lamartime এর Lalac এর মতো কবিতার কাব্যানুবাদও করেছেন। ত্রিলোচন দাস ফরাসিতে গবেষণামূলক প্রবন্ধে সিদ্ধহস্ত। অধ্যাপক গোলোক গুঁই - যিনি কিছুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসিদের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন তাঁরও রচনা কিছু আছে শুনেছি। তেমনি উল্লেখের দাবী রাখেন গোলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন দত্ত, শিল্পী হরিনারায়ণ দাস ও রাজস্থানের প্রাক্তন অধ্যাপকলক্ষ্মী দাস, নটনাট্যকার হরিচরণ মুখোপাধ্যায়। হরিবাবু ছিলেন ইন্দোফরাসি সংস্কৃতি পরিষদের অন্যতম কৃতী সম্পাদক। ফরাসি কমেডি নাটক মলিয়্যার -এর Medecine Malgre lui নাটকের বাংলা ভাষান্তর 'দায়ে পড়ে কবিরাজ' কয়েকবারই সুঅভিনীত হয়েছে চন্দননগরের বিভিন্ন মঞ্চে।

বিগত ৩০০ বছরে চন্দননগরে ফরাসি চর্চা কতো যে হয়েছে — ভাষা, কাব্য, সাহিত্য, নাটক, প্রবন্ধাদি, এমন কি ব্যাকরণ অভিধান পর্যন্ত, তা শ্রদ্ধেয় হরিহরবাবুর দেওয়া চন্দননগরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রন্থের গ্রন্থ তালিকায় দ্রষ্টব্য। সে সমুদয়ের সামান্য করেও আলোচনা (মূল্যায়ন তো দূরের কথা) বিরাট এক দায়। আরো কতো সংযোজন সমৃদ্ধ করেছে ও করছে সে সম্ভারকে। এ সব জানানোর মহাভার কে নেবে? নেবে প্রধানত চন্দননগরের ফরাসি পড়ুয়া তরুণ তরুণী সবাই। Institute de Chandernagar -এর ছাত্রছাত্রী সংস্থা 'মৈত্রী'-র প্রথম পর্বের অন্যতর সম্পাদক কৃতবিদ্য ফরাসিবিদ অসিত কুশারী 'মৈত্রী'র উদ্বোধন দিনে যথার্থই বলেছেন — " What lies ahead of us is future – a really demanding future where cultural efforts will have to be more intensive than ever if we hope to impress people by our existence and our activities. we can assure that this we will do as much as we can and request the favour of our readers of their friendship & good wishes which will be a capital asset for Moitri and boost up the spirit of the members in their thoughts

& action. – Au revoir."

ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় চন্দননগরের কতিপয় গ্রন্থ (হরিহর বাবুর তালিকা এবং আরও গ্রন্থ থেকে)

অনুবাদ : বাংলা থেকে ফরাসিতে

শশাঙ্ক বড়াল	:	বনফুলের গল্পের অনুবাদ।
পূর্ণচন্দ্র পাকড়ে	:	Folk tales of Bengal (?) ফরাসি অনুবাদ।
নগেন্দ্রনাথ চন্দ্র	:	(M.A., Chevalier du Dragon d' Annaum) Chandidasa : Les Amours de Radha et de Krichna (Manha -এর সহিত একত্রে লিখিত)
মীরা রায়	:	রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্প ও কবিতার ফরাসি অনুবাদ। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই' এর ফরাসি রূপান্তর (অপ্রকাশিত)
নন্দদুলাল দে	:	বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস (UNESCO)- প্রকাশিত ও শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ফরাসি অনুবাদ। 'ইনস্টিটিউটের' ছাত্র-ছাত্রীদের রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাস, জসীমউদ্দিন প্রমুখ কবিদের কবিতার অনুবাদ।
সাতকড়ি নন্দী	:	রবীন্দ্রনাথ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ কবির কবিতার বাংলা পদ্যানুবাদ।

অনুবাদ : ফরাসি থেকে বাংলায়

ফটিকলাল দাস	:	'কুড়ানো ছেলে, Sans famille -র বঙ্গানুবাদ।
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	:	মোপাসাঁর একাদশ, কবি তরু দত্ত, কুমারী আরভ্যার -এর দিনপঞ্জী (তরু দত্তের ফরাসি থেকে অনুবাদ)
নন্দদুলাল দে	:	মাদাম লেভির ডায়েরী ('দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত)
নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	:	'নিরুপায়ে চিকিৎসক' (Moliere -এর Le Medecine Malgre Lui -এর অনুবাদ)
কালীচরণ মিত্র	:	অম্লমধুর (Moliere -এর Le Medecine Malgre lui -এর অনুবাদ)
অজ্ঞাতনামা	:	গোবৈদ্য (Moliere এর Le Medicine Malgre lue -এর অনুবাদ)
ইন্দুমতী ভট্টাচার্য	:	চোখে ধুলো (Labiche-র La Poudre aux teux নাটকের বঙ্গানুবাদ
মীরা রায়	:	বাংলায় ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাস Renaissance পর্যন্ত (পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত)
নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায়	:	লা মার্তিনি -এর ল লাক কবিতার বাংলা পদ্যানুবাদ (অপ্রকাশিত)

ফরাসি ভাষা সাহিত্য বিষয়ে অন্যান্য রচনা :

প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী	:	(L' Officier d' Acadimi) The Necessity of learning French.
ভবানী দাস	:	বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে মাইকেল মধুসূদনের উপর ফরাসি প্রভাব বিষয়ে ফরাসিতে মৌলিক গবেষণাপত্র।
কালীচরণ কর্মকার	:	(Chandernagar et Dupleix, Auquetil Duperon ... etc.)
সৌরীন্দ্রকৃষ্ণ পাল	:	ফরাসিতে বাংলা ও ফরাসি সাহিত্যের তুলনামূলক গবেষণা।
কার্তিক দাস	:	La Nuit Bengale -এর অন্যতম অনুবাদক।
Prof. J. Buffard	:	The 'Jubilee' French Course পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কলেজ দুপ্লের ফরাসি ভাষাসাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক (Book I sowing or French Rudiments Book 2 - Reading or French Composition) Calcutta University Publication.
বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায়	:	Theses Prosentees de La Faculte des sciences de L' Universite de Strasbourge
ড. তারাপ্রসাদ দাস	:	রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ফরাসিতে বহু মৌলিক প্রবন্ধাদি। Chef de La Methode de Lecture.
Fortune Decosta	:	Vocabulary of French, English & Bengali words.
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	:	French for Indians, Jean Jaques Rousseau : A Phychanalytical approach.

হুগলি : পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-দিনেমার কথা

অনন্তদেব মুখোপাধ্যায়

১

আর্য, অনার্য, শক, হূণ, পাঠান, মোগল — যুগ যুগ ধরে এমনই কত জাতি প্রবেশ করেছে ভারতে। সংগ্রাম - সংঘর্ষ ঘটলেও সে সব বিরোধের অবসান হয়েছে। জেগে উঠেছে একটি বিরাট হিয়া।

পরবর্তী কালে আরো এসেছে ইউরোপ থেকে পর্তুগীজ-ডাচ-আর্মেনীয়-গ্রীক-জর্মন-ডেনিস-ইংরেজ ও ফরাসি জাতিসমূহ। ভারতের পশ্চিম উপকূল, দক্ষিণ উপকূলে বাণিজ্যের জন্য অবস্থান করেছে। পরে পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগর ছেড়ে ভাগীরথী নদী বেয়ে সপ্তগ্রাম-হুগলি-চুঁচুড়া-চন্দননগর-ভদ্রেশ্বর-শ্রীরামপুর-রিষড়া ও কোন্নগরে তারা উপনীত। নানা উত্থান - পতনের মধ্য দিয়ে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তাতে আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন :

> পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
> দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—'

কিন্তু পশ্চিম থেকে আসা ইউরোপীয় জাতিগুলি বর্ণসচেতন উপনিবেশবাদীর ভূমিকা নেয়। তাই পূর্বযুগে আসা জাতিগুলির মত তারা এক দেহে লীন হল না। তাদের অত্যাচার, তাদের শোষণের ফলেই তাদের ফিরে যেতে হয়েছে। তবু ঘটনার অন্তরালে মানবিক মানসিক দেওয়া - নেওয়ায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও প্রতীচী সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিকে তথা হুগলি জেলার আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে আধুনিক করেছে, উপহার দিয়েছে ভাষা ও নব্য সংস্কৃতির রীতি নীতি।

২

হুগলি জেলায় প্রথম এসেছে পর্তুগীজেরা। সে ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দের কথা। সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁওতে তারা গড়ে তোলে Porto Pequeno বা ছোট বন্দর। তাদের Porto Grande বা বড় বন্দর ছিল চট্টগ্রামে। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে জি. বারোজ-এর আঁকা মানচিত্রে এই সাতগাঁওয়ের উল্লেখ রয়েছে। ভারতে মানচিত্রের ব্যবহার সম্ভবত জি বারোজ-কে নিয়েই শুরু হয়।

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সরস্বতী নদী সরে যাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য ভাগীরথী তীরে হুগলিতে গড়ে ওঠে নতুন বন্দর। সেটি পর্তুগীজদের হাতে। তাদের বাণিজ্য বিস্তৃত হতে থাকে ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। সাম্প্রায়ো নামে এক পর্তুগীজ হুগলিতে জমি কেনেন ১৫৩৭-এ। হোগলা থেকে, কি গোলঘাট থেকে, নাকি গুদাম থেকে যেভাবেই ব্যাখ্যা হোক না কেন, হুগলি

শহরটির নামকরণে পর্তুগীজদের অবদান অনুমিত।[২]

১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে এখানে গড়ে ওঠে একটি কনভেন্ট এবং অখন্ড বঙ্গে প্রাচীনতম রোমান ক্যাথলিক গির্জা। এই গির্জা শব্দটিও Eccelsia এই Latin শব্দের অপভ্রংশ পর্তুগীজ Igrea শব্দটি থেকে এসেছে। এই গির্জাটি থেকেই প্রচারিত ও প্রসারিত হতে থাকে পর্তুগীজের পাশ্চাত্য শিক্ষা - দীক্ষা। তাদের ভাষা এখানে অন্য সব ইউরোপীয় বণিক ও ঔপনিবেশিকদের কথ্য ভাষারূপে বহুবছর চালিত ছিল। ইংরাজী ছাড়া ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে পর্তুগীজ ভাষাজাত শতাধিক শব্দ বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত। ফলাফল, নানান সাংসারিক জিনিসপত্র ছাড়াও কাবার, এস্তার, মাইরি, মিস্ত্রি এসব শব্দ এই অঞ্চলে বহুশ্রুত।

পর্তুগীজরা তাদের 'গোলিন' বা হুগলিতে গড়ে তোলে উপনিবেশ। এই উপনিবেশের মধ্যে ছিল 'পিপুলপাতি' 'বাবুগঞ্জ' আর 'ব্যান্ডেল'। ঐতিহাসিক সুধীরকুমার মিত্রের মতে বন্দর ছিল বলেই "ব্যান্ডেল" নামটির উৎপত্তি। কিন্তু ভিন্নমতে "পোর্তুগীজরা নিজেদের বসতিগুলিকে ব্যান্ডেল বলত। এই শব্দটি ফারসী শব্দ বন্দর থেকে বানানো।"[৩]

ইউরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে প্রথম যিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শাহজাহানের রাজত্বকালে বাঙলায় তিনবার এসেছিলেন এবং হুগলিতেও তিনি হলেন রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পর্তুগীজ পাদরি মেস্টো ফ্রে সেবাস্টিনেল মানরিক। ১৬২৮ বা ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে কোচিন থেকে যাত্রা আরম্ভ করে সেই বছরই জুন মাসে হুগলিতে আসেন। মানরিকের ভ্রমণকাহিনী থেকে জানা যায় যে অধিকাংশ পর্তুগীজ ছিল ভাগ্যান্বেষী। তাদের মধ্যে ছিল কিছু বরখাস্ত হওয়া সৈনিকও। কেউ কেউ স্থানীয় রাজা বা জমিদারের অধীনে চাকরি করত। অনেকে আরাকানের মগ রাজার নৌ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হত। কিছু লোক স্বাধীনভাবে জলদস্যুবৃত্তিও করত। যাই হোক, পর্তুগীজ আমলে হুগলি শহরের প্রভূত উন্নতি হয়। ফলে এখানে তারা 'সর্বেসর্বা' হয়ে ওঠে। অনেকে মনে করেন সম্রাট আকবর পর্তুগীজদের সুনজরে দেখতেন বলে তাদের ঔদ্ধত্য ও দুর্বৃত্ততা চরমে উঠেছিল। তাই তারা সপ্তগ্রামের ফৌজদারকেই অমান্য করত।[৪] এদের সঙ্গে জুটেছিল মিশনারি সম্প্রদায়। তারা হিন্দু-মুসলমানদের ধরে ধরে খ্রিস্টান করতে শুরু করেন। এরা বুঝেছিলেন যে এদেশের ভাষা না শিখলে বিধর্মীদের সহজে খ্রিস্টান করা যাবে না। তাই পাদরি কয়েকজন বাঙলাভাষা শেখেন (পর্তুগীজ শব্দ PADRE থেকে পাদরি)।

রবীন্দ্রনাথ একদা যেমন ইংরেজদের (এই ইংরেজ শব্দটিও পর্তুগীজ INGLES শব্দ থেকে পাওয়া) 'বড়' ও 'ছোট' শ্রেণীভেদ করেছিলেন তেমন পর্তুগীজদেরও করা যায়। অত্যাচারী জলদস্যু 'হার্মাদ' (এই শব্দটি পর্তুগীজ শব্দ ARMADA থেকে নেওয়া) ছাড়া এমন পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক মিশনারিও ছিল যাদের হাত ধরে বাঙলা ভাষায় বহু পর্তুগীজ শব্দ, পোষাক পরিচ্ছদ, রীতিনীতি এদেশে এসেছে। সুধীরকুমার মিত্রের মতে 'এমন কি তাহাদের রক্ত পর্যন্ত অদ্যাপি বঙ্গদেশে বিদ্যমান'।[৫]

মালয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাষাগুলি থেকেও পর্তুগীজরা কিছু কিছু শব্দ শুধু বাঙলায় নয় ভারতীয় ভাষাগুলিতে এনে দিয়েছে। যেমন, কিরিচ, গুদাম। গুদাম আমাদের দেশে নিশ্চয় এই পর্তুগীজরা আসার আগেও ছিল কিন্তু এই বিশেষ শব্দটি তারাই এনেছে মালয় ভাষার শব্দ গোডং (GODONG) থেকে। কেউ কেউ বলেন আমরাই নাকি শব্দটিকে গোডাউন (GODOWN) বানিয়ে ইংরেজী ভাষায় যোগ করার সুযোগ করে দিয়েছি।[৬]

শুধু ভাষাই নয়, পর্তুগীজরা আমদানী করেছে বহু ফুল ফল গাছ এবং নামগুলিও। যেমন আতা, আনারস, ওলন্দা, কপি, কাজু, নোনা, পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদি। কতকগুলো নামকরণ আবার এদেশেই

হয়েছে। আলু পর্তুগীজরা আমদানী করলেও নামটি এদেশীয়। আমেরিকা থেকে পর্তুগীজদের আনা আর কয়েকটি ফুল-ফলের এদেশী নাম হল : কামরাঙা, কৃষ্ণকলি, ভুট্টা, লঙ্কা প্রভৃতি। পর্তুগীজ নামগুলি প্রচলিত হওয়ার আগে বাঙলা ভাষায় ঐসব জিনিসের দেশী নামগুলি কি ছিল তা জানা যায় মানোজল দা আস্‌সুম্পসাউ -এর ব্যাকরণ অভিধান VOCUBULARIO EM IDIOMA BENGALLA E PORTUGUEZ থেকে। বইটি ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। রোমান অক্ষরে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে ছাপা হয়। তখনও ছাপার অক্ষরে বাঙলা হরফের ব্যবহার শুরু হয় নি।[১]

আস্‌সুম্পসাউ-এর ঐ বইটির বাঙলা অনুবাদ করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন। বইটি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রমারা নামে এক রকমের তাস খেলা পর্তুগীজরা এদেশে আনে। এই খেলার পাঁচটি শব্দ প্রমারা, কোরেস্তা, তেরেস্তা, ফিক্রু ও বিস্তি পর্তুগীজ ভাষা থেকে নেওয়া।

বাঙলা সাহিত্যে পর্তুগীজ শব্দের অজস্র ব্যবহার ঘটেছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা 'খনার বচন' প্রসঙ্গে, হুতোম প্যাঁচার নকশা-য়, সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনায়, ভারতচন্দ্রের কাব্যে, রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিতে; কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ সকলেই কোন না কোন রচনায় এই পর্তুগীজ শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু পর্তুগীজদের ঔদ্ধত্য, খ্রিস্টধর্ম প্রচারে নানান অপচেষ্টা, নারী ও শিশু অপহরণ ও দাস ব্যবসা, জলদস্যুবৃত্তি স্থানীয় শাসকদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর প্রথমে তাদের কিছু বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়েছিলেন; পরে বাধ্য হয়ে সে সব সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করে নেন। শাহ্‌জাহানের সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের উৎপাতে বাঙলার জলপথে নৌচলাচল বিঘ্নিত। এমন কি বাদশাহজাদী মমতাজের দুই বাঁদীকেও নাকি তারা হরণ করে হুগলিতে রাখে। এই সব কারণে বিরক্ত বাদশাহের নির্দেশে বাঙলার সুবেদার কাশিম খাঁ ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ ঘাঁটি হুগলি অবরোধ করেন। পরিণামে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পর্তুগীজরা হুগলি ছেড়ে সাগরদ্বীপে পালাতে বাধ্য হয়। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে হুগলিতেই প্রথম ইউরোপীয়দের সঙ্গে স্থলযুদ্ধে ভারতীয়দের জয়লাভ ঘটে। পর্তুগীজরা উচিৎ শিক্ষা লাভ করে।

তবু পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনায় পর্তুগীজ জেসুইট মিশনারিদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। পর্তুগীজ দলিল অনুসারে দু-জন জেসুইট ফ্রান্সিস্‌কো ফার্নাণ্ডেজ এবং ডোমিনিগো ডি সুজা ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে হুগলিতে উপস্থিত হন। তাঁরা একটি বিদ্যালয় এবং একটি চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এমন কি তারা গোয়ার অন্তর্গত সান্তা ফে-র বিশাল জেসুটি কলেজ "কলেজ অফ সাও পল্‌স" এ- বাঙালী ছাত্রদের শিক্ষার জন্য পাঠাতেন। ফাদার এইচ জেসন, এস জে পাঁচজন ছেলেমেয়ের নাম করেছেন যাঁরা সান্তা ফে-র কলেজে ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই তথ্যটি পাওয়া যায় WEST BENGAL DISTRICT GAZETTEERS HOOGHLY, 1972 গ্রন্থটির 521 পৃষ্ঠায়। তথ্যটি অবশ্য গ্রহণযোগ্য হলেও তারিখ বিভ্রাট সুস্পষ্ট। দুই জেসুইটের উপস্থিতি ঘটেছে ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে। তার চল্লিশ বছর আগে কী করে বাঙালী ছাত্রদের কলেজ অফ সাও পলস্ -এ ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে পাঠানো যেতে পারে? হয় দুটি ঘটনা ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দেই, নয় ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিল। তদানীন্তন বহু লেখক হুগলিতে স্থাপিত একটি জেসুইট কলেজ -এর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেগুলি ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই অবলুপ্ত। এর ধ্বংসাবশেষ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে পাওয়া যায়। তা ছাড়া পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে

"PUBLIC SCHOOL AND NUNNERY OF MISCARDIA" নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। তা ছাড়া ব্যান্ডেলে ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি কলেজকে কনভেন্ট স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়, যেটি আরো পরবর্তীকালে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে 'সেন্ট জন্‌স এস. ই. স্কুল' নামে পরিচিত। এ অঞ্চলের গরীব ছেলেদের শিক্ষার জন্যই এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। তবে এক বিশেষ গোষ্ঠীর খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা প্রচারের জন্যই এই সব ব্যবস্থা। পর্তুগীজ দুর্গের ভেতরে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে মুঘলদের হাতে গির্জাটি ধূলিসাৎ হলেও সন-তারিখ-চিহ্নিত ফলকটি অটুট থাকে। সেটি গোমেজ দ্য সোতো নামে পর্তুগীজ বণিক ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে নব নির্মিত চার্চ সংলগ্ন মাঠের পূবপ্রান্তের প্রবেশ পথে স্থাপিত করেন। Nossa Senhora di Rozario বা Our Lady of the Rosary-র নামে উৎসর্জিত এই দক্ষিণ - উত্তরে বিস্তৃত চার্চ - ভবনটির সম্মুখে ক্রশ বাহিত শিখরের নীচে রয়েছে মূল অলিন্দটি। অলিন্দের ভিতরে আছে শিশু কোলে কুমারীমাতার মর্মরমূর্তি। তার নীচে সাজানো আছে একটি ছোট জাহাজ। জাহাজডুবি ও মর্মরমূর্তির উদ্ধার-কাহিনী স্মরণে এটি এক জাহাজের কাপ্তেনের ভক্তি-উপচার। গির্জার সামনে আজও অটুট রয়েছে সেই জাহাজের মাস্তুল যে জাহাজটি বঙ্গোপসাগরের ঝড়ের মুখে পড়েও আজ থেকে সাড়ে তিন শো বছরেরও আগে মেরী মাতার কৃপায় রক্ষা পায়। এই সুপরিচিত ও অতি প্রিয় সুবিশাল উপাসনালয়ে চারটি উৎসব প্রতি বছরে আয়োজিত হয়। মে মাসে Feast of the Blessed Lady of Happy Voyage, আগস্ট মাসে Feast of Saint Augustine, নভেম্বরে Feast of the Blessed Lady of Rosary আর Ash Wednesday থেকে Easter Eve অবধি চল্লিশ দিন উপবাসে ও সংযত আহারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়। দূর-দূরান্তর থেকে সব ধর্মের মানুষ ডিসেম্বরের খ্রিস্ট-উৎসবে এখানে সমবেত হন সপরিবারে, চড়ুইভাতিতে মাতেন অনেকেই।

৩

পর্তুগীজদের ভারতে আসার প্রায় এক শো বছর পরে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে একে একে ডাচ বা ওলন্দাজ (এই শব্দটি পর্তুগীজ HOLLANDEZ থেকে এসেছে), ডেন বা দিনেমার, ইংরেজ ও ফরাসিরা ক্রমান্বয়ে চুঁচুড়ায়, দিনেমারডাঙা ও শ্রীরামপুরে, হুগলি-চুঁচুড়ায় ও চন্দননগরে বাণিজ্য ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারে আসে। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে 'ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অফ দি নেদারল্যান্ডস (ডাচ ভাষায় Ostindiche Vereenigde Companie) নামে একটি কোম্পানী গঠন করে পর্তুগীজদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পূর্ব ভারতে ওলন্দাজরা ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নেয়। পর্তুগীজরা ওলন্দাজদের ঠেকিয়ে রাখতে পারল না নিজেদের ভুলে নানাবিধ দুষ্কর্মে।

এক হাতে মোগলেরা পর্তুগীজদের রুখলেও আর হাতে সম্রাট শাহ্‌জাহান চারটি ফারমানের হুকুমনামায় ১৬৩৫ থেকে ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাণিজ্য করার অধিকার তুলে দিলেন ডাচেদের হাতে। তাদের ব্যবসায়ের লক্ষণীয় উন্নতিতে আর ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় ফৌজদার ইসলাম খানের চুক্তিতে উৎসাহিত হয়ে সরাসরি ওলন্দাজদের ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র বাটাভিয়ার পরিচালনায় সৃষ্ট হল একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ। যেহেতু হুগলি বন্দরই হল বাঙলার একমাত্র বন্দর যেখানে যে কোন অবস্থাতেই জাহাজগুলি মাল বোঝাই বা মাল খালাসের জন্য ভিড়তে বাধ্য হত সেহেতু পরের বছরে প্রধান কারখানাটি এখানে সরিয়ে নিয়ে আসা হল। বার্ষিক পনেরোশো চুয়াত্তর টাকার খাজনার বিনিময়ে চুঁচুড়া, বরানগর আর বাজার মির্জাপুর ওলন্দাজদের হাতে লীজ (Lease) হিসাবে তুলে দেওয়া হল। সার্জেন গার্সিন এর Chinchora আজ কখনো চন্দ্রবিন্দুশোভিত কখনো বা চন্দ্রবিন্দু বর্জিত 'চুঁচুড়া'।

ইউরোপীয় বণিক হলেও পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের আচার আচরণে জাতিগত ভেদ সুস্পষ্ট। প্রথমত এরা বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষায় অহেতুক জলদস্যুতা, দাসব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল না। দ্বিতীয়ত স্থানীয়

অধিবাসীদের 'বিধর্মী'দের খ্রিস্টীয় সুসমাচার শুনিয়ে ধর্মান্তরকরণে মত্ত হয় নি। তবে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় ও স্বার্থরক্ষায় পর্তুগীজদের মতই দুর্গ নির্মাণ করেছে।

ওলন্দাজদের এই দুর্গ গড়ে ওঠে ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে। ওই নির্মাণকালটি পর্যটক স্টাভোরিনাস-এর মতানুসারে। তবে এই দুর্গটি সম্ভবত পুনর্নির্মিত হয় বারে বারে। "কারণ ওলন্দাজ দুর্গের উত্তরদিকে '১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ' এবং দক্ষিণ দিকের ফটকে '১৬৯২ খ্রিস্টাব্দ' এই সাল দুইটি লিখিত ছিল।" এই দুর্গটি ঘন্টাঘাট থেকে কাছারি ঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দুর্গটি Fort Gustaves নামে সুপরিচিত। এই দুর্গটির নির্মাণকার্য অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে পরিদর্শন করে পর্যটক Gautier Schouten লিখেছেন— "There is nothing in it more magnificent than the Dutch Factory. It was built on a great space at the distance of a musket shot from the Ganges, for fear that, if it were nearer, some inundation of the waters of the river might endanger it or cause it to fall. It has more the appearance of a large castle than a factory of merchants. The walls are high and built of stone and the fortifications are also covered with stone. They are furnished with canon, and the factory is surrounded by ditches full of water. It is large and spacious. There are many rooms to accommodate the Director, the other officers who compose the council and all the people of the company. There are large shops built of stone, where goods that are brought in the country and those that our vessels bring there are placed."

Thomas Bowrey বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের একজন Sailing Master ছিলেন। তাঁর লেখা A Geographical Account of the Countries round the Bay of Bengal (1669-1679) বইটিতে ওলন্দাজদের নামে ঐ Factory'র কাজে Castle টিকে 'The largest and completest factories in Asia' রূপে চিহ্নিত করেছেন। এই ফ্যাক্টরির গেটে একটি ঘড়ি ছিল যার সম্পূর্ণ বিবরণটি দীর্ঘ হলেও প্রাসঙ্গিকতার কারণে উদ্ধৃত করতেই হয় : " মুসলমানদের সময় জানবার একটা অদ্ভুত উপায় আছে, আর এটা ইয়োরোপের প্রণালী থেকে একেবারে ভিন্ন। এরা কোন সূর্য ঘড়ি, ঘড়ি বা টেঁক ঘড়ি বা বালির ঘড়ি ব্যবহার করে না। কারণ আমার মনে হয় এরা এগুলি বানাতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা সময় জানাবার একটা বেশ ভাল উপায় বার করেছে।

প্রথমে এরা খুব বড় একটা বাসনে পরিষ্কার জল রাখে, আর তারপর ছোট একটা তামার বাটি, যাতে আধ পাইন্ট বা এক পাইন্ট জল ধরে, সেই জলে ভাসিয়ে দেয়। বাটিটি খুব পাতলা চাদরের তৈরি, আর তার তলায় একটি ছোট ফুটো। বাটিটি আস্তে আস্তে জল ভরে গিয়ে ডুবে যায়। এটিকে দেখবার জন্য সামনে লোক বসে থাকে। সে তখনি আবার এটিকে ভাসিয়ে দেয় আর একটা ঘন্টা বাজায়। যখন আবার ডোবে, তখন দুবার ঘন্টা বাজায়। এমনি করে ৩,৪,৫,৬,৭। সাতটা বেজে যাবার পর সে তার পরের বারে একবার ঘন্টা বাজায়, অর্থাৎ তখন এক প্রহর (Pore) হ'ল। তারপর যখন আবার বাটিটি ডোবে তখন সে আবার একবার ঘন্টা বাজায় অর্থাৎ এক ঘড়ি (Gree)। দুই প্রহর মানে মধ্যাহ্ন বা মধ্য রাত্রি। সকাল নটায় এক প্রহর মধ্যাহ্ন, বারটায় দুপ্রহর, বিকেল তিনটের তিন প্রহর, আর সূর্য ডোববার সময় চার প্রহর। রাত্রেও এই নিয়ম। এদের ঘন্টা বেলের (Bell) মত নয়, মুসলমানদের বেল নেই এদের ঘন্টা পেগুর কাঁসা (gans of Pegu) বলে এক রকম ভাল কাঁসার তৈরি চাকতি। দেড় ফুট বা দু ফুট বা তার চেয়েও বড়। এগুলি এক পাশে একটি ফুটোর মধ্যে দিয়ে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে

দেওয়া হয়। এর নাম গংগ (gonge)। ছোট একটি কাঠের হাতুড়ি দিয়ে এটা পেটা হয়... ইংরেজ আর ওলন্দাজরাও ... তাদের ফ্যাক্টরির গেটে এইরকম ঘড়ি রাখে।"

ওলন্দাজদের নির্মাণ কার্যের কিছু স্মারক আজও বর্তমান। তার মধ্যে বর্তমান বর্ধমান বিভাগীয় কমিশনারের সরকারী বাসভবনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাগীরথী নদীর ঠিক ওপরেই এই দ্বিতল ভবনটি স্টাভোরিনাস-এর মতে ওলন্দাজ গভর্নর Sichterman ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। যে ফলকটি ওলন্দাজ দুর্গের সিংহদ্বারে স্থাপিত ছিল সেটি পরে এই ভবনটির সিঁড়ির কাছে স্থাপিত হয়। ওলন্দাজ উপনিবেশবাদীদের প্রাচীনতম নিদর্শন এই ফলকটিতে লেখা আছে, 16 OVC87 বা Ostindiche Vereenigde companie 1687 অর্থাৎ ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬৮৭। এই দুর্গটির নির্মাণ কাল একাধিক পাওয়া যায়।

সরকারী সার্কিট হাউস আর ঐতিহ্যসমৃদ্ধ হুগলি কলেজের বা হুগলি মহসীন কলেজের মাঝে ভাগীরথীতীরে ছিল প্রাচীন ওলন্দাজ গির্জা যেটি ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজ গভর্নর Sir G. Vernet নির্মাণ করান। গভর্নর Sichterman এই চূড়া আর ঘন্টা ঘড়ি নির্মাণে সাহায্য করেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের সাইক্লোনে চূড়াটি নষ্ট হয়; ঘন্টা ঘড়িটিও নষ্ট হয়। ভাগীরথী নদীতীরবর্তী ঘাটটি আজও 'ঘন্টাঘাট' নামে সেই ঘড়ি - ঘন্টাটিকে স্মরণ করে। এই গির্জাতে রক্ষিত ছিল কয়েকজন ওলন্দাজ গভর্নর ও তাঁদের পত্নীর তৈলচিত্রগুলি। এই ঘন্টাঘাটটি নিয়ে যে ছড়াটি একদা বহুশ্রুত ছিল সেটিও উল্লেখযোগ্য —

কে বলে রে বেনে বুড়ি গিয়েছিল বৃন্দাবন?
'ঘন্টা-ঘাট' -এর 'গির্জা' দেখে বলে গিরি-গোবর্ধন॥

চুঁচুড়ার প্রাচীন ইতিহাসসমৃদ্ধ অঞ্চল ধরমপুর ও মিঞাবেড়ের মাঝে আছে ওলন্দাজদের কবরভূমি। আকর্ষণীয় বড় কবর রয়েছে যার স্থাপত্যশিল্প বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এমন অনেক শিল্পকর্মে ইঁটের খিলানেই স্থাপিত আছে মৃতদেহ — যেগুলি মাটির নীচে আর প্রোথিত করা হয় নি। Sir Cornelius Jonge মারা যান এখানে ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর কবরটিই সম্ভবত প্রাচীনতম। শেষ ডাচ গভর্নর Daniel Overbeck (১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ) চিরশয্যায় এখানে শয়ান।

চুঁচুড়া ও চন্দননগরের মধ্যবর্তী গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পূর্বে তালডাঙা অঞ্চলে আছে একটি বড় ওলন্দাজ কবরস্থান। এ কবরটিতে শায়িত আছেন এক ওলন্দাজ মহিলা, যাঁর ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে মৃত্যু ঘটে। তাঁর এই স্মৃতিসৌধে প্রতিষ্ঠিত একটি ফলকে ওলন্দাজ ভাষায় লেখা আছে :

TER GEDAGTENIS
Van
SUSANNA ANNA MARIA YEATS
GEBOORE VERKERK
obit
Den 12, May, Anno 1809

এই ওলন্দাজ মহিলা ২১ শে নভেম্বর ১৮০৫ তারিখে লিখিত শেষ ইচ্ছাপত্রে (will) একটি ট্রাস্টের মাধ্যমে চার হাজার টাকা গচ্ছিত রাখেন যার সুদে তাঁর ও তাঁর দুই স্বামীর কবরের প্রয়োজনীয় পৌনঃপুনিক সংস্কার সাধন ও তার পরে অবশিষ্ট টাকায় তদানীন্তন ওলন্দাজ সরকার প্রতিষ্ঠিত "চুঁচুড়া

দুঃস্থ ভান্ডার" থেকে ওলন্দাজ উপনিবেশের চৌহদ্দি মধ্যে বসবাসকারী গরিব মানুষকে সাহায্য করা হবে।

এছাড়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় তাঁর অথবা অন্যের লেখা কবিতা ঐ ফলকের শেষে ওলন্দাজ ভাষায় লিখিত আছে। অনুবাদসহ মূল প্রাপ্ত কবিতাটি উদ্ধৃত করা হল :

I leg in het greft zonder gekley	I rest in my bed without compliments
En rust daar tot der Jongster dag	I will rest here till the day of Judgement.
Dan zuutgy Heer myn graft ontdekken	Then thou, my Lord, will discover my grave
En my ter Eeuwige vreugd verstrekken	And give me eternal Joy.

পনেরো ফুট উঁচু গম্বুজ ও চূড়াবিশিষ্ট এই স্মৃতিসৌধে শায়িতা ওলন্দাজ মহিলা সুসান্না আন্না মারিয়া ইয়েট্‌সের নামটি এই এলাকায় বিকৃত হয়ে লোকমুখে 'সাত সাহেবের বিবির গোর' নামে উল্লেখিত হয়ে থাকে।

'ডাচ ভিলা' নামে ওলন্দাজদের নির্মিত প্রাসাদোপম বাড়িটি আজও সেই Gustavus কুঠির চিহ্নহীন 'কুঠির মাঠ'-এর পশ্চিমে দাঁড়িয়ে আছে। এখন এটি মন্ডলদের পারিবারিক বাসগৃহ।

ওলন্দাজদের শাসনকালে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত যে ভবনটি ভাগীরথীতটে আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে সেটির নির্মাতা ছিলেন মঁসিয়ে পেরন নামে 'মহারাষ্ট্রীদের কার্যে নিযুক্ত' এক ফরাসি সৈনিক। এর নির্মাণ কার্যে ওলন্দাজ নির্মাণশৈলী প্রভাবিত। এটি প্রাণকৃষ্ণ হালদার ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ও জগমোহন শীল -এর হাত বদল হয়ে হুগলি কলেজ বা হুগলি মহসীন কলেজে রূপান্তরিত। এ কাহিনী দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী' কাব্যে ছন্দোবদ্ধ করেছেন :

চন্দ্রমা মাধুরী ধরি চুঁচুড়া নগরী
জল-কেলি-আশে যেন উপকূলোপরি
সুরূপা রমণী এক ভঙ্গিমার সনে
দাঁড়াইয়ে আভাময়ী সহাস-বদনে —
কাঞ্চন-কলস কক্ষে কালেজ ভবন,
পূর্বকালে প্রাণকৃষ্ণ-নৃত্য নিকেতন।

চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ কৌশল আজও আধুনিকতম বাস্তুবিজ্ঞানের কাছে বিস্ময়কররূপে সক্রিয় রয়েছে. ওলন্দাজ আমলে আঠারো ইঞ্চি নয় ২১ ইঞ্চিতে এক হাত মাপ ধরা হত। এই মাপকে "RYNLAND" মাপ বলা হত।

বিশাল বাড়ী ও সংলগ্ন বাগান নির্মাণে ওলন্দাজদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। কৃষিকাজে তাদের দক্ষতা স্বীকৃত। এক বিশেষ ধরণের কড়াইশুঁটির চাষ এদেশে তারাই প্রথম করে। তাদের নামানুসারে সেটি 'ওলন্দাশুঁটি' নামে পরিচিতি। চুঁচুড়ায় শাক-শব্জীর বাগান তাদের হাতে এমন অতিরিক্ত উৎপাদন করে যে সেগুলি তারা বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর লাভবান হয়।

ওলন্দাজেরা স্বভাবে মিশুক ছিলেন। ইংরাজদের সঙ্গে তারা বাদশাহী ও নবাবী স্থানীয় অভিশাসনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে ও বাণিজ্যিক স্বার্থে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরূপে ইংরাজদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। ইংরাজরা 'ওলন্দাজ রমণীদের' সঙ্গে নাচ-গানের টানে চুঁচুড়ায় আসতেন। বাঙলায় প্রথম ইংরাজ গভর্নর উইলিয়াম হেজ ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজ গভর্নরের আতিথ্য

গ্রহণে চুঁচুড়ায় আসেন। এমন কি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট মিস্টার গাইফোর্ডের সঙ্গে মতান্তর থেকে মনান্তর ঘটলে ওলন্দাজ ডিরেক্টরের কোয়ার্টার্সে কিছু দিন অবস্থানও করেন।

উইলিয়ম হিকির স্মৃতিকথা (১৭৭৭-১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ওলন্দাজ বা ডাচেদের ওপর মোগল বাদশাহের রীতিনীতির প্রভাবের একটি আকর্ষণীয় তথ্যচিত্র পাওয়া যায় : "..... গেলাম চুঁচুড়ায়, বাঙলা দেশের (বর্তমানে বাঙলা দেশ পররাষ্ট্র - লেখক) ডাচ উপনিবেশে। তখন গভর্নর ছিলেন মিঃ রোজ। হল্যান্ডে জন্ম হলেও তাঁর পিতা ছিলেন স্কচম্যান। ডাচ গভর্নরও ঠিক নবাবের মত বাস করতেন চুঁচুড়ায়। মধ্যে মধ্যে তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের সভা বসত তাঁর বাড়িতে এবং সভার শেষে কেউ তাঁর দিকে পিছন ফিরে যেতে পারত না। অর্থাৎ ফিরে যাবার সময় তাঁরা মাথা হেঁট করে হাত তুলে সেলাম করতে করতে যেতেন।"

সেকালে ওলন্দাজ গভর্নরবৃন্দ বিলাসিতার জন্য 'বিশেষ প্রসিদ্ধ' ছিলেন। তাঁদের সংসার খরচে লাগত বছরে এক লক্ষ টাকা। 'তাঞ্জাম' নামে তাঁদের এক পাল্‌কি ছিল। তার মধ্যে বসার জন্য চেয়ার থাকত। এই 'তাঞ্জাম' একমাত্র গভর্নর ছাড়া আর কারো ব্যবহার করবার অনুমতি ছিল না। গভর্নর মাঝে মাঝে নগর ভ্রমণ করতেন। সে সময় তাঞ্জামের আগে আগে ব্যান্ড পার্টি ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে এগিয়ে গভর্নরের তাঞ্জামের পথ করে দিত। রূপার দন্ড হাতে থাকত ছজন চোপদার।

তাঁদের বিশাল বজরাও জলপথে ভ্রমণের জন্য ছিল। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজ ডিরেক্টর কলকাতায় ইংরাজ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তার বিবরণ দিয়েছেন ওলন্দাজ এডমিরাল স্ট্যাভোরিনাস, যিনি এ সময়ে চুঁচুড়া পরিদর্শনে আসেন। সেই বিশাল বজরার প্রকোষ্ঠে ছত্রিশ জন এক সঙ্গে ভোজে বসতে পারতেন। তার সঙ্গে আরো কয়েকটি বজরা থাকত। একটিতে থাকত জিনিসপত্র, অন্যটিতে হত রান্নাবান্না। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে উনিশবার তোপধ্বনি দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয় আর সেখানকার পরিষেবকদের বখশিস দিতে ওলন্দাজ ডিরেক্টরের খরচ হয়েছিল মাত্র এক হাজার টাকা।

ওলন্দাজ গভর্নরের ব্যবহারের জন্য টানা পাখার প্রথম প্রচলন এই চুঁচুড়াতে হয়। বড় বড় তালপাতার পাখার প্রথম ব্যবহার এখানে তাঁরাই করেন। তা ছাড়া ওলন্দাজদের বাড়িতে বেতের জাফ্‌রি লাগানোর ব্যবস্থাও ছিল।

চুঁচুড়ায় বসবাসকালে বহু ওলন্দাজ বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করেন। তাদের বংশধরেরা হুগলির কালেক্টরের পেন্‌সন ভোগ করেছেন।

টয়েনবি লিখেছেন যে ওলন্দাজেরা ধর্মের ব্যাপারে একটু উদাসীন থাকতেন। তাঁদের গির্জা নির্মাণের পরে বহু বছর কোন যাজক ছিলেন না। "Service was performed by a Ziekentrooster (comforter of the sick) who was not in holy orders" আর নবজাতকদের খ্রিস্টধর্মভুক্ত (Christerned) করার জন্য কলকাতা থেকে পাদ্রী (এ শব্দটি পোর্তুগীজ Padre শব্দ থেকে পাওয়া) আনাতেন চুঁচুড়ার ওলন্দাজেরা।

তাঁদের স্মৃতিচিহ্নরূপে চুঁচুড়ার গ্রাম্য দেবতা ষণ্ডেশ্বরদেবের মন্দিরে আজও একটি ব্রোঞ্জের পঞ্চমুখ আর একটি পিতলের ঢাক সুরক্ষিত। এগুলি ঘিরে একটি কাহিনী গড়ে উঠেছে যেটি স্থানীয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। সেটি হল : "১৮০৩ সালে ঘনশ্যাম হালদার (ষণ্ডেশ্বর দেব মন্দির প্রতিষ্ঠাতা দিগম্বর হালদারের বংশধর) যখন গাজন পূজা করেন ঐ সময় এক বিপদ দেখা যায়। সেই সময় ডাচ (বা ওলন্দাজ) গভর্নমেন্টের চুঁচুড়ার কমিশনার J. M. BIRCH ঘনশ্যামকে বারবার ঢাক

বাজাইতে নিষেধ করেন। ঘনশ্যাম আদেশ অমান্য করিলে তিনি চড়কের দিন স্বয়ং আসিয়া বলেন "আমার দেওয়া এই বাণের উপর ঝাঁপ দিতে হইবে। যদি সন্ন্যাসী অক্ষত থাকে তবে ষণ্ডেশ্বরকে রাখিব, নচেৎ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিব।" ঘনশ্যাম নির্ভয়ে ষণ্ডেশ্বরের আপৎকালীন বিশেষ মন্ত্র জপ করিয়া ঝাঁপ দিবার আদেশ দেন। ষণ্ডেশ্বর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি শ্বেতমক্ষিকারূপে বাণের উপর বসিলে সন্ন্যাসী যেন ঝাঁপ দেয়।' কমিশনার ঘনশ্যামকে নানা ভয় দেখান এবং বলেন "যদি সন্ন্যাসীর মৃত্যু হয় তবে তাঁহার সম্মুখে তাঁহার (তোমার -?) পুত্রকে বধ করা হইবে।" কিন্তু ঘনশ্যাম কোন ভয় পান না, তাঁহার কথামত সন্ন্যাসী নির্ভয়ে ঝাঁপ দিলে ঐ বাণ ভাঙ্গিয়া তিন টুকরা হইয়া যায়। ইহাতে কমিশনার খুব ভীত হন এবং ষণ্ডেশ্বরকে একটি ব্রোঞ্জের পঞ্চমুখ ও একটি পিতলের ঢাক উৎসর্গ করেন।"

ডাচদের সহযোগিতা প্রসঙ্গে আরো কিছু তথ্য পাওয়া যায় ফরাসি পর্যটক JEAN BAPTISTE TAVARNIER -এর ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে বাঙলা পরিদর্শনকালে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২রা মার্চ অবধি তাঁর অভিজ্ঞতার কথায় : " ১৭ তারিখে আমি ওলন্দাজদের দেওয়া ১৪ দাঁড়ের নৌকাতে হুগলি রওনা হলাম। ..... ২০ তারিখে আমি হুগলি পৌঁছলাম। সেখানে আমি ২রা মার্চ অবধি ছিলাম আর এই সময় আমি ওলন্দাজদের অতিথি ছিলাম। এই দেশে যা কিছু আনন্দ সম্ভব ওরা তা আমাকে দিতে চেষ্টা করেছিল। কয়েকবার আমরা নদীতে বেড়ালাম। ইউরোপে যত রকম সুস্বাদু শাকসবজি পাওয়া যায় সেই সব খেতাম। কয়েক রকম স্যালাড, বাঁধাকপি, অ্যাসপারাগ্যাস, মটর, নানা জাতের জাপান থেকে আমদানি করা বীজের সীম তার মধ্যে ছিল। ওলন্দাজরা তাদের বাগানে নানা জাতের শাকসবজি সযত্নে চাষ করে, তবে অনেক চেষ্টা করেও তারা আর্টিচোক (Artichoke) ফলাতে পারে নি। ২রা মার্চ হুগলি ছেড়ে ৫ তারিখে আমি কাসিমবাজারে পৌঁছলাম।"

Du Bois-র LIVES OF THE GOVERNORS GENERAL OF THE DUTCH গ্রন্থে সংযোজিত CHINSURA AS IT WAS IN 1721 এই স্কেচ ম্যাপ (সংযোজিত) থেকে জানা যায় যে দড়ির সেতু, হাসপাতাল, ঘোড়া ছাড়াও হাতির আস্তাবল, জেল, কবর, বাজার, গোলন্দাজ (Artillery) -দের ব্যারাক, শস্যভাণ্ডার, ডাক্তার-বাড়ি, মন্ত্রণাগৃহ -এসবই ছিল। তার সঙ্গে ছিল চার-পাঁচটি বাগান। দুটি দুই ডিরেক্টরের। দীঘিও ছিল।

কিন্তু এখানে ওলন্দাজ-ইংরাজের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হত তাদের মূল ভূখণ্ড ইয়োরোপের ইতিহাসের ধারায়। ২৫ শে নভেম্বর ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে বিদেরার যুদ্ধে ওলন্দাজদের হার মানতে হল। ৭ মে, ১৮২৫ হস্তান্তর চূড়ান্ত হল। হুগলিসহ চুঁচুড়া ইংরাজের দখলে এল।

৪

ইউরোপীয় বণিক তথা উপনিবেশবাদীদের ক্রিয়াকাণ্ড : এক হাতে বাণিজ্য, অন্য হাতে ধর্মপ্রচার। তাদের কীর্তিচিহ্ন : একদিকে কুঠি-দুর্গ, অন্যদিকে সমাধিস্তম্ভ-গির্জা।

আর্মেনিয়নরা আর কি রেখে গেছে জানা না গেলেও ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত গির্জাটিতে তাদের উত্তরপুরুষেরা আজও প্রতি বছর ২৫শে জানুয়ারি (ডিসেম্বর নয়) আসেন 'জন দি ব্যাপটিস্টের' স্মরণে উপাসনায়। চুঁচুড়ার আর্মানিতলায় আর্মেনীয় স্থাপত্যের ঐ নিদর্শন বাঙলার দ্বিতীয় প্রাচীনতম গির্জা। খোয়াজা জোসেফ মার্গার এর নির্মাতা। তাঁর পিতা খোয়াজা জোহানিজের মৃতদেহ এই চার্চের পাশেই সমাধিস্থ। ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এটিই প্রাচীনতম সমাধিস্তম্ভ।

পরবর্তী প্রসঙ্গ ইংরাজ ও ফরাসি উপনিবেশবাদীদের কথা বিস্তৃতভাবে এই সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন

প্রবন্ধে আলোচিত। পুনরুক্তি দোষ এড়াতে ঐ দুই উপনিবেশবাদীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গ এখানে থাক অনুক্ত, অনালোচিত।

৫

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের মধ্যে এক পর্তুগীজ ছাড়া অন্য সব জাতিই - ওলন্দাজ, ফরাসি আর দিনেমার একটি করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।

১৬১২ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠে দিনেমার বা Danes-দের DANISH EAST INDIA COMPANY। তখন ডেনমার্কের সিংহাসনে সম্রাট চতুর্থ খ্রিস্টিয়ান প্রতিষ্ঠিত। তখন ডেনমার্কের অধীনে ছিল জার্মানীর সেলজউইগ ও হোলস্টাইন প্রদেশ। তা ছাড়া ছিল সুইডেন আর নরওয়ে। দিনেমারদের দেশটি ছিল সমুদ্রে ঘেরা। ওলন্দাজদের মত তারাই তাই কৃষিকাজের সুযোগ না পেয়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে একরকম বাধ্য ছিল।

ভারতে তারা প্রথম বাণিজ্য করতে আসে, কুঠি নির্মাণ করে দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুরে। ফরাসিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভাল ছিল; তাই দেখা যায় ফরাসী উপনিবেশগুলির কাছে কাছেই তাদের উপনিবেশগুলি। যেমন কারিকলের পাশে ত্রিবাঙ্কুর, চন্দননগরের পাশে দিনেমারডাঙা। ডেনস্‌দের 'দিনেমার' নাম ভারতে প্রচলিত হয় ফরাসিদের মুখ থেকে। আর ফরাসিদের উপনিবেশ চন্দননগরের দক্ষিণে দিনেমারডাঙায় বাণিজ্য পত্তন করল, কুঠি নির্মাণ করল তারা। ঐতিহাসিক স্টুয়ার্টের মতে সে হল ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দের কথা। তখন শায়েস্তা খাঁ বাঙলার সুবাদার।

দিনেমার বণিকেরা বাণিজ্যেই মন দেয়। আমদানি-রপ্তানি দুইই করত। তবে রপ্তানিতেই তাদের আগ্রহ ছিল বেশি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন লক্ষ্যই তারা গড়ে তোলে নি কোন সময়ে। প্রধান প্রধান যে জিনিসগুলি তারা রপ্তানি করত সেগুলি হল আফিম, সোরা, তুলাজাত ও রেশমজাত কাপড়।

তা ছাড়া সে যুগে জাহাজ বলতে পালতোলা জাহাজই বোঝায়। সেসব জাহাজের জন্য প্রচুর দড়াদড়ির দরকার হয়। তার চাহিদা অপরিহার্য. সে কথা বুঝে দিনেমাররা উন্নত প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্থানীয় কর্মীদের সাহায্যে তৈরি দড়ি দেশ-বিদেশে বিক্রির ব্যবস্থা করে।

টয়েনবি সাহেবের মতে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথমে হুগলী জেলায় নীলের চাষ হয়। মি. প্রিন্সেপ (Mr. Princep) সর্বপ্রথম নীলের কারবার শুরু করেন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ১৭ মার্চ তারিখে 'কলিকাতা গেজেট'-এ চুঁচুড়া চন্দননগরের মাঝে 'মুন্সিগঞ্জ'-এ Mr. Blume -এর নীলকুঠি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় ঐ স্থানে একটি নীলকুঠি সক্রিয় ছিল। বাঁশবেড়িয়াতেও একটি নীলকুঠি ছিল। এসব তথ্য সুধীর কুমার মিত্রের 'হুগলী জেলার ইতিহাসে' মিললেও 'পূর্ব ভারতে নীলচাষের পথিকৃৎ হিসাবে ফরাসি বংশভূত লুই বেনো'র নামোল্লেখ করা হয় নি। একটি প্রবন্ধে অধ্যাপক শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'বলা হয় উত্তর চন্দননগরের তাউৎখানার বাগানে প্রথম নীলকুঠি স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে লুই বেনো সাহেব দক্ষিণ চন্দননগরে দিনেমারডাঙা অঞ্চলে নতুন নীলকুঠি স্থাপন করেন।' পরে লিখেছেন, "তালডাঙার বাগানে প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করেন এন্ড্রেস্ (Berge Andres) নামে এক দিনেমার। কেবল চন্দননগরে নয়, ডেনেরা (দিনেমাররা) হুগলী জেলায় অন্তত আরও একটি নীলকুঠি স্থাপন করেছিল। রাজবলহাটের উপকণ্ঠে পীরতলা নামক অঞ্চলে 'তেলে পুষ্করিনী'র পার্শ্বে ডাচ ও দিনেমারদের বাণিজ্য কুঠি ছিল।" এই নীলকুঠিগুলির মধ্যে কোনটির প্রতিষ্ঠা সর্বপ্রথম সে বিতর্কে না গিয়ে এই তথ্যটুকু যে — ডেনেরা গুঁড়ো নীল ইউরোপের বাজারে চালান দেয় সেটুকু এখানে অবশ্য উল্লেখ্য।

১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাঙলার নবাব ডেনিস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে শ্রীরামপুরে ৩ বিঘা, আকনাতে ৬০ বিঘা জমি দেড় লক্ষ সিক্কা টাকার সেলামিতে বন্দোবস্ত করে দেন। এই জমি সংগ্রহ এবং বাণিজ্য করার ফারমান সংগ্রহে ফরাসি কূটনীতিবিদ্ Jean Law (মসিয়ে জাঁ ল্য) মধ্যস্থতা করেন। এ অবস্থায় দিনেমারডাঙায় জাহাজঘাটা ও জাহাজ মেরামতির কেন্দ্র গড়ে তোলার কল্পনা ছেড়ে শ্রীরামপুরে চলে যায় দিনেমাররা। চন্দননগরের তৎকালীন মানচিত্রে দিনেমার কুঠি প্রদর্শিত। সেই মানচিত্রটি এখানে সংযোজিত।

দিনেমারডাঙ্গায় তাদের কুঠির তিন দিক প্রাচীর দিয়ে আর একদিক ভাগীরথী নদীতে ঘেরা। সে কুঠিও ছিল দুর্গের মত। গোন্দলপাড়া জুট মিল ও তার সংলগ্ন শ্রমিকদের বস্তি অঞ্চলটি দিনেমারদের অধিকারে ছিল। এখনো ঐ মিল সীমানায় ভাগীরথী গর্ভে একটি সুড়ঙ্গের মুখ দেখা যায়। এ ছাড়া ঐ নদীগর্ভে খোদিত অক্ষর-সহ প্রোথিত একটি পাথরের স্তম্ভও লক্ষ্য করা যায়।

৮ অক্টোবর, ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে দিনেমারদের পতাকা প্রথম ওড়ে। শ্রীরামপুরের নতুন নাম হয় ডেনমার্কের তৎকালীন সম্রাট পঞ্চম ফ্রেডারিকের নামে 'ফ্রেডারিকনগর'। এই দিনেমার অঞ্চলটির অন্তর্গত ছিল শ্রীপুর, আকনা, গোপীনাথপুর, মোহনপুর এবং পেয়ারাপুর।

ভাগীরথীতীরে এই সুন্দর শহরটি ছিল ইউরোপীয়দের এক বিশেষ 'বিহারক্ষেত্র'। পর্যটক Bishop Heber এই ফ্রেডারিকনগর দেখে মন্তব্য করেন 'It looked more of an European town than Calcutta.'। ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্ক থেকে এক প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারি Zigenbalg ভারতে তথা এ শহরে সর্বপ্রথম আসেন। সরকারী ধর্মযাজকরূপে ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে আসেন John Kiernander।

ইংরাজ তাঁতীর ছেলে ইউলিয়ম কেরী বারো বছর বয়স থেকে কাজ করতে থাকেন। জুতো সেলাই -এর কাজ থেকে চণ্ডী পাঠ তিনি করেছেন আক্ষরিক অর্থেই। তাঁর তিয়াত্তর বছরের জীবনকাল (১৭.৮.১৭৬১-৯.৬.১৮৩৪) -এর মধ্যে একচল্লিশ বছর খ্রিস্টধর্ম প্রচার ছাড়াও ভারতীয় তথা সমাজ ও সাহিত্যের জন্য যে অক্লান্ত শ্রম দিয়ে গেছেন তা তার দিনেমার শাসনকালে বিধৃত। তাই তাঁর সমাজমুখী কার্যকলাপের বিশদ পরিচয় নিলে দিনেমার আমলে শ্রীরামপুরের তথা হুগলি জেলার বিকাশ কতখানি ঘটেছিল জানা যায়। কোন এক সময়ে তিনি টমাস জোনসের কাছে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। সুযোগমত ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণকাহিনী, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-এমনই নানা বিষয়ে পড়াশুনা করেন। কয়েকবছর ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তার আগে হিব্রু ভাষাও শেখেন। ধর্মপ্রচারের জন্যই ১১ নভেম্বর, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এসে পৌছান। প্রথম সাত মাস তিনি ব্যান্ডেল, নদীয়া, মাণিকতলা ও সুন্দরবন অঞ্চল ঘুরে বেড়ান। তাঁর মুনশি চুঁচুড়াবাসী রামরাম বসুর কাছে বাঙলা শিক্ষা করেন এবং মুনশির সাহায্যে বাঙলায় বাইবেল অনুবাদের কাজ করেন। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে মালদহের মদনবাটি নীলকুঠিতে তত্ত্বাবধায়কের কাজ করেন। স্থানীয় মানুষদের সাথে কাজের সুবিধার জন্য বাঙলা ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ও ব্যাকরণ বই রচনা করেন। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তিনি সেখানে কৃষক প্রজাদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। এখানে তিনি একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র পেয়েছিলেন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে মার্শম্যান, ওয়ার্ড, গ্রান্ট প্রমুখ কয়েকজন মিশনারি এই দিনেমার শাসিত শ্রীরামপুর আসেন। তখন কেরী সাহেব তাঁর কষ্টে সংগৃহীত খিদিরপুরের সম্পত্তি ছেড়ে শ্রীরামপুরে চলে আসেন। পরের বছর ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের প্রথমেই জানুয়ারি মাসে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। মার্চ মাসে হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া নিবাসী হরফ নির্মাণশিল্পী পঞ্চানন কর্মকার ঐ মিশন প্রেসে যোগ দেন। তাঁদের যৌথ প্রয়াসে ১৮ মার্চ তারিখে ম্যাথু-লিখিত সমাচারের প্রথম পাতা বাঙলা ভাষায় মুদ্রিত হয়। একই বছরের আগস্ট মাসে 'মথী - রচিত মিশন সমাচার' ঐ মিশন প্রেসে

মুদ্রিত প্রথম গদ্যে লেখা বই। এর আগে অবশ্য খ্রিস্টমন্ডলীর কতকগুলি গান আর রামরাম বসুর 'হরকরা' কবিতাটি ছাপা হয়। বাঙলা ভাষায় অনুবাদ ও অনুদিত বই প্রকাশে খ্যাতির জন্য ইংরাজদের কলকাতায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই নিয়োগের তারিখ হল ৪ঠা মে, ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ।

অধ্যাপনাকালে তিনি বাঙলা ভাষায় ব্যাকরণ, অভিধান, পাঠ্য বই ছাড়া ভারতীয় অনেক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ এবং ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন ও মুদ্রিত করেন। এ ছাড়াও ভারতীয় কৃষি, ভূ-বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা ও প্রাণী বিজ্ঞান বিষয়গুলিতে তাঁর গবেষণা, বাঙলা হরফের সংস্কার ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার হরফ নির্মাণ এবং ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি স্থাপন তাঁর অসামান্য কর্মপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। বাঙলা ভাষায় রচিত তাঁর বইগুলি হল: 'নিউ টেস্টামেন্ট' (বাইবেল) 'ইতিহাসমালা' আর পনের বছরের পরিশ্রমে আশি হাজার শব্দ সমন্বিত, দুহাজার ষাট পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বাঙলা-ইংরাজী অভিধান। এ ছাড়া অন্যান্য বই-এর সংখ্যা সাতচল্লিশ।

ফেলিক্স কেরী (২০.১০.১৭৮৬ — ১০.১১.১৮২২) তাঁর পুত্র। তিনিও বাপকা বেটা অনেকটাই। বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার তিনি পথিকৃৎ। তার প্রধান কীর্তি 'বিদ্যাহারাবলী' 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র পঞ্চম সংস্করণের বাঙলা অনুবাদ। চিকিৎসাবিদ্যায় বিশেষ করে শল্য চিকিৎসায় তিনি সুদক্ষ ছিলেন। ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রের তত্ত্ব, বাঙলা ভাষা তাঁর মাতৃভাষা না হলেও, যে সাবলীলতায় রচনা করেছেন তা বিস্ময়কর। পিতার সহকারী হিসাবে পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় কাজ করেছেন। টেলর নামে এক ডাক্তার শ্রীরামপুরে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে আসেন। তাঁর কাছে ফেলিক্স চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করেন। ধর্মপ্রচার নয়, রোগীর চিকিৎসায় তাঁর উৎসাহ ছিল বেশী। মাত্র একুশ বছর বয়সে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে তিনি ব্রহ্মদেশে যান। কিন্তু রাজনীতিচর্চার আকর্ষণ, ঐশ্বর্য আড়ম্বরের প্রতি আসক্তি এবং উপর্যুপরি দুই স্ত্রীবিয়োগ তাঁর জীবনে অভাবিত অস্থিরতা আনে। তিন বছরেরও বেশি সময় তিনি পূর্বভারতের বনে-পাহাড়ে অজ্ঞাতবাস করেন। পরে শ্রীরামপুরে ফিরে এসে সংস্কৃত, পালি ও বাঙলা ভাষাচর্চা করেন। পালি ব্যাকরণও রচনা করেন বাঙলা অনুবাদসহ। অকালমৃত্যু না হলে তিনি রামকমল সেনের সঙ্গে যে ইংরাজী ও বাঙলা অভিধানের কাজ করছিলেন তা সম্পূর্ণ করতে পারতেন।

এবার ইংরাজ জোশুয়া মার্শম্যান (২০.৪.১৭৬০ — ৫.১২.১৮৩৭) এর কথা। তিনিও কেরীসাহেবের মতই তাঁতী-পুত্র। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে লন্ডনের এক বইয়ের দোকানে চাকরি শুরু করেন। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে হন শিক্ষক। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ওয়ার্ড আর তাঁদের আরো দুই বন্ধু। তদানীন্তন ইংরাজ গভর্নর লর্ড ওয়েলেসলি তাঁদের ফরাসি গুপ্তচর মনে করেন। তাই তাঁদের দেশে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেন। রেভারেন্ড ডেভিড ব্রাউনের মধ্যস্থতায় এঁরা বাঙলায় বসবাসের অনুমতি পান। কিন্তু মালদহে কেরীর কাছে যাবার চেষ্টা করলে ইংরাজ সরকার বাধা দেয়। তাই তাঁরা শ্রীরামপুরে থাকতে বাধ্য হন। এখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়টি পরে শ্রীরামপুর কলেজ ও ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে, যেখানে চীনাভাষা প্রচলিত সেখানে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য দুরূহ চীনা ভাষা আয়ত্ত করে বাইবেল ঐ ভাষায় অনুবাদ করেন ও ব্যাকরণ আর অভিধান সংকলন করেন। কেরী ও তিনি 'সংস্কৃত রামায়ণ'-এর অনুবাদ করেন। কেরী ছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশনারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। কেরী সাহেবের বিরোধিতা উপেক্ষা করে তিনি তিনটি পত্রিকা যথাক্রমে ইংরাজী "ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া', বাঙলা 'সমাচার দর্পণ' ও 'দিগদর্শন অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" প্রকাশ করেন। 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক রূপে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। গঙ্গাকিশোর

ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গালা গেজেট'এর পূর্ববর্তী হলেও ছিল স্বল্পায়ু। তাই এটিকে বাঙলায় প্রথম মুদ্রিত সাপ্তাহিক বলা যায়। দিগদর্শন পত্রিকাটি ছিল মাসিক। সেটি মার্শম্যানের পরিচালনায় প্রকাশিত হয় এর একমাস আগে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজ দেশ ইংলন্ডে যান। ফেরার পথে ডেনমার্কের রাজার কাছে যান। তৎকালীন, দিনেমাররাজ 'শ্রীরামপুর থিওলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ফলে কীয়েল ও কোপেনহেগেনের মত একই ক্ষমতাসম্পন্ন আর ভারতে Divinity বিষয়ে উপাধি প্রদানে ক্ষমতাপন্ন একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত হওয়ার গৌরব অর্জন করে। তাঁর 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় রামমোহন রায়ের ধর্মসম্বন্ধীয় বিতর্ক প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণদাস পাল নামে শ্রীরামপুরের এক সূত্রধর, শ্রীরামপুর মিশনের চেষ্টায় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর সকাল বেলায় সর্বপ্রথম খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরের সময়ে শ্রীরামপুরের দিনেমার গভর্নর এবং হিন্দু - মুসলমান ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী উপস্থিত ছিলেন। 'পুরাতনী' বইটিতে শ্রদ্ধেয় হরিহর শেঠ লিখেছেন যে, কেরী সাহেব এ কাজে উদ্যোগী হন। এ ঘটনাটি এখানে উল্লেখ বিশেষভাবে এই কারণে যে খ্রিস্টীয় এই ক্রিয়াকর্ম বাঙলা ভাষার মাধ্যমেই সাধিত হয়। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে ঐ কৃষ্ণদাসের কন্যার সাথে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী কৃষ্ণপ্রসাদ নামে এক ব্রাহ্মণের বিবাহ প্রথম খ্রিস্টীয় ধর্মমতে বাঙলা ভাষার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। তারপর দুশো বছর পার হয়ে গেছে তবু মাতৃভাষার মর্যাদা আজও নিজের মাটিতে যথাযথ প্রতিষ্ঠা লাভ করল না।

শ্রীরামপুরে গোকুল দাস নামে এক বাঙালী খ্রিস্টানের মৃত্যুর পর সমাধি দেওয়া হয়। এটি অবিভক্ত বাঙলায় দেশীয় খ্রিস্টানদের সর্বপ্রথম সমাধি। প্রথম এদেশীয় খ্রিস্টান কৃষ্ণদাস পাল নিজের টাকায় মসলিন কাপড় দিয়ে গোকুলের শবাধার ঢাকা দেন। সংস্কৃতি বিনিময়ের নজির সৃষ্টি করে এই ঘটনাটি। হিন্দুদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে বিশেষ সাফল্য দেখে পাদরিরা হিন্দু তীর্থস্থান কলকাতার কালীঘাটের মন্দিরে লোক পাঠিয়ে পাঁচশো টাকার পূজা দেন।

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন একটি বাড়ি কিনে সেখানে মিশন প্রেস স্থাপন করে। দিনেমার শাসিত এই শ্রীরামপুরেই কাঠে খোদাই করা বাঙলা অক্ষর তৈরী করা হয়। ছাপা হয় বাঙলা ভাষায় দু-হাজার কপি বাইবেল। একই বছরে ছাপা হয় কেরী সাহেবের লেখা 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'। বইটির চতুর্থ সংস্করণ ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়। অথচ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের লেখা তাঁর মাতৃভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় আরো পনেরো বছর পরে।

রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং 'খৃষ্টচরিত' ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে মিশন প্রেসে ছাপা হয়। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'কে বঙ্গের প্রথম মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থ বলা হয়। কিন্তু মতান্তর আছে। A descriptive Catalogue of Bengali Works - এর ঐ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে উল্লেখ করা হয় ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহেড সাহেবের লেখা 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গোয়েজ' যে বইটি ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজদের শাসনাধীন হুগলির পিপুলপাতি অঞ্চলে স্থাপিত মুদ্রণযন্ত্রে মুদ্রিত। তবে যেহেতু এটি "বোধপ্রকাশ শব্দশাস্ত্র ফিরিঙ্গিনামুপ কারার্থ" রচিত এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্মচারীদের বাঙলা গদ্যরচনার সহায়ক সেহেতু এর ব্যবহার ব্যাপক ছিল না। দ্বিতীয় যে বইটির কথা সুধীর কুমার মিত্র লিখেছেন সেটির নাম 'ধর্মপুস্তক'। এটি ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আখ্যাপত্রটি থেকে জানা যে "প্রভু ও প্রাণ কর্তা যিশুখ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার" এটি গ্রীক ভাষা থেকে তর্জমাকৃত। এ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধটি 'দেশ' পত্রিকার ১৮ শ্রাবণ, ১৩৫৩ সংখ্যায় প্রকাশিত। একই বিষয়ে লিখেছেন ড. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর লেখা বই 'সাহিত্যের কথা'-য়।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের কর্মী মেভিসাহেব ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে একটি ইংরাজী বাঙলা অভিধান

সংকলিত করেন। ১৮২৯-এ মার্শম্যান বাঙলা - ইংরাজী ও ইংরাজী - বাঙলা দুরকমের দুটি অভিধান প্রকাশ করেন।

তবে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ তারিখে মিশনের প্রেসে আকস্মিক আগুন লাগে। ফলে কেরী ও মার্শম্যানের যৌথ প্রচেষ্টায় বাঙলা ভাষায় অনূদিত রামায়ণটির অভিধান ও একটি তেলুগু ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হয়।

শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক ম্যাক 'Principles of Chemistry' নামে একটি ইংরাজী গ্রন্থ রচনা করেন। মার্শম্যানের ইচ্ছায় 'কিমিয়া বিদ্যাসর' নামে অনূদিত এই বইটি বাঙলা ভাষায় 'রসায়ন শাস্ত্র' সম্বন্ধে আদি গ্রন্থ।

হুগলি জেলায় ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা যে মানচিত্র ব্যবহারের পদ্ধতি প্রবর্তন করেন তারই ধারা অনুসরণ করে ম্যাক সাহেব ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে বাঙলা অক্ষরে নির্মিত ভারতবর্ষের মানচিত্র শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশ করেন।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজের অধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের এবং শ্রীরামপুরের দিনেমার গভর্নর কর্নেল কেফটিং-এর পৃষ্ঠপোষণায় কেরী মার্শম্যান ওয়ার্ডের দ্বারা শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতীয় ছাত্রদের সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা এবং ইঙ্গ ভারতীয় ও ভারতীয় উপযুক্ত শিক্ষার্থীদের খ্রিস্টধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে এই কলেজের প্রতিষ্ঠা। ১৩ জুলাই, ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত সমাচার দর্পণ-এ লেখা হয় : "এই কলেজে ইউরোপীয় বিদ্যাশিক্ষা করিলে যত লাভ হয় তত লাভ ভারতবর্ষের কোন স্থানে হয় না যেহেতু এই কলেজে কেবল সাধারণ ইংরাজী বিদ্যা যে পাইবেন এমত নয় কিন্তু বৃহৎ ২ যন্ত্র দর্শনে ভূগোলবিদ্যা ও খগোলবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা ও পূর্ববৃত্তান্তবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন।...."

১৮২১ খ্রিস্টাব্দে দিনেমার সম্রাট ষষ্ঠ ফ্রেডারিক এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে 'রাজকীয় সনন্দ'-দ্বারা ছাত্রদের এই মহাবিদ্যালয়ে পাঠশেষে 'ডিগ্রী' দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে দিনেমাররা ওলন্দাজদের মত ইংরাজের হাতে শ্রীরামপুরের শাসনভার তুলে দেবার কালে কয়েকটি শর্ত স্থির করেন। ঐ শর্তাবলীর ষষ্ঠ ধারায় শ্রীরামপুর কলেজ এবং পাদ্রীদের প্রচারশিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে লেখা হয় : "Article VI – The Church Missionary Board at Copenhagen for the Propagation of the Gospel shall be at liberty to continue their exertions in India for the conversion of the heathens to the Christian religion, and shall be afforded the same protection, by the Government of India as similar English societies under the general law of the land; the rights and immunities granted to the Serampore College by Royal Charter, of date 23rd of February 1827, shall not be interfered with, but continue in force in the same manner as if they had been obtained by a charter from the British Government, subject to the general law of British India."

শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা দিনেমার আমলে সারা বাঙলা জুড়ে তরলাভিঘাত তোলে। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে থেকে যে সমাচারদর্পণ প্রকাশিত হতে শুরু করে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যাটিতে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় তাতে লেখা হয় :

"এই সমাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এই ২ সমাচার দেওয়া যাইবে।

১)   এতদ্দেশের জজ ও কালেক্তর সাহেবদের ও অন্য রাজকমাধ্যক্ষদের নিয়োগ।

২)   শ্রীশ্রী যুত বড় সাহেব যে ২ নূতন আয়িন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

৩)   ইংলন্ড ও ইউরোপের অন্য ২ প্রদেশ হইতে যে ২ নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪)   বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ।

৫)   লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর ব্যবসার বাজার মন্দা দেখে দিনেমার রাজ শ্রীরামপুরসহ ভারতে তাদের উপনিবেশগুলি ইংরাজ সরকারের কাছে বিক্রি করেন।

৬

কথিত ইতিবৃত্তের পরিধির বাইরে রয়ে গেল অকথিত বহু ইতিকথা। আলোচিত অংশের পর্যালোচনায় বলা যায় যে পর্তুগীজদের দস্যুবৃত্তির পাশাপাশি তারা খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছাকাছি বসবাসের ফলে ফুল ও ফলের চাষবাস ও ভাষার লেন-দেনে হুগলি জেলার তথা বাঙালীর জীবনচর্যায় স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে, বাঙলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ওলন্দাজেরা দস্যুচরিত্রের নয় বরং অনেক সামাজিক ছিলেন। তাঁদের ছিল বাগানের শখ। ফুল ও ফলের চাষে তাঁরা পর্তুগীজদের মতই স্থানীয় সমাজজীবনকে প্রভাবিত করেছেন। পর্তুগীজদের মত তাস খেলাতেও তাঁদের বিশেষ ঝোঁক ছিল। রুইতন, হরতন, চিড়েতন, ইস্কাবন — এই চারটি শব্দ ওলন্দাজেরা দিয়ে গেছেন বাঙলা শব্দভাণ্ডারে। এ ছাড়া ওলন্দাজেরা তাস খেলাকে করে গেছেন জনপ্রিয়। তাঁদের অভিনয়কুশলতাও ছিল উল্লেখ করার মত। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিতভাবে কোন নাটক অভিনয় তাঁরা করেছিলেন কিনা জানা না থাকলেও তাঁরা একটি রঙ্গমঞ্চ রেখে গেছেন। কলকাতার প্রথম নাট্যমঞ্চ যেমন দি প্লে হাউস এন্ড ডান্‌সিং হল, ডালহৌসী স্কোয়ার (বর্তমানে বি বা দী বাগ) এ অবস্থিত, তেমনই চুঁচুড়ার বড়াল বাগান (বর্তমানে মাধবীতলা) -এ ছিল ডাচ (বা ওলন্দাজ) ডান্‌সিং হল। এটি সম্ভবত অখণ্ড বাঙলার প্রাচীনতম রঙ্গমঞ্চ। অবহেলায় সে মঞ্চ দীর্ঘকাল থেকে থেকে বর্তমানে বিলুপ্ত। কলাশিল্পেও ছিল তাঁদের উল্লেখনীয় অনুরাগ। ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায় সেই "ডাচ স্কুল অফ পেইন্টিং" সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "There is evidence that the school flourished in and near the Dutch Settlement in Bengal. The subject depicted therein are deities & mythological figures. An indepth scholarly study is still awaited." আর্মেনীয়দের প্রভাব তেমন কিছু নেই। দিনেমারদের সৌজন্যে শ্রীরামপুর কলেজে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার চূড়ান্ত পর্যায় পার হয়ে শ্রীরামপুর মিশনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে যে অবদান তা উপনিবেশবাদী মনোভাব ছাপিয়ে মানবিক স্থায়ী সম্পদে পরিণত। অষ্টাদশ শতকের রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় থেকে বিংশ শতকের অন্নদাশঙ্কর রায় এই ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী জাতিদের সম্পর্কে সমান উৎসুক — তাই লিখেছেন শতকে শতকান্তরে পরম কৌতূহলে, চরম কৌতুকে। ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন :

> প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
> ইংরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গী ফরাস॥
> দিনেমার এলেমান করে গোলন্দাজী।
> সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥

আর লঘু ছন্দে তাঁর পিতৃকুলের 'কোতরং'- এর কথা লিখতে গিয়ে ছড়াকারে লিখলেন:

হাঁসের প্রিয় গুগলি
পোর্তুগীজের হুগলি।
গুণীর প্রিয় তানপুরা
ওলন্দাজের চিনসুরা।
চোরের প্রিয় আঁধার ঘর
ফরাসিদের চন্দনগর।
শিশুর প্রিয় চানাচুর
দিনেমারের শিরামপুর।

ছড়ার শেষ চরণদুটি আর বাকি থাকে কেন —

লোকের প্রিয় ভেট রং
পিতৃকুলের কোতরং।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা

১) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি, সংশোধিত সপ্তম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩১২।
২) ভারতবর্ষের ইতিহাস — ড. প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত, বাণী মন্দির পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ (সংশোধিত) অক্টোবর, ১৯৮৭।
৩) বঙ্গ বৃত্তান্ত — অসীম কুমার রায়, কবি ইন্ডিয়া, প্রথম প্রকাশিত, ১৯৮৮।
৪) হুগলী জেলার ইতিহাস — সুধীর কুমার মিত্র, শিশির পাবলিশিং হাউস, সপ্তম সংস্করণ।
৫) সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান — প্রধান সম্পাদক সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৭৬।
৬) স্মরণে-লেখনে - চন্দননগর পুস্তকাগার।
৭) যণ্ডেশ্বর স্মরণিকা — যণ্ডেশ্বর জীউ মন্দির সংস্কার সমিতি, ১লা বৈশাখ, রবিবার, ১৩৮৬।
৮) Journal of the India - Netherlands Friendship Society – First Issue, March, 1993.
৯) West Bengal District Gazetteers - Hooghly – By Amiya kumar Bandyopadhyay, October 1972.
১০) ছড়া-সমগ্র — অন্নদাশঙ্কর রায় - বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯৮৫।



হুগলি : পাঠাগার আন্দোলন

অনিল কুমার দত্ত

বঙ্গদেশে গ্রন্থাগারের প্রসার খুব বেশী দিনের নয়। প্রায় দেড়শো বছর বলা যায়।

> "অক্ষরময় বাণী অক্ষয়
> গ্রথিত যথা গ্রন্থে —
> সেসব রত্নে এনেছ যত্নে
> পুঁথি পারাবার মন্থে।
> সংস্কৃতির মহান স্মারক করুক চমৎকার
> হে অসাধারণ তুমি সাধারণ গ্রন্থাগার।"

উনবিংশ শতাব্দী নবচেতনার যুগ। আমরা ঐ সময় বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা দেখতে পাই। ইংরেজদের যত দোষই থাকুক আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। ঐ সময় হুগলি চুঁচুড়া অঞ্চলে অনেকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একটি কলেজও হয়েছে। জেলার বিভিন্ন জায়গাতেও স্কুল ও কলেজ স্থাপনের কথাও জানতে পারি।

শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। শিক্ষা প্রসারে ইংরাজদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষা প্রসারের জন্য ইংরাজরা আমাদের দেশে মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসার ঘটায় তবে কবে মুদ্রণ যন্ত্র বঙ্গদেশে আমদানী করা হয় বলা শক্ত। আমাদেরও সাংস্কৃতিক জীবনে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ঐ বৎসর হুগলিতে জন এন্ড্রুসের ছাপাখানায় হলহেড (Halhed) সাহেবের 'A Grammar of Bengal language' প্রকাশিত হয়। এর আগে বা পরে আর কোন বই ঐ ছাপাখানায় প্রকাশ হয়েছিল বলে জানা নেই। এই বইয়ে যে হরফ ব্যবহার করা হয়েছিল সেই হরফগুলি চার্লস্ উইল্‌কিন্স কাটেন এবং তাঁকে সাহায্য করেছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। এরপর শ্রীরামপুরে মুদ্রণের কাজ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে দেখতে পাই। মোটামুটি এই সময় মুদ্রণের ধারাবাহিকতার বিষয় জানা যায়। শ্রীরামপুরে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রণের সময় থেকেই হুগলির পঞ্চানন কর্মকারকে অক্ষর কাটার কাজে দেখতে পাই।

আপজোন (Upjohn) সাহেবের ইংরাজী ও বাঙালী বোকেবিলরী (১৭৯৩), মিলারের The Tutor বা 'শিক্ষাগুরু' (১৭৯৭) এবং ফরস্টার সাহেবের দুখণ্ডে সম্পূর্ণ Vocabulary (১৭৯৯-১৮০২) অর্থাৎ ইংরাজী-বাংলা অভিধান প্রকাশ হয়েছে দেখতে পাই। ১৮৩২ পর্যন্ত ৪০টি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষায় অনেক বই ছাপা হয়েছিল। এ ছাড়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে বই ছাপা হত। শ্রীরামপুর মিশন শুধু বই প্রকাশ করেই তাদের কাজ শেষ করেনি, তারা বই সংগ্রহ করবার পথও দেখায়। ১৮২৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় আর

সেখানে সুষ্ঠুভাবে বই সংগৃহীত হতে থাকে এবং বই সংরক্ষণের মাধ্যমেই হুগলি জেলার গ্রন্থাগার স্থাপনের কাজ শুরু হয়। এই শতকের প্রথমদিকে আমরা কেরী লাইব্রেরি দেখতে পাই — আজ এই লাইব্রেরির সংগ্রহ দেশের গর্ব।

১৮৩৫ সালে হুগলি মহসীন্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ও অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই মূল্যবান গ্রন্থসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়। পরমেশ চন্দ্র মল্লিক, ড. মোয়াট, কর্নেল ডি. বসু প্রভৃতির ব্যক্তিগত দানে ও পুরাতন বই ক্রয়ের মাধ্যমে আজ এই কলেজের গ্রন্থাগার আমাদের গর্বের।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রভাব বঙ্গদেশের সর্বত্রই দেখা যায়। ডিরোজিও সাহেব এই নবজাগরণে প্রাণ দিলেন ১৮৫১ সালে আগস্ট মাসে মেদিনীপুর শহরের অলিগঞ্জে। তৎকালীন জেলাশাসক মি. ভিনসেন্ট বেলী ও রাজনারায়ণ বসুর সক্রিয় সহযোগিতায় মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরি পরবর্ত্তীকালে হ'ল বেলী হল ও পাবলিক লাইব্রেরি। এই প্রাচীন গ্রন্থাগারকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (UNO) GATT Publication তাদের Depository Library হিসাবে মর্যাদা দিয়েছেন। বর্ত্তমানে ঐ লাইব্রেরিটি রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার নামে পরিচিত অন্যতম শহর গ্রন্থাগার, ১৮৫৪ সালে হুগলির সরকারী উকিল ও পৌরপতি ঈশানচন্দ্র মিত্র (১৮৩০-১৮৯৭) হুগলি পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ১৮৫৬ সালে কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ জেলার বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক হজসন প্যাট কৃষ্ণনগরে গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় ঐ জমি কৃষ্ণনগরের জনসাধারণকে দান করেন।

ডিরোজিও সাহেব ও ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম প্রধান কোন্নগরের শিবচন্দ্র দে ১লা এপ্রিল ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি এন্ড ফ্রি রিডিং রুম প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি জনসাধারণের জন্য উৎসর্গীকৃত ও বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার। পৃথিবীর বিভিন্নদেশ থেকে তিনি নানা বিষয়ের বই সংগ্রহ করে এই গ্রন্থাগারকে ভারতের গর্বের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন।

১৮৭১ সালে শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি ও দি মিউচুয়াল ইমপ্রুভমেন্ট এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের জোশুয়া মার্শম্যান সাহেব স্থানীয় অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্য ১৮০৬ সালে শ্রীরামপুর ওয়েলফেয়ার কমিটি স্থাপন করেন। ১৮৪৫ সালে যখন শ্রীরামপুর ইংরাজদের অধীনে আসে ঐ সময় কমিটির নাম দেওয়া হয় 'শ্রীরামপুর হিতকারিনী সভা'। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলে ঐ সভার পক্ষে ছিলেন না। তাঁরা দি মিউচুয়াল ইমপ্রুভমেন্ট এসোসিয়েশন নামে আলাদা একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে মহকুমা শাসক মি. ট্রেভার প্লাউডেন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কমিটি গঠিত করেন। কমিটির চেষ্টায় এবং গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী ও হেমচন্দ্র গোস্বামীর বদান্যতায় ১৮৭১ সালে শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০১ সালে 'দি মিউচুয়াল ইমপ্রুভমেন্ট এসোসিয়েশন' শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত হয়। ঐ সময় স্থানীয় মানুষের আর্থিক সাহায্য, রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী, বর্ধমানের মহারাজা ও তুলসীবরণ গোস্বামীর পুস্তকদানে গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু গ্রন্থাগারটির নিজস্ব কোনও বাড়ি না থাকায় বেশ কয়েকবার স্থান বদলের পর ১৯২৮ সালে রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী মেমোরিয়াল হলের একাংশে তাঁর পুত্র তুলসীচরণ গোস্বামীর দানপত্র অনুসারে গ্রন্থাগারটি স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়।

স্বাধীনতার পরেও চন্দননগর ফরাসিদের উপনিবেশ ছিল। শিক্ষা বিস্তারে চন্দননগরের দান

অনস্বীকার্য্য। জনশিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের কথা চিন্তা করে যদুনাথ পালিত, হরিমোহন সুর, মহেন্দ্রনাথ নন্দী, প্রমথনাথ মিত্র, প্রমথনাথ বিশ্বাস, মতিলাল শেঠ ইত্যাদি কয়েকজন উৎসাহী যুবক চন্দননগরের উর্দিবাজারে ১৮৭৩ সালে একটি ভাড়াবাড়িতে চন্দননগর পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৩ সালে জি. টি. রোডে একটি বাড়িতে পুস্তকাগারটি স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯২০ সালে দানবীর হরিহর শেঠের আর্থিক সাহায্যে নির্মিত ভবনে পুস্তকাগার স্থায়ীভাবে স্থান লাভ করে। আজও ঐ স্থানে গ্রন্থাগারটি রয়েছে সরকার অনুমোদিত মহকুমা গ্রন্থাগার হিসাবে। এখানে সংগ্রহ অমূল্য। বহু মূল্যবান পুস্তক, পত্র-পত্রিকা অমূল্য সম্পদে ভরা এই গ্রন্থাগার। স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার সম্পদ এই গ্রন্থাগারে আছে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যা এই গ্রন্থাগারে আছে।

বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে ১৮৮৮ সালে রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় ছাত্রদের প্রয়োজনে বাঁশবেড়িয়া ছাত্র সমিতি গঠন করেন। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলো দেখানোর কথা চিন্তা করে বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি গঠন করেন। ঐ সময় আরও যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন তাদের মধ্যে ডা. তিনকড়ি আঢ্য, বিপিন বিহারী দে, অনুকূল চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপেশচন্দ্র মিত্র, হরিহর ঘোষ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আনন্দময়ী মন্দিরের কাছে ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা সভাগৃহে প্রথমে লাইব্রেরিটি স্থাপিত হয়। এরপর ১৯০১ সালে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ১৯১২ পর্যন্ত থাকার পর আবার পুরাতন জায়গায় অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে স্থানান্তরিত হয়। সেই সময় ডা. তিনকড়ি আঢ্য ও হরিহর ঘোষ সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। এর কিছুদিন পর লাইব্রেরিটি আবার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়। ইতিমধ্যে ১৯২৩ সালের ৮ ডিসেম্বর লাইব্রেরিটি আইনানুসারে রেজিস্ট্রী করা হয় ও লাইব্রেরিপ্রেমী বিদ্যোৎসাহী পৌরপিতা বিষ্ণুচরণ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় পৌর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এক খণ্ড জমি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পায়। ১৯২৪ সালে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় সভাপতি নির্বাচিত হন। অধ্যাপক মনীন্দ্রনাথ রুদ্র, অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ও তিনকড়ি দত্ত একটা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত করার পরিকল্পনা করেন। এরপরেই হুগলি জেলার গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়ে একটি সংগঠন গড়ার কাজ শুরু হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত হুগলি জেলায় স্থাপিত ছোট বড় গ্রন্থাগার তাদের প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল ইতিহাস, গ্রন্থ সংগ্রহ, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও জীবন জীবিকার প্রয়োজনে তার ব্যবহারের ফলে সমাজের অগ্রগতিতে গ্রন্থাগারগুলির অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।

১৯২৪ সালে বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগার সম্মেলনে শ্রীরামপুরের তুলসীচরণ গোস্বামী প্রতিনিধিত্ব করেন। ফিরে এসে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কথা নতুন করে ভাবতে শুরু করেন।

বাংলার নবজাগরণের ঢেউ সুদূর গ্রামাঞ্চলেও পৌছেছিল। তারই প্রভাব হুগলি জেলার শ্রীপুরেও পড়েছিল। তারই ফলস্বরূপ ১৮৯২ সালের ৩রা জুলাই শ্রীপুর স্টুডেন্টস লাইব্রেরির স্থাপনা দেখতে পাই নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিদাস মুস্তৌফি, নীরোদবরণ মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ দাস, বিমলকৃষ্ণ সরকার ইত্যাদিদের নিজস্ব ব্যক্তিগত পুস্তকদানে মুস্তৌফিদের পূজার দালানের পাশের বাড়ীতে লাইব্রেরি স্থাপিত হয়। পরে এই লাইব্রেরি শ্রীপুর বেনেভোলেন্ট এসোসিয়েশনে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালে এসোসিয়েশনের জায়গা ক্রয় করা হয়। ১৯৪৯-এ সাহিত্যিক 'বনফুল' এই এসোসিয়েশনের

নাম 'শ্রীপুর কল্যাণ সমিতি' রাখবার কথা বলেন — সেই থেকে এর নাম হয় শ্রীপুর কল্যাণ সমিতি। তখন থেকে বাড়ি তৈরীর কাজ শুরু হয় ও ১৯৫৪ সালের ৪ঠা জুন সমিতির নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ১৯৭৮-এ এই সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৯০ সালে শহর গ্রন্থাগারে উন্নীত হয়।

জনাই পাবলিক লাইব্রেরি স্থানীয় জমিদার রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ১৮৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে ঐ অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারের জন্য ১লা জানুয়ারী, ১৮৫০ সালে জনাই ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগারটি গড়ে উঠেছিল জমিদার কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ভ্রাতাদের উৎসাহে। কিন্তু গ্রামবাসীদের উৎসাহের অভাবে এই গ্রন্থাগারটি বন্ধ হয়ে যায়। আবার উক্ত গ্রন্থাগারটিকে কিভাবে সচল করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ১৮০১ সালে জমিদার ও স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় Janai People's Association গড়ে উঠে। সকলের প্রচেষ্টায় জনাই পাবলিক লাইব্রেরিকে আবার চালু করা হয়। নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ১৯৪২ সাল থেকে ঐ গ্রন্থাগারটি ঠিকভাবে জনগণের সেবায় এগিয়ে চলেছে।

১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী পাণ্ডুয়া ব্লকের মণ্ডলাই গ্রামে মণ্ডলাই পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত হয়। প্রথমে স্থানীয় কুণ্ডুবাড়ির একটি ঘরে এই লাইব্রেরির সূচনা। যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, প্রমথনাথ দে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যুগলকিশোর বসু, নারায়ণচন্দ্র চৌট্খণ্ডি, যতীন কর, আশুতোষ ঘোষ ইত্যাদি লাইব্রেরির উন্নতিকল্পে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন। নিয়মিত সাহিত্যসভা ও 'তারা' নামক পত্রিকা প্রকাশ এই লাইব্রেরির বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৯১৬-তে দেখা যায় লাইব্রেরিটি স্থানীয় জনৈক শচীন্দ্রনাথ মহাশয়ের বৈঠকখানায় স্থান পায়। ১৯৬৫ সালে ঐ গ্রামের দানশীলা মহিলা কবি শান্তিসুধা দাস ভারতী লাইব্রেরিকে একটি জমি দান করেন। জনসাধারণের আর্থিক সাহায্যে ১৯৭৬ সালের ৪ জুন লাইব্রেরির নতুনভবনের দ্বারোদঘাটন করেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। লাইব্রেরিটি ১৯৭৫ সালে সরকারপোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

জামগ্রাম নন্দী সাধারণ পাঠাগার মোটামুটি শুরু হয় ১৮৯৪ সালে পারিবারিক গ্রন্থাগার হিসাবে। নন্দী পরিবার এ জেলার সব থেকে বড় যৌথ পরিবার। পরিবারের কিছু উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় এই গ্রন্থাগার স্থাপিত হলেও সাধারণের সুবিধার্থেও এর দ্বার খুলে দেওয়া হয়। নন্দী এস্টেটের জমিতেই ক্ষেত্রময়ী দাসীর আর্থিক সাহায্যে গ্রন্থাগারের নিজস্ব বাড়ী ১৯৭৬-৭৭ সালে তৈরী হয়। ১৯৮০ সালে সরকার পোষিত গ্রন্থাগার রূপে স্বীকৃতি পায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যখনই যে কোনও বিষয়ে আমরা জানতে চাই - তখনই ভারতের মানচিত্রের পূর্বদিকের একটি জেলার নাম জ্বল জ্বল করে উঠে। বুঝতে কোন কষ্ট হয় না — সেটা আমাদের গর্বের জেলা হুগলি। কি সাহিত্য, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা যাই হোক না কেন হুগলি জেলার নাম সব থেকে আগে এসে পড়বে।

রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় ১৮৯১ সালে বাঁশবেড়িয়ায় ছাত্র সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব শিক্ষা বিস্তারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা অনুভব করে ঐ বৎসর থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচারে অবতীর্ণ হন। ১৮৯১ সালে তিনি ছাত্র সমিতির সম্পাদক ও তাঁর পিতা রাজা পূর্ণেন্দুদেব রায় সভাপতি ছিলেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টিতে যে সহায়তা করেছিলেন তা ক্রমে সামাজিক ও

সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অপরিহার্য পরিপূরক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এশিয়াটিক সোসাইটি হলে 'All India Library Conference -এ Mr. D. T. Rao বিখ্যাত ব্যারিস্টার রাজাকে 'Grandfather of Library movement in India' বলে সম্মানিত করেন।

বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাতের শুরুতে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলো হুগলি জেলা। বেলজিয়ামে ১৯২৪ সালে যে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলন হয় সেখানে তুলসীচরণ গোস্বামী প্রতিনিধিত্ব করেন। ফিরে এসে ইউরোপের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা দেখে উৎসাহিত হন এবং নিজ জেলার সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে যাতে ঐ স্রোতে নিয়ে যাওয়া যায় তারজন্য ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে শ্রীরামপুর সাধারণ পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশনে হুগলি জেলার গ্রন্থাগারগুলির একটি সংস্থা গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাব পূজাবকাশে বাঁশবেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থগারে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় -এর সভাপতিত্বে ও অধ্যাপক মনীন্দ্রনাথ রুদ্রের আহ্বানে তদনীন্তন হুগলি জেলার গ্রন্থাগার সমুহের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে ষোল জন সভ্য নিয়ে হুগলি জেলা গ্রন্থাগার সমিতি গঠিত হয়। দুই দিন ব্যাপী ঐ সভা ২৮শে ও ২৯ শে মার্চ ১৯২৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি গ্রন্থাগারিক মি. জে. এ. চ্যাপম্যান এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উক্ত সমিতির সভ্যগণের মধ্যে শ্রীরামপুরের বরদাপ্রসাদ দে, তুলসীচরণ গোস্বামী, ফনীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বলাগড়ের গুরুদাস রায়, চন্দননগরের হরিহর শেঠ, চারুচন্দ্র রায়, বাঁশবেড়িয়ার কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়, অধ্যাপক মনীন্দ্রনাথ রুদ্র, অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হন। উক্ত সমিতির প্রথম সভাপতি হিসাবে তুলসীচরণ গোস্বামী ও সহকারী সভাপতি বরদাপ্রসাদ দে ও মুনীন্দ্রদেব রায় নির্বাচিত হন। অধ্যাপক মনীন্দ্র রুদ্র-কে উক্ত সমিতির সম্পাদক করা হয়। (দুই বৎসর পর অধ্যাপক রুদ্র সম্পাদকের কাজে অক্ষমতা প্রকাশ করায় সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীরামপুরের ফনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-কে সম্পাদক নির্বাচন করা হয়) প্রথম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রস্তাব হল "That the primary duty of libraries should be to look after social service and spread of education within their jurisdiction and they shall devise means for the proper solution of economic problems of the irrespective locality." বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত হুগলি জেলার গ্রন্থাগার সমূহের সুসংযোগ স্থাপনের জন্য বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরির প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে হুগলি জেলার বলিষ্ঠ অধিনায়কত্বের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন। তৃতীয় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে হুগলি জেলার গ্রন্থাগার অনুরাগীরা হুগলি জেলার গ্রন্থাগার সমূহকে সংগঠিত করবার জন্য জেলার গ্রন্থাগারগুলির কাছে সহযোগিতার আবেদন জানায়। ১৯২৫ সালে (১৩৩১ বঙ্গাব্দের) ২৮শে ও ২৯ এ মার্চ / ১৪ ও ১৫ চৈত্র, শনি ও রবিবার বাঁশবেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগারে হুগলি জেলার গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসে। এই জেলাতেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বলে এই জেলাকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবর্ত্তক বলা হয়। এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন যে বাঁশবেড়িয়ার আরও তিন কৃতী সুসন্তান যাঁরা 'The three musketeers' নামে পরিচিত ছিলেন অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি দত্ত ও অধ্যাপক মনীন্দ্রনাথ রুদ্র এই গ্রন্থাগার আন্দোলন কিভাবে শুরু করা যায় চিন্তা করছিলেন সেই সময় তিনকড়ি দত্ত (যাঁর মানুষ চেনবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল) কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়কে দায়িত্ব নেবার জন্য অনুরোধ করেন — এটাই এ জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা।

এই প্রথম সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধিরা আসেন সর্বশ্রী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত,

চারুচন্দ্র সিংহ, হরিহর শেঠ, হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, তুলসীচরণ গোস্বামী, বরদাপ্রসাদ দে, ফনীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, ড. গুরুদাস রায়, যদুগোপাল রায় ইত্যাদি আরও অনেকে। তৎকালীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক চ্যাপম্যান সম্মেলন উপলক্ষে যে প্রদর্শনী হয় তার উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে আগত গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রণীদের মধ্যে অন্যতম তুলসীচরণ গোস্বামীকে সভাপতিত্ব করবার জন্য আহ্বান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় ইংরাজীতে যে ভাষণ দেন তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল, "পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় গ্রন্থাগারের অবস্থার উন্নয়ন এবং সম্ভব হইলে ইহার কাজের গণ্ডির প্রসারণ বিশেষ করিয়া জ্ঞান ও সমাজসেবার বিস্তার সাধনার্থে উপায় উদ্ভাবনই আমাদের এই সম্মেলন আহ্বানের উদ্দেশ্য। দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অনেক উচ্চ আদর্শ ও সুরুচির বিবরণ রহিয়াছে। কয়েক শতাব্দী পূর্বে দেশের স্বাধীনতা লুপ্ত হইলে সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে ছেদ পড়ে। ভারতীয় সভ্যতার সূত্রপাতে-এ আমরা দেখিতে পাই যে প্রাচীন মহর্ষিরা ব্রহ্মার প্রেরণায় পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীর কূলে কূলে বৈদিক স্তোত্র সুর করিয়া উচ্চারণ করিতেন। এই মহর্ষিরা মানুষের কাছে ভগবানের বার্তা পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য তাহার হৃদয়কন্দরে আলোকবর্তিকা জ্বালাইয়াছিলেন, এই প্রত্যাদেশাবলী লিপিকৌশল আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত লোকের মুখে মুখেই বিচরণ করিত। পাণ্ডুলিপিগুলি তালপাতা বা ভোজপাতায় কালিকলমের সাহায্যে লেখা হইত। গ্রন্থ বা পুঁথির নামেই ছিল ইহাদের পরিচয়। এই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহই আমাদের দেশের গ্রন্থাগারে মূল ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছিল। কেহ কেহ, বলেন গ্রন্থাগার জিনিষটা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধারণা হইতেই উদ্ভূত। সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান ভারতে একবারে নুতন জিনিস নয়। ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি — যথা তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা ও দণ্ডপুরী প্রভৃতিতে হাজার হাজার পাণ্ডুলিপির সংগ্রহালয় ছিল। হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধবিহার এবং মঠও সযত্নে ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র সংরক্ষণ করিত। নালন্দার নয়তলা 'রত্নোদধি' বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজ চালাইত এবং তৎকালে মূল্যবান পাণ্ডুলিপির সর্বাধিক সংগ্রহের জন্য ইহার গর্ব ছিল। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌ ৬২৯ - ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হর্ষবর্ধন এবং দ্বিতীয় পুলকেশির রাজত্বকালে ভারতের এক সমৃদ্ধির যুগে হিন্দু সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইবার জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন।

সেই সময় তিনি কয়েকবার নালন্দার গ্রন্থাগার দেখেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ইহার অধঃপতন হয়। পালরাজাদের আমলে বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরীর সুসজ্জিত গ্রন্থাগার উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বক্তিয়ারউদ্দিন খল্‌জীর আক্রমণে ঐ গ্রন্থাগারগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কতকগুলি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি লইয়া নেপালে সরিয়া পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ছাড়া সেকালে রাজারাজড়া এবং অভিজনবর্গেরও প্রাসাদের সংলগ্ন গ্রন্থাগার থাকিত, প্রাচীন মনীষীদের এবং চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদেরও গ্রন্থাগার ছিল। হিন্দু মন্দিরে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ একটি ধর্মকার্য বলিয়া গণ্য হইত। ধর্মশাস্ত্রের পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষা করিয়া নকল করা ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দৈনন্দিন কার্যের অঙ্গীভূত। জৈন ভিক্ষুদের উপরও ধর্মশাস্ত্রের পাণ্ডুলিপিকে সযত্নে রক্ষা করার নির্দেশ থাকিত। পশ্চিম ভারতের ওলাম্বে, জসলমীর ও সুরাতের জৈন গ্রন্থাগারে এখনও ঐ ধরণের পাণ্ডুলিপি দেখা যায়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তবংশের রাজত্বকালে জনগণের জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পাইয়া পূর্বাপেক্ষা উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল। ভারতবিদ্যার গবেষকরা এই সময়কে হিন্দুর পুনর্জাগরণের যুগ বলিয়া থাকেন।

গুপ্ত রাজত্বের অবসানের পরে ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসকদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মুক্ত হস্তে অর্থব্যয়ের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান আমলে সম্রাট হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং ফিরোজ শাহ

এতদর্থে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহাদের অধীনস্থ হিন্দু সীমান্ত রাজারাও জ্ঞানবিস্তারে মুক্তহস্তে অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহারা শুধু পাণ্ডুলিপিই সংগ্রহ করিতেন না। তাঁহাদের দরবারে বিখ্যাত পণ্ডিতদিগকেও পোষণ করিতেন। এবং বৃত্তি দিয়া জ্ঞানান্বেষীদের উৎসাহ দিতেন। একাদশ শতাব্দীতে ধারার রাজা ভোজেরও চমৎকার পুস্তকসংগ্রহ ছিল। চালুক্যরা মালব জয় করিলে এই মূল্যবান পুস্তকগুলি তাঁহাদের গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। চালুক্য রাজা বিশালদেব ইহাদের সংরক্ষণের জন্য বহু ব্যয় করেন। বিশালদেবের গ্রন্থাগারস্থ রামায়ণের একখানি পাণ্ডুলিপি জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইয়াছে. জার্মানীর বহু গ্রন্থাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি রাখা হইয়াছে। নেপাল, জম্মু, মহীশূর, বিকানীর ও আলেনীরে পুরান পাণ্ডুলিপি-র উৎকৃষ্ট সংগ্রহ রহিয়াছে। তাঞ্জের প্রাসাদের গ্রন্থাগার ১৮০০০ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের আধুনিক গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, মাদ্রাসের কন্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরি, পুণার ভাণ্ডারকর লাইব্রেরি, সারভ্যান্ট অব ইণ্ডিয়া লাইব্রেরি এবং বড়োদা সেন্ট্রাল লাইব্রেরি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিজদের মধ্যে বেদপাঠ সীমাবদ্ধ থাকিলেও যাহাদের কোন অক্ষরজ্ঞান ছিল না তাহাদের মধ্যেই শিক্ষাবিস্তারের নানা উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি হইতে কথকতা, যাত্রা কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। নিরক্ষর জনগণের রচিত গাথা অলিখিত অবস্থায় সঙ্গীতের আকারে অতীত হইতে চালিয়া আসিয়া লোকের মুখে মুখে পুরুষ পরম্পরায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে দেশের জনগণের আশ্চর্যজনক মানসিক উৎকর্ষের প্রকাশ পাওয়া যায়। এই গাথায় বর্ণিত মানুষের আবেগ, গভীর দুঃখ এবং সাদামাঠা কাহিনী হইতে নিরক্ষর জনগণের মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির স্পষ্ট পরিচয় মিলে। সেকালে শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা শুধু অক্ষরজ্ঞান, উহার বিন্যাস ও ব্যাকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সুপ্ত মানসিক বৃত্তির উন্মেষ সাধন দ্বারা সুরাষ্ট্রিক পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মহৎ দান যে সৎ জীবন তাহা যাপনে জনগণকে প্রণোদিত করা।

জনগণের প্রাথমিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। বই, সাময়িকী ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে জ্ঞানবিস্তার দ্বারা ইহাকে পূরণ করিতে হইবে। শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগার একটি আনুষঙ্গিক যন্ত্র আজকালকার দিনে ইহা অত্যাবশ্যক। পাশ্চাত্য দেশে গ্রন্থাগারকে শুধু পুস্তকের সংগ্রহালয় বলিয়া গণ্য করা হয় না, দেশবাসীর জীবনের মর্মস্থল বলিয়া মনে করা হয়। তাহা হইতেই আসে মানসিক, দৈহিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মার্জিত রুচি সম্পর্কীয় সর্ববিধ কর্মপ্রচেষ্টার প্রেরণা। এ দেশে ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের ফলে নগরে, শহরে ও গ্রামে গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিয়াছে। সর্বজনীন গ্রন্থাগার আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে বাড়াইয়া তোলার কাজে বিশেষ সহায়তা করে।

পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার সাধনের পথে আমেরিকা দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। ভারতে বরোদা রাজ্য এই বিষয়ে অগ্রণী। আমেরিকার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মহামান্য গায়কোয়াড় এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধার স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৮ বঙ্গাব্দে) বরোদায় গ্রন্থাগার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত পাঠাগার ও শিশু গ্রন্থাগারের পত্তন করা হইয়াছে। ভারতে সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারের মাধ্যমে লোক শিক্ষার্থ বিদ্যালয় স্থাপনও মহামান্য গায়কোয়াড়েরই কীর্তি।

এক শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ ইংলণ্ডেও জনশিক্ষা বিকিরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে আমেরিকায়ও জনশিক্ষা বিকিরণের ভার ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান

জগতে এমন কোন দেশ নাই যেখানে আমেরিকার মত সুবিশাল ও সুপরিকল্পিত চলন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আছে। জাতিশিক্ষা বিস্তারের এই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ভারতের অনেক অংশে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

নিরক্ষর জনগণের সুবিধার্থে বরোদার চাক্ষুরী শিক্ষা বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। এই শিক্ষার কাজ চালান হয় চলচ্চিত্র, ছাপান ছবির কার্ড প্রভৃতির মাধ্যমে। বরোদার গ্রন্থাগার পরিচালন সম্পর্কে শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা আছে। সেখানে যুবকদিগকে ভাল গ্রন্থাগারিক রূপে গড়িয়া তোলার জন্য বিনা বেতনে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

'বোম্বাই'র 'সোশ্যাল সারভিস লীগ' চলন্ত গ্রন্থাগারের পত্তন করিয়াছে। ইহা দ্বারা আমেরিকা ও বরোদার ব্যবস্থা মত জনগণ দেশীয় ভাষার বই পড়িবার সুবিধা পায়। ইহা পঞ্চাশটির উপর গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছে এবং পাঁচশটি গ্রন্থাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট অবৈতনিক বিদ্যালয় আছে। বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার সমিতির উদ্যোগে মহারাষ্ট্রে গ্রন্থাগার আন্দোলন বেশ অগ্রসর হইতেছে। প্রায় দেড় শত পাঠাগার ও গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য স্থানেও গ্রন্থাগার আন্দোলন বেশ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

আমাদের শহরে ও গ্রামে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপনে বাংলার যুবকগণই উদ্যোগী হয়। কিন্তু সংসারী হইলেই তাহাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে।

সকল প্রধান গ্রন্থাগারেই অন্তত বালক, মহিলা ও নিরক্ষরদের বিভাগ থাকা উচিত। সমাজসেবা এবং গ্রামের পুনর্গঠনকেই গ্রন্থাগারসমূহের কার্যাবলীর অঙ্গীভূত করা যাইতে পারে। গ্রন্থাগার হইল জ্ঞানভাণ্ডার এবং সকলকেই ইহা হইতে উপকার লাভ করিবার জন্য উৎসাহ দিতে হইবে। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও সুরাষ্ট্রিকসুলভ গুণাবলী অর্জন করিবার পক্ষে এইগুলি হইবে এক একটি শিক্ষাক্ষেত্র। ইহার চতুঃসীমানায় যেন বাদবিসম্বাদ স্থান না পায়। নরনারী, জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে পরমতের প্রতি উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা অভ্যাসের জন্য এই গুলি হইবে সকলের মিলনক্ষেত্র। গ্রন্থাগারসমূহ পবিত্র মন্দির বলিয়া মনে করা উচিত।"

সম্মেলনের বক্তাদের মধ্যে ছিলেন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, চারুচন্দ্র মিত্র, হরিহর শেঠ, হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা দেন। প্রথম দিন বিকালবেলা সম্মেলন ক্ষেত্রে একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনী হয়। তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক চ্যাপম্যান প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির এবং পাশ্চাত্যের অন্য অন্যান্য গ্রন্থাগারের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তৃতান্তে মুনীন্দ্রদেব রায় সম্মেলনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান।

প্রদর্শিত জিনিষের মধ্যে ছিল বরোদার মহামান্য গায়কোয়াড় কর্তৃক প্রেরিত পুস্তক ও প্রাচীর পত্রাদি, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি হইতে প্রদত্ত গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত বিদেশী ও ভারতীয় বই এবং হুগলি জিলার বিবরণ বিষয়ক বই, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কাঠের অক্ষরে ছাপা প্রথম বাংলা সংবাদপত্র দিগদর্শন ও সমাচার দর্পণের পুরান সংখ্যা, রাধানগর হইতে প্রেরিত রামমোহন রায়ের হস্তাক্ষর ও অন্যান্য বই, চন্দননগর হইতে হরিহর শেঠ কর্তৃক প্রদত্ত জিনিষ, মুনীন্দ্রদেব রায় সম্পাদিত দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা 'ঈস্টার্ন ভয়েস', ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি ইউনাইটেড বেঙ্গল', প্রথম শ্রেণীর বাংলা সাময়িকী 'পূর্ণিমা', গ্রামীণ বাংলার অবস্থা এবং হুগলি জিলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান সম্পর্কে তাঁহার লিখিত ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী,

কবি শ্রীধর কথকের হস্তাক্ষর এবং সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে সাতগাঁওতে প্রস্তুত একটি সুমার্জিত বাঁশের বাক্স।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের (১৩৩২ বঙ্গাব্দের) ১৪ই জুন ৩১শে জৈষ্ঠ রবিবার হুগলি জিলা গ্রন্থাগার পরিষদের নিয়মাবলী প্রণীত হয়। এর সদর কার্যালয় বাঁশবেড়িয়াতেই অবস্থিত ছিল। প্রথম যে কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল তাতে তুলসীচরণ গোস্বামী - সভাপতি, মনীন্দ্রনাথ রুদ্র - সম্পাদক, তিনকড়ি দত্ত ও অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় - যুগ্ম-সম্পাদক, যদুগোপাল রায় - হিসাবপরীক্ষক এবং জিলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পনেরজন প্রতিনিধি সভ্য ছিলেন।

হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর বিবরণ

(১৯২৫ প্রকাশক, সম্পাদক, হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ, অফিস : বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি, ডাকঘর : বাঁশবেড়িয়া, জেলা : হুগলি)

হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ :

ভূমিকা : আজ সর্বত্র সামাজিক উন্নয়ন ও প্রসারে সুশৃঙ্খল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গুরুত্ব স্বীকৃত। আজ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ছেলেদের ও যুবকদের শিক্ষার দায়িত্ব বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের, বয়স্কদের শিক্ষার দায়িত্ব সাধারণ গ্রন্থাগারের। আধুনিক গ্রন্থাগারকে কেবলমাত্র বইয়ের সংগ্রহশালা নয়, বলা হয় সমাজের নৈতিক ও সদ্‌বুদ্ধি সম্পন্ন উৎপাদন গৃহ ও নায়কেন্দ্র।

আজ সংগঠনের যুগে গ্রন্থাগারগুলির প্রয়োজনীয় ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। আধুনিক সংস্কৃতির বাহক এই গ্রন্থাগারের ভূমিকা প্রতিটি নাগরিককে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করা। প্রত্যেক জায়গায় বুদ্ধিজীবীদের একই পতাকাতলে আনতে হবে। যাতে ভারতের ভবিষ্যত সুষ্ঠুভাবে গঠন করা যায়। হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ এই বিষয়ে অগ্রহনীয় ভূমিকা পালন করে। ভারতে পুনর্গঠনের সময় সাধারণ গ্রন্থাগারকে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আধুনিক কৃষ্টির বানী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। প্রতিটি মানুষকে তাদের নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। গ্রন্থাগারের যে দায়িত্ব সেই সম্বন্ধে মানুষকে জ্ঞাত করতে হবে।

হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ বঙ্গের প্রথম প্রতিষ্ঠান যারা গ্রন্থাগার প্রসার ও উন্নয়নে এ দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে। অনুরূপ আন্দোলন ভারতের অন্য প্রদেশে অন্ধ্র মহারাষ্ট্র ও বরোদার মত কিছু করদ রাজ্যেও শুরু হয়। হুগলি জেলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগারগুলিকে একটি সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ঐ সম্মেলনে তুলসীচরণ গোস্বামী, বিধায়ক পৌরোহিত্য করেন। হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন সংগঠিত করবার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। সকলের কাছে সহযোগিতার জন্য আবেদন করা হয়। সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ বা ঐ জাতীয় সংগঠনের কাছে বার্ষিক এক টাকা (১ টাকা), এককালীন ২০০ (দুইশত) টাকা হারে চাঁদা দিয়ে পরিষদের সভ্য হতে অনুরোধ করা হয়।

১৯২৫ সালের ২৮শে ও ২৯শে মার্চ বাঁশবেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগারে হুগলি জেলার গ্রন্থাগার সমূহের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১) সভায় ঠিক হয় যে, বঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগারকে নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হোক এবং হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদও পূর্বোক্ত সংস্থার শাখা হিসাবে গঠিত হোক। নিয়মাবলী

প্রস্তুত করবার জন্য একটি উপ-সমিতি গঠিত হোক।

(ক) হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদকে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

(খ) সব জেলার সমস্ত গ্রন্থাগার ও বিদ্বজন সংস্থাকে বার্ষিক এক টাকা (১) চাঁদা দিয়ে সভ্য হবার আবেদন করা হয়।

২) জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, পৌরসভা ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থার নিকট আবেদন।

৩) গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য অনুরোধ করা ও গ্রন্থাগারের প্রাথমিক কাজ সমাজসেবা এবং শিক্ষাপ্রসার। কিভাবে অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করা যায় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া। সমস্ত গ্রন্থাগারের পরিচালক মণ্ডলীর কাছে প্রস্তাবগুলি পাঠিয়ে দিতে হবে।

৪) জেলার সমস্ত গ্রন্থাগার নিয়ে একটি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করা। সমস্ত গ্রন্থাগারকে তাদের বিবরণী ও অন্যান্য প্রকাশিত খবরাখবর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ।

৫) প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। পৌরসভার স্থানীয় বোর্ড ও জেলা বোর্ডের কাছে প্রতি গ্রামে কমপক্ষে ২ বা ৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনুরোধ করা।

৬) হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গ্রন্থাগারকে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আন্তর্গ্রন্থাগার লেনদেনের সুনিশ্চিত করা।

৭) প্রত্যেক গ্রন্থাগারকেই কিছু কর্মী তৈরী করবার ও বিদ্যার্থীদের প্রয়োজনে বিনা পারিশ্রমিকে বই পত্র দিয়ে সাহায্য করার আবেদন।

৮) গ্রন্থাগারগুলি জেলার ও স্থানীয় ইতিহাস, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার অনুরোধ।

৯) গ্রন্থাগারিকদের সংগঠন তৈরী করা। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করা ও ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থাগারে এই জাতীয় ভাব বিনিময় হওয়া প্রয়োজন।

১০) জেলার গ্রন্থাগারগুলিকে উপরোক্ত প্রস্তাবের অনুলিপি প্রেরণ ও কাগজে প্রচারের জন্য দেওয়া।

নিয়মাবলী ও নিয়ন্ত্রণ
৪ঠা জুন ১৯২৫ -এ গৃহীত

১) সংস্থার নাম : হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ।

২) পরিষদের উদ্দেশ্য : বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার বিশেষ করে হুগলি জেলায় নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগারগুলিকে পরামর্শ ও সাহায্য দান এবং সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন, বিভিন্ন স্তরে উন্নয়নের বাতাবরণ তৈরী করা।

৩) জেলার সমস্ত গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। বার্ষিক এক টাকা চাঁদার বিনিময়ে,

৪) সভা বা অ্যাসেম্বলি - নিম্নলিখিতদের নিয়ে গঠিত :

(১) পরিষদের পৃষ্ঠপোষক

(২) আজীবন সদস্য

(৩) সহযোগী সদস্য

(৪) প্রতি নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগারের তিন জন প্রতিনিধি

পৃষ্ঠপোষক : যে সমস্ত ব্যক্তি এককালীন ২০০.০০ (দুই শত) টাকা নগদ বা সম্পত্তি হিসাবে দান করবেন।

আজীবন সদস্য : যে সমস্ত ব্যক্তি এককালীন পঞ্চাশ (৫০) টাকা নগদ বা সম্পত্তি হিসাবে দান করবেন।

৬) **সহযোগী** : যে সমস্ত ব্যক্তি কোন সংস্থার সহিত জড়িত নন কিন্তু পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত ও পরিষদকে বার্ষিক এক টাকা চাঁদা দেন। সভা (অ্যাসেম্বলি) : কমপক্ষে বৎসরে একবার বসবে যখন বাৎসরিক রিপোর্ট ও পরবর্তী বৎসরের কার্যাবলী আলোচিত হবে।

৭) পরিষদের বার্ষিক সভায় পরিষদের ১ জন সভাপতি, ১ জন সাধারণ সম্পাদক, ২ জন যুগ্ম সম্পাদক, ১ জন হিসাব-পরীক্ষক ও কাউন্সিলের সভ্য নির্বাচিত হইবে।

৮) **কাউন্সিল** : কার্য্যনির্বাহী সভ্য ছাড়া আরও ১৫ জনকে নিয়ে কাউন্সিল গঠিত হবে। এঁদের মধ্যে কমপক্ষে ১০ জন নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগার সভ্যর প্রতিনিধি। কাউন্সিল প্রয়োজনে আরও কিছু সভ্যকে অতিরিক্ত সভ্য হিসাবে নিতে পারেন। কিন্তু এই সভ্য সংখ্যা কোন ভাবেই ২৫ জনের বেশী হবে না।

৯) নির্বাচনের এক মাসের মধ্যে কাউন্সিলের সভ্যদের বার্ষিক ২ (দুই) টাকা হারে চাঁদা দিতে হবে।

১০) কাউন্সিলই পরিষদের কার্যকরী কমিটি হিসাবে কাজ করবে। প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি বা নাকচ করবার ক্ষমতা থাকবে। ব্যক্তি বিশেষে নির্বাচন, আজীবন সদস্য ও সহযোগী সদস্যদের নির্বাচন করবে। সুষ্ঠভাবে পরিচালন করবার জন্য উপবিধি তৈরী করতে পারবে।

১১) কাউন্সিলের সভাপতিই চেয়ারম্যান হবেন, সাধারণ সম্পাদকই কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান হিসাবে থাকবেন। গত অভ্যার্থনা সমিতির একজন সদস্য বর্ত্তমান কাউন্সিলের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক হবেন। শূন্য পদে একজনকে কো-অপ্ট করা হবে।

১২) পরিষদের অফিস বর্ত্তমানে বাঁশবেড়িয়ায় হবে। হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ, ডাকঘর - বাঁশবেড়িয়া, জেলা - হুগলি।

১৩) কর্মীদের ও সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে প্রতিবৎসর সভ্যদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। স্থান নির্বাচন করবে কাউন্সিল।

১৪) স্থানীয় অভ্যর্থনা কমিটি তাঁদের সভাপতি কাউন্সিলের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচন করবে।

১৫) সম্মেলনের জন্য অভ্যার্থনা কমিটি নিয়মাবলী প্রস্তুত করবে।

১৬) যে কোনও বিষয় অ্যাসেম্বলির বার্ষিক সভায় সংশোধিত, বাতিল অথবা নতুন শর্ত আরোপিত হতে পারে।

১৭) নিম্নলিখিতদের নিয়ে পরিষদের প্রথম কাউন্সিল গঠিত হয়েছে।

(১) তুলসীচরণ গোস্বামী — এম. এ. বার-এট-ল, এম. এল. এ (সভাপতি)

(২) মনীন্দ্রনাথ রুদ্র — এম. এস. সি (সম্পাদক)

(৩) তিনকড়ি দত্ত — যুগ্ম সম্পাদক,

(৪) অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় — বি. এ. (যুগ্ম সম্পাদক)
(৫) যদুগোপাল রায় — হিসাব পরীক্ষক (যুগ্ম সম্পাদক)
(৬) কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় — বাঁশবেড়িয়া (সদস্য)
(৭) গুরুদাস রায় — বলাগড় ”
(৮) আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় — ভদ্রেশ্বর ”
(৯) বিজয়কৃষ্ণ রায় — বন্দিপুর ”
(১০) সতীশচন্দ্র মোদক — বি. এল., হুগলি ”
(১১) নরেন্দ্রলাল চৌধুরী — হুগলি ”
(১২) ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় — উত্তরপাড়া ”
(১৩) হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় — বৈদ্যবাটি ”
(১৪) ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস — সোমড়া ”
(১৫) বঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায় — বি. এল., রাধানগর ”
(১৬) হরিহর শেঠ — চন্দননগর ”
(১৭) বরদাপ্রসাদ দে — এম. এল. এ., চন্দননগর ”
(১৮) চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য — বি. এল., মানকুণ্ডু ”
(১৯) ধারানাথ ভট্টাচার্য — হরিপাল ”
(২০) প্রসাদদাস মল্লিক — বি. এল., হুগলি ”

হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের কাজ বেশ ভাল ভাবেই এগিয়ে চলছে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে যোগযোগ, উন্নয়নের ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমাজকল্যাণের নানারকম এর মধ্যে ছিল। উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মেলনের উদ্যোগে ১৯২৬ সালে ৮ ও ৯ মে (বঙ্গাব্দের ১৩৩৩ - ২৫ ও ২৬শে বৈশাখ শনি ও রবিবার কুমার ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাতীরস্থ বাসভবনে পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক ছিলেন উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মেলনের ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রায় সত্তর জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (হিতবাদী পত্রিকা), রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায়, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সুশীলকুমার ঘোষ, সত্যচরণ শাস্ত্রী, ড. প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধায়, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ আনোয়ার আলী ও অন্যান্য অনেকে।

সম্মেলনের শেষে গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, মনীন্দ্রনাথ রুদ্র - সম্পাদক, এবং ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ও তিনকড়ি দত্ত - যুগ্ম সম্পাদক।

১৯২৭ সালের ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর বাংলা ১৩৩৪-২৪শে ও ২৫শে ভাদ্র শনি ও রবিবার

চন্দননগরের নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন চারুচন্দ্র রায়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মতিলাল রায়, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, প্রভাত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিহর শেঠ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ১৯২৮ সালে (১৩৩৫ বঙ্গাব্দে) বাঁশবেড়িয়ায় হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

রাজা ক্ষিতীশদেব রায় হুগলি জেলার গ্রন্থাগার সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক ও নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সমিতির পক্ষে বঙ্গের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী নবাব মুসাররফ হোসেন খাঁ-কে বাঁশবেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্য সাদর সম্ভাষণ জানান।

১৯২৮ সালের পরে চার বৎসর কোন জেলা সম্মেলন হয় নি। কিন্তু আন্দোলনের কাজ এগিয়ে যেতে থাকে। কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় তখন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। তিনি গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। এই বিষয়ে তিনকড়ি দত্ত মহাশয়কে লেখা একটি চিঠির উল্লেখ করা প্রয়োজন। চিঠিটি ইংরাজীতে লেখা কিন্তু তার বঙ্গানুবাদ নীচে দেওয়া হল। তিনি ঐ সময় কলকাতায় ছিলেন।

২১ এফ, রাণী শঙ্করী লেন।
কালীঘাট, কলকাতা
২২.১.১৯৩২

প্রিয় তিনকড়ি,

বে-সরকারী প্রস্তাবাবলীর জন্য আগামী ১লা থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী এই চারদিন ধার্য করা হয়েছে। আমার লাইব্রেরি অনুসন্ধানকারী প্রস্তাবগুলি উদ্বোধনী দিনে অর্থাৎ ১লা ফেব্রুয়ারী তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছে। আমি এখনো পর্যন্ত আমার বক্তব্য ঠিক করে উঠতে পারি নি। তোমার যদি বিশেষ কিছু বক্তব্য থাকে আমাকে জানাও। আমার গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কিছু বইয়ের প্রয়োজন। রঙ্গনাথনের বইগুলি পেলে কাজে লাগবে। বে-সরকারী সভ্যদের বিল শুনানীর দিন আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী ধার্য হয়েছে। সরকারী কার্যাবলী ও সরকারী বিলের জন্য ১৫ থেকে ১৯-এ ফেব্রুয়ারী এই পাঁচ দিন ধার্য হয়েছে। আমি এই অধিবেশনে ৬টি বিল উত্থাপন করব আগামী ৫ তারিখে।

তোমার স্নেহের
সহি - মুনীন্দ্রদেব রায়।

উপরোক্ত পত্রটি বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক দলিল। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (Legislative Council) Non-Official Member's Business Resolution -এ মুনীন্দ্রবাবুকে গ্রন্থাগার আইনের প্রস্তাবক রূপে দেখা যায়। ভারতে গ্রন্থাগার আইনের প্রথম রূপকার তাঁকেই বলা যায়। তিনি তথ্যবহুল ও সারগর্ভ দাবী নিয়ে সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। উত্তরদানকালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। সরকারের আর্থিক অসঙ্গতির উল্লেখ করে প্রস্তাবটি তুলে নিতে বলেন। মূল Resolution টা এখানে সংযোজিত হ'ল। মূল প্রস্তাবটি ইংরাজীতে লেখা। কিন্তু এখানে বঙ্গানুবাদ করা হল। যদিও জানি মূল তাৎপর্য এতে নষ্ট হয়ে যায়।

প্রস্তাবাবলী (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২)
বেসরকারী সভ্যের আনা কার্যাবলীর প্রস্তাবাবলী
(সাধারণ মানুষের স্বার্থে)

গ্রন্থাগার প্রসারণ

মুনীন্দ্রদেব রায় : আমি পরিষদের সামনে উত্থাপন করতে চাই যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া রাজ্যে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইক। গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের ঐ কমিটিতে কো-অপ্ট করিয়া লইবার ক্ষমতা দেওয়া হউক। ঐ কমিটি তিন - মাসের মধ্যে তাদের বক্তব্য পেশ করিবে। সভ্যগণ :

১) মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী — বঙ্গদেশ

২) শিক্ষা অধিকর্তা — বঙ্গদেশ

৩) রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ — নসিপুর

৪) ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত — এম. এ. ডি. এল.

৫) শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় — বার-এট. ল.

৬) মৌলভী আব্দুল করিম

৭) খান বাহাদুর মৌলভী আজিজুল হক্

৮) রেভ. বি. এ. নাগ

৯) স্যার ল্যান্সলট ট্রাভারস্ কেটি. সি. আই. ও. বি. ই

১০) স্বয়ং

"মাননীয় সভামুখ্য মহোদয়, এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবার মূলে আমার মনের উদ্দেশ্য কি তাহা ব্যক্ত করিতে চাই। কি অবস্থায় বর্তমান গ্রন্থাগারগুলি চলিতেছে তাহা নিরূপণ করা এবং ইহাদের অকৃত কাজগুলি সম্যকরূপে ও প্রয়োজনানুসারে করিতে পারে এমন ধরণের একটি সংস্থার কথা ভাবিয়া বাহির করাই হইবে এই তদন্ত সমিতির উদ্দেশ্য। বয়স্ক শিক্ষার সমস্ত দিকই এই সমিতিকে খতাইয়া দেখিতে হইবে। যদি ইহা এক ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে পারে তবে আমার বিশ্বাস আমাদের জননির্বাচিত শিক্ষামন্ত্রী এই সমিতির কাজ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়া নিজেই স্বেচ্ছায় আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হইবেন। যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় আইন ছাড়া গ্রন্থাগারের সুসংগঠিত আদান প্রদান ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করিতে পারে না। আইনের ক্ষমতা ছাড়া গ্রন্থাগার বিশেষ টিকিয়া থাকিতে পারে এবং উন্নতিও করিতে পারে, কিন্তু ক্ষমতাদায়ক আইন ছাড়া একটা সুস্থির প্রণালীবদ্ধ পরিচালনা এবং গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বিকাশ হয় না। ব্রিটিশ রাজের অধীনস্থ উপনিবেশ ও রাজ্যগুলি সহ প্রায় পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হইয়াছে। সর্বপ্রথমে গ্রেট ব্রিটেনের কথাই ধরা যাক। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর -এ শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি লর্ড ইউস্টেস পার্সি তাঁহার পূর্ববর্তী সভাপতি মিস্টার ট্রেভেলিয়ানের গঠিত সমিতিকে মানিয়া লন। সর্বজনীন গ্রন্থাগার আইন প্রমুখে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ইতিপূর্বে করা হইয়াছিল তাহা যথেষ্ট কিনা এবং ঐ আইনসমূহ দ্বারা পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির ও অন্যান্য সর্বজনীন গ্রন্থাগারগুলি পরস্পর সম্পর্কে এবং দেশের সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইংলন্ড ও ওয়েলসের সর্বত্র ঐ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ছড়াইয়া দেওয়ার উপায় আছে কি-না তাহার সম্বন্ধে তদন্ত করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। সমিতির উনচল্লিশটি সভা

হইয়াছিল। গ্রাম ও শহরে সার্বজনীন গ্রন্থাগারগুলির কর্তৃপক্ষের নিকট এক প্রশ্নমালা পাঠানো হইয়াছিল। তাহার উত্তরে বহু তথ্য পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা ছকের আকারে সাজানো হইয়াছে। সমিতি গ্রন্থাগার, পৌরসভা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, গ্রন্থাগারিক ও ব্যক্তিবিশেষকে লইয়া আরো বাহান্নজন সাক্ষীর সাক্ষ্যও গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহারা একমত হইয়া একটি প্রতিবেদন উপস্থিত করিয়াছেন এবং যথাসময়ে ঐ সুপারিশগুলি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। বর্তমান আইনে লন্ডন নগর রাজধানীর বরো, কাউন্টি বরো ও কাউন্টির পরিষদ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালাইবার অধিকারী। ইহারাই প্রধান কর্তৃপক্ষ এবং প্রত্যেকটি নিজ অঞ্চলে স্বাধীন, কিন্তু কাউন্টির মর্যাদাপ্রাপ্ত নয় এমন স্থানে পরিষদ অর্থাৎ বরো, শহরধর্মী ডিস্ট্রিক্ট এবং গ্রাম্য প্যারিস গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ থাকিতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের অর্ডিন্যান্স বলে কেপ কলোনির প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে সেখানে প্রকাশিত প্রত্যেক গ্রন্থের একখণ্ড বিনামূল্যে পাওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি তাহাদের এলাকাধীন গ্রন্থাগারগুলিকে অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করে। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে নাটালের ব্যবস্থাপক সভা আইনত সমিতিবদ্ধ নয় এরূপ সাহিত্যিক ও অন্যান্য সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আইন পাশ করে।

কানাডায় ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ গ্রন্থাগার আইনে জিলা পরিষদগুলিকে চার রকমের গ্রন্থাগার স্থাপনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে : (১) বালকদের ও করদাতাদের ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার, (২) পৌরসভার করদাতাদের ব্যবহারযোগ্য সাধারণ সর্বজনীন গ্রন্থাগার, (৩) শুধু শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ সম্বন্ধীয় পেশানুসারি গ্রন্থাগার এবং (৪) পৌরসভার কর্তৃত্বাধীন কোন সর্বজনীন সংস্থার গ্রন্থাগার।

অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশগুলি সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের আইনের কতকটা অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন আইন পাশ করিয়াছে। নিউ ওয়েলস, কুইনসল্যান্ড ট্যাসম্যানিয়া, নিউজিল্যান্ড দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গস্বরূপ গ্রন্থাগার আইনপ্রণয়ন করিয়াছে। যাহাতে এখানেও সেই একই ধারার একটা সূত্রপাত করা যায় শুধু এই আশায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতির কথা আমি এইমাত্র উল্লেখ করিলাম।

পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের, বিশেষ করিয়া মহাযুদ্ধের (প্রথম) জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত দেশগুলির গ্রন্থাগারের অপূর্ব উন্নতি সম্বন্ধে অবতারণা করা বাহুল্য মাত্র। কিভাবে এই রণবিধ্বস্ত দেশগুলি শিক্ষার সাধারণ মান উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিতেছে তাহা দেখইবার জন্য শুধু কয়েকটি কথাই উল্লেখ করিতে চাই। যথা চেকোশ্লোভাকিয়া ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৩৪০০ হইতে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ১৬,২০০তে দাঁড়াইয়াছে। গ্রন্থাগারের জন্য প্রতি বৎসর পনর লক্ষ টাকা সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। পোলান্ডে ৩০০০ গ্রন্থাগার আছে। ইহার ব্যবস্থাপক সভায় যে নূতন গ্রন্থাগার আইনের খসড়ার রূপ দেওয়া হইতেছে তাহা আইনে পরিণত হইলে ১৫০০০ গ্রন্থাগার দেশময় স্থাপিত হইবে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাগার আইনে ফিনল্যান্ডে সমস্ত গ্রন্থাগারকে রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার পর্ষদের অধীনে আনা হইয়াছে। ইহার কর্তা একজন গ্রন্থাগার আধিকারিক। ১০০০ গ্রন্থাগার এখন ৫৩৭ গ্রাম্য কমিউনে পুস্তক আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সাকুল্য ব্যয়ের অর্ধেক সরকার বহন করে। শিক্ষামন্ত্রীর পরিচালনাধীনে নরওয়েতে ষাটটি পৌরসভা গ্রন্থাগার এবং এক হাজারের উপর গ্রাম্য গ্রন্থাগার আছে। এই মস্তক সরকারী সাহায্য দেয় এবং গ্রন্থাগারের সঠিক মান যাহাতে বজায় থাকে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখে। সুইডেনে ৮৫০০ গ্রন্থাগার আছে। ইহারা স্থানীয় সংস্থা হইতে প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ টাকা এবং সরকার হইতে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা সাহায্য পায়। ডেনমার্ক যতটা সম্ভব সহযোগিতামূলক গ্রন্থাগার

ব্যবস্থা আছে। পাঠক যেখানেই বাস করুক না কেন, সেখানেই বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে পুস্তকবিনিময়ের দৌলতে দেশের সমস্ত প্রকার পুস্তক সংগ্রহই হাতের কাছে পায়। ইহার ফলে যথার্থ চাহিদা মিটিতেছে অথচ একই বইয়ের অতিরিক্ত সংখ্যা কিনিবার খরচ কমিয়া যাইতেছে। এই অপূর্ব সহযোগিতা ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের গ্রন্থাগার আইনের একটি ফল। এই আইন এক অর্থে দেশের গ্রন্থাগারগুলিকে আপামর জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া উহাদের উন্নতিসাধন ও দেখাশুনা করার ভার শক্তিশালী গ্রন্থাগার পরিদর্শক সহায়তাপুষ্ট একটি রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার অধিকারের হাতে দিয়াছে। জার্মানীতে ভল্কস বুকারেইন দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং লিপজিগের ওয়ালটার হফম্যানের নির্দেশে উহা একমাত্র শিক্ষাদানের শক্তিশালি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কারণ প্রত্যেক পাঠকের বিকাশের উপযোগী মালমসলা পাইবার জন্য ইহা সর্বপ্রকার সাহায্য করিয়া থাকে। ইটালীর ফ্যাসীপন্থীসরকার দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য গ্রন্থাগারের একজন প্রবীণ আধিকারিক নিযুক্ত করিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া পাঁচ বৎসরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের সংকল্প নিয়াছে, ৪৬ হাজার ৭ শত ৫৯টি গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছে এবং ৫০ হাজার ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া দিয়াছে।

বুলগেরিয়ার শিক্ষামন্ত্রী ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে একটি আইন করিয়াছে। ইহার ফলে চিতালিস্তাদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। চিতালিস্তাস নাট্যশালা, চলচ্চিত্র, মিলনমন্দির সম্বলিত এক শ্রেণীর গ্রন্থাগার। যুগোশ্লাভিয়ার শিক্ষামন্ত্রক গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ বিভাগ স্থাপন করিয়াছে। এই বিভাগ এক হাজারের উপর গ্রাম্য গ্রন্থাগারের পত্তন করিয়া নিরক্ষরদের জন্য সাত শত শিক্ষাকেন্দ্র বসাইয়াছে। ইহাতে হাজার হাজার নরনারী অক্ষরজ্ঞান লাভ করিতেছে। বিপ্লব এবং দেশবিভাগ সত্ত্বেও হাঙ্গেরীর শিক্ষামন্ত্রী ফলপ্রসু জনশিক্ষার প্রয়োজন এবং উপায় সম্বন্ধে ব্যাপক তদন্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। তদন্তের ফলে বয়স্ক শিক্ষা আইনের যে খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার তৃতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত আলোচনা আছে এবং গ্রাম ও শহরে গ্রন্থাগার স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়া বয়স্ক শিক্ষা নূতন ঝোঁক এবং উন্নত ধারার সন্ধান দিতেছে। প্রয়োজনবোধ ও স্পৃহা জাগানোকে শিক্ষার মূল বিষয় ধরিয়া বয়সের উপর জোর না দিয়া এই দুইটির উপরই জোর দেওয়া হয়। ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজের প্রগতির পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া অনবরত মনের প্রসারতা সাধন ও সামঞ্জস্য বিধানের মূল ভাবটি যাহাতে জনমনে দাগ কাটে তাহার চেষ্টাও করা হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব মেক্সিকোতে জনগণের মধ্যে বিদ্যার্চচার আকাঙক্ষা জাগাইয়াছে। জনশিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে একটি গ্রন্থাগার বিভাগ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার কাজ এতটা ফলপ্রসু হইয়াছে যে মেক্সিকোতে এখন ১৫০০ সর্বজনীন গ্রন্থাগার, ১০০০ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ৮০০ শিল্প বিষয়ক গ্রন্থাগার এবং ৫০০ গ্রাম্য গ্রন্থাগার রহিয়াছে। এই বিভাগ এল লাইব্রেরেল পিউএবল নামক একখানা গ্রন্থপঞ্জীর সাময়িকী চালায়।

জাপানে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এক রাজাজ্ঞায় এই মর্মে ঘোষণা করা হয় "এখন হইতে এই পরিকল্পনা করা হইল যে, শিক্ষা এমনভাবে প্রসারিত হইবে যাহাতে কোন গ্রামে যেন একটি নিরক্ষর পরিবার না থাকে বা কোন পরিবারে যেন একটি নিরক্ষর লোক না থাকে"। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে জাপানে গ্রন্থাগার আইন প্রথমে পাশ হয়। ১৯২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে জাপানে ৪৩৩৭ টি গ্রন্থাগার ছিল। এই গ্রন্থাগার আইন এখন পরিমার্জন করা হইতেছে। ফিলিস্তিন, চীন এবং প্রাচ্যের অন্যান্য কোন কোন দেশে গ্রন্থাগার ক্রমাগত বাড়িতেছে. এমন কি, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ১৫ জন অধিবাসীর বাস একটি ক্ষুদ্রতম দ্বীপেও গ্রন্থাগারের সুবিধা দেওয়া হইতেছে।

এখন আমরা ভারতের কথায় আসিব। গ্রন্থাগারের প্রসার সাধনে বরোদা রাজ্য অগ্রণী হইয়াছে।

পাঞ্জাবে সরকার সমস্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে আপামর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থাও আছে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবে ১৭৬৯ টি গ্রন্থাগার ছিল। যুক্ত প্রদেশের চারটি জিলায় সরকারী ব্যয়ে পরীক্ষাধীনভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। বাক্স বোঝাই বই লোকের চাহিদা বাড়াইতেছে ও মিটাইতেছে। মুক্ত হস্তে প্রদেশময় সরকারী সাহায্য দেওয়া হইতেছে। মাদ্রাজ সরকার অর্ধেক সাহায্য দেওয়া প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থাও আছে। আমার খুবই আনন্দ হইত যদি বাঙ্গালার একটি ভাল চিত্র দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু না পারার জন্য আমি দুঃখিত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতের বাঙ্গালা প্রদেশ অন্তত গ্রন্থাগারের ব্যাপারে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। কলিকাতার কথা বাদ দিলে এই প্রদেশে এখন একটি মাত্র গ্রন্থাগারই আছে যাহা মাসিক ২৫ টাকা সরকারী সাহায্য পায়। এই বিষয়ে সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। অতীতের অকার্যের জন্য এখন প্রায়শ্চিত্ত করার সময় আসিয়াছে। আশা করি, প্রস্তাবিত তদন্ত সমিতি এই প্রদেশে গ্রন্থাগারের প্রসারের ব্যাপারে নূতন যুগের সূচনা করিবে।

এখন যখন আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর যোগ্য পোষকতায় প্রাথমিক শিক্ষা আইন অচিরেই বলবৎ হইতে চলিয়াছে তখন এই সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার মান ঠিকভাবে বজায় রাখার বা অতিরিক্ত পাঠের দ্বারা তাহা পরিপূরণ করার কোন ব্যবস্থা আবশ্যক কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। এরূপ কোন ব্যবস্থা না করা হইলে অক্ষরজ্ঞান ভুলিয়া যাওয়ার বিপদ আছে কিনা তাহা আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে। অংশত যদি তাহা হইয়া থাকে তবে এই শিক্ষায় ব্যয়িত অর্থকে সাধারণের অর্থের নিছক অপচয় বলা যায় কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ? অক্ষরজ্ঞান ভুলিয়া যাওয়া হইতে সতর্ক থাকা অথচ অল্পব্যয়ে বা বিনাব্যয়ে জ্ঞানের পরিধি বাড়াইবার জন্য প্রত্যেকের সহজ আয়ত্তের মধ্যে সুবিধাজনক ব্যবস্থা করাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য ছিল না কি? ইহা সর্বজনস্বীকৃত যে, শিক্ষার উচ্চ আদর্শের রূপায়ণের জন্য লাভজনক ভাবে সদ্ব্যবহার করার যদি কোন উপায় থাকে তবে তাহা একমাত্র গ্রন্থাগারই। সুসজ্জিত ও সুপরিচালিত গ্রন্থাগার নিজেই আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করে।

অক্ষরজ্ঞান ভুলিয়া যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে আমি রুমানিয়ার কথা উল্লেখ করিতে চাই। সেখানে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ হইতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ছিল। বহু অর্থ ব্যয়ে অর্জিত অক্ষরজ্ঞান বজায় রাখা ও চর্চা করার জন্য যে সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক যোগান আবশ্যক ছিল তাহার ব্যবস্থা না করিয়া রুমানিয়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনার জন্য ব্যয়িত অর্থের অপচয় ও ব্যর্থতা সম্প্রতি বুঝিতে পারিয়াছে। রুমানিয়ার আর্থিক সম্বল কম ছিল বলিয়া 'অ্যাত্র' ও 'অ্যাথেনিয়ামগুলিকে' গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের কাজে নামিতে রাজী করাইল এবং সর্বসাধারণের জন্য আট হাজারের উপর বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে উন্মুক্ত করিয়া দিল। আশা করি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিবেচনা করার সময় রুমানিয়ার কথা উপেক্ষা করা হইবে না।

মনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক দেশের জনগণ উহার মস্তবড় আর্থিক সম্পদ। যাহা কিছু এই মানব সম্পদকে রক্ষা করে এবং ইহাকে অধিকতর উৎপাদনক্ষম ও মূল্যবান করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে তাহারই দেশের নিকট একটি আর্থিক মূল্য থাকে। এই মানব সম্পদে আর্থিক মূল্য বাড়াইবার পক্ষে গ্রন্থাগার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সর্বজনীন সংস্থার মধ্যে অন্যতম। টাকা-আনা-পাইয়ের মূল্যে এই মানব সম্পদের বিপুলতার কথা না ভাবিলেও জনগণের এই আর্থিক মূল্য একটা বাস্তব জিনিস। মানবসম্পদের আর্থিক মূল্য বাড়াইবার পক্ষে যেহেতু বয়স্ক শিক্ষার এই নূতন আধারের উন্নয়ন, প্রসারণ এবং শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলী গড়িয়া তোলা প্রয়োজন সেইহেতু এই প্রদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা খতাইয়া দেখা ও ইহার ভবিষ্যত উন্নতির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে আমি তদন্ত সমিতি গঠনের এই প্রস্তাব সভার গ্রহণার্থ উত্থাপন করিলাম।" সময় বিকাল ৫-৪৫ মিনিট।

জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন : আপনারা সকলে জানেন আমার বন্ধু মুনীন্দ্রদেব রায় বঙ্গে গ্রন্থাগার প্রসার, উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য কি রকম মনোনিবেশ করেছেন। যে বক্তব্য তিনি রেখেছেন তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় কি রকম পরিশ্রম ও তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের সকলকে গ্রন্থাগার উন্নয়নের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে নিয়ে সরকারের অসুবিধার কথা আমায় জানাতে হচ্ছে। প্রথমত গ্রন্থাগার বিষয়ে সরকারী নীতি কি প্রস্তাবক মহাশয়কে পূর্বে বলা হয়েছে। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব, সরাসরি ও প্রাথমিক ভাবে প্রাদেশিক সরকারের নয় কিন্তু জনসাধারণের উদার আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

এবং দ্বিতীয়ত নীতি ছাড়া বর্ত্তমানে আর্থিক দুরবস্থার জন্য প্রস্তাবকের বক্তব্য অনুসন্ধানকারী কমিটি গঠন করা সম্ভব নয়। কমিটির জন্য যে ব্যয় হবে সে সম্বন্ধে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, অর্থ ব্যয় করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত তর্কের খাতিরে যদি ঐ কমিটির সুপারিশ গৃহীত হয় তবে সেই সুপারিশ অদূর ভবিষ্যতে কার্যকরী করা যাবে না। দু তিন বছরের মধ্যে অবস্থা পাল্টে যাবে। প্রস্তাবক জানিয়েছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা আইন গৃহীত হয়েছে সুতরাং সরকার গ্রন্থাগারের বন্দোবস্ত করবেন। কারণ তা না হলে যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হচ্ছে তারা আবার নিরক্ষর হয়ে যাবে। কিন্তু আইনটি এখনও কার্যকরী করা হয় নি। সুতরাং অপেক্ষা করে দেখতে হবে আজ যদি কমিটি গঠন করা হয় তাদের বক্তব্য পরবর্ত্তী সময়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ এক রকম নাও হতে পারে। সুতরাং প্রস্তাবক মহাশয়কে আবার চিন্তা করতে অনুরোধ জানাই। এ ছাড়া আর্থিক অস্বচ্ছলতা বড় অন্তরায়। আমি তাই প্রস্তাবককে তাঁর প্রস্তাব তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। মুনীন্দ্রদেব রায় -এর প্রস্তাবটি যেহেতু সভায় উপস্থাপিত হয়েছিল, সেই জন্য মৌলভী সৈয়দ জালালউদ্দিন হাসান আপত্তি জানিয়ে বলেন ভোটে দেওয়া হউক। ভোটে দেওয়া হয় ও নাকচ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কাজটি সমগ্র হুগলি জেলার গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় অবস্থায় বেসরকারী উদ্যোগে প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন ও সমীক্ষাকরণ। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সফল করতে হলে পূর্ব পদক্ষেপ হিসাবে সমগ্র জেলার সমস্ত গ্রন্থাগারের সরজমিনে পরিদর্শন ও পর্য্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা। অর্থাভাব, কর্মীর অভাব, জেলার চতুর্দিককার অভ্যন্তরে ও দুরভিগম্য স্থানে যাতায়াতের অসুবিধার কারণে কিছু করা সম্ভব হচ্ছিল না। সেই সময় হুগলি জেলার কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় ও তিনকড়ি দত্ত, প্রমীলচন্দ্র বসুকে এই দুরূহ কষ্টসাধ্য কাজটি করবার অনুরোধ জানাতে বসু নিঃস্বার্থভাবে কাজটি করবার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তারা তিনজনে মিলে এই কাজের পরিকল্পনা করেন। এবারে শ্রী বসুর নিজের লেখা এক কাহিনী বর্ণিত হল।

"হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এই কাজে সহযোগিতা চেয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, ডিস্ট্রিক্ট স্কুল ইনস্পেকটর প্রভৃতির কাছে চিঠি লেখা হোল এবং উত্তরও এসে গেল। মুনীন্দ্রবাবু ও তিনকড়ি বাবু ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে এবং সংবাদপত্র মারফৎ জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের এবং স্কুল, কলেজ ও প্রতিষ্ঠানাদির কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। গ্রন্থাগার অবস্থার সরজমিন পরিদর্শন, আলোচনা এবং আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্নের উদ্দেশ্যে পরিদর্শকের জন্য ১৯৩২ সালের ২৪শে নভেম্বর থেকে ২৪শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ণ একমাসের (৩১ দিনের) ঠাসবুননের এক কর্ম ও ভ্রমণ সূচী তৈরী করা হোল এবং এই কর্মসূচী গন্তব্য স্থানের সর্বত্র কাজ শুরু হবার পূর্বেই প্রেরণ করা হোল।

যথাসময়ে কাজ আরম্ভ হোল। কার্যসূচী নিখুঁতভাবে অনুসরণ করে কাজ সমাপ্ত হবার পর নানা তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ গ্রন্থাগার পরিদর্শন ও সমীক্ষার দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গ এক প্রতিবেদন পরিদর্শনকারী

কর্তৃক প্রণীত হোল। সেই সময়ে হুগলি জেলার রাজবলহাটে পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অনাথনাথ বসু, অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং বঙ্গ দেশের তৎকালীন অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তির উপস্থিতিতে এক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে হুগলি জেলার অবস্থা ও গ্রন্থাগারের উন্নতির উপর উপায় সম্পর্কীয় এই প্রতিবেদনটি উপস্থাপিত ও সমাদৃত হয়। অন্য কোথাও এই প্রতিবেদন এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।

প্রতিবেদনটি ইংরাজীতে রচিত হয়েছিল। হুগলি জেলার গ্রন্থাগার পরিদর্শন ও সমীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিদর্শককে কি ধরণের কাজকর্ম করতে হয়েছিল তার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। এই সমীক্ষার জন্যে পরিদর্শক ৩১ দিনের জেলার সদর বা হুগলি শ্রীরামপুর এবং আরামবাগ এই তিন মহকুমার ৫০টি শহরে ও গ্রামে উপস্থিত হয়ে ৪০টি সাধারণ গ্রন্থাগার (প্রধানত চাঁদামূলক গ্রন্থাগার), ২৮টি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও কয়েকটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন এবং বেশ কয়েকটি গতায়ু গ্রন্থাগারের সন্ধান পান। পরিদৃষ্ট গ্রন্থাগারগুলির প্রত্যেকটি সম্পর্কে ৩২ দফার তথ্য, পরিসংখ্যান ও সংবাদ যতটা সম্ভব সংগ্রহ করেন। সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লাইব্রেরির স্থানীয় সমস্যা ও সাধারণ সমস্যা এবং ঐ সমস্যা দূরীকরণের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অধিকাংশ স্থানে আয়োজিত জনসভায় (কোন কোনদিন ৩/৪টি সভারও আয়োজন ছিল) গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন এবং শ্রোতাদের নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দেন। ছোট ছোট দলের মধ্যে উন্নত দেশের আধুনিক গ্রন্থাগার নীতি ব্যাখ্যা করেন এবং বৈজ্ঞানিক প্রথার ভিত্তিতে কিভাবে গ্রন্থাগার পরিচালিত হয় তার ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রদর্শন করেন। সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরিগুলির প্রতিকারযোগ্য ত্রুটিগুলি দেখিয়ে তার প্রতিকারের পন্থা সম্পর্কেও পরামর্শ দেওয়া হয়।

পরিভ্রমণ ও গ্রন্থাগার পরিদর্শন কালে পরিদর্শক সকল শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসেন ও যাদের সাথে গ্রন্থাগারের সমস্যাদি আলোচনা করেন তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক, মহকুমা শাসক, কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও কমিশনার, কয়েকটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সদস্য, সার্কেল অফিসার, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ, প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রবৃন্দ, সংবাদপত্র প্রতিনিধি, সাহিত্যিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, জমিদার, ব্যবসায়ী, লাইব্রেরি ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানাদির সভাপতি, কর্মসচিব ও সদস্যবৃন্দ, গ্রন্থাগারের সভ্য ও গ্রন্থপাঠক, রাজনীতিবিদ, অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন অথচ অনুন্নত জনসাধারণ — অর্থাৎ যাঁহারা সমাজের সকল স্তরের ও সকল মতের লোক।

জেলার যে সকল সাধারণ গ্রন্থাগারের এই সময় অস্তিত্ব ছিল এবং যেগুলি পরিদৃষ্ট হয়েছিল তার মধ্যে প্রাচীনতম দুটি গ্রন্থাগার ছিল চুঁচুড়ায় অবস্থিত হুগলি পাবলিক লাইব্রেরি ও কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি। এই দুটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৮৫৪ ও ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে। যে গ্রন্থাগারগুলি পরিদৃষ্ট হয়েছিল সেগুলির প্রতিষ্ঠাকালের তারিখ ও তৎকালীন গ্রন্থ সংগ্রহের পরিমাণসহ গ্রন্থাগারগুলির নামের তালিকা নীচে দেওয়া হোল। জানি না চল্লিশ বছরেরও অধিক কাল পরে এই সকল গ্রন্থাগারের সবগুলির আজও অস্তিত্ব আছে কি না এবং তাঁদের অবস্থাই বা কি? প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সম্পর্কে সরেজমিনে এই বিশদ সমীক্ষা বঙ্গদেশে এবং সম্ভবত সর্বভারতে এ ধরণের সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার সমীক্ষা। এই সমীক্ষার অনতিকাল মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক কলকাতা, হাওড়া জেলায় এবং কুমিল্লায় গ্রন্থাগার সমীক্ষার কাজ চালান হয়।"

১৯৩৩ সালের ২৭শে জানুয়ারী হইতে ২৯শে জানুয়ারী (বঙ্গাব্দের ১৩৩৯ - ১৪ই মাঘ হইতে

১৬ই মাঘ) শুক্র, শনি ও রবিবার শ্রীরামপুরে কিশোরীলাল গোস্বামী মেমোরিয়াল হলে পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন হুগলি মহসীন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায়, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়, ফনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বরদাপ্রসাদ দে, ড. গুরুদাস রায়, ড. পঞ্চানন নিয়োগী, নির্মলচন্দ্র ঘোষ, প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, তুলসীচরণ গোস্বামী, তিনকড়ি দত্ত, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উইল্‌কিন্‌সন, শিক্ষা সচিব খাজা নাজিমুদ্দিন প্রমুখ।

৮/১০ বছর এই পরিষদ বিশেষ সক্রিয় ছিল। পরিষদের নানা প্রচার ধর্মী কাজকর্ম ছাড়া ১৯৩৪ সালে ২টি কাজ বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। এই দুটি কাজের জন্য প্রমীলচন্দ্র বসুর অবদান অতুলনীয়। বিশেষ করে হুগলি জেলার গ্রন্থাগার সমীক্ষা সম্পর্কে। এই জাতীয় সমীক্ষা এর আগে ভারতে আর কোথাও হয় নি।

বঙ্গদেশে প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ শিবির ১৯৩৪ সালের ১লা জুন থেকে ১৫ই জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক প্রমীলচন্দ্র বসু এই শিবির পরিচালনা করেন। শিবির চলাকালীন তৎকালীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক খান বাহাদুর আসাদুল্লা, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ এই শিক্ষণ শিবিরে এসেছিলেন। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে যাঁরা শিক্ষার্থী ছিলেন তাদের মধ্যে নয় জনের নাম ও ঠিকানা নীচে দেওয়া হ'ল —

১) বীরেন ভৌমিক — রামমোহন লাইব্রেরি, ঢাকা

২) নক্ষত্রলাল সেন, এম. এ. — ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলকাতা

৩) সুরেন্দ্রনাথ দাস, বি. এ. — শিক্ষক, ই. আই. রেল হাই স্কুল, আসানসোল

৪) শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. এ. — জিরাট, আশুতোষ স্মৃতিমন্দির

৫) বিভূতিভূষণ বাগচী — চন্দননগর পুস্তকাগার

৬) ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — দেশবন্ধু স্কুল, চুঁচুড়া

৭) ফণীভূষণ মল্লিক, বি. এ. — বাঁশবেড়িয়া

৮) অপূর্বধন মুখোপাধ্যায়, বি. এ. — বাঁশবেড়িয়া

৯) দেবীকুমার গোস্বামী, এম. এ. — কলকাতা

১০) ....

হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কিভাবে উন্নতি করা যায় সে বিষয়ের কথা স্মরণে রেখে জেলার গ্রন্থাগারগুলির প্রকৃত অবস্থা কি তা জানার জন্য গ্রন্থগার সমীক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। পরিষদের প্রথম সম্মেলনেই হুগলি জেলার গ্রন্থাগার সমূহের একটি ডাইরেক্টরি তৈরীর প্রস্তাব গৃহীত হয় সেজন্য একটি নির্দিষ্ট ফর্মও তৈরী হয়েছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের প্রবর্তনের জন্য যে কমিটি গঠিত হয় সেই কমিটিরও অন্যতম সদস্য ছিলেন কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়, কারাগার সংক্রান্ত কমিটিতে থাকাকালীন তিনি কারাগারে গ্রন্থাগার ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৫ সালে মাদ্রিদ শহরে (স্পেনে) দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী কংগ্রেসে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ঐ বিশ্বসভায় তিনি এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে একদিকে বিদেশীদের যেমন অভিভূত করেছিলেন অপরদিকে ভারতের নাগরিকদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূলনীতি ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে উৎসাহী হতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। ঐ মহতী সভায়

দেবরায় মহাশয়ের বক্তৃতা প্রসঙ্গে একটি উক্তি স্মরণ যোগ্য "His remarkable speech at the Congress drew the unstinted praise and admiration of all and he was awarded the signal honour of being the first speaker in the first day's session."

এই সময় থেকে যেন বাতাসে আমরা বারুদের গন্ধ পেতে থাকি। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু। পৃথিবীর সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ভারত দ্বিখণ্ডিত হল ও স্বাধীন হল। স্বাধীনতার পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়। এই পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের কথাও বলা হয়। বিভিন্ন জেলাতে গ্রন্থাগার পরিবেশ সুষ্ঠুভাবে পরিবায়িত করবার জন্য প্রত্যেক জেলাতে গ্রন্থাগার সমিতি গঠনের কথা বলা হয়। জেলা গ্রন্থাগার সমিতি কিভাবে ও কাদের নিয়ে গঠিত হবে তার একটা কাঠামোও তৈরী করে প্রত্যেক জেলাতে জেলা সমাহর্তার নিকট পাঠানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি ও হাওড়া জেলাতে আগে থেকেই জেলা গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ দুটো জেলাতে বেসরকারী ব্যক্তিদ্বয় সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁদের ঐ পদেই রেখে জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে পুনর্গঠিত হয়। হুগলিতে এই সভা ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৪ বেলা ৩টেয় বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও হুগলির বাঁশবেড়িয়ার সু-সন্তান তিনকড়ি দত্ত সভাপতিত্ব করেন। সভায় ঠিক হয় সমিতি রেজিস্ট্রিকৃত করা হবে এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে সমিতির কাউন্সিল গঠিত হয়।

১) অমিয়কুমার সেন — অতিরিক্ত জেলাশাসক (সভাপতি)
২) তিনকড়ি দত্ত — সহ-সভাপতি
৩) হরিহর শেঠ — সহ-সভাপতি
৪) অমরনাথ মুখোপাধ্যায় — উত্তরপাড়া, (সহ-সভাপতি)
৫) গোপীনাথ অধিকারী — সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (কোষাধ্যক্ষ)
৬) ফনীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী — সাধারণ সম্পাদক
৭) অমিয়কুমার রুদ্র — বাঁশবেড়িয়া, (যুগ্ম-সম্পাদক)
৮) শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় — চুঁচুড়া, (যুগ্ম-সম্পাদক)
৯) সন্তোষকুমার ঘোষ — সমাজ শিক্ষার সার্কেল এ্যাসিসটেন্ট (যুগ্ম-সম্পাদক)
১০) মনোমোহন লাহিড়ী — শ্রীরামপুর (সভ্য)
১১) গোষ্ঠবিহারী দে — আরামবাগ (সভ্য)
১২) উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি
১৩) ফ্রেন্ডস লাইব্রেরি — বালী
১৪) শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি
১৫) ত্রিবেণী হিতসাধন লাইব্রেরি
১৬) সাহিত্য মন্দির — হুগলি
১৭) কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি
১৮) চন্দননগর পুস্তকাগার
১৯) চন্দননগর সাধারণ পাঠাগার

২০) সিঙ্গুর সাধারণ পাঠাগার

২১) ইটাচুনা সাবিত্রী মনোরমা লাইব্রেরি

২২) সতীশচন্দ্র পাঠাগার, গুপ্তিপাড়া

২৩) রামমোহন পাবলিক লাইব্রেরি

২৪) হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার

২৫) দশঘরা অ্যাসোসিয়েশন

২৬) উত্তরবাহিনী লাইব্রেরি, শিয়াখালা

২৭) + (২৯) প্রতিনিধি — জেলা গ্রন্থাগার

৩০) প্রতিনিধি — বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই কাউন্সিল এক বছরের জন্য গঠিত হয়।

জাতীয় গ্রন্থাগারিক বি. এস. কেশবন এই মহতী সভায় বক্তব্য রাখেন। সমাপ্তি ভাষণ দেন ড. পরিমল রায়।

১৫ জানুয়ারী ১৯৫৫ বৈকাল ৪টায় হুগলি পাবলিক লাইব্রেরি কাউন্সিল-এর সভা জেলা সমাহর্ত্তা এস. ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমিতির মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকলস অ্যাসোসিয়েশন খসড়া রেজিস্ট্রীকরণের জন্য উপস্থাপিত হয় ও গৃহীত হয়।

সমিতি ১৯৫৫ সালের ২৪শে মার্চ রেজিস্ট্রীকৃত হয়। নং ২২২৩৮/৬৭০ অব ১৯৫৪-৫৫, পরবর্তী কাউন্সিলের সভা জেলা সমাহর্ত্তা এস. ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গঠনের জন্য অনুরোধ করা হয় বৈদ্যবাটি এম. এ ও-কে। বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরিকে জেলা গ্রন্থাগার-এ রূপান্তরিত করার কথা ঠিক হয়।

পরবর্তী কাউন্সিলের সভা জেলা সমাহর্ত্তার বাসভবনে ২৪.৫.৫৫ তারিখে বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গঠনের জন্য নিম্নলিখিত সভ্যদের নিয়ে একটি উপসমিতি গঠিত হয়। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, তিনকড়ি দত্ত, দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীনাথ অধিকারী ও শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরবর্তী কাউন্সিলের সভা ২৬.৭.৫৫ তারিখে বৈকাল ৪টার সময় জেলা সমাহর্ত্তার অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বি. ওয়াই. এম. এ. এর প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গঠনের সর্তাবলী মানতে রাজি না হওয়ায় ঠিক হয় কম পক্ষে ১০ কাঠা জমি দান হিসাবে পাওয়া যায় কি না তার জন্য সচেষ্টিত হওয়া। ৬ই আগষ্ট, ১৯৫৫-র সভায় নিম্নলিখিত স্থানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গঠনের প্রস্তাব আসে।

১) সাধারণ সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীরামপুরে জি. টি. রোডের উপর ১১ কাঠা জমি।

২) কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি ও তৎসংলগ্ন জমি।

৩) সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা কমিটির অসমাপ্ত ভবন ও জমি।

৪) হুগলি-চুঁচুড়া পৌরসভা কর্ত্তৃক

(ক) দেশবন্ধু পার্ক বা

(খ) মল্লিককাশেম হাট (বর্ত্তমান যেখানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত)।

৫) হুগলি জেলের নিকটস্থ আর্য লাইব্রেরি।

সভায় ঠিক হয় জেলার প্রধান কার্যালয়ের যে কোনও জায়গায় গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হবে। তখন হুগলি-চুঁচুড়ার তিনটি স্থানের মধ্যে ভোটাভুটিতে মল্লিককাশেম হাটের পক্ষে ৬ জন, আর্য লাইব্রেরির পক্ষে ৫ জন ও দেবীপার্কের পক্ষে ২ জন ভোট দেওয়ায় মল্লিককাশেমের হাটের স্থানই নির্বাচিত হয়। পরবর্তী সময়ে হুগলি-চুঁচুড়ার পৌরপতি অবনীনাথ নন্দী ও হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী'র সঙ্গে ৯৯ বছরের এক চুক্তিতে উভয়ে সাক্ষর করেন। সুজন বাগানের খতিয়ান নং ৩১৮৯ এর ৩১৮ একর ও খতিয়ান নং ৩১৯০ -র ২৭৮ একর মোট ৫৯৬ একর জমি ৯৯ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয়।

স্থান নির্ধারণের পর সরকার হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদকে জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য প্রথম ৫৫,৫০০.০০ টাকা ও পরবর্তী সময়ে আরও ৭৪,৫০০.০০ টাকা মোট ১,৩০,০০০.০০ টাকা গ্রন্থাগার ভবন, ভ্রাম্যমান গ্রন্থযান, বই ও আসবাবপত্রের জন্য দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারিক, গাড়ীর চালক ও গ্রন্থাগার সহায়কদ্বয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য প্ল্যান ও এস্টিমেট পাঠাতে বলা হয়।

১৯৬০ সালে নিজস্বভবনে জেলা গ্রন্থাগার মহেন্দ্র মিত্র রোডস্থ ভাড়া বাড়ী থেকে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৩ সালের ৯ মার্চ বেলা ২টায় গ্রন্থাগার ভবনে যে সম্মেলন হয় তাতে তিনকড়ি দত্ত সভাপতিত্ব করেন। এতে ৪০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে গঠনতন্ত্র সংশোধিত হয়। ৩৩ জনের স্থানে ৩৫ জনকে নিয়ে কাউন্সিল গঠিত হয়। চাঁদার হার বৃদ্ধি করা হয়। ১৮.৩.৬৭ সালে বেলা ২-৩০ মিনিটে মণিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় -এর সভাপতিত্বে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আনুপাতিক হারে মহকুমার গ্রন্থাগারগুলিকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়।

১.১.৭১ সালে সকাল ১২টায় হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সমিতির সম্মেলন গৌরাঙ্গকান্ত চট্টোপাধ্যায়-এর (তৎকালীন জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ৪০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

এরপর তৎকালীন জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের সঙ্গে সমিতির সম্পাদকের সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ফলে সমিতিকে দেয় যাবতীয় অনুদান এমন কি জেলা গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনবাবদ অনুদান দেওয়া বন্ধ করেন। উপর মহলকে জানিয়েও কোনও ফল পাওয়া যায় নি। সমিতি তখন যুগ্ম-সম্পাদকের নেতৃত্বে একটি উপসমিতি গঠন করে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন ফলে সমস্ত বকেয়া অনুদান দু'দিনের মধ্যে নগদে দিতে বাধ্য হন তৎকালীন লাইব্রেরি ডাইরেক্টর। যাই হোক ১৯৭৭ সালে সমিতির সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার ৩ রাজ্য সম্মেলন জেলা গ্রন্থাগারে ৭ এপ্রিল ১৯৭৭ থেকে ১০ এপ্রিল, ১৯৭৭ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিমলেন্দু মজুমদার। প্রায় ৮০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সকলের এখানে থাকা ও খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করা হয়। ১৮.১২.৭৭ তারিখে সম্মেলনের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয়।

পরবর্তী সম্মেলন ২৫.১২.৭৯ সালে জেলা গ্রন্থাগারে বিকাল ৩টার সময় গৌরাঙ্গকান্তি চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতে সমিতির সম্পাদক ফনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৫৩ বৎসর সম্পাদক থাকার পর পদত্যাগ করেন ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয় হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অনিল কুমার দত্ত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য জেলার সমস্ত সরকারী, সরকার-পোষিত ও বেসরকারী গ্রন্থাগারের সভ্যরা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সাহায্য ও সহযোগিতার কথায় সমিতি গর্ব অনুভব করে। এই সম্মেলনে সকলে যেন একই পরিবারভুক্ত হিসাবে কাজ করেন। সভায় আরও স্থির হয়

দ্বিতল ভবনের কাজ অবিলম্বে শুরু করা হোক। ১৯৭২-৭৩ সালে এর জন্য ৬০,০০০ টাকা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বিশেষ দান হিসাবে অনুমোদন করেন কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বৎসর যাবৎ এই দানের টাকা সমিতিকে দেওয়া হয় নি।

১৯.৬.৭৮ তারিখের সরকারী আদেশনামা ৪৩৮ ই.ডি.এন. -এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি জরুরী সাধারণ সভা আহ্বান করা হয় ১০.৯.৭৮ তারিখে জেলা গ্রন্থাগার ভবনে বেলা ১টার সময় কিন্তু কোরামের অভাবে ঐ সভা ২৪.৯.৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রবোধচন্দ্র দাস সভাপতিত্ব করেন।

সমিতির কার্যাবলীর উপর সরকারী বাধার ফলে সমিতির কাজ সীমিত হয়ে যায়। তবুও সমিতি তার সীমিত ক্ষমতায় ১৯৮৩ সালে বই বাঁধাইয়ের ট্রেনিং -এর বন্দোবস্ত জেলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অফিসের সহযোগিতায় বন্দোবস্ত করে। দশজন বেকারকে এই ট্রেনিং দেওয়া হয়, এর মধ্যে অনেকেই স্বনির্ভর হয়েছেন। এ ছাড়া যাঁরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি কোর্সে পড়াশোনা করে - তাদের বিনা পারিশ্রমিকে সমিতি শিক্ষা দিয়ে থাকে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলন হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়।

৪র্থ সম্মেলন :

মূল ৪র্থ সম্মেলনটি চাঁপাডাঙ্গা, হুগলিতে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় -এর সভাপতিত্বে ১৯৩৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

৭ম সম্মেলন :

১৯৪১ সালের ১১-১২ এপ্রিল বাঁশবেড়িয়া হুগলিতে বিনয়রঞ্জন সেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস. কে. হালদার, জেলা শাসক এবং প্রদর্শনীর উদ্বোধক ছিলেন এ. সি. চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার উপর প্রস্তাব নেওয়া হয়।

২৪শ সম্মেলন :

দ্বারহাট্টায় ১৯৬৬ সালের ১১-১৩ ফেব্রুয়ারী নারায়ণ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

২৭শ সম্মেলন :

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে ৪-৬ এপ্রিল ১৯৬৯ সালে ড. অমলেন্দু বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায়। উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তের মধ্যে পশ্চিমবাংলার জন্য একটা খসড়া গ্রন্থাগার বিল প্রণয়ন।

৩৪শ সম্মেলন :

১৯৭৭ সালের ৮-১০ এপ্রিল হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবন, চুঁচুড়া, বিমলেন্দু মজুমদার -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

হুগলি জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে অনেকে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের সকলের নাম করা সম্ভব নয় — তবে এঁদের মধ্যে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ত্রিবেণী), সুধীর মান্না (চণ্ডীতলা), সুবোধ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), ড. তরুণ মিত্র (উত্তরপাড়া), সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী (শ্রীরামপুর), মুরারীমোহন মিত্র (কোন্নগর), অমল বসু (মহানাদ), অনিল হালদার (গুড়াপ), পশুপতি বসু (দশঘরা), জ্ঞানশংকর ঘোষ (গোপালনগর), আদ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইলছোবা), শুভ্রাংশু মিত্র (শ্রীরামপুর), বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (চন্দননগর), সুকুমার ভট্টাচার্য্য (সিজা), আতায়ুর রহমান (আমগ্রাম), মহম্মদ মুজাফফর রহমান

(ফুরফুরা), শচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (হুগলি), নরেন্দ্রনাথ সেন (হুগলি), সিদ্ধেশ্বর চৌধুরী (চুঁচুড়া), তারকদাস সুর (ভরতপুর), বিনয় ভাদুড়ী (চুঁচুড়া), ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় (আলতাড়া), গুরুদাস মুখোপাধ্যায় (আনুড়), চন্দননগরের আবু সঈদ, রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, মৃণাল কুমার (শেওড়াফুলি), গোপীনাথ ঘোষ (ভদ্রেশ্বর), দেবপ্রসাদ কর (পাণ্ডুয়া), শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী, জয়দেব সেন (জয়পুর) ইত্যাদি। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগারকর্মী একে অপরের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে বাঁধা। কিন্তু এই নিবিড় বন্ধন থাকা সত্ত্বেও এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থাকা সত্ত্বেও - গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য পৃথক একটি সমিতির কথা অনেক দিন থেকেই চিন্তা করে আসছি। কারণ হিসাবে বলা যায় আমি নিজে ভুক্তভোগী। সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে (পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগারে) যোগ দেবার পর থেকেই অন্যান্য জেলার জেলা গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকি। ১৯৬০ সালে জাতীয় গ্রন্থাগারে একটা সেমিনারে জেলা গ্রন্থাগারিকেরা যোগ দেন। আমরা সেইখানে স্বল্পস্থায়ী District Librarians Association গঠন করি। সভাপতি নির্বাচিত হন অনিলকুমার দত্ত ও সম্পাদক নির্বাচিত হন নির্মলচন্দ্র চৌধুরী। এই সমিতি স্বল্পস্থায়ী ছিল এই কারণে আমরা সকল কর্মীকে আমাদের মধ্যে আনতে পারিনি। সকলকে যে সমিতির মধ্যে আনা যায় তার চিন্তা মাথায় নিয়ে জেলাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। এর মধ্যে ১৯৬১ সালে আমরা হুগলি জেলাতে জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কর্মী সমিতি গঠনের জন্য সরকার পোষিত গ্রন্থাগার কর্মীদের আহ্বান করি ও হুগলি জেলা গ্রন্থাগারিক ও কর্মীসভা গঠন করি। সভাপতি নির্বাচিত হন হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক অনিল কুমার দত্ত ও সম্পাদক নির্বাচিত হন নিরঞ্জন অধিকারী (তালপুর কিশোর পাঠাগার)। অন্যান্যদের মধ্যে ভোলা নাথ পাল, দীনবন্ধু ঘোষ ইত্যাদিরা ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কর্মীদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে থাকি। যাই হোক ১৯৬৪ সালের ২১ অক্টোবর কুচবিহার শহরে আমরা বিভিন্ন জেলার কর্মীরা মিলিত হই ও একটি অ্যাড-হক কমিটি গঠিত হয় জিতেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর (কুচবিহার) পরিচালনাধীনে (সভাপতিত্ব করেন অনিল কুমার দত্ত)। প্রথমে ঠিক হয় মালদহ শহরে আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। পরে কলকাতায় এক বিশেষ সভায় স্থির হয় মালদহের পরিবর্তে কলকাতায় ১৩ ও ১৪ এপ্রিল ১৯৬৫ সালে ভারতসভা হলে আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। সভায় সমিতির সভাপতি হন হরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন অনিল কুমার দত্ত, সমিতির নামকরণ করা হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড লাইব্রেরিজ ইউনিয়ন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কর্মীদের স্বার্থে হুগলি জেলায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এক মাত্র কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি গঠিত হয় ১৯৮৫ সালে। এর কৃতিত্ব অনিল কুমার দত্ত ও নিরঞ্জন অধিকারীর।

হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের অধীনে এক সময় প্রায় ২৬০টি গ্রন্থাগারকে নিয়মিতভাবে মাসিক ২০টি বই গ্রন্থযান মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হত। প্রতি তিনমাস অন্তর এই বইগুলি ফেরৎ নিয়ে আবার বই ঋণ দিত।

হুগলি জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত অর্থাৎ সংগঠকবৃন্দ ও তার কর্মীগোষ্ঠী দুটি দিকের কথা চিন্তা করেছিলেন। কর্মী সমিতির উদ্যোগে বড় অবদান লাইব্রেরি ম্যানুয়েল 'ইউনিয়ন ক্যাটালগ অব বেঙ্গলি বুক্স অ্যান্ড পিরিয়ডিক্যাল্স্' ও 'বিষয় - সাধারণের গ্রন্থাগার'। এ ছাড়া গ্রন্থাগারের জন্য 'পরিগ্রহণ খাতা' হুগলি জেলা শাখা প্রকাশ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হবার পর যেন গ্রন্থাগার আন্দোলন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে — উন্নয়নের আশা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা আন্দোলন করে 'বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার' চেয়েছিলাম। পাই নি বরং চাঁদার হার যথেচ্ছ বেড়ে

গেছে। উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় বই গ্রন্থাগারগুলিতে নিয়মিত সংগৃহীত হচ্ছে না। কর্মী অবসর গ্রহণের পর তার জায়গায় কর্মী নিয়োগ হচ্ছে না। এ ছাড়া অনেক গ্রন্থাগার রয়েছে - সেগুলি পরিচালনা করার জন্য কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা নেই। জানি না আজকে যারা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তারা সকলে সমবেত হয়ে কেন এই সমস্ত বিষয়ে সচেতন হচ্ছেন না। আমাদের পূর্বসূরীদের পথে কি আমরা চলতে পারবো না। জানি কর্মী সমিতির অসুবিধা আছে — তাই সকলের কাছে আবেদন আসুন আমরা হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদকে আবার শক্তিশালী করি।

কৃতজ্ঞতা

১) 'গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন' (গ্রন্থাগার পত্রিকা)

২) হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সুভেনির ১৯৭৬।

বি: দ্র: হুগলি জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সারণি - ১,২,৩) গ্রন্থের শেষে সন্নিবিষ্ট হ'ল।

হুগলি : মন্দির স্থাপত্য

দীপকরঞ্জন দাস

বর্তমান প্রশাসনিক পরিধি দ্বারা চিহ্নিত হুগলি জেলার সীমান্তর্গত ভূভাগে প্রাচীন জনপদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেলেও এখানে মুঘল আমলের পূর্বে নির্মিত কোন দণ্ডায়মান দেবালয়ের দেখা মেলে নি। কিন্তু কিছু কিছু নিদর্শন প্রমাণ করে তুর্কো-আফগান অভিযানের পূর্বে বেশ কিছু দেবালয় এ অঞ্চলে নির্মিত হয়েছিল। সময়ে সময়ে এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের দেব মূর্তি আবিষ্কার থেকে অনুমান করা যায় এ সব মূর্তি এক সময়ে স্থানীয় মন্দির সমূহে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্দিরের বিভিন্ন প্রকার স্থাপত্যাংশ আবিষ্কারও এই অনুমানের স্বপক্ষে যায়। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত বিদেশাগত বিজেতাগণ তাদের ধর্মীয় ও জাতিগত উন্নত অবস্থানের উদ্ধত পরিচয় প্রদানে পরধর্ম ও ধর্মস্থানগুলির প্রতি তীব্র অসহিষ্ণু মনোভাব প্রকাশ করে এবং বিধর্মীয় প্রতীকগুলির বিলোপে তৎপর হয়। এর ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত ধর্মায়তনের উপকরণ তারা নিজ ধর্মীয় সৌধ নির্মাণে উদারভাবে ব্যবহার করে। এ প্রসঙ্গে দিল্লীর 'কোয়াৎ-উল-ইসলাম' (ইসলামের শক্তি) নামক মসজিদের প্রতিষ্ঠা লিপিতে কুতব-উদ-দীন আইবাকের সদম্ভ ঘোষণায় স্থানীয় কয়েকটি হিন্দু ও জৈন মন্দির বিধ্বস্ত করে তা থেকে সংগৃহীত উপাদন দ্বারা সৌধটি নির্মাণের উল্লেখ করা যায়। অনুরূপ মানসিকতা থেকে হুগলি আক্রমণকারী তুর্কী অভিযাত্রীরাও মুক্ত ছিল না। তাদের নেতা জাফর খাঁ গাজী এখানকার হিন্দু নরপতিকে পরাজিত করে যে বেশ কিছু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ত্রিবেণীতে জাফর খাঁ, পুত্র আইন খাঁ গাজী, ঘইন খাঁ গাজী, সস্ত্রীক বড় খাঁ গাজী ও তাঁর পুত্রদ্বয়ের যে দুইকক্ষের ছাদ বিহীন পারিবারিক সমাধিভবন রয়েছে তার নির্মাণে এক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষকে উদারভাবে ব্যবহারে। এই ভবনে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও অন্যান্য ভাস্কর্য দ্বারা অলঙ্কৃত দ্বারস্তম্ভ ও দশাবতার প্যানেল, নৃত্যরত অপ্সরা, উৎকীর্ণ মুক্তামালা শোভিত এবং রামায়ণের চরিত্রের নামোল্লেখ সহ প্রস্তরখন্ড সমূহ, দ্বাদশাদিত্য প্যানেল, স্তম্ভমূলে ভারবাহক, মন্দিরের বিভিন্ন স্থাপত্যাঙ্গের অবিন্যস্ত উপস্থিতি এবং ভবন প্রাঙ্গণে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্দিরের বহু উপকরণের সমাবেশ এই স্থানে একদা একটি প্রাচীন এবং সুদৃশ্য ভাস্কর্যমণ্ডিত দেবকুলের অবস্থানের সাক্ষ্য দেয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সমাধি ভবনের কক্ষ দুটির একটি প্রাচীন মন্দিরটির গর্ভগৃহ ও অপরটি মণ্ডপ। ডেভিড ম্যাককাচ্চন এই মতের সমর্থনে কিছু যুক্তি প্রদান করে একটি কক্ষকে গর্ভগৃহ ও অপরটিকে চতুর্মুখ অন্তরাল বলে সিদ্ধান্ত করেন। অধিকতর অনুসন্ধান ব্যতীতই সাম্প্রতিক কালের কোন কোন লেখক প্রথমোক্ত মতটির পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে উভয় মতের কোনটিকেই প্রমাণ করা যায় না। গঠন, নির্মাণ কৌশল ও বেশ কিছু গাত্রালঙ্কার ভবনটিকে আদি মন্দিরের সংরক্ষিত অংশ বলে গ্রহণ করতে সাহায্য করে না। তথাকথিত গর্ভগৃহ

ও ম্যাককাচ্চন অনুমিত অন্তরালের পরিমাপগত অনুপাতও ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যে কখনই অনুসৃত হয় নি। চতুর্মুখ অন্তরালও উত্তর ভারতে বিরল। দরগা প্রাঙ্গণে একটি প্রাচীন সৌধের ভগ্নাবশেষরূপে স্তূপীকৃত প্রস্তরখন্ড, স্তম্ভ, কড়ি প্রভৃতির সমাবেশে মনে হয় জাফর খাঁ বিজয়ীর গর্বে স্থানীয় মন্দিরটিকে সমূলে উৎপাটিত করে সে স্থানে নিজ পারিবারিক সমাধি ভবনটি নির্মাণ করেন। এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ জরাজীর্ণ মসজিদটির নির্মাণে তিনি এই মন্দিরটি এবং / অথবা নিকটবর্তী অপরাপর মন্দির থেকে কিছু কিছু উপকরণ সংগ্রহ করেন। জাফর খাঁ দ্বারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত মন্দিরটির আদিরূপ কল্পনার পর্যায়েই থেকে যাবে। মনে হয় সারা উত্তর ভারতের প্রধান স্থাপত্য শৈলী, যা নাগর শৈলী নামে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছিল, অনুসরণেই এখানকার দেবালয়টি নির্মিত হয়। ভবনটির বেদীতে যে সব অনুভূমিক কাম (মোল্ডিং) রয়েছে তা নাগর মন্দিরের পাদভাগ নির্দিষ্ট করতে ব্যবহৃত হত।

এই ধরণের কাম গুলি যথাযথ ভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে আদি মন্দিরের দেওয়ালের নিম্নাংশে বর্তমান স্কার্টিং বা 'ডাডু'-র মত প্রদর্শিত হত। বর্তমান ক্ষেত্রে অনুরূপ কামগুলিকে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে অনুকরণ করা হলেও তার অলঙ্করণে অল্টো রিলিভো প্রথায় উৎকীর্ণ বাতিদানাকৃতি নক্সাটি সম্পূর্ণ রূপে বিদেশাগত।

দেওয়ালের অঙ্গভূষণ রূপে ছিল ফুল, লতা-পাতা, জ্যামিতিক নকসা ও বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দেব-দেবীর মূর্তি। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে দেব-দেবী মূর্তিগুলির অধিকাংশকে খণ্ডিত করে সনাক্তকরণের প্রায় অযোগ্য করে তোলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ ও বরাহ অবতারের উল্লেখ করা যায়। দ্বাদশা-দিত্যের একটি উৎকীর্ণ চিত্র সম্বলিত প্রস্তরখণ্ডকে দরগাটির উত্তর দেওয়ালের নিম্নাংশে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। মন্দিরের দ্বার স্তম্ভে দেউলাকৃতি ছোট ছোট কুলুঙ্গীতে ক্ষয়িষ্ণু দেবী মূর্তিও লক্ষ্য করা যায়।

রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতের চরিত্রের উল্লেখ সহ প্রাগ বঙ্গ হরফে উৎকীর্ণ লিপিযুক্ত খণ্ডিত প্রস্তরখণ্ডগুলি প্রমাণ করে মন্দিরগাত্রে এসব গ্রন্থের কাহিনী চিত্রিত হয়েছিল। দেওয়ালের উর্ধ্বাংশে ফিতের মত করে মুক্তামালা সৃষ্ট ঝালরের নিদর্শন স্থানচ্যুত হয়ে এখনও বর্তমান। দ্বারস্তম্ভে প্রদর্শিত শিখর মন্দিরের অনুকৃতি মূল দেউল শীর্ষেও শিখরের উপস্থিতির স্বপক্ষে যায়।

ত্রিবেণীর মত পাণ্ডুয়াতেও বারি মসজিদ নামে পরিচিত মসজিদটি এক বা একাধিক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপর নির্মিত। ধ্বংসে করা দেবায়তনের উপকরণ সমূহকে মসজিদ নির্মাণে উদারভাবে ব্যবহার করা হয়। এ স্থানের মন্দিরগুলিও ত্রিবেণীর মন্দিরের অনুরূপ ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য দ্বাদশ শতাব্দীর কবি ধোয়ী তাঁর 'পবন দূত' নামক কাব্যগ্রন্থে গঙ্গা তীরবর্তী ব্রহ্ম অর্থাৎ সুহ্ম বা ব্রহ্মোত্তর দেশে মুরারি অর্থাৎ বিষ্ণুর মন্দির, রঘুকুলগুরু নামক সূর্যের মন্দির অর্দ্ধনারীশ্বর মন্দির এবং শিব মন্দিরের বর্ণনা করেছেন। পণ্ডিতগণের মতে এই সুহ্মদেশ ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম ও পাণ্ডুয়া অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল।

নবাগত বিজাতীয় ও বিপরীত ধর্মাবলম্বী শাসকদের প্রতিকূল মনোভাবের জন্য হুগলি জেলায় মার্গ রীতির মন্দির শিল্পধারায় ছেদ ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কোথাও এই ধারাটি ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হলেও হুগলি জেলায় তার চিহ্ন পাওয়া যায় নি। এই সময় বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মসজিদ - দরগার মাধ্যমে বিকশিত হতে থাকে। প্রধানত পোড়ামাটির ইঁটেই নির্মাণ কার্যের মূল মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হয়। ইঁটের মাপও ৯" X ১২" X ২.৫" এর বদলে ৬" X ৩" X ২" তেই নির্দিষ্ট হয়।

গাঁথনীর কাজে পূর্ব প্রচলিত জৈবিক চূনের পরিবর্তে খনিজ চূন ও ইঁটের গুড়ো মিশ্রিত সুড়কি ব্যবহার করা হতে থাকে যদিও সৌধের বহির্ভাগে সুড়কির প্রলেপ দেওয়া হত না। নির্মাণ কৌশলেও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। পূর্বতন স্তম্ভ কড়ি বরগা, লহড়া পদ্ধতির খিলেন ও ভল্ট দ্বারা সৌধ নির্মাণ পদ্ধতি যা 'ট্রাবিয়েট মেথড' নামে পরিচিত, পরিত্যক্ত হয়ে পশ্চিম এশিয়ায় প্রচলিত আর্কুয়েট পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা খিলেন বা ভল্টের সাহায্যে ভারের প্রলম্ব মাধ্যাকর্ষণ রেখাকে অনুভূমিক রেখায় পরিণত করে পার্শ্ববর্তী দেওয়ালে পরিচালিত করার উন্নত কৌশলের প্রচলন করা হয়। এ সময় থেকেই আর্কুয়েট প্রথাসম্মত খিলেন ও ভল্ট ধর্মীয় সৌধ নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হতে থাকায় কড়ি ও বরগা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। দেওয়াল সজ্জায় অলঙ্করণের আদলেও পশ্চিম এশীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পূর্বের সুডৌল, গভীর ও কমনীয় চরিত্রের স্থানে অলঙ্করণ হয়ে যায় অগভীর, সূক্ষ্ম ও স্থানু। অলঙ্করণের বিষয়বস্তুতেও নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। জালি, বাঁশের ফালি বা পাতার দ্বারা বোনা ব্যবহার্য সামগ্রীর গায়ের মত নকসা, ছোট তাল জাতীয় গাছের পাতা, ঝার, আঙ্গুর, লতা, প্রথাগত ফুল, অতি বিবর্তিত গোলাপ, ঝরোখা, খিলেন শীর্ষ কুলুঙ্গী, ব্যাটেলমেন্ট (দুর্গপ্রাকার শীর্ষে রেলিং-এ অনেকটা বর্শাফলকের ন্যায় সারিবদ্ধ অংশ), কণ্ডুয়িত লতা যার পাতাগুলি ছোলাগাছের পাতার মত, সাইপ্রেস, টাসেলসহ গ্রীক ধনুকাকৃতি নক্সা প্রভৃতি দেওয়াল সজ্জায় ব্যবহৃত হয়েছিল। হুগলি জেলায় এ ধরণের অলঙ্করণ সমৃদ্ধ সৌধ সমূহের মধ্যে ত্রিবেণীর জাফর শাহ গাজীর সমাধি ভবন ও সন্নিহিত মসজিদ ও পাণ্ডুয়ার বারি মসজিদ এবং আদিসপ্তগ্রামের সৈয়দ জামাল দীন হুসেন কর্তৃক নির্মিত জামা মসজিদের উল্লেখ করা যায়। পূর্বে উল্লিখিত ধনুকাকৃতি নক্সা, যা প্রাক সুলতানী আমলের মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়, ফেস্টুন সহযোগে নবকলেবর লাভ করে মসজিদ দরগায় প্রদর্শিত হয় এবং পরবর্তী কালে স্থানীয় দেব - দেউলে স্থান লাভ করে। পোড়ামাটির চিত্র সম্বলিত ফলকে ফটো ফ্রেমের মত নকসা কাটা বর্ডার, যা সমস্ত অন্ত-মধ্যযুগীয় মন্দিরে দেখা যায়, তাও ইসলামী সৌধ গাত্রে পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছিল।

এভাবে কিছু কিছু প্রাচীন ভারতীয় ও পশ্চিম এশীয় নক্সাগুলি হয় পরস্পর মিলিত হয়ে অথবা পৃথক ভাবে কিছুটা বিবর্তিত হয়ে ইসলাম ধর্মীয় সৌধ সজ্জার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। একথা অনস্বীকার্য বাংলার তুর্কো-আফগান শাসন প্রবর্তিত হবার বেশ কিছু কাল পর পর্যন্ত অর্থাৎ খ্রিস্টিয় ১২শ শতাব্দীর পর থেকে ১৬শ শতাব্দীর প্রায় শেষপর্যন্ত সময়কালের অন্তর্গত কোন পোড়া মাটির অলঙ্করণে সমৃদ্ধ মন্দির অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি। সুতরাং সিদ্ধান্ত করতে অসুবিধা হয় না পশ্চিম এশীয় সৌধ নির্মাণ কৌশল সহ পূর্বতন পোড়ামাটির মাধ্যমে অঙ্গসজ্জার প্রথাটিও ইসলামী স্থাপত্য কীর্তিগুলির মাধ্যমে নবভাবে এবং নবরূপে দেউলের শোভাবর্ধনে প্রবেশ করে।

১

১৬-শ শতাব্দীর অবসানের প্রাক্কালে পোড়ামাটির মাধ্যমে বাংলার একান্ত নিজস্ব একটি মন্দির স্থাপত্য শিল্পের প্রাথমিক উদ্ভব পরিলক্ষিত হলেও তা হুগলি জেলায় ১৭শ শতাব্দীর পূর্বে আত্মপ্রকাশ করেনি। আকারগত দিক দিয়ে মন্দিরের যে কয়টি শ্রেণী বিভাগ করা হয় তার কোনটিই তৎকালীন বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত মন্দির স্থাপত্যশৈলী বহির্ভূত ছিল না। এখানে যে সব মন্দির দেখা যায় চরিত্র বিচারে সেগুলি শিখর, চালা, বাংলা, রত্ন ও দালান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি বিভাগের যে কটি উপবিভাগের নিদর্শন হুগলি জেলায় পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :

শিখর শ্রেণী : এ ধরণের মন্দিরে উপবিভাগ লক্ষ্য করা না গেলেও শিখরের আকৃতিতে বৈচিত্র অনুপস্থিত ছিল না। যেখানে অন্তর ট্রাবিয়েট পদ্ধতি অনুসৃত লহরা দ্বারা নির্মিত সেখানে

শিখর সুউচ্চ। আবার যেখানে অন্তরে গম্বুজ সেখানে শিখর খর্বকায় ও কিছুটা গোলাকার।

চালা শ্রেণী : চার চালা, আট চালা ও বারো চালা।

বাংলা শ্রেণী : এক বাংলা বা দো চালা ও জোড় বাংলা।

রত্নশ্রেণী : এক রত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, ত্রয়োদশ রত্ন (?) ও একবিংশতি রত্ন।

দালান শ্রেণী : একতল ও দ্বিতল।

শিখর শ্রেণী

হুগলি জেলার প্রায় সর্বত্রই শিখর মন্দির দেখা যাবে। এগুলি প্রাচীন নাগররীতির টিয়া পাখীর ঠোঁটের মত বাঁকানো চূড়া-শীর্ষ মন্দিরের ধারাকে অক্ষুন্ন রাখলেও পূর্বের সুঠাম দীর্ঘাঙ্গ চরিত্রকে ধরে রাখতে পারে নি। অনেক ক্ষেত্রে শিখরের উচ্চতা গর্ভগৃহের উচ্চতা অপেক্ষা অধিক হলেও তার প্রলম্ব ভাবটি রক্ষিত হয় নি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গর্ভগৃহের আচ্ছাদনের জন্য গম্বুজ ব্যবহৃত হওয়ায় প্রায় সরল রেখায় উন্নীত শীর্ষ দেশে অকস্মাৎ দ্রুত অন্তর্মুখী ঝোঁক এক বিসদৃশ ছন্দপতন ঘটায়। এ প্রসঙ্গে খানাকুলের ঘন্টেশ্বর শিব মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্বে লহরা (করবেল) স্তর দ্বারা শিখরের চারটি দেওয়ালকে ক্রমশ নিকটবর্তী করে মধ্যস্থ গহ্বরকে অত্যন্ত ছোট করা হত এবং তা একটি টালি সদৃশ ইঁট বা প্রস্তর পাটা অথবা অনুরূপ কয়েকটি ইট অথবা প্রস্তর পাটা দ্বারা ঢাকা হত। এই নির্মাণ প্রণালী অনুসরণের ফলে শিখরের উচ্চতা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী ছিল। অন্ত-মধ্যযুগে গর্ভগৃহের আচ্ছাদন স্বরূপ গম্বুজের উপস্থিতি শিখরের উচ্চতা বৃদ্ধিকে অনাবশ্যক করে। উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক প্রভাবে মেদিনীপুর জেলায় পূর্বরীতি অনুযায়ী কিছু কিছু শিখর দেউল নির্মিত হলেও তা একেবারেই সাদামাটা এবং উত্তর-গঙ্গা উড়িষ্যার দেউলের মতই শৈলীগত অবক্ষয়ের সাক্ষ্য বহন করে। হুগলি জেলায় এ ধরণের কয়েকটি মন্দিরের মধ্যে খানাকুল থানার সেনহাটের একটি দেউলের উল্লেখ ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন করেছেন। শিখর শ্রেণীর অন্তর্গত পাণ্ডুয়া থানার বৈঁচি গ্রামে ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে গোপাল সিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি পরিত্যক্ত ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে। মন্দির শিখরের অভ্যন্তর গম্বুজ - সৃষ্ট। ফলে শিখর স্ফীত ও খর্বকায়। শিখরে উপর্যুপরি ঘনসমৃদ্ধ অনুভূমিক উজ্জ্বল শিরা মন্দিরের গঠনে যে মৃদু নান্দনিক ভাব প্রকাশ করেছে তা নবজাগরিত বঙ্গ সমাজের সৃজনশীলতার প্রতীক। এই মন্দিরটির সম্মুখে অল্প কিছু পোড়ামাটির অনুচ্চ কারুকর্ম সুলতানী স্থাপত্য অলঙ্করণ রীতিকে স্মরণ করালেও এ ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন মুক্ত হওয়ার ফলে অনেক বেশী স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল।

শ্রীরামপুর - চাতরার দোলতলায় ত্রিআয়তন গৌরাঙ্গ মন্দিরের কেন্দ্রীয় আয়তনটি বৈঁচিগ্রামের মন্দিরের শিখরের প্রায় অনুরূপ। দুই পাশের দুটি আয়তনের শিখর উড়িষ্যার ভদ্রদেউলের ন্যায় পিরামিডাকৃতি। ক্রমপর্যায়ে উন্নীত অনুভূমিক সমান্তরাল শিরা দ্বারা তিনটি শিখর দেহই বেষ্টিত। অবশ্য পার্শ্ব শিখর দ্বয়ের সর্বনিম্ন শিরা ধনুকাকার। কেন্দ্রীয় আয়তন প্রবেশ দ্বারের সরদলের মধ্যস্থলে গণেশের প্রতিকৃতি প্রাক সুলতানী মন্দির অলঙ্করণকে স্মরণ করায়। স্থানীয় লোকশ্রুতি অনুযায়ী মন্দিরটি শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর কাশীশ্বর পণ্ডিত ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। সময়ে সময়ে সংস্কারের ফলে মন্দিরের আদিরূপে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কালক্রমে এ ধরণের দেবায়তন সমূহ একেবারেই খর্বাকায়, পোড়ামাটির অলঙ্করণ বিবর্জিত, শিরাহীন শিখর সম্বলিত ও পলেস্তরা আবৃত হয়ে এক নিষ্প্রাণ অবক্ষয়িত মন্দির শৈলীর নিদর্শনে পরিণত হয় যার উদাহরণ হুগলি জেলার যত্রতত্র পাওয়া যাবে।

চালা শ্রেণী

পশ্চিম এশীয় নির্মাণ কৌশল গ্রহণ করে বাংলার গ্রামীণ কুটিরের আদলে যে সব দেবালয় তৈরী হয় তা চালা মন্দির নামে খ্যাত। গম্বুজ বা ভল্টের ছাদকে বাইরে থেকে গ্রামীণ কুটিরের চালার আকার দিয়ে এই চালা মন্দির করা হত। অনুমান করা যায় স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট বিপরীত ধর্মের প্রতীক এই বৈদেশিক গম্বুজ বা ভল্ট দেবায়তনের ছাদরূপে গৃহীত হতে দ্বিধা থাকায় মন্দিরের বহির্দেশে গর্ভগৃহ আচ্ছাদনকে তার নির্মাণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইঁট ও চূণ-সুড়কী দিয়ে অতি পরিচিত চালার আদল দেওয়া হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে হুগলি জেলায় চালা শ্রেণী যথাক্রমে (১) চার চালা (২) আট চালা ও (৩) বারো চালা এই তিনটি উপরিভাগে বিভক্ত।

চার চালা

এ ধরণের মন্দিরে ছাদের চার দিক থেকে চারটি পিরামিডাকৃতি চাল শীর্ষদেশে একটি বিন্দুতে অথবা মুদন (রিজ পোল) নামক শিরা দণ্ডে মিলিত হতে দেখা যায়। প্রত্যেকটি চালের পৃষ্ঠদেশ সমতল না হয়ে চালা কুটিরের অনুকরণে কূর্মপৃষ্ঠবৎ হত। স্থানীয় জল-বায়ু ও কুটির নির্মাণ উপকরণ চালের গড়নকে প্রভাবিত করেছিল। কুটিরের চাল ছাওয়ার খড় বৃষ্টির জলে ভিজে ভারী হয়ে যাওয়ার ফলে চাল বসে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই চাল পৃষ্ঠকে উত্তল করার রীতির উদ্ভব। এ কারণে চাল কাঠামোর পাড় (পারলিন) ও রোকাট (র‍্যাফটার) গুলিকে সব সময়ই প্রায় ধনুকাকৃতি করা হত। ফলে চালের কোণাচ (হিপ র‍্যাফটার), কার্নিশ ও সরদল (লিন্টেন) সরল রেখায় না থেকে বাঁকানো থাকত। গ্রামীণ কুটিরের আদলে চালা মন্দির সমূহ তৈরী হওয়ায় তাদের মধ্যেও এই চরিত্র পরিস্ফুট হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন বাংলার লোকায়ত মন্দিরের বৈশিষ্ট্য তাকে ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পে এক বিশেষ স্থান করে দিয়েছে। ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে এই আঞ্চলিক স্থাপত্য রীতির কিছু কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

চার চালা মন্দিরে সাধারণত একটি মাত্র প্রবেশদ্বার দিয়ে সরাসরি গর্ভগৃহে যাওয়া যেত। প্রবেশ দ্বারের উপর ত্রিকেন্দ্রিক খিলেনের নিম্নধার ধরে অবতল পল (কাম্প) কাটা হত। পরবর্তীকালে এককেন্দ্রিক পল বিহীন গোল খিলেনের প্রবর্তন হয়।

চার চালা মন্দিরের নিদর্শন হুগলি জেলায় সংখ্যায় নগণ্য না হলেও স্থাপত্যগত মহিমার দাবী করার মত উদাহরণ খুব বেশী নেই। সেলানপুর ও শ্যামবাজার (গোঘাট থানা) এ রকম দুটি মন্দিরের আসন কয়েকটি ক্রম-প্রসারিত উদগত অংশ (রথ)-এ বিভক্ত। পুরশুড়া থানার বাখরপুরে যে পরিত্যক্ত চারচালা মন্দির রয়েছে তা ত্রিখিলান প্রবেশ পথ সহ বারান্দা সমন্বিত। এরূপ ত্রিখিলান প্রবেশপথ সহ বারান্দায় দেখা যাবে শ্রীপুর-বলাগড়ে রাধাগোবিন্দের চারচালা মন্দিরে। দমদমা (পাণ্ডুয়া থানা)-য় এগারোটি চারচালা শিব মন্দির বর্গাকারে সাজানো আছে।

দেউল সংলগ্ন মণ্ডপরূপে চারচালার কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে। গোঘাট থানার বেত্রায় পরিত্যক্ত চারচালা, মন্দিরটির মণ্ডপও চারচালা। অনুরূপ মণ্ডপের উদাহরণ দেখা যাবে খানাকুলে শিখর শ্রেণীর ঘন্টেশ্বর শিব, আঁটপুর (জাঙ্গীপুর থানা)-এ আটচালা রাধাগোবিন্দ, কৃষ্ণপুর (হরিপাল থানা)-এ চণ্ডালজী ও বৈঁচিগ্রাম (পাণ্ডুয়া থানা)-এ আটচালা রাধাগোবিন্দ মন্দিরে।

আটচালা

চার চালার চারটি চালের শীর্ষ বিন্দু অথবা মুদনে মিলিত হবার পূর্বেই তার গতি স্তব্ধ করার ফলে যে সমতল পৃষ্ঠ পাওয়া যেত তার উপর অপর একটি ক্ষুদ্রাকায় চারচালা বসিয়ে আটচালা মন্দিরের রূপ প্রদান করা হত। গ্রাম বাংলায় আটচালা কুটিরের সংখ্যা সর্বাধিক। কিন্তু কোন মন্দিরেই দ্বিতীয় চারচালা আটচালা কুটিরের মত কক্ষ সমন্বিত দ্বিতীয় তলে পরিণত হয় নি। এ ক্ষেত্রে খিলেন, স্কুইঞ্চ ও পিন্ডেটিভের সাহায্যে সিলিং রূপী গম্বুজকে অনেকটা উঁচুতে স্থাপন করে তাকে বাইরে থেকে দ্বিতীয় চারচালার আবরণ দিয়ে মন্দিরকে আটচালার আকৃতি দেওয়া হত। অনেক সময় দ্বিতীয় চারচালাটি স্থূল দেহী করার কারণে প্রথম চারচালাটির প্রসারতা বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভূত হয়। অতএব গম্বুজ-সিলিং বহির্ভূত পার্শ্বস্থ অংশদ্বয়ে লহরা স্তরে উন্নীত ভল্ট অথবা দুটি গভীর খিলেন করে তার উপর নিম্নতলের চালার দুধার ন্যস্ত করা হত। এ ধরণের মন্দিরের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্মুখস্থ বারান্দায় চালার তৃতীয় অংশটি প্রসারিত হত। বারান্দার আর্কুয়েট আয়তাকার ভল্ট-সিলিং চালার এই প্রসারিত অংশকে বহন করত। কোন কোন গ্রন্থে এ ধরণের ভল্ট-সিলিং বেলনাকার আচ্ছাদন রূপে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বেলনাকার অর্থাৎ নলাকৃতি (সিলিন্ড্রি-কাল) আচ্ছাদন সৃষ্টি অসম্ভব। এই সিলিং অর্ধ নলাকৃতিও নয়। প্রকৃতপক্ষে একে ক্লয়েস্টার ভল্ট বলাই যুক্তিসঙ্গত।

হুগলির আটচালার দৈর্ঘ্য ও উচ্চতার সমতা রক্ষার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এখানে বিষ্ণুপুরী আটচালার ন্যায় দুটি চারচালাকে ঘন সম্বদ্ধ করে দেউলের প্রস্থের উপর অধিক ঝোঁক না দিয়ে উভয়ের মধ্যে বিভাজক দেওয়ালকে তুলনামূলক ভাবে দীর্ঘ করে প্রস্থ ও উচ্চতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। পরবর্তীকালে উপরের তলটিকে ক্ষুদ্র কিন্তু অযথা উচ্চ করায় এই সামঞ্জস্যে বিঘ্ন ঘটে। দেউল সৌধটির বিস্তার অপেক্ষা সামগ্রিক উচ্চতা বৃদ্ধি করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। কেবল গর্ভগৃহ সমন্বিত আটচালায় একটি খিলানশীর্ষ প্রবেশদ্বার করাই ছিল সাধারণ প্রথা। প্রবেশ পথের দুপার্শ্বস্থ দেওয়াল সংলগ্ন পাদপীঠের উপর ন্যস্ত দ্বারস্তম্ভের আকার অনেকটা কলাগাছের দেহের মত। অনেকসময় গুচ্ছ স্তম্ভও নির্মিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে স্তম্ভগুলি আইয়োনীক অথবা টাসকান রীতিসম্মত হত। খিলেন সমেত প্রবেশদ্বার একটি ফ্রেমের বেষ্টনে আবদ্ধ থাকত। ফ্রেমের দুপাশ দুটি অর্ধ স্তম্ভ ও উপরে কয়েকটি কাম (মোল্ডিং)-এর সমাহার বিরল দৃশ্য নয়। অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত নির্মিত মন্দিরে এই কামের মধ্যে একটি হুড মোল্ড ও কাঠের সরদলের অনুকরণে পরিকল্পিত একটি মকরপ্রান্ত সহ অলঙ্করণ দেখা যায়। এ সমস্ত কামই ছিল ধনুকাকৃতি। কিন্তু উত্তরকালে তা সাদামাটা সরল রেখায় রূপান্তরিত হয়। দেওয়ালের নিম্নাংশ সামান্য উদ্ধত হয়ে স্কার্টিং-এর মত একটি নির্দিষ্ট বিভাগ সৃষ্টি করে বেশ কিছু কাল পর্যন্ত স্কার্টিং'-এ এক বা দুই সারি প্যানেল করার প্রথা প্রচলিত ছিল। 'স্কার্টিং'-এর উপর দেওয়ালের প্রান্ত বরাবর অনুভূমিক হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের গুচ্ছ কাম কিছু দূর অন্তর অন্তর প্রায় কার্নিশ পর্যন্ত প্রসারিত হত। দেউলের সম্মুখে দেওয়ালের কাম সম্বলিত অংশ ও ফ্রেম বেষ্টিত প্রবেশ পথের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি ছোট ছোট প্যানেলে বিভক্ত হত। অন্যান্য পার্শ্ব সাধারণত সাদামাটাই থাকত।

বারান্দাবিহীন এক কক্ষের অসংখ্য আটচালার মধ্যে সাহাগঞ্জ (চুঁচুড়া থানা) ডানলপ কারখানার নিকট গঙ্গাতীরে অধুনালুপ্ত সম্ভবত শিব মন্দির (১৭২৫), বৈঁচিগ্রাম (পাণ্ডুয়া থানা) -এ রঘুনাথ জীউয়ের মন্দির, হরিরামপুর (জাঙ্গীপাড়া থানা) -এ দুটি শিব মন্দির (১৭৩৩), কোন্নগর (উত্তরপাড়া

থানা) -এ শিব মন্দির (১৭৪৩), ভাঙ্গামোড়া (পুরশুড়া থানা)-র শীতলা মন্দির ও নিত্যানন্দপুর (মগরা থানা)-র গঙ্গাধর শিব মন্দির (১৭৫২) পোড়ামাটির অলঙ্করণ সজ্জার সমৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য।

পোড়ামাটি অলঙ্করণ সজ্জা সহ অথবা বিহীন অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে কয়েকটি হল বলাগড় থানার শ্রীপুর ও সুখাড়িয়ায় শিব মন্দির দ্বয়, খানাকুল থানার উদয়পুর ও বীরলোকে দুটি শিব মন্দির এবং ১৭৪২-এ নির্মিত একটি দেউল সহ তিনটি শিব মন্দির, তারকেশ্বরে এলোকেশী সংক্রান্ত কেলেঙ্কারীতে জড়িত থাকার অপবাদে ভূষিত মাধব গিরির মরদেহের উপর নির্মিত শিব মন্দির, শ্রীরামপুরে চারটি শিব মন্দিরের একটি সমষ্টি, হেনরী মার্টিনের প্যাগোডা নামে পরিচিত রাধাবল্লভ নির্মাণকাল 'ডেভিড ম্যাককাচ্চনের মতে সম্ভবত ১৬শ শতাব্দী' মাহেশ (শ্রীরামপুর থানা) রাধাবল্লভ (১৭৬৪), ভদ্রেশ্বরের একটি শিব মন্দির, হরিপালের বহু সংখ্যক এ জাতীয় শিব মন্দিরের মধ্যে যথাক্রমে ১৭২৪, ১৭৪৬, ১৭৫৭, ১৭৬৩, ১৭৮৪, ১৮২৩, ১৮৪৪ ও ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সাতটি ও ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ মন্দির, জাঙ্গীপাড়ায় ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি সহ তিনটি শিব মন্দির, আঁটপুর (জাঙ্গীপাড়া থানা) -এ একটি শিব মন্দির, সিঙ্গুরে বেশ কয়েকটি শিব মন্দির, দশঘরা (ধনিয়াখালি থানা) -তে একটি শিব মন্দির, বৈঁচি গ্রাম (পাণ্ডুয়া থানা) -এ তিনটি শিব মন্দির, খিরকুণ্ডি (পাণ্ডুয়া থানা) -তে পাঁচটি শিব মন্দির ও মহানাদ (পোলবা থানা) - এ তিনটি শিব মন্দির।

উপরোক্ত তালিকা থেকে হুগলি জেলায় এ ধরণের মন্দিরের বিপুল সম্ভারের আভাস মাত্র পাওয়াও সম্ভব নয়। বিবরণ বিহীন অথবা অনুরূপ বিবরণের পুনরাবৃত্তি সহ মন্দিরের বিস্তৃত তালিকা ক্লান্তিকর একঘেয়েমি সৃষ্টি করতে পারে আশঙ্কায় তা বর্জন করা হল।

বহু ক্ষেত্রে আটচালা শ্রেণীর দেউলের শাসনে একটি ঢাকা বারান্দা দেখা যায়। সাধারণত প্রথম চালাই গর্ভগৃহের উপর দিয়ে সামনের দিকে প্রসারিত হয়ে বারান্দাকেও আচ্ছাদন করত। অন্তর্দেশে বারান্দাটি প্রকৃতপক্ষে একটি ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত হত। এরূপ ক্ষেত্রে বারান্দার জন্য একটি ত্রিখিলান প্রবেশপথ করাই ছিল সাধারণ নিয়ম। মধ্যস্থলের খিলান দুটি স্থূল ও খর্বাকার স্তম্ভের উপর ন্যস্ত থাকত। স্তম্ভের বেদী ছিল চতুষ্কোণ, দেহকাণ্ড বহুকোণ ও শীর্ষদেশ পুনরায় চতুষ্কোণ। পার্শ্ব খিলেনের প্রতিটির দুই পাদমূল যথাক্রমে একটি স্তম্ভ ও দেওয়াল সংলগ্ন অর্ধস্তম্ভে স্থাপিত হত। অন্ত-মধ্যযুগীয় মন্দিরে দৃষ্ট স্তম্ভের ন্যায় স্তম্ভ বহু পূর্বেই ত্রিবেণীর শিবপুর অঞ্চলে জাফর খাঁ গাজীর আস্তানার ঠিক পশ্চিম দিকে অবস্থিত সাত গম্বুজ মসজিদে বহুপূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম এশীয় স্থাপত্যে এ ধরণের স্তম্ভ অনুপস্থিত থাকায় সিদ্ধান্ত করা যায় প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত বহুকোণ স্তম্ভ থেকেই প্রাথমিক পর্যায়ে নির্মিত মসজিদগুলিতে এর আগমন। পূর্ব ভারতে বহু মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এই স্তম্ভের আদিরূপের উদাহরণ পাওয়া যাবে।

আটচালা মন্দিরের বেশ কয়েকটিতে বারান্দার বদলে পৃথক মণ্ডপ রয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বৈঁচি গ্রামে রাধামাধব মন্দিরের মণ্ডপটি চারচালা ঘেরা (গোঘাট থানা) -র পরিত্যক্ত মাকরা পাথরের আটচালা ও আঁটপুরে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের মণ্ডপ ও চারচালা। বিরল ক্ষেত্রে ইউরোপীয় নব্যমার্গ রীতির স্তম্ভ সমন্বিত খোলা মণ্ডপ (যথা : হরিপালের রাধাগোবিন্দ ও ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত গুড়াপে'র নন্দদুলাল) দেখা যায় যা মন্দিরে পরবর্তীকালে সংযোজিত।

ত্রিখিলান প্রবেশপথ সহ আট চালার উদাহরণও বহু। মাত্র কয়েকটির উল্লেখই এখানে করা হল।

আঁটপুরে ফুলেশ্বর শিব (১৭৬৯), অনামা শিব (১৭৮৮), রাধাগোবিন্দ (১৮৫৮) ও সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, হরিপালে শিব (১৭৬৩), রাধাগোবিন্দ ও অনন্তদেব মন্দির; পুরুষোত্তমপুর (সিঙ্গুর থানা) -এ শিব (১৭৪০) ও ডাকাত কালী মন্দির, বৈঁচিগ্রামে রাধামাধব মন্দির; দশঘরায় শিব মন্দির (১৭৪৬); গুপ্তিপাড়া (বলাগড় থানা) -তে কৃষ্ণচন্দ্র (আ: ১৭৫০ বা নিকটবর্তী সময়ে), রামচন্দ্র ও বৃন্দাবনচন্দ্র। উল্লিখিত মন্দিরসমূহের অধিকাংশই পোড়ামাটির অলঙ্করণ সজ্জায় সজ্জিত। গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের গর্ভগৃহের বহির্দেওয়ালে পৌরাণিক দেব-দেবীর রঙ্গীন চিত্রাবলী তৎকালীন আঞ্চলিক শিল্পধারার একটি দিককে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করে। পরিতাপের বিষয় কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে থাকা সত্ত্বেও যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে এই অমূল্য চিত্রাবলী ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

ইছাপুর (পুরশুড়া থানা) গ্রামে একটি আট চালা মন্দির আছে। মন্দিরটির দ্বিতীয় চালার উপর একটি ক্ষুদ্রাকার নবরত্ন (দ্রঃ নবরত্ন শ্রেণী) স্থাপন করে অভিনব দেউল নির্মাণ করা হয়েছে।

বারো চালা

আটচালার উপর আর একটি চার চালা স্থাপন করে বারো চালা মন্দিরের সৃষ্টি করা হয়েছিল। হুগলিসহ পশ্চিমবঙ্গে এ ধরণের মন্দির বিরল হলেও অনুপস্থিত নয়। হুগলি জেলায় মাত্র দুটি বারো চালা মন্দিরের মধ্যে একটি আছে আরামবাগ থানার সেনহাটি এবং অপরটি পাণ্ডুয়া থানার ইলছোবা গ্রামে।

দোচালা বা এক বাংলা

তাঁবুর মত করে দুটি আয়তাকার চালা দ্বারা আবৃত মন্দিরকে দোচালা বা এক বাংলা বলা হয়। তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশে দোচালা মন্দিরের আধিক্য নজরে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে দোচালা মন্দির দেখা যাবে। হুগলি জেলায় এ জাতীয় মন্দির প্রায় অনুপস্থিত। চন্দননগরের বোসপাড়ায় নন্দনন্দন জীউয়ের ধ্বংসোন্মুখ (সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর আর্ট এন্ড কালচারাল হেরিটেজ -এর প্রসাদে নবেকলেবর প্রাপ্ত) মন্দিরটি হুগলি জেলায় দোচালা মন্দিরের একমাত্র জ্ঞাত নিদর্শন। আয়তাকার মন্দিরটির বারান্দা ও গর্ভগৃহের বহি আচ্ছাদন রূপে রয়েছে একটি মাত্র দোচালা। বাইরে থেকে বারান্দায় এবং বারান্দা থেকে গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য একটি করে মোট দুটি খিলেন শীর্ষ প্রবেশপথ করা হয়েছিল। মন্দিরের অন্তরে বারান্দা ও গর্ভগৃহের সিলিং রূপে এই ভল্টকে বাইরে থেকে দোচালার আকার দেওয়া হয়েছে। আর কোন দোচালা মন্দির এ অঞ্চলে দেখা না গেলেও সমতল-পৃষ্ঠ চন্দননগরে নন্দদুলালের একটি সুদীর্ঘ আয়তাকার দোচালা বারান্দা রয়েছে।

জোড়বাংলা

দুটি দোচালাকে পাশাপাশি যুক্ত করে জোড়বাংলা মন্দির নির্মিত হত। এক্ষেত্রে সামনের দোচালার অংশবিশেষ দিয়ে বারান্দা ও অবশিষ্টাংশ দিয়ে গর্ভগৃহ আচ্ছাদন করাই ছিল রীতি।

সামান্য হলেও জোড়বাংলা মন্দিরের কয়েকটি হুগলি জেলায় দেখা যাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বারান্দায় ত্রি-খিলান ও গর্ভগৃহে মাত্র একটি প্রবেশ পথ। অবশ্য ব্যতিক্রমী একক প্রবেশ পথের

মন্দিরও রয়েছে। গুপ্তিপাড়ায় ক্ষুদ্রায়তন চৈতন্যদেবের মন্দিরটির মধ্যে এক প্রাথমিক চরিত্র প্রকাশিত হওয়ায় এটিকে জোড়বাংলা শ্রেণীর মন্দিরের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন বলে গ্রহণ করা হয়। চূণ-সুরকী দিয়ে অভ্যন্তরস্থ ভল্টকে দোচালার রূপ প্রদানে শিল্পীর প্রচেষ্টা এখানে যেন পরীক্ষার পর্যায়েই রয়ে গেছে। সিনেট (দাদপুর থানা)-এ বিশালাক্ষী (লোকশ্রুতি অনুযায়ী ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে), দশঘরায় বিশালাক্ষী, চুঁচুড়ায় নিস্তারিনীদুর্গা, খানাকুল-কৃষ্ণনগরে জটেশ্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গণে অন্নপূর্ণা ও মহানাদ (পোলবা থানা)-এ অন্নপূর্ণা দেবী পূজিত মন্দিরগুলি এ অঞ্চলের অন্যান্য জোড়বাংলা শ্রেণীর অন্তর্গত দেউল। বালি-দেওয়ানগঞ্জ (গোঘাট থানা) -এ আনুমানিক ১৯ শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত জোড়বাংলা দুর্গা মন্দিরের দুটি দো-চালার সংযোগস্থলের উপর একটি নবরত্ন মন্দিরের বৃহৎ অনুকৃতি স্থাপন করা আছে। পরিকল্পনার অভিনবত্বে মন্দিরটি অদ্বিতীয়। গুপ্তিপাড়ার চৈতন্যদেবের মন্দিরটি ব্যতীত আলোচিত মন্দিরগুলির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিক্ষেত্রেই মন্দিরে এক দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বলভী বা খাখর শ্রেণীর মন্দিরেও সাধারণভাবে এরূপ দেবীর উপাসনা হতে দেখা যায়।

রত্নশ্রেণী

শিখরচূড়া অথবা চালা আচ্ছাদন সহ চতুদ্বারী প্যাভিলিয়ন সদৃশ ক্ষুদ্রাকৃতি কাঠামোকে রত্ন বলা হয়। রত্ন অনেকটা ইউরোপীয় স্থাপত্যের টারেট বা পিন্নাকল -এর সঙ্গে তুলনীয়। একটি বর্গাকার মন্দিরের কূর্মপৃষ্ঠবৎ ছাদের উপর ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি রত্ন স্থাপিত থাকলে তাকে একরত্ন বলা হয়। ছাদের চারকোণে আরও চারটি কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট রত্ন স্থাপন পঞ্চরত্নের সৃষ্টি করে। কিছুটা ক্ষুদ্রাকার করে প্রথম তলের অনুরূপ দ্বিতীয় তল নির্মাণ করে নবরত্ন মন্দির রূপায়িত হত। এভাবে তলের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি করে পঞ্চবিংশতি রত্ন মন্দির পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল। হুগলি জেলায় প্রায় সমস্ত প্রকার রত্ন মন্দির দেখা গেলেও পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন মন্দিরের সংখ্যাই অধিক।

একরত্ন

এ জেলায় স্বল্পসংখ্যক একরত্ন মন্দিরের মধ্যে রয়েছে বাঁশবেড়িয়া (মগরা থানা) -তে রামেশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব (১৬৭৯-৮০), খানাকুল-কৃষ্ণনগরে রাধাবল্লভ, গুপ্তিপাড়ায় রামচন্দ্র (১৭শ/১৮শ শতাব্দী) ও কানপুর (আরামবাগ থানা) -এ কনকেশ্বর (১৯শ শতাব্দী?) মন্দির সমূহ। এ ছাড়া উদয়রাজপুর (গোঘাট থানা) -এ তিনটি পরিত্যক্ত একরত্ন মন্দির রয়েছে যার মধ্যে একটির নির্মাণ কাল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। এ সব মন্দিরের অধিকাংশের রত্নেই আচ্ছাদন চতুর্ভুজ অথবা অষ্টভুজ চালা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মন্দিরের তিন দিক ঘিরে ত্রি-খিলান প্রবেশপথ সহ বারান্দা ও পশ্চাতে সিঁড়ি যা উপরে রত্নরূপী কুঠুরীতে আসার পথ। বারান্দায় প্রবেশপথের খিলান বাহক স্তম্ভগুলি পূর্বে বর্ণিত আটচালা মন্দিরের দৃষ্ট স্তম্ভের অনুরূপ। বারান্দার সিলিং ভল্ট দ্বারা গঠিত হলেও প্রতিকোণে দুই পাশ থেকে প্রসারিত এরূপ দুটি ভল্টের মিলন স্থলে একটি গম্বুজ স্থাপত্য সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। কানপুরে মন্দিরের পশ্চাদদেশকে আবদ্ধ না রেখে তা ত্রিখিলান প্রবেশ পথ দ্বারা উন্মুক্ত করা হয়েছে। বারান্দায় একাধিক প্রবেশ পথ থাকলেও গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য একটি মাত্র পথ করা হত। একরত্ন মন্দিরগুলির প্রসারতা সাধারণত উচ্চতা অপেক্ষা অধিক। কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন উদয়রাজপুরে) ছাদ ও রত্নের পরিসীমার মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করে মন্দিরের উচ্চতার উপর ঝোঁক দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চরত্ন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে হুগলি জেলায় যথেষ্ট সংখ্যক পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এ অঞ্চলে সারিবদ্ধ অনুভূমিক গভীর শিরা সম্বলিত শিখর শীর্ষ রত্নগুলি প্রাচীন ভারতীয় নাগর শৈলীর মন্দিরের অন্তমধ্যযুগীয় বঙ্গীয় সংস্করণের স্থানীয় প্রকাশ। সবক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় রত্নটির উচ্চতা কোণের রত্নগুলি অপেক্ষা অধিক। কোথাও কোথাও যেমন সোয়ালিক (পুরশুড়া থানা) -এর গোপীনাথ মন্দিরের রত্নগুলি লঘুভার কিন্তু দীর্ঘকায়। মেমানপুর (গোঘাট থানা) -এর শ্যামসুন্দর মন্দির বিষ্ণুপুরী শৈলীর প্রভাবে উচ্চতা অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। উল্লিখিত উভয় মন্দিরেই ত্রিখিলান প্রবেশপথ সহ বারান্দা আছে। এ ধরণের বারান্দা অন্যান্য বেশ কিছু মন্দিরে দেখা যাবে। দু একটি ব্যতীত এর কোনটিকেই ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে স্থান দেওয়া যায় না, মেমানপুরে গোপীনাথ মন্দির কারও কারও মতে স্থাপত্য ও অলঙ্করণের শৈলীগত বিচারে ১৭শ শতাব্দীর উদাহরণ রূপে গ্রহণ করা যায়। এসব মন্দিরের রত্নশিখরগুলির অনুভূমিক শিরা বিরল ক্ষেত্র ব্যতীত সরল রেখায় প্রসারিত এবং ক্রমহ্রাসমান স্তরে উন্নীত। উল্লেখযোগ্য মন্দিরের সংখ্যা অপ্রতুল নয়। এদের মধ্যে অন্তর্গত দশঘরার গোপীনাথ (১৭২৯), সোয়ালিকের পুরাতন গোপীনাথ, মামুদপুর (গোঘাট থানা) -এর বিষ্ণু (১৮০৬), উদয়পুরের রঘুনাথ (১৮১৮), বীরলোক (খানাকুল থানা) -এর সিংহবাহিনী, শ্রীপুরের জোড়াশিব, সুখাড়িয়ার গণেশ, আঁটপুরের তারা, ডিহিবাতপুর (পুরশুড়া থানা) -এর শিব (১৭৫৬), উত্তরপাড়ার পঞ্চশিব (১৭৯৪, ইলছোবার বিষ্ণু ও শিব, বাঁশবেড়িয়ার (জি. এন. মুখার্জী রোড) -এর জোড়া শিবমন্দির এবং কৃষ্ণপুর (দাদপুর থানা) -এর দুটি পরিত্যক্ত মন্দির। বালি-দেওয়ানগঞ্জে দামোদর মন্দির (১৮২২) -এর রত্ন শিখরে শিরাগুলি বাঁকানো বা চালা এবং রত্ন মন্দিরের ধনুকাকার কার্নিশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও বিরল।

পঞ্চরত্ন মন্দিরের অনেকগুলিতেই একটি প্রবেশ পথ এবং বারান্দাবিহীন বীরলোক (খানাকুল থানা) -এ সিংহবাহিনী মন্দিরের পরিকল্পনায় অভিনবত্ব প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে একটি দ্বিতল ভবনের উপর পঞ্চরত্ন দেউলটি নির্মিত। গোস্বামী-মালিপাড়া (দাদপুর থানা) -তে একটি পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চ আছে যার কার্নিশ বাঁকানো না হয়ে সরল রেখায় প্রসারিত। স্থাপত্যগত বিচারে দোলমঞ্চটি ১৯শ শতকের শেষপ্রান্তে অথবা বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

নবরত্ন

হুগলি জেলায় পঞ্চরত্ন অপেক্ষা নবরত্নেরই সংখ্যাধিক্য। বহু মন্দিরেরই পরিসর বৃদ্ধি করে সম্মুখে একটি ত্রি-খিলান প্রবেশপথ সহ বারান্দা করা হয়েছিল। বারান্দা ও গর্ভগৃহের সিলিংরূপে যথাক্রমে ভল্ট ও গম্বুজই সাধারণভাবে নির্মিত হত। প্রথম দিকে মন্দির আসনের বিস্তারের সঙ্গে উচ্চতার সামঞ্জস্য থাকলেও পরবর্তীকালে তা রক্ষিত হয় নি। দৈর্ঘ-প্রস্থের তুলনায় উচ্চতার উপর অধিক ঝোঁক দেওয়ায় মন্দিরের গঠনে অবাঞ্ছিত ছন্দপতন ঘটে। অধিকন্তু রত্নগুলিকে শীর্ণ ও দীর্ঘ করে তার দেহকাণ্ডকে শিখর অপেক্ষা দীর্ঘায়িত করায় মন্দিরের গঠন সৌন্দর্য অনেকটাই হানি হয়। কালক্রমে কার্ণিশের ধনুকাকৃতিও সরলরেখাকৃতি হওয়ায় আঞ্চলিক মন্দির স্থাপত্যের অবক্ষয় প্রকটভাবে প্রকাশ পায়।

যে কয়েকটি বৃহদাকার নবরত্ন মন্দির এ জেলায় রয়েছে তার মধ্যে দিগসুই (মগরা থানা) -তে প্রতিষ্ঠাফলক অনুযায়ী নারায়ণ মিস্ত্রী নির্মিত ও রমাকান্ত প্রতিষ্ঠিত যাদব রায়ের মন্দির (১৭২২) উল্লেখযোগ্য। ডেভিড ম্যাককাচ্চন খানাকুলে অপর একটি বৃহৎ নবরত্ন মন্দিরের উল্লেখ করলেও

পরবর্তীকালে ক্ষেত্রসমীক্ষায় এ রকম কোন মন্দির সেখানে নজরে পড়ে নি। প্রতিবেশী গ্রাম কৃষ্ণনগরে ১৭৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আদি গোপীনাথ মন্দিরটিকে বৃহৎ না বলে মাঝারি মাপের বলাই উচিত। যাদব রায় ও আদি গোপীনাথ - উভয় মন্দিরেই ত্রিখিলান প্রবেশ পথ। খিলানগুলি গুরুভার বহুকোণ স্তম্ভের উপর স্থাপিত। শেষোক্ত মন্দিরের গর্ভগৃহ ঢাকা বারান্দা দ্বারা তিন দিক থেকে বেষ্টিত। বারান্দায় পূর্বমুখী মূল প্রবেশ পথ ছাড়াও দক্ষিণ ও উত্তরদিকে গৌণ প্রবেশ দ্বার রয়েছে। মন্দিরটির প্রায় ধনুকাকার কার্নিশের চার কোণে চারটি মকর প্রণাল রয়েছে। কার্নিশের আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এখানে রত্ন শিখরের শিরাগুলিও বাঁকানো। ১৮১১ সালে মন্দিরটিকে ঝুলনমন্দিরে রূপান্তরিত করে পূজিত বিগ্রহকে একটি নবনির্মিত একরত্ন মন্দিরে স্থানান্তরিত করা হয়।

সুন্দুরুস (পুরশুড়া থানা) -এ একদা বৃহৎ একটি ভগ্ন নবরত্ন মন্দিরের সংবাদ ম্যাক্কাচ্চনের তালিকা থেকে পাওয়া যায়।

অপেক্ষাকৃত ছোট নবরত্ন মন্দিরের অন্তর্গত কয়েকটি হল বদনগঞ্জ (গোঘাট থানা) -এ দামোদর (১৮১০), কয়াপাট (গোঘাট থানা) -এ শ্রীধর (১৮০৭) ও বাকসা (চণ্ডীতলা থানা) -তে রঘুনাথ মন্দির (১৭৯৩)। প্রতিটি মন্দিরেই রয়েছে ত্রিখিলান প্রবেশ পথ। শেষোক্ত মন্দিরের দীর্ঘাঙ্গ রত্নগুলির শিখর শিরা সমূহ ঘনসম্বদ্ধ নয়। হাজিপুর (ধনিয়াখালি থানা) -এ লক্ষ্মী জনার্দন মন্দির (১৮১৭) -এর গর্ভগৃহের ছাদের উপর বৃহৎ কেন্দ্রীয় রত্ন ও চারকোণে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র যুগ্ম রত্ন স্থাপন করে এক বৈচিত্রপূর্ণ নবরত্নের রূপদান করা হয়েছে।

একটি প্রবেশদ্বার সহ নবরত্নের মধ্যে শহরের অন্তর্গত উত্তরচন্দননগরে বুড়োশিব ও বাঁশবেড়িয়ায় প্রধান সড়কের ধারে পাশাপাশি দুটি শিব মন্দির। কোথাও কোথাও বাঁশবেড়িয়ার মন্দির দ্বয়ের একটিকে পঞ্চরত্ন বলার কারণ সম্ভবত এটির অধিকাংশ রত্নই নেই। এই মন্দিরসমূহের একটি প্রবেশ পথ থাকলেও পার্শ্ববর্তী দেওয়ালে নকল দরজার একটি নক্সা প্রস্ফুটিত করার যে প্রথা লক্ষ্য করা যায় তা এ অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বহুল প্রচলিত হয়েছিল। চন্দননগরের নিকটবর্তী ভদ্রেশ্বরে প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত রামসীতা মন্দির অপর একটি একদ্বারী নবরত্ন মন্দিরের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সূচনা পর্ব থেকেই যে বাঁকানো কার্নিশ অন্ত-মধ্যযুগীয় মন্দির স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তা ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই সরলরেখায় টানা কার্নিশে রূপান্তরিত হয় যদিও এর পরও বেশ কিছুকাল বাঁকানো কার্নিশের সমান্তরাল অস্তিত্ব বজায় থাকে। সরলরেখায় প্রসারিত কার্নিশ যেসব নবরত্ন মন্দিরে দেখা যায় তার মধ্যে কয়েকটি হল সোমরা (বলাগড় থানা) -এর হরসুন্দরী কালী (১৮১৩), নিস্তারিনী কালী (১৮৪৭), মহানাদে ব্রহ্মময়ী কালী (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৩০ কিন্তু পরবর্তীকালে বহু সংস্কৃত) এবং ভদ্রেশ্বরের অন্নপূর্ণা কালী (১৮০১) মন্দির। অবশ্য উত্তরকালে সংস্কৃত হরসুন্দরী ও ব্রহ্মময়ীকালী মন্দিরদ্বয় এবং ১৮০১ সালে প্রতিষ্ঠিত বলে একটি অর্বাচীন মার্বেল ফলকে লিখিত নবকলেবর প্রাপ্ত অন্নপূর্ণা কালী মন্দিরের আদিরূপ ধারণা করা সম্ভব নয়।

একটি আটচালার উপর নবরত্ন সৌধ স্থাপন করে ইছাপুরে রামনাথ শিবের যে মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে তার সঙ্গে তুলনীয় দ্বিতীয় কোন মন্দির এ পর্যন্ত দেখা যায় নি। জামগ্রাম (পাণ্ডুয়া থানা) -এ নবরত্ন গঠনে একটি রাসমঞ্চ আছে।

ত্রয়োদশ রত্ন

পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন স্থানে ত্রয়োদশ রত্ন মন্দির দেখা গেলেও হুগলি জেলায় একটি মাত্র

মন্দিরকেই ম্যাককাচ্চন স্থানীয় লোকশ্রুত নির্ভর তথ্যের ভিত্তিতে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে ঐ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বালি-দেওয়ানগঞ্জে মঙ্গলচণ্ডীর প্রায় আকারহীন ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরটিই এই উদাহরণ। কোথাও কোথাও 'বাংলাদেশের দর্শনীয় মন্দির সমূহের একটি' বলে বর্ণিত ও বহুল প্রচারিত বাঁশবেড়িয়ার ত্রয়োদশ চূড় হংসেশ্বরী মন্দির (১৮১৪) -এ উত্তর ভারতাগত মিস্ত্রীদের দ্বারা চুনারের বালি পাথরের মাধ্যমে রত্নশৈলীর আদলে অভিনবত্ব আনয়ন প্রচেষ্টার বিপরীত পরিণতি ঘটিয়েছে। স্থানীয় লোকশ্রুতি অনুযায়ী রাণী শঙ্করী তাঁর পরলোকগত পতি রাজা নৃসিংহদেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী তন্ত্রের জটিল তত্ত্বকে স্থাপত্যের মাধ্যমে রূপ প্রদানের প্রয়াসরূপেই এই মন্দির নির্মাণ করান। কিন্তু বিদেশাগত শিল্পীরা বাংলার আঞ্চলিক স্থাপত্য ধারা, রীতি-নীতি, পরিমাপ সম্পর্কিত আর্যা প্রভৃতি কোনটির সঙ্গেই পরিচিত না থাকার ফলে তাদের দ্বারা নির্মিত হংসেশ্বরী মন্দির স্থানীয় রত্নশৈলীর অন্তর্গত হবার প্রয়াসে এক নিষ্প্রাণ দৃষ্টি পীড়াদায়ক আকার ধারণ করেছে।

পঞ্চদশ রত্ন

এ যাবৎ সপ্তদশ বা একবিংশতি রত্নের কোন মন্দির হুগলি জেলায় আবিষ্কৃত হয় নি। অবশ্য পঞ্চবিংশতি রত্নের একটি বিশাল মন্দির সুখাড়িয়ায় রয়েছে। বীরেশ্বর মুস্তাফী কর্তৃক আনন্দময়ী কালীর এই মন্দিরটি ডেভিড ম্যাককাচ্চন এবং স্পষ্টতই তাঁকে অনুসরণ করে অধুনা রচিত দু একটি গ্রন্থের লেখক মন্দিরটিকে ১৮১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বলে উল্লেখ করলেও এর সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। তাঁরা কোন তথ্যের ভিত্তিতে মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আনন্দ ভৈরবী বলে উল্লেখ করেছেন তাও স্পষ্ট নয়। মন্দিরটি চারতলা। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলের ছাদের প্রতিকোণে যথাক্রমে তিনটি, দুটি ও একটি রত্ন ও চতুর্থ তলরূপী শীর্ষরত্ন স্থাপিত করে মন্দিরটিকে পঞ্চবিংশতি রত্ন করা হয়েছে। মন্দিরের প্রথম তিনটি তলেই ত্রি-খিলান প্রবেশ রয়েছে। চতুর্থ তল চারদিকে চারটি খিলান-শীর্ষ প্রবেশ পথ দ্বারা উন্মুক্ত।

দালান শ্রেণী

হুগলি জেলায় বেশ কিছু মন্দিরের ছাদ সমতল। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠা ফলক থেকে জানা যায় এ জাতীয় দেবালয় দালান মন্দির রূপে পরিচিত ছিল। সাধারণ পরিসরের দালান মন্দিরে গর্ভগৃহের সম্মুখে ত্রি-খিলান প্রবেশ দ্বার সহ বারান্দা এবং অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মন্দিরে চার অথবা পাঁচটি খিলেন শীর্ষ প্রবেশ দ্বার সহ বারান্দা করাই ছিল রীতি। সূচনায় বহুকেন্দ্রিক খিলেনের নিম্ন প্রান্ত ধরে অবতল পল কাটা থাকত। উত্তরকালে পল বিহীন এককেন্দ্রিক গোল খিলেনের আগমন ঘটে। খিলেন বাহক বহুকোণ গুরুভার স্তম্ভও এ সময় বর্গাকার ও কিছুটা লঘুভার হয়ে যায়।

দালান শ্রেণীর দুটি ঝামাপাথরের মন্দির গোঘাট থানার সেলানপুর ও পাণ্ডুগ্রামে অবস্থিত। এর প্রথমটি দামোদর ও অপরটি শ্রীধরের নামে উৎসর্গীকৃত। নিকটবর্তী হওয়ার কারণে উভয় মন্দিরের আঙ্গিকেই মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা অঞ্চলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত স্থানীয়ভাবে অলভ্য ঝামা পাথরও অন্যত্র থেকে সংগৃহীত। শ্রীধর মন্দিরের ছাদের প্রান্তদেশ ঘিরে নীচু ব্যাটেলমেন্ট দ্বারা সৃষ্ট রেলিং অভিনব। ইসলামী স্থাপত্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও মন্দির স্থাপত্যে ব্যাটেলমেন্টের উপস্থিতি বিরল। বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরের মদনমোহন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। হুগলির উপরোক্ত মন্দিরদ্বয়কে শৈলীগত বিচারে ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে আনয়ন

করা যেতে পারে। এ জেলায় অন্যান্য প্রায় সব দালান মন্দিরের কার্নিশই সরলরেখায় প্রসারিত। এরূপ একটি উদাহরণ সালেপুর (আরামবাগ থানা) -এ ধর্মঠাকুরের মন্দির। অবশ্য মন্দির প্রবেশপথের স্তম্ভগুলি প্রথাগত ধারায় গুরুভার ও বহুকোণ। হরিণখালি (পুরশুড়া থানা) -এর ধর্মঠাকুরের মন্দির অনুরূপ হলেও প্রবেশ পথ একটি। গোঘাট থানার কামারপুকুর ও উদয়রাজপুর যথাক্রমে বিষ্ণু ও দামোদর মন্দিরের উপর একটি করে ক্ষুদ্র দ্বিতীয় তল আছে। ঐ থানারই বদনগঞ্জে শ্রীধর লালজী মন্দির দ্বিতল হলেও দ্বিতীয় তলটি পরবর্তী কালের সংযোজন। নিকটবর্তী কুমারগঞ্জের দালান মন্দিরটি ক্রমহ্রাসমান চারটি তলে উন্নীত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বীরলোকে সিংহবাহিনীর দ্বিতল দালান মন্দিরের শীর্ষে একটি পঞ্চরত্ন স্থাপিত আছে।

টিপ্পনী

প্রথা বহির্ভূত বেশ কিছু মন্দির হুগলি জেলায় দেখা যাবে। কিন্তু স্থান সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নি।

২

দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, তুলসীমঞ্চ

মন্দির পরিকল্পনার অঙ্গরূপে অনেকক্ষেত্রেই দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ ও তুলসীমঞ্চ নির্মাণ করা হত। ডেভিড ম্যাককাচ্চন অন্ত-মধ্যযুগীয় মন্দিরের তালিকায় বাংলায় ঝুলনমঞ্চ নির্মাণের উল্লেখ করলেও এরকম কোন উদাহরণ দেন নি। হুগলি জেলাতেও ঝুলনমঞ্চ রূপে নির্দিষ্ট কোন স্থাপত্য শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায় নি।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানকার দোলমঞ্চগুলিও দু'একটি ব্যতিক্রম সহ বর্গাকার। প্রথম দিকে মঞ্চ আচ্ছাদন রূপে শিখর প্রচলিত থাকলেও পরবর্তীকালে চারচালা, আটচালা ও রত্নই নজরে পড়ে। কয়েকটি ক্ষেত্রে দোলমঞ্চের উপর রয়েছে ছোট ছোট চূড়া যা চার্চ স্থাপত্যে 'টারেট' নামে পরিচিত। ডেভিড ম্যাককাচ্চনকে অনুসরণ করে এ ধরণের চূড়াকে 'বারোক ভাস টারেট' নামে আখ্যাত করা যায়। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি দোলমঞ্চের তালিকা দেওয়া হল :

অবস্থান	প্রকৃতি	প্রতিষ্ঠাকাল	মন্তব্য
কাঁকড়াকুলি (ধনিয়াখালি থানা)	শিখর শীর্ষ	১৭৫৪	
বৈঁচিগ্রাম	ঐ	১৭৬৫/১৮১৭?	
গুড়াপ (ধনিয়াখালি থানা)	ঐ	?	
কোঁচমালি (পাণ্ডুয়া থানা)	চারচালা	?	
দশঘরা	ঐ	?	
কৃষ্ণনগর (খানাকুল থানা)	ঐ	?	

রাধানগর	আটচালা	১৭৬১	রামমোহন রায়ের পৈতৃক বাস্তুর অন্তর্গত
গোপীনগর (খনিয়াখালি থানা)	ঐ	১৮৬০	রাধাবল্লভ মন্দির সংলগ্ন
গৌরাঙ্গপুর	ঐ	?	
কৃষ্ণনগর (খানাকুল থানা)	ঐ	?	রাধাবল্লভ মন্দির সংলগ্ন
কুমারচক (খানাকুল থানা)	ঐ	?	
আলা (ধনিয়াখালি থানা)	ঐ	১৭৬৫ (পারিবারিক সূত্র অনুযায়ী)	
তালচিনান (দাদপুর থানা)	ঐ	১৭৯২	
পুইনান (দাদপুর থানা)	ঐ	১৮০০	
আঁটপুর	ঐ	?	রাধাগোবিন্দ মন্দির সংলগ্ন
হারিট (দাদপুর থানা)	ঐ	? (১৯৬৫ সালে সংস্কৃত)	গোপীনাথ মন্দির সংলগ্ন
গোস্বামী-মালিপাড়া (দাদপুর থানা)	ঐ	?	মদনগোপাল মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত
হরিপাল	ঐ	?	দুটি উদাহরণ আছে
জামগ্রাম (পাণ্ডুয়া থানা)	নবরত্ন	?	সম্মুখ ত্রি-খিলান প্রবেশ পথ, অভ্যন্তরে অর্ধনলাকৃতি সিলিং
রাধানগর (খানাকুল)	'বারোক ভাস টারেট' সহ	?	
হরিপাল	ঐ	(১৮৯৩ সালে সংস্কৃত)	

পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এ অঞ্চলেও রাসমঞ্চে একটি কেন্দ্রীয় কক্ষকে ঘিরে বারান্দা দেখা যাবে। সাধারণত কক্ষ ও বারান্দা অষ্টভূজ। একটি মাত্র ক্ষেত্রেই রাসমঞ্চ ষড়ভূজ। বারান্দার প্রতিভূজে একটি এবং কক্ষের চারদিকে চারটি প্রবেশপথ রাখাই ছিল বিধি। ব্যতিক্রমস্বরূপ চারটি প্রবেশ সহ বারান্দাও কয়েকটি স্থানে নির্মিত হয়েছিল। বারান্দা ও কক্ষে সিলিং-এর স্থলে যথাক্রমে অর্ধ পিপাকৃতি 'টানেল ভল্ট' ও গম্বুজ করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে গম্বুজের পরিবর্তে বর্গাকার

আর্কুয়েট অথবা ট্রাবিয়েট ভল্ট নির্মিত হয়েছিল। সৌধপরি মূল শিখর কিছুটা নীচে তাকে ঘিরে অনুশিখরগুলি 'বারোক ভাস টারেট' শ্রেণীর।

নিম্নলিখিত তালিকায় হুগলি জেলায় অবস্থিত অসংখ্য রাসমঞ্চের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হল:

অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল	মন্তব্য
গুড়বাড়ী	১৭৮৯	
গোস্বামী-মালিপাড়া	?	
দশঘরা	?	
শ্রীরামপুর	?	
বালি-দেওয়ানগঞ্জ	?	
তারকেশ্বর	?	বারান্দায় কেবলমাত্র চারটি প্রবেশপথ।
হরিপাল	?	এখানকার দুটি রাসমঞ্চের একটি ষড়ভূজ।

তুলসীমঞ্চ

দেউল পরিকল্পনার অঙ্গরূপে তুলসীমঞ্চ স্থাপন ছিল একটি বহুল প্রচলিত প্রথা। বর্গাকার মঞ্চগুলি প্রলম্ব অক্ষে বেদী, দেহকাণ্ড ও শীর্ষ এই তিনটি অংশে বিভক্ত হত। দেহকাণ্ড অপেক্ষা বেদী ও শীর্ষদেশের পরিসর সামান্য অধিক রাখা হত। তুলসীগাছ রোপনের জন্য উপরিভাগে মাটি দিয়ে ভরাট করা গর্ত থাকত। অলঙ্করণ বর্জিত তুলসী মঞ্চগুলি গঠনগত সারল্যে দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে লোকান্তরিত প্রিয়জনের স্মৃতি স্মারক রূপেও তুলসীমঞ্চ নির্মাণের উদাহরণ পাওয়া যায়। লোকচক্ষুর অন্তরালে এরূপ একটি তুলসীমঞ্চ রয়েছে চুঁচুড়ার শ্যামবাবুর ঘাটে। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে বৃন্দারাণী কর্তৃক পরলোকগত স্বামী গোবিন্দের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মঞ্চটি নিবেদিত হয়েছিল।

চণ্ডীমণ্ডপ

অনেক সময়ই মন্দির প্রাঙ্গণে চণ্ডীমণ্ডপ করা হলেও সেগুলি অত্যন্ত সরলভাবে বাঁশ বা কাঠের তৈরী কাঠামোর উপর খড়ের ছাউনী দ্বারা নির্মিত হওয়ার ফলে স্থাপত্যগত গুরুত্ব লাভ করতে পারে নি। এগুলির জীবনও দীর্ঘস্থায়ী হত না। ব্যতিক্রম হিসাবে আঁটপুর ও শ্রীপুরে দুটি চণ্ডীমণ্ডপ রয়েছে তার সমগোত্রীয় একটি মাত্র নিদর্শনই নদীয়া জেলার উলাবীরনগরে রয়েছে। এই চণ্ডীমণ্ডপ ত্রয় আকারগত সৌষ্ঠব ও দারু ভাস্কর্যের সৌকর্যে বাংলার অন্ত-মধ্যযুগীয় স্থাপত্যকলাকে সমৃদ্ধ করেছে। এদের মধ্যে বিনষ্ট প্রায় শেষের দুটি পরবর্তীকালে জীর্ণোদ্ধার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের পূর্বগরিমা প্রায় সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে। অনেক কিছু অপসৃত হলেও আঁটপুরে মণ্ডপের আদি চরিত্র অনেকাংশে রক্ষিত। আয়তাকার মণ্ডপটি দোচালা। মণ্ডপের মূল কাঠামো সম্পূর্ণভাবে কাঠের। বৃত্তাকারে আবর্তিত পংক্তিতে ফুল লতা পাতার উৎকীর্ণ নক্সায় সজ্জিত পলকাটা

কাঠের খুটির সারির উপর চাল কাঠামোটি স্থাপিত। মন্ডপের দীর্ঘ প্রান্তদ্বয়ে কাঠামোটির সর্বনিম্নস্তরে খুটির ব্রাকেটশীর্ষে স্থাপিত আছে দুটি সরল (লিন্টেল)। এর উপর কিছুদূর অন্তর অন্তর আড়াআড়িভাবে রয়েছে আড়া (কড়িকাঠ)। প্রতিটি আড়ার দু প্রান্ত থেকে কিছুটা ভিতরের দিকে প্রলম্বভাবে বসানো আছে দুটি তীর (কিং পোস্ট)। তীরের উপর আবার অপেক্ষাকৃত ছোট যে আড়া আছে তাকে অঞ্চল বিশেষে বামনা বলা হয়। এর উপর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র করে নিম্ন স্তরের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এই স্তরের আড়াটির নাম টুনি বামনা। দুটি তীর টুনি বামনার মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে মুদন (রিজ পাল) কে ধরে রেখেছে। আড়া, বামনা ও টুনি বামনার দুই প্রান্তে মণ্ডপ কক্ষের দীর্ঘ পার্শ্ব বরাবর দুটি করে পাড় (পারলিন) বসানো আছে। মুদনের দুপাশ থেকে পাড়ের উপর দিয়ে ঢালু করে রাখা হয়েছে চাল কাঠ (র‍্যাফটার) গুলি। এর উপর প্রাথমিক আচ্ছাদন রূপে ময়ুর পালকের চিহ্ন এখনও দেখা যাবে। চাল কাঠামোটি খড়ের ছাউনী দিয়ে আবৃত। বর্তমানে অনেকাংশে স্থানচ্যুত 'ট্রাস' ও ব্রাকেট রূপে প্রযুক্ত কাঠের খণ্ডগুলি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে উৎকীর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ এবং সুরলোকের বহুবিধ প্রতিকৃতি রূপে যথাযোগ্য স্থানে নিবদ্ধ থেকে এই চণ্ডীমণ্ডপকে একদা লাবণ্যমণ্ডিত করেছিল।

৩

অভিনব স্থাপত্য চরিত্র হুগলি তথা বাংলার অন্ত-মধ্যযুগীয় মন্দির শিল্পকে যে গৌরবময় স্থান করে দিয়েছে তা আরও উজ্জ্বল হয়েছে পোড়ামাটি ভাস্কর্যের ব্যাপক প্রয়োগ দ্বারা মন্দির গাত্র অলঙ্করণের মাধ্যমে। স্থাপত্যের ন্যায় এই ভাস্কর্যেও কালের গতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৬শ শতাব্দীতে বৈঁচিগ্রামে হুগলি জেলার অন্ত-মধ্যযুগীয় মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উন্মেষ। সূচনায় মন্দির সজ্জায় অলঙ্করণ সংক্ষিপ্ত ও অগভীর। ১৭শ শতাব্দীতে মন্দিরের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। তৎসহ মন্দির ভাস্কর্যেও শিল্পীর দক্ষতা ও কুশলতার বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটে। নমনীয় গভীর মডেলিং, জ্যামিতিক কিম্বা লতাপাতার নক্সায় প্রাণের স্পন্দন, মনুষ্যমূর্তির স্ফীত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শক্তিমত্তার পরিচয়, মুখাবয়ব পাশ ফেরানো, জীবজন্তুর মধ্যে গতির ছন্দ এ পর্যায়ের ভাস্কর্যের মূল বৈশিষ্ট্য। এ ধরণের পোড়ামাটির ভাস্কর্য সম্বলিত মন্দিরগুলির অন্যতম বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব (১৬৭৯), গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্র, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের রাধাবল্লভ ও হরিপালের রাধাগোবিন্দ (১৬৫৪)।

১৮শ শতাব্দীতে পূর্বতন বলিষ্ঠতা ক্রমশ অপসৃত হতে থাকে। মডেলিং-এর নমনীয়তাও হারিয়ে যেতে থাকে। আংশিক আড়ষ্টতা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সচ্ছন্দ সঞ্চালনকে ব্যাহত করে। দেহের প্রায় সমস্ত অঙ্গই কৌণিক হওয়ার ফলে দেহ অবয়ব সীমারেখা ক্ষণে ক্ষণেই ভেঙ্গে গিয়ে সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হতে পারে নি। ১৮শ শতাব্দীর পোড়ামাটি ভাস্কর্যে অলঙ্কৃত মন্দিরগুলির মধ্যে কয়েকটি হল দশঘরার গোপীনাথ (১৭২৯), সুয়োলোকের আদি গোপীনাথ, কৃষ্ণপুর (পোলবা থানা)-এর শিব (১৭৬২), বালি-দেওয়ানগঞ্জে দামোদর, দিহিবাতপুরে শিব (১৭৫৬), উত্তরপাড়ায় পঞ্চানন শিব (১৭৯৪?), গুড়াপে নন্দদুলাল (১৭৫১), দ্বারহাট্টা (হরিপাল থানা)-তে রাজরাজেশ্বর (১৭২৮) এবং দ্বারিকাচণ্ডী (১৭৬৪), হরিপালে সীতারাম (১৭৩৬) ও কালী (১৭৪২), বোড়াগরি (পাণ্ডুয়া থানা)-তে শিব (১৭০৯), কাঁকড়াকুলিতে লক্ষ্মী জনার্দন (১৭৩৩), গোবিন্দপুর (জাঙ্গীপাড়া থানা) -তে শ্রীধর (১৭৩৬), জানিরবাটিতে দামোদর (১৭০৪), দেউলপাড়া (পুরশুড়া থানা)-তে জয়চণ্ডী (১৭৬৯), বাহিরগড় (জাঙ্গীপাড়া থানা), দামোদর (১৭৪৩), রাউতারায় সীতারাম (১৭০০), রাজবলহাট (জাঙ্গীপাড়া থানা) -এ দামোদর (১৭২৩), সাহাগঞ্জ (সদর থানা) -এ পরিত্যক্ত শিব

(১৭২৩) এবং আটপুরে রাধাগোবিন্দ (১৭৮৬)। এ ছাড়াও অনুল্লিখিত পোড়ামাটি ভাস্কর্য্য সমৃদ্ধ এক বিপুল সংখ্যক মন্দির হুগলি জেলায় রয়েছে। সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গে ১৮শ শতাব্দীতে নির্মিত মন্দিরের সমাবেশ এ জেলাতেই সর্বাধিক।

১৯শ শতাব্দীতে পোড়ামাটি শিল্পে দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। বিষয়বস্তুর প্রাধান্যে শিল্পকুশলতা গৌণ হয়ে যায়। প্রাণহীন আড়ষ্টতা মূর্তি, ফুল, লতাপাতাকে ব্যাপ্ত করে ছন্দময় গতিশীলতাকে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত করে। সমস্ত ভাস্কর্যে পুতুলের চরিত্র ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে। মাটি মেশানো ও পোড়ানোর মধ্যে দক্ষতার অভাব ও অবহেলা দেখা যায়। সমস্ত কাজের মধ্যে এক স্থূলত্ব আত্মপ্রকাশ করে। এই শতকের মাঝামাঝি থেকে পোড়ামাটি ভাস্কর্যের সমান্তরালভাবে পঙ্খ দ্বারা মন্দির অলঙ্করণের প্রচলন শুরু হয়। কালক্রমে পঙ্খই একমাত্র অলঙ্করণ মাধ্যম হিসেবে স্থান করে নেয়। এভাবে অবলুপ্ত হয় একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ শিল্প ঐতিহ্য।

পোড়ামাটি ভাস্কর্যের ধারাবাহিক ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় ১৭শ শতকে এই শিল্পে কোন উপ-আঞ্চলিকতা নেই। অর্থাৎ হুগলী বিষ্ণুপুর ও সমসাময়িক অন্যান্য অঞ্চলে শিল্পটি রীতিগতভাবে প্রায় বিভেদ শূন্য। ১৮শ শতাব্দীতে হুগলি রীতির প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। এ সময়ের শেষ দিক থেকে ভ্রাম্যমান শিল্পীগোষ্ঠীকে বিভিন্ন অঞ্চলে মন্দির নির্মাণে রত থাকতে দেখা যায় এবং প্রতিষ্ঠা ফলকে স্থপতির নাম উল্লেখের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।

একটি প্রথাবদ্ধ রীতি পোড়ামাটি ভাস্কর্য দ্বারা মন্দির অলঙ্করণকে নিয়ন্ত্রণ করত। দেওয়ালের পাদ দেশে একটি অনুভূমিক 'ফ্রিজ' এ রাজা, রাজপুরুষ, বাণিজ্যতরী, ইউরোপীয় উপনিবেশ, পাল্কীতে অভিজাত, অশ্বারোহী, কল্পনাশ্রিত রথ, যুদ্ধ দৃশ্য, বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু, সামাজিক চিত্র প্রভৃতি দেখা যায়। এর উপর অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতায় আর একটি অনুভূমিক 'ফ্রিজ'-এ ভাগবত অবলম্বনে কৃষ্ণলীলা ও কোন কোন ক্ষেত্রে রামায়ণ কাহিনীও প্রদর্শন করা হত। এর উপর প্রবেশ পথের দুপাশের দেওয়াল, কার্ণিশের নীচ পর্যন্ত দেওয়াল বর্গাকার ছোট ছোট প্যানেলে বিভক্ত হয়ে তা নানাবিধ নক্সায় অলঙ্কৃত থাকত। বৃহৎ মন্দিরের ক্ষেত্রে অর্ধস্তম্ভ দ্বারা দেওয়াল একাধিক প্রলম্ব ক্ষেত্র ('বে')-তে বিভক্ত হয়ে তা এরূপ প্যানেলে আবৃত থাকত। স্প্যান্ড্রেলের উপর কার্নিশের তল বরাবর এই প্যানেলের আরও একটি বা দুটি সারি প্রসারিত করা হত। সম্মুখে খিলেন বাহক স্তম্ভ গুলির দেহও আবৃত হত অলঙ্কৃত প্যানেলে। এখানে অনেক সময়ই অন্যান্য দেব-দেবী সহ মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গাকে প্রদর্শন করা হয়েছে। স্প্যান্ড্রেল (প্রবেশপথের খিলেনের শীর্ষ ও ত্রি-খিলানের অন্তর্বর্তী দেওয়াল) সজ্জায় রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড বিশেষ করে যুদ্ধদৃশ্য গুরুত্ব লাভ করে। স্প্যান্ড্রেলের দুধারে রোসেট (অতি বিবর্তিত গোলাপ বা পদ্ম) অথবা রামমন্ডল নিবদ্ধ করার প্রথাও ছিল অতি প্রচলিত। অবশ্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেওয়ালের অন্য অংশেও রামমণ্ডল দেখা গেছে। দেওয়ালের শীর্ষদেশের কেন্দ্রে পাথর কিম্বা পোড়ামাটির ফলকে প্রতিষ্ঠালিপি নিবদ্ধ থাকত। ১৮শ প্রথমার্ধ শতাব্দীর থেকেই কোন কোন মন্দিরের সম্মুখ ও প্রতি পার্শ্ব দেওয়ালের সংযোগস্থলে কোণাকুণি ভাবে উদগত একটি পোড়ামটির প্রলম্ব পাটা দেখা যাবে। পাটাটি উপর্যুপরি স্থাপিত কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিখণ্ডেই রয়েছে শত্রু নিধনরত অশ্বারোহী। প্রাচীন কাঠের রথে এ রকম পাটার নিদর্শন রয়েছে। সেক্ষেত্রে কাঠের তৈরী পাটা বর্শা নামে আখ্যাত। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না দারু শিল্পে দক্ষ সূত্রধররা মন্দির নির্মাণে নিয়োজিত হয়ে তার অঙ্গসজ্জায় বর্শাসমেত রথের বহু অংশকে পোড়ামাটির ভাস্কর্যে রূপায়িত করে। দশঘরার গোপীনাথ ও আটপুরের রাধাগোবিন্দ মন্দির এ ধরণের দুটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ যাতে বর্শা প্রযুক্ত হয়েছে। বাঁশবেড়িয়ায় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি শিবমন্দিরেও বর্শা দেখা যাবে।

১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে মন্দিরের সম্মুখ ও ক্ষেত্র বিশেষে, পার্শ্বদেওয়াল সম্পূর্ণভাবে পোড়ামাটি ভাস্কর্যে আবৃত থাকত। কোন কোন মন্দিরের মণ্ডপ অথবা বারান্দাতেও অলঙ্করণ করা হত। এ প্রসঙ্গে বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব ও আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ মন্দিরদ্বয়ের উল্লেখ করা যায়। ১৯শ শতাব্দীতে মন্দির সজ্জায় প্রাচুর্যের উচ্ছাস ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। এ সময়েই মানুষ, পশু, পাখির প্রতিকৃতি হ্রাস পেয়ে ফুল, লতা, পাতা ও জ্যামিতিক নক্সার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন মন্দিরের অভাব নাই যাতে অলঙ্করণে প্রাণী জগতের নিদর্শন সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। কেবলমাত্র অমূর্ত এবং বিমূর্ত নক্সায় মন্দির সজ্জার উদাহরণ পূর্বেও রয়েছে যেমন বৈঁচি গ্রামের গোপাল (শিব) ও কৃষ্ণনগরের রাধাবল্লভ মন্দিরে। কিন্তু ওক্ষেত্রে মুসলিম শাসককুল কর্তৃক প্রবর্তিত পশ্চিম এশীয় স্থাপত্য অলঙ্করণের প্রভাবে যে শিল্প কুশলতার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তা ১৯শ শতাব্দীতে প্রায় অস্তমিত।

৪

মন্দির নির্মাণ ও অলঙ্করণে হুগলি জেলার শিল্পী স্থপতিকুলের পারদর্শিতা অনস্বীকার্য। এদের সমাজ প্রধানত কয়েকটি থাক বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত সূত্রধর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। স্থপতির থাক অনুযায়ী মন্দিরের গড়ন ও আঙ্গিকে কিছুটা প্রভেদ সৃষ্টি হত। জানা যায় অষ্টকুল সমাজভুক্ত সূত্রধরদের বসতি ছিল হুগলি সহ মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং নদীয়া জেলার অংশ বিশেষে। অষ্টকুলের অন্তর্ভুক্ত বলে সঠিকভাবে জানা না গেলেও সূত্রধরদের মান্দারণ নামে একটি থাক সম্ভবত আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার মান্দারণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।

যে সব শিল্পী মন্দির নির্মাণের মূল দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের বেশ কিছু নাম মন্দির প্রতিষ্ঠা লিপিতে উল্লেখ আছে। লিপি প্রমাণে জানা যায় ১৭৩৮ সালে বাঞ্ছারাম নামে জনৈক শিল্পী হরিরামপুর (জাঙ্গীপাড়া থানা) -এ একটি আটচালা শিব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মাহেশ (শ্রীরামপুর থানা)-এর আটচালা রাধাবল্লভ মন্দির (১৭৩৮) নির্মাণের মূল স্থপতি ছিলেন কৃষ্ণদাস। এঁদের বাসস্থানের পরিচয় জানা যায় না। সাফল্যরাম মিস্ত্রী নামে এ রকম একজন স্থপতি পুরশুড়া থানার দেলপাড়া বা দেউলপাড়া গ্রামে ১৭৬৪ সালে এক আটচালা মন্দির (বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত) নির্মাণ করেন। নিঃসন্দেহে বাঁকুড়া জেলার ভগলপুরে ১৭৯৩ সালে একটি মন্দিরের নির্মাতা কানপুর গ্রাম (আরামবাগ থানা) নিবাসী সাফল্যরাম দে ও পূর্বোক্ত স্থপতি একই ব্যক্তি। হুগলি জেলার হাজীপুর গ্রাম (গোঘাট থানা) -এ ১৮২৭ সালে লক্ষ্মী জনার্দন মন্দিরটির নির্মাতা সাফল্যরাম মিস্ত্রী বলে প্রতিষ্ঠা লিপিতে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সময়ের ব্যবধান তাঁর ও কানপুরের সাফল্যরামের পৃথক অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। সেনহাট (খানাকুল থানা) -এর অশ্বিনীকুমার কুণ্ডু ১৯১৩ সালে উবিদপুর (খানাকুল থানা) -এ ঘন্টেশ্বর শিবের মন্দির নির্মাণ করেন। প্রথমোক্ত সাফল্যরামের ন্যায় তিনিও হুগলি জেলার বাইরে মন্দির নির্মাণের ডাক পেয়েছিলেন। সেনহাটের অপর এক শিল্পী পঞ্চানন কুণ্ডু ১৯৪০ সালে রাজহাটে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। সেনহাটে একটি মন্দিরের নির্মাতা হীরাচাঁদ দে। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা লিপিগুলি থেকে আরও জানা যায় আরামবাগ অঞ্চলে একদা জাহানাবাদ পরগণা নামে পরিচিত প্রশাসনিক ভূভাগে স্থপতিকুলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এরূপ কেন্দ্রের মধ্যে সেনহাট (কোন কোন লিপিতে সেনহাট অথবা সেনহাটি বলেও বর্ণিত) ঘোসপুর, খানাকুল, ময়াল প্রভৃতির সুনাম ছিল। বায়রা পরগণায় কানপুর (আরামবাগ থানা) নামে আরও একটি কেন্দ্রের নাম পাওয়া গেছে। আরামবাগ অঞ্চলের বাইরেও বেশ কয়েকটি স্থানে সূত্রধরদের বসতি ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। মন্দির স্থাপত্যের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধশালী

আঁটপুর স্বাভাবিকভাবেই এই বসতিগুলির অন্যতম একটি রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

হুগলি জেলার স্থপতিকুলের কারিগরী দক্ষতা ও শিল্প নৈপুণ্যের খ্যাতি জেলার সীমায় আবদ্ধ ছিল না। সুতরাং প্রতিবেশী জেলাগুলিতেও তাদের চাহিদার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই স্থপতিবৃন্দ হুগলির বাইরে কোথায় কোথায় মন্দির নির্মাণ করেছিল তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :

ক) মেদিনীপুর জেলা :

মন্দির পরিচয়	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল	স্থপতি
মদনমোহনের রাসমঞ্চ	কিসমৎ নারাজোল (দাসপুর থানা)	১৮১৬	মথুরামোহন মিস্ত্রী (সে° হাট)
পঞ্চরত্ন কাশী গোপাল	হীরাধরপুর (চন্দ্রকোণা থানা)	১৮৪৮	কালাচাঁদ মিস্ত্রী (সেনহাট)
পঞ্চরত্ন গোপীমোহন	দেহাটি (পাঁশকুড়া থানা)	১৮৪৮	গিরিধর মিস্ত্রী (ঘোষপুর)
গোপীমোহনের রাসমঞ্চ	ঐ	১৮৪৮	ঐ
বিষ্ণু ও শিবের মণ্ডপ নামক দালান	জাড়ী (চন্দ্রকোণা থানা)	১৮৫২	গোপাল মিস্ত্রী (খানাকুল)
ত্রয়োদশরত্ন শিব	উদয়গঞ্জ (ঘাটাল থানা)	১৮৬৪	কার্তিক চন্দ্র মিস্ত্রী ও মাহিন্দ্র নাথ মিস্ত্রী (সেনহাট)
আটচালা শিব	আলুই (ঘাটাল থানা)	১৮৬৭	মাহিন্দ্রনাথ কুণ্ডু ও গণেশ চন্দ্র কুণ্ডু (সেনহাট)
নবরত্ন দধিপবন	উদয়গঞ্জ (ঘাটাল থানা)	১৮৭৭	মাহিন্দ্রনাথ মিস্ত্রী (সেনহাট)
পঞ্চরত্ন সিংহবাহিনী	উদয়গঞ্জ (ঘাটাল থানা)	১৮৭৭	মাহিন্দ্রনাথ মিস্ত্রী (সেনহাট)
আটচালা বুড়োশিব	খড়ার (ঘাটাল থানা)	১৮৭৮	মাহিন্দ্রনাথ মিস্ত্রী (সেনহাট)
শীতলার দালান	মারিচ্যা (ঘাটাল থানা)	১৯০২	তিনকড়ি মিস্ত্রী (সেনহাট)
আটচালা শিব	উদয়গঞ্জ (ঘাটাল থানা)	১৯০৫	তিনকড়ি মিস্ত্রী (সেনহাট) ও শশীভূষণ মিস্ত্রী (দাসপুর)
নাটমন্দির, জিষ্ণুহরি	তমলুক (তমলুক থানা)	১৯২১	অশ্বিনীকুমার কুণ্ডু (সেনহাট)

খ) হাওড়া জেলা :

মন্দিরপরিচয়	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল	স্থপতি
আটচালা সীতারাম (সংস্কার সাধন)	আসণ্ডা (উদয়নারায়ণপুর থানা)	১৭১৯	রামেশ্বর মিস্ত্রী (তারাপদ সাঁতরা শিল্পীর নিবাস বিনগ্রামকে হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত করলেও প্রতিষ্ঠা ফলক থেকে স্থানটি কোন থানা বা জেলায় অবস্থিত জানা যায় না বলে মন্তব্য করেছেন।)
আটচালা বিশ্বেশ্বর শিব	বরুউপুর (উদয়নারায়ণপুর থানা)	১৮৪০	রামগোপাল মিস্ত্রী (আটপুর)
আটচালা উমাপতি শিব	ইছাপুর (জগৎবল্লভপুর থানা)	১৮৬৬	দিগম্বর দের পুত্র (সেনহাটি)। সম্ভবত এই পুত্রের নাম রামকুমার দে
আটচালা চন্দ্রচূড় শিব	রসপুর (আমতা থানা)	১৮৭০	বনমালী মিস্ত্রী (ময়াল)
আটচালা কল্যাণেশ্বর শিব	চোঙঘুরালি (জগৎবল্লভপুর থানা)	১৮৮৪	দিগম্বর দের পুত্র। রামকুমার দে (সেনহাট)
নবরত্ন বংশীগোপাল	গোপীনাথ চোঙদার লেন, হাওড়া	১৮৯০	যদুনাথ মিস্ত্রী (ময়াল)

গ) বাঁকুড়া জেলা :

মন্দিরপরিচয়	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল	স্থপতি
পঞ্চরত্ন রঘুনাথ	কোঙারপুর (কোতুলপুর থানা)	১৭৮৫	রামমোহন মিস্ত্রী (বাঘাটি)
কৃষ্ণরায়ের দালান	ভগলপুর (কোতুলপুর থানা)	১৭৯৩	মিস্ত্রী সাফল্যরাম দে
পঞ্চরত্ন দামোদর	জীবটা (কোতুলপুর থানা)	১৮৩৩	যতিরাম মিস্ত্রী (সানোতা)
দুর্গা দালান	জীবটা	১৮৯০	পানাউল্লা কাজী (তাজপুর)

এ ছাড়া রাজহাটি নিবাসী দারিখানাথ মিস্ত্রী মেদিনীপুর জেলার লছিপুর (ঘাটালথানা) এ

১৮৬০ সালে শ্রীধর জীউ-এর নীলাকর নাথ মঞ্চ (রাসমঞ্চ) ও উদয়চন্দ্র পতি গোবিন্দপুর (পাঁশকুড়া থানা) -এ ১৮৮১ সালে মহাদেব তারকনাথের আটচালা মন্দির নির্মাণ করেন। পারিবারিক সূত্রে আরও জানা যায় হাওড়া জেলার কল্যাণচক গ্রাম (উদয়নারায়ণপুর থানা) -এ যে আটচালা পরেশনাথ শিব (১৮৪৩) ও দুর্গা দালান (১৮৫২) পঞ্চানন মিস্ত্রী নির্মাণ করেছিলেন তিনি হুগলি জেলার খানাকুল থানার রাজহাটি নন্দনপুরের অধিবাসী। নিঃসন্দেহে এই পঞ্চানন মিস্ত্রীই পেঁড়ো গ্রাম (উদয়নারায়ণপুর থানা) -এ শ্রীধর জীউ-এর শিখর মন্দির (১৮৮৬)-এর নির্মাতা পাঁচু মিস্ত্রী। মেদিনীপুর জেলায় প্রাপ্ত মন্দিরলিপিতে উল্লিখিত রাজহাটি কারও কারও মতে পাঁশকুড়া থানায় ঐ নামেরই একটি গ্রাম। পূর্বে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে স্থানটিকে হুগলি জেলাতে নির্দেশ করা যেতে পারে।

এ পর্যন্ত সংগৃহীত মন্দিরলিপিতে যে সব শিল্পীর নাম জানা যায় তাদের মধ্যে সেনহাটের কুণ্ডু পরিবারভুক্তদের যথেষ্ট সুনাম ছিল বলে মনে হয়। এই পরিবারের অন্তত দুজনের নাম প্রতিষ্ঠা ফলকে রয়েছে। এরা হলেন মাহেন্দ্রনাথ ও গণেশচন্দ্র। সম্ভবত মাহিন্দ্রনাথের সঙ্গে যৌথভাবে কর্মরত কার্তিকচন্দ্র মিস্ত্রীও এই পরিবারের একজন। এঁদের মধ্যে মাহিন্দ্রনাথ যে অগ্রগণ্য ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন স্থানে অন্তত: পাঁচটি মন্দির নির্মাণে তার একক অথবা যৌথ নেতৃত্বদানে। তিনি আরও বহু মন্দির যে নির্মাণ করেছিলেন তা অনস্বীকার্য। কানপুরের সাফল্য রাম দে ও বেশ খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি হুগলির দেলপাড়া ছাড়াও বাঁকুড়ার ভগলপুরে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেনহাটের ভাগলপুরে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেনহাটের দে পরিবারভুক্ত সদস্যদেরও বংশপরম্পরায় স্থপতির কাজ করে খ্যাতি অর্জন হয়েছিল বলে মনে করা যায়। এই পরিবারের দিগম্বর ও তাঁর গৌরবে গৌরবান্বিত পুত্র রামকুমার এরকম দুজন কুশলী স্থপতি ছিলেন বলে অনুমান করা যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পী স্থপতিগণ মিস্ত্রী বলে নিজেদের পরিচয় দেওয়ায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় এঁদের সামাজিক অবস্থান খুব উচ্চে ছিল না। বহু লিপিতেই ভাষা ও ব্যাকরণগতভুল এঁদের মধ্যে প্রথাবদ্ধ শিক্ষার অভাব প্রকাশ করেছে। বাংলার এক গৌরবময় ঐতিহ্য স্থাপনাকারী এই শিল্পীকুল খুব আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতেন তাও বোধ হয় না।*

❑ ঋণস্বীকার

* প্রবন্ধটি রচনার প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহে ক্ষেত্রবিশেষে তারাপদ সাঁতরা ও ড. রমাপ্রসাদ মজুমদার যে সাহায্য করেছেন তার জন্য আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়া পরিশোধ সম্ভব নয়। ডেভিড ম্যাককাচ্চন কৃত অন্ত্য-মধ্যযুগীয় মন্দির স্থাপত্য সম্পর্কিত আকর গ্রন্থ 'লেট মিডিয়েভাল টেম্পল অব বেঙ্গল' (কলকাতা, ১৯৭২) থেকেও যথেষ্ট সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তথ্যসংগ্রহের প্রাথমিক পর্যায়ে বিমলেন্দু কুমার মূল্যবান সাহচর্য দান করেছিলেন। ক্ষেত্র সমীক্ষায় ড. রমাপ্রসাদ মজুমদার কর্মকর্তী অংশগ্রহণ করেন। মন্দিরের শ্রেণী বৈচিত্র্য প্রদর্শনে ব্যবহৃত রেখাচিত্রগুলি সোমজিত দাশগুপ্ত কর্তৃক অঙ্কিত। এঁদের সকলের প্রতিই লেখকের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম।

হুগলি : প্রত্নসম্পদ

প্রণব রায়

প্রত্নসম্পদের ক্ষেত্রে হুগলি জেলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রত্নসম্পদগুলির প্রায় সবই ঐতিহাসিক কালের বিভিন্ন পর্বের অন্তর্ভুক্ত। প্রাগৈতিহাসিক বা প্রায় ঐতিহাসিক যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র বা মৃৎপাত্রের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আজও হুগলির মৃত্তিকান্তর থেকে পাওয়া যায় নি। একমাত্র পশ্চিমে গোঘাট অঞ্চলের কঠিন ও উচ্চ ভূখণ্ড থেকে উপযুক্ত উৎখননের সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কিছু পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হতে পারে। একটি পাথরের অস্ত্র গোঘাট থানার অন্তর্গত কুনকুন নামক গ্রাম থেকে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়।[১] এই ধরণের পাথরের অস্ত্র জেলার অন্য কোন স্থানে পাওয়া গেছে বলে জানা যায় না। ভাগীরথীর ব-দ্বীপসংলগ্ন অঞ্চল ও তার পলিমাটিতে গঠিত এই জেলার প্রায় সবটাই এককালে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। কালক্রমে পলিমাটি সঞ্চয়ে উদ্ভূত এই অঞ্চল শস্য শ্যামল ভূমিতে পরিণত হয় এবং উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটতে থাকে। একারণে, ছোটনাগপুরের পার্বত্য ভূখণ্ড যা মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চলকে ছুঁয়ে গেছে এবং যেখানে ভারতের আদিম মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির সাক্ষ্যরূপে অজস্র পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে — পলিসঞ্চয়ে উদ্ভূত হুগলির নবভূমিতে সে ধরণের অস্ত্রশস্ত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন।

এ-কথা সত্য, প্রাচীনকালে বিভিন্ন নদ-নদীর ধারে সভ্যতা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। নদীধারের উঁচু ঢিবি ও সংলগ্ন স্থান অনুসন্ধান বা উৎখনন ক'রে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু পুরানিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্ধমানের অজয়নদ তীরবর্তী 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' তার অন্যতম নিদর্শন। হুগলিতেও যেসব নদনদী আজও বিদ্যমান, তার তীরসন্নিকটবর্তী তেমন কোন ঢিবি বা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় নি। এই জেলার মধ্য দিয়ে বহমান দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, আমোদর, দ্বারকেশ্বর, কাণা দামোদর, সরস্বতী এবং পূর্ব সীমানায় ভাগীরথী বা হুগলি নদী প্রবাহিত হলেও এদের কোন কোনটির গতি পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, বর্তমান মুণ্ডেশ্বরী যেটা আগে 'মুড়াই' নামে আরামবাগের কয়েক কিলোমিটার পূর্বে প্রসিদ্ধ 'তেলো-ভেলোর মাঠ' দিয়ে প্রবাহিত হোত, তা আরও অনেক পূর্বে সরে গেছে। ভালিয়া গ্রামের পাশ দিয়ে এই নদীটির মরা খাত লক্ষ্য করা যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ষোল শতকের শেষাশেষি বর্ধমানের দামিন্যা থেকে গৃহত্যাগ করে যখন মেদিনীপুরে ব্রাহ্মণভূমের আড়রায় যান, তখন যাত্রাপথে এই মুড়াই নদী পার হয়ে আরামবাগের কাছে দ্বারকেশ্বর তীরবর্তী তেউট্যায় পৌঁছান। ভাগীরথী বা হুগলি নদীর চেয়ে প্রাচীন কালে সরস্বতী ছিল হুগলির প্রধান নদী। সুলতানী আমল বা তারও আগে থেকে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কিন্তু এ নদীরও পতন হয়েছে খ্রিস্টীয় ষোল শতক বা তার কিছু পর থেকে। হুগলি নদীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এই সময় থেকে। এককালে সরস্বতীর তীরে সপ্তগ্রামে যে নগর ও

বন্দর গড়ে উঠেছিল এবং উন্নত সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল, মুমূর্ষু সরস্বতীর তীরে তার অনেক পুরানিদর্শন পাওয়া গেছে, কিন্তু আজও অনেক কিছুই এখানকার ভূগর্ভে সমাহিত হয়ে আছে। উৎখননের মাধ্যমে সেসব পুরাবস্তু উদ্ধার করা সম্ভবপর।

হুগলি জেলার প্রত্নসম্পদের অনুসন্ধান ও প্রাপ্তি তাই ঐতিহাসিক কালের বিভিন্ন যুগে বিস্তৃত। কিন্তু বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এই সব প্রত্নস্থল ও প্রত্নবস্তু যে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক কালপর্বের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বহু পুরানিদর্শন হুগলি জেলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে বা লক্ষ করা গেছে। প্রাচীন কালের নিরিখে এই জেলা থেকে প্রাপ্ত পুরাবস্তুগুলি গুপ্ত, গুপ্তোত্তর এবং পাল-সেন শাসনাধিকার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়সীমা আ: খ্রিস্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত টানা যায়। এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলগুলি হোল, মহানাদ, পাণ্ডুয়া, ত্রিবেণী, আদিসপ্তগ্রাম বা সপ্তগ্রাম।

হুগলির মধ্যযুগের ইতিহাস মূলত সপ্তগ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। ত্রিবেণী ও পাণ্ডুয়া ছিল এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই সময়ে সুলতানী আমলে এইসব স্থানের প্রাচীন মন্দিরগুলি নির্মমভাবে ধ্বংস ক'রে মসজিদস্থাপত্যের বিকাশ ঘটে। এগুলিও আজ ধ্বংসোন্মুখ, তবুও এদের স্থাপত্যশৈলী সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা করে নিতে পারি। কিন্তু এই জেলায় প্রাচীনকালের হিন্দুমন্দিরগুলির স্থাপত্যশৈলী সম্পর্কে ধারণা অনেকটা অনুমান নির্ভর হয়ে পড়ে। যদিও আশপাশের দু'একটি জেলায় টিকে থাকা এক্ আধটি হিন্দু আমলের মন্দির (যেমন, বর্ধমান জেলার সাতদেউলিয়ার ইঁটের 'শিখর' মন্দির) লক্ষ করে হুগলিতেও এ ধরনের মন্দির যে নির্মিত হয়েছিল, তা অনুমান ক'রে নেওয়া যায়। এ-সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনায় আসছি। মোটামুটিভাবে হুগলি জেলায় সুলতানী আমলে মসজিদ স্থাপত্যের বিকাশের কালপর্ব খ্রিস্টীয় তের শতকের শেষ থেকে চোদ্দ শতক পর্যন্ত (কারও কারও মতে পনের শতক পর্যন্ত) চলেছিল।

সুলতানী আমলের শেষ দিক থেকে এবং মুঘল - পাঠান শাসনকালে বাংলার সর্বত্র মন্দির স্থাপত্যের যে প্লাবন লক্ষ্য করা গেল, তা ছিল অভূতপূর্ব। হুগলি জেলায় স্বাভাবিকভাবেই অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়েছিল ষোল শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত। হিন্দু আমলের সু-উচ্চ 'শিখর'-দেউল মন্দিরের বদলে এখন নির্মিত হ'তে থাকল বাংলার নিজস্ব 'স্টাইলে' তৈরি 'চালা', 'চাঁদনি', 'দালান', 'রত্ন', সরল 'দেউল' মন্দির এবং আরও কোন কোন বিশিষ্ট শৈলীর মন্দির। এইসব প্রত্নকীর্তি ও মন্দিরাশ্রিত 'টেরাকোটা' অলংকরণ (সম্ভবত হুগলিতে পাথরে তৈরি মন্দির নেই) বিস্ময়করভাবে আজও বর্তমান। যদিও প্রাচীন মন্দিরের অনেকগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে।

মন্দিরের সঙ্গে গির্জা ও সমাধিগুলি এই জেলার বিশিষ্ট প্রত্নসম্পদ। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু বিদেশী পর্যটক ও বণিকদের আনাগোনা সপ্তগ্রামের অভ্যুদয় থেকেই শুরু হয়। মুঘল আমলে জাহাঙ্গীর ও শাহাজাহানের সময়ে পোর্তুগীজ, ইংরেজ, ডাচ, ফরাসিরা নদীতীরবর্তী যথাক্রমে ব্যান্ডেল, হুগলি, চুঁচুড়া ও চন্দননগরে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলে। পোর্তুগীজরা অবশ্য আরও অনেক আগে (খ্রি: ষোল শতকের প্রথমার্ধে) এদিকে এসে উপস্থিত হয়। ব্যবসা - বাণিজ্যের জন্যে আঠার শতকে আসে দিনেমার, জার্মান ও বেলজিয়ানরা। কাজেই য়ুরোপের প্রায় সব জাতিই হুগলির তটবর্তী স্থানগুলোতে তাদের বসতি, দুর্গ ও ধর্মচর্চা কেন্দ্ররূপে গির্জা নির্মাণ করে। সেসবের কিছু কিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও য়ুরোপীয় স্থাপত্যের নিদর্শনরূপে গির্জা ও সমাধিগুলির সংখ্যা কম নয়, যা বাংলার অন্য কোন স্থানে এত বেশি দেখা যায় না। এ কারণে, হুগলি জেলার প্রত্নসম্পদের বৈচিত্র্য এত বেশি যা (একমাত্র মেদিনীপুর জেলাকে বাদ দিলে) অন্য কোন জেলায় লক্ষ্য করা

যায় না। মধ্যযুগের মন্দিরস্থাপত্য - ভাস্কর্য ও গির্জা স্থাপত্য এই জেলায় প্রায় সমকালীন। কিন্তু মন্দিরের সংখ্যা ও গুণগত উৎকর্ষের তুলনায় গির্জাস্থাপত্য যে নিতান্ত নগণ্য, তা বলা বাহুল্য।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে হুগলি জেলার প্রত্নসম্পদগুলির বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

হুগলি জেলায় আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য উৎখনন না হওয়ায় প্রাচীনকালের বহু প্রত্নসম্পদ আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। তুর্কীবিজয়ের একশ বছরের মধ্যে হুগলি মুসলমানদের দ্বারা দারুণভাবে আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে, অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, পাণ্ডুয়া এবং মহানাদ মুসলমান আক্রমণে খুবই বিপর্যস্ত হয়। হিন্দুদের সু-উচ্চ দেবদেউল এবং দেবমূর্তিগুলি মুসলমান শাসকরা চূর্ণ - বিচূর্ণ করে দেয়। এর ফলে প্রাচীন হিন্দু কীর্তির অক্ষত কোন নিদর্শন আজ এই জেলায় দেখা যায় না। কিন্তু দেবদেবীর মূর্তিভাস্কর্য কখনও অক্ষত, কখনও বা ভগ্নরূপে পূর্বোক্ত স্থানগুলি থেকে উদ্ধার করা গেছে। এগুলি নিশ্চিতরূপে পাল-সেন বা তৎপূর্ববর্তীকালের বলে জানা যায়। বহু দেবদেবীমূর্তি উদ্ধার হওয়ায় এবং মুসলমানদের মসজিদ, দরগা ও কবরস্থানে সেগুলির পশ্চাদ্ভাগে আরবীলিপি খোদিত থাকায় সহজেই অনুমান করা যায়, মূর্তিগুলিকে দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে মসজিদ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাকালীন লিপিফলকরূপে সেগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজীর কবরস্থানে এবং পাণ্ডুয়ায় শাহসুফীর দরগায় দেবমূর্তির পেছনে এইরূপে লিপি লক্ষ্য করা গেছে। পরবর্তী পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

কিন্তু মুসলমানবিজয়ের বহু আগে মহানাদ, সপ্তগ্রাম যে খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহানাদ ও পার্শ্ববর্তী সুদর্শন গ্রাম থেকে বহু প্রত্নসম্পদ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে কুষাণ ও গুপ্তযুগের সুবর্ণমুদ্রা[৩], গুপ্তযুগের মাটির পাত্র, জম্ভল ও মায়াদেবীর পাথরের মূর্তি, 'টেরাকোটা' ছাঁচ, খ্রি. পঞ্চম - ষষ্ঠ শতকের স্টাকো মূর্তি, পালযুগের হরপার্বতী মূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি (নিকটবর্তী রোসনা পল্লী থেকে আবিষ্কৃত), কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের সুবর্ণমুদ্রা, শশাঙ্কের সুবর্ণমুদ্রা প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এগুলি ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতার আশুতোষ চিত্রশালা এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এছাড়া গুপ্তযুগের মাটির প্রদীপ, মাটির ঢাকনি, পালযুগের বিষ্ণুমূর্তি, মাটির বাটখারা, মাটির টাকু, মুসলমান যুগের কিছু আসবাপত্রও পাওয়া গেছে।[৪] মহানাদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রত্নকীর্তি হ'ল গুপ্তযুগের ইঁটের তৈরি একটি দেওয়াল। ১৯৩৬ সালে 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের' উৎখননের ফলে গুপ্তযুগের বিস্ময়কর প্রাচীরটি মৃত্তিকান্তর থেকে বেরিয়ে আসে। প্রাচীরকে নিয়ে এক বিশাল এলাকায় ঢিবি লক্ষ করা যায়। জায়গাটা বনজঙ্গল ও বাঁশঝাড়ে ঢাকা, কিন্তু স্থানে স্থানে আমরা ইঁটের দেওয়াল লক্ষ্য করেছি। মহানাদ ও তার আশপাশে কিছু কিছু উঁচু ঢিবি আছে। এছাড়া গোটা গ্রামের কোন না কোন স্থানে বহু প্রাচীন প্রত্নসামগ্রী, খোলামকুচি প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। কাছাকাছি সুদর্শন গ্রামের মাটি থেকে পাথরের বহু দেবদেবীর মূর্তি, মনসামূর্তি এবং কিছু মাটির পাত্রও পাওয়া গেছে।[৫] গুপ্তযুগে এই স্থানে একটি প্রসিদ্ধ শৈবকেন্দ্র ছিল। জটেশ্বরনাথ মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ লিঙ্গ ও গৌরীপট্ট তার সাক্ষ্যরূপে আজও বর্তমান। পরবর্তীকালে এই স্থান 'নাথ'- সম্প্রদায়ের এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়। বর্তমান জটেশ্বরনাথ মন্দির কিন্তু আদৌ প্রাচীন নয়। তবে জটেশ্বরনাথ এখানে নবম - দশম শতকে পালযুগে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেন।

মহানাদের এইসব পুরাবস্তু থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই স্থানে কুষাণযুগ থেকে পালযুগ পর্যন্ত একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। জায়গাটি যে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ এত বিচিত্র ধরণের পুরাবস্তু এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। কুষাণ ও গুপ্তশাসনাধিকার যে এই

অঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছিল, তার প্রমাণ এখান থেকে পাওয়া সুবর্ণমুদ্রাগুলি। গুপ্ত আমলের সুবর্ণমুদ্রা অবশ্য হুগলির আরও দু'একটি স্থান থেকে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বৈটিগ্রাম থেকে কয়েক বছর আগে পাওয়া গুপ্তসম্রাটদের সুবর্ণমুদ্রাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। এগুলির কয়েকটিতে সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে।

মহানাদ ছাড়া আরও বহু প্রাচীন মূর্তি এই জেলার নানা স্থান থেকে পাওয়া গেছে। ভান্ডারা গ্রাম (ধনিয়াখালি) থেকে খ্রি. দশম শতকের পাল আমলের অনেক মূর্তি, সূর্য, বিষ্ণু, বরাহ প্রভৃতির মূর্তি পাওয়া গেছে। ভাণ্ডারহাটি (ধনিয়াখালি) থেকেও বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বরের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি সব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশুতোষ চিত্রশালা'য় আছে। হরিপাল থানার অন্তর্গত কৈকালা গ্রাম থেকে একটি দত্তাত্রেয় বিষ্ণুমূর্তি (আ: খ্রি. ১০ম-১১শ শতক, আশুতোষ চিত্রশালায় সংরক্ষিত), হরিপাল ব্লকের অন্তর্গত জেজুর থেকে পাওয়া বিষ্ণুমূর্তি (রানীয়া পুকুর থেকে পাওয়া গেছে), দ্বারবাসিনী (পাণ্ডুয়া) থেকে পাওয়া পাল-সেন আমলের অনেকগুলি বিষ্ণুমূর্তি, বরাহ, সূর্য ও চণ্ডীমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দাদপুর থানার পুইনান থেকে একটি বিষ্ণু ও ভগ্ন সূর্যমূর্তি এবং পূর্বোক্ত দ্বারবাসিনীর কাছাকাছি পুনাজগড় থেকেও দুটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিগুলি পালযুগের এবং আনুমানিক ১০ম শতকে তৈরি। হুগলি জেলার অন্যান্য যে সব স্থান থেকে প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলি হ'ল, বিষ্ণু (মেঘসার, পোলবা-দাদপুর), তিনটি বিষ্ণুমূর্তি (রোসনা, পাণ্ডুয়া দুটি অক্ষত এবং অপরটি ভগ্ন), ভগ্ন সরস্বতী মূর্তি (সপ্তগ্রাম), সূর্যমূর্তি (সিমলা গড়, পাণ্ডুয়া, আ: ১০-১১শ শতক), একটি চতুর্হস্তা দেবীমূর্তি ও একটি বিষ্ণুমূর্তি (হাতনী, পাণ্ডুয়া, আ: ১০-১১শ শতক) প্রভৃতি। মৃত সরস্বতী নদীর তটভূমি থেকে মাঝে মধ্যে কিছু কিছু মূর্তি পাওয়া যায়। বেশ কয়েক বছর আগে (নভেম্বর, ১৯৭৯) সরস্বতীর তটবর্তী মগরা থানার আলিখোজা গ্রামের ইটভাটার কাছ থেকে একটি ভগ্ন দশভূজা মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। মূর্তিটি আ: খ্রি দ্বাদশ শতকের। মূর্তিটি বর্তমান লেখকের নেওয়া মাপ অনুসারে উচ্চতায় সাড়ে চার ফুট ও প্রস্থে দু'ফুট চার ইঞ্চি ছিল। এরও বেশ কিছু আগে পাণ্ডুয়া থেকে একটি ভগ্ন মূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটি মস্তকহীন। বর্তমান লেখক চুঁচুড়ায় সেই মূর্তিটি দর্শন করে কালভৈরব বলে মনে করেন। ভাস্কর্যশৈলী লক্ষ ক'রে সেটি আনুমানিক নবম - দশম শতকের বলে অনুমান করা যায়। নৃত্যের ভঙ্গিমায় ঐ পুরুষমূর্তিটি একটি 'পঞ্চরথ' পাদপীঠের ওপর বিকশিত শতদল পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান। দ্বাদশভূজ ঐ মূর্তি ডান পায়ের ওপর ভর দিয়ে বাঁ পাটি ঈষৎ উত্তোলিত ক'রে নৃত্যভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। হাতগুলিতে শিঙ্গা, ডমরু, রুদ্রাক্ষমালা, খড়্গ, ত্রিশূল ইত্যাদি। ডানদিকের পাশের হাতে সকলের ওপর ত্রিশূল - ত্রিশূলে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি মনুষ্য বিদ্ধ, তার নীচে বজ্রায়ুধ, তার নীচের হাতে পাশ (ফাঁস দেওয়া অবস্থায়), তার নীচের হাতে মুদ্রা এবং সকলের নীচের হাতে মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলীদ্বয় ভাঁজ ক'রে নীচে পার্শ্ববর্তী দণ্ডায়মান। একটি স্ত্রীমূর্তির কপোলদেশকে স্পর্শ করেছে। সামনে দুটি হাতের মধ্যে ডান হাতটি নৃত্যের ভঙ্গিমায় বামদিকে স্থাপিত হয়েছে বক্ষের ওপর দিয়ে। সামনের বাম হাতে ধৃত রয়েছে নরকপাল বা পানপাত্রে মদ্য। মূর্তিটির পদযুগলে নূপুর শোভিত। প্রায় নগ্ন এই মূর্তির কটিদেশে অল্প বসন, তাও অস্পষ্ট। গলদেশ থেকে নৃমুণ্ডমালা ঊরুদেশ পর্যন্ত প্রলম্বিত। গলদেশ থেকে মস্তক ভগ্ন, তবে রত্নালঙ্কার প্রলম্বিত। দেহ ও পদ প্রায় সবই অনাবৃত। দেবমূর্তিটির নীচে দু'পাশে দুটি ক্ষুদ্রাকৃতি স্ত্রী মূর্তি। ডানপাশে স্ত্রীমূর্তিটি আভঙ্গ রীতিতে দণ্ডায়মানা, নিখুঁতভাবে খোদিত। বামপাশে কঙ্কালসার এক ক্ষুদ্র মূর্তি যার পাঁজর দেখা যায়।

পাণ্ডুয়ায় আরও অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে। এসব মূর্তি এককালে হিন্দুমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাণ্ডুয়ায় যে সূর্য ও নারায়ণের বিশাল মন্দির ছিল, সেই মন্দিরদুটিকে ধ্বংস ক'রে বাইশ দরওয়াজা মসজিদ ও ফিরুজ মিশর তৈরি করা হয়। উক্ত দুটি সৌধেই হিন্দু মন্দিরের অংশ ও হিন্দু ভাস্কর্য লক্ষ করা গেছে। মসজিদে উক্ত দেবমন্দিরের সুন্দর কারুকার্য যুক্ত বহু থাম লক্ষ করা যায়। এছাড়া অপূর্ব কারুকার্যযুক্ত দেববিগ্রহের উচ্চ সিংহাসনও এই মসজিদে এখনও দেখা যায়। নিকটবর্তী শাহসুফীর দরগায় মস্তকহীন সূর্যমূর্তিটিকে দেখা যায়। মূর্তিটি ছিল সুন্দর কারুকার্য মণ্ডিত। কিন্তু মুসলমানদের দ্বারা পাণ্ডুয়া বিজিত হওয়ায় পর মূর্তিটি অঙ্গহীন ক'রে তার পৃষ্ঠদেশে একটি আরবী লিপি খোদাই করা হয়। বেশ কিছুকাল ঐ ভগ্ন মূর্তিটি শাহসুফীর দরগার প্রাঙ্গণে পড়ে ছিল। সম্প্রতি (জানুয়ারী ২০০০) দেখা গেল, মূর্তিটিকে দরগার একটি দেওয়ালের মধ্যে গেঁথে লিপিটিকে বাইরে রাখা হয়েছে।

পাণ্ডুয়ার ঐ মিনারটির প্রবেশপথ যে এখানেরই হিন্দুমন্দিরের অংশ, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। শক্ত পাথরে তৈরি এই দ্বার'ফ্রেমে' কারুকার্যের মধ্যে ঝুলন্ত ঘন্টা, বাতি প্রভৃতি বর্তমান। পাশে একটি বৃহৎ কুলুঙ্গীতে হিন্দুমন্দিরের ওপরের একটি অংশ উল্টানো অবস্থায় আছে, তা লেখক সম্প্রতি লক্ষ করেছেন। কারুকার্যখচিত অনেক ছোট ছোট থাম বাইশ দরওয়াজা মসজিদে যেমন বর্তমান, তেমনি শাহসুফী দরগার পাশে একটি মুসলমান আবাসগৃহেও লক্ষ করা যায়।

প্রাচীনকালে ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, পাণ্ডুয়া, মহানাদ, দ্বারবাসিনী প্রভৃতি স্থানকে নিয়ে একটি 'সাংস্কৃতিক অঞ্চল' গঠিত হয়েছিল, তা অনুমান করা যায়। গুপ্তযুগ বা তারও আগে থেকে এইসব স্থানে সমৃদ্ধশালী জনপদ গড়ে ওঠা ছাড়াও উন্নত সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। সু-উচ্চ বিশাল বিশাল মন্দির, সুন্দর কারুকার্যযুক্ত মূর্তি ভাস্কর্য এবং অন্যান্য পুরাবস্তু এই সব স্থান থেকে আবিষ্কৃত হওয়ায় এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত। মধ্যযুগে সপ্তগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ বন্দররূপে আত্মপ্রকাশ করলেও এর অভ্যুদয় আরও অনেক আগে বলে জানা যায়। এটি একসময়ে রাঢ়ের শ্রেষ্ঠ নগর ছিল। রেভারেন্ড লঙের মতে প্লিনির সময় থেকে পোর্তুগীজদের আগমন পর্যন্ত বাংলার এটি একটি রাজকীয় বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। উইলফোর্ডের মতে, স্থানীয় রাজাদের অধিষ্ঠানভূমি ছিল এই সপ্তগ্রাম। একশত গ্রাম নিয়ে এর আয়তন গড়ে উঠেছিল বিশাল। পূজা-অর্চনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এই স্থান।[৩] চীনা পরিব্রাজকদের পর্যটনকালে সপ্তগ্রামের নাম ছিল 'চরিত্রপুর'। টলেমি এই রাজকীয় নগরটির বিপুল আয়তনের বিষয় উল্লেখ করেছেন।[৪] এখানে যে এককালে বহু দেবমন্দির ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জাফর খাঁ গাজী সপ্তগ্রাম আক্রমণ করে জয় করেন (খ্রি. ১২৯১ - ১৩০১)। এরপর বাংলার তুর্কী শাসক সামসুদ্দীন ফিরুজ শাহের সময়ে (১৩০১ - ১৩২২) সপ্তগ্রাম ও হুগলির বহু অংশ তুর্কীদের অধিকারে আসে। সেসময় অনেক হিন্দুমন্দির ধ্বংস হয়। সেসবের কোন চিহ্নই এখন আর পাওয়া যায় না। তবে এখানে সেসময়কার ইঁটের যে ভগ্ন মসজিদ বর্তমান, তাতে কিছু কিছু হিন্দু স্থাপত্যের অংশ লক্ষ করা যায়। অবশ্য, এই মসজিদটি আরবী লিপি অনুসার হিজরী ৮৯২ বা ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়।[৫] সপ্তগ্রাম থেকে প্রাচীন 'টেরাকোটা' শিল্পের অনেক নিদর্শনও পাওয়া গেছে। তার কিছু কিছু কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে।[৬]

এই জেলার ত্রিবেণীতে ভাগীরথী ও সরস্বতীর তীরবর্তী স্থানে কয়েকটি প্রসিদ্ধ মন্দিরদেবালয় যে ছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। গঙ্গা - ভাগীরথী ও সরস্বতীর এই সঙ্গমস্থলটি সেকালে হিন্দুদের কাছে ছিল অতি পবিত্র। নদীতীরবর্তী এখানের এক উচ্চ ভূখণ্ডে পাথরে তৈরি বিষ্ণুর এক

'শিখর' দেউলের অস্তিত্ব জাফর খাঁ গাজীর কবরস্থানে লক্ষ করা যায়। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই মন্দিরের গর্ভগৃহ ও মুখশালায় জাফর খাঁ ও তার আত্মীয়দের সমাধি স্থাপন করা হয়। সমাধিস্থানটি লক্ষ করলেই বোঝা যায় নীচের অংশ এবং ওপরের দেওয়ালের অনেকটা প্রাচীন মন্দিরের অবশিষ্ট অংশ, শুধুমাত্র ওপরে পাথরের দেওয়ালের সঙ্গে ইঁট দিয়ে আরও কিছুটা দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। এই সমাধিগৃহের বাইরের দেওয়ালে পূর্বতন মন্দিরের বেশ কিছু ভাস্কর্য ফলক দেওয়ালের নীচের অংশে বসানো আছে। কোন কোনটি আবার উল্টানো অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। এগুলির বেশির ভাগই ছোট ছোট ফলকে বিষ্ণুমূর্তি, রামচন্দ্র ও হনুমানের মূর্তিফলক এবং গোলাকার বৃত্তের মধ্যে কিছু কিছু মূর্তি অস্পষ্টভাবে খোদিত। প্রায় বঙ্গাক্ষরে খোদিত কোন কোন ফলকে মূর্তি গুলির সংস্কৃতে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যেমন, 'রামেণ রাবণবধঃ', 'সীতাবিবাহঃ', 'রামরাবণয়োঃ যুদ্ধম্'। সমাধিগৃহের অভ্যন্তরে ও বাইরে এগুলি লক্ষ করা যায়। আমরা পাণ্ডুয়ার পূর্বোক্ত মিনারের দেওয়ালেও এই ধরণের 'প্রোটো-বেঙ্গলি' (প্রায় - বঙ্গাক্ষর) হরফের লিপি লক্ষ করেছি।

সমাধিগৃহের নীচের অংশ যে ধ্বসপ্রাপ্ত বিষ্ণুমন্দিরের নিম্নভাগ, তাতে সন্দেহ নেই। গঙ্গার দিকে বাইরের দেওয়াল লক্ষ করলেই বোঝা যায়, প্রাচীন 'রেখ' দেউলের বৈশিষ্ট্য এতে উপস্থিত। পাদপীঠের ওপর 'রাঢ়' অংশের নীচের পদ্মাকৃতি অংশটি স্পষ্ট বোঝা যায়। ভাগীরথী তট থেকে উচ্চ ভূখণ্ডে আনুমানিক পাল সেন যুগে নির্মিত প্রাচীন বাংলার এই সৌধটি অবস্থিত ছিল। কিন্তু মুসলমান আক্রমণে সেটি বিধ্বস্ত হওয়ায় এর প্রকৃতরূপটি আজ আর জানা যাবে না। কি নির্মমভাবে সেই অনন্য সৌধ ও পাণ্ডুয়ার সূর্য ও নারায়ণের দুটি প্রসিদ্ধ মন্দির ধ্বংস করা হয়, তার চিহ্ন এই দুটি স্থানে আজও লক্ষ করা যায়। জাফর খানের এই সমাধিগৃহ থেকে যে শিলালিপিটি পাওয়া যায়, তা থেকে জানা যায়, সাতগাঁ বা সপ্তগ্রামের শাসন কর্তা সাহাবুদ্দিন জাফর খাঁ 'খান-ই-জাহান' ত্রিবেণীতে একটি মাদ্রাসা বা 'দার-উল-খয়রাৎ' তৈরি করেন। লিপিটির তারিখ ৭১৩ হিজিরা বা ১৩১৪ খ্রিস্টাব্দ। আর একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ৬৯৮ হিজিরাতে বা ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে জাফর খাঁ গাজী এখানে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই গাজী জাফর খাঁই ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম অঞ্চল জয় করেন। বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন কৈকায়ুসের সময় ঐ ঘটনা ঘটে (১২৯১ - ১৩০১ খ্রিঃ)। তখন ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম মহানাদ অঞ্চলে মাননৃপতি ও ভূদেবনৃপতি রাজত্ব করতেন। ভূদেব নৃপতির সঙ্গে মহানাদে জাফর খাঁ গাজীর প্রচণ্ড যুদ্ধে গাজী নিহত হন এবং তার দেহ ত্রিবেণীতে সমাহিত করা হয়।

ত্রিবেণীতে জাফর খাঁ গাজীর ইঁটের ভগ্ন দশগম্বুজ মসজিদেও হিন্দু মন্দিরের বহু অংশ আছে। 'ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি ছাড়া এই মসজিদের দেওয়ালে চারটি সাধুর মূর্তি আছে। ঐ মূর্তিগুলির মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্তি ও একটি পার্শ্বনাথের মূর্তি বিদ্যমান।[১] মসজিদটির দেওয়ালের মধ্যেও সম্ভবত কোন প্রাচীন দেবমূর্তি লুকানো আছে। এই মসজিদের পশ্চিমদিকের বাইরের দেওয়ালে ইঁটের গাঁথনির সঙ্গে একটি দেবমূর্তির পাদপীঠের অংশও আমরা লক্ষ করেছি। এছাড়া মসজিদ ও সমাধিগৃহের প্রাঙ্গণে প্রাচীন মন্দিরের শক্ত পাথরের বহু ভগ্ন অংশও লক্ষ করা যায়।

এছাড়া ওড়িশার রাজা মুকুন্দদেব নির্মিত (খ্রি. ১৬শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) ত্রিবেণীঘাটে পাল-সেন যুগের কয়েকটি মূর্তি লক্ষ করা গেছে। এগুলিও কাছাকাছি কোন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে করা যায়। এগুলির মধ্যে গজলক্ষ্মী মূর্তিটি (বহুল প্রচারিত গঙ্গামূর্তি নয়। বর্তমান লেখক মূর্তিটি ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন সেটি আদৌ গঙ্গামূর্তি নয়)। কালো পাথরে সুন্দর কারুকার্যযুক্ত। চতুর্ভূজা দেবী লক্ষ্মী হাতীর পিঠে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর 'ত্রিভঙ্গ'রীতিতে দণ্ডায়মানা'। তার

ডানদিকের ওপরের হাতে পদ্ম এবং নীচের হাতে বরাভয়মুদ্রা। ওপরের বাম হাতে 'তিলথুবড়ি' (সম্পদ্‌ভান্ড) এবং নীচের বামহাতেও বরাভয়মুদ্রা, তার সঙ্গে পদ্মও আছে। তাঁর পরিধানে বস্ত্র ও নানাবিধ অলংকার। হস্তীটি শুন্ডের সাহায্যে পদ্ম নিয়ে দেবীর চরণে অর্পণ করছে। এই মূর্তির কারুকার্য খুবই সুন্দর। মূর্তিটির কারুকার্য ও গঠনভঙ্গী লক্ষ করে এটি পাল-সেন যুগে আনুমানিক দশম একাদশ শতকে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। অতএব কোন কোন গ্রন্থে এটি গঙ্গামূর্তি বলে যে উল্লেখ করা হয়েছে, তা আদৌ ঠিক নয়।

ত্রিবেণীঘাটে অপর একটি উল্লেখযোগ্য মূর্তি বাসুদেব বা বিষ্ণুর। কালপাথরে নির্মিত চতুর্ভুজ এই মূর্তি 'সমভঙ্গ' রীতিতে দণ্ডায়মান। তার ওপরের ডান হাতে গদা ও নীচের হাতে পদ্ম এবং ওপরের বাম হাতে শঙ্খ এবং নীচের বাম হাতে চক্র। পরিধানে বস্ত্র ও নানাবিধ অলংকার। ওপরে মাথার দুপাশে দুটি উড্ডীয়মান গন্ধর্ব। বিগ্রহের দু'পাশে ফলকের ওপর সিংহ প্রভৃতির মূর্তি খোদিত। নীচে দু'পাশে দুই পার্শ্বদেবতা। বিষ্ণু মূর্তি ছাড়া এখানে আছে মূষিকবাহন এক গণেশ মূর্তি। এছাড়া শ্মশ্রুমণ্ডিত একটি মূর্তি ভগ্ন।

উপরিউক্ত মূর্তিগুলি ছাড়া আরও বহু মূর্তি এই জেলার কোন কোন মন্দিরদেবালয়ে লক্ষ করা যায়। সেগুলিও নিকটবর্তী কোন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বরতলায় এরূপ দুটি প্রাচীন মূর্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ষণ্ডেশ্বরমন্দিরের সামনে কালী মন্দিরের পাশে একটি ক্ষয়প্রাপ্ত সূর্যমূর্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। মূর্তিটি প্রায় তিনফুট উঁচু ও দেড়ফুট চওড়া। ডানহাত অর্ধেক ভাঙা। বিগ্রহের দু'হাতে ধৃত পদ্মনালসহ দুটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। দুপায়ে জুতো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। বিগ্রহের পাদপীঠের দু'পাশে দণ্ড ও পিঙ্গল। শ্মশ্রুধারী ও স্ফীতোদর সম্ভবত দণ্ড ও পিঙ্গলের হাতে ঢাল ও তরোয়াল — তাদের দু'পাশে প্রত্যুষা। পাদপীঠের নীচে সাতটি ঘোড়া রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান লেখকের দর্শনের সময় (৩০.০৪.১৯৮৩) লক্ষ করা গিয়েছিল যে সেই অশ্বগুলি ভগ্ন ও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ওপরে মাথার দুদিকে দুটি মাল্যধারী উড্ডীয়মান গন্ধর্ব, তার নীচে দু'দিকে অদ্ভুত আকারের অশ্বমানব ও অশ্বমানবী। মূর্তিটি আনুমানিক পালযুগের (১০ম শতক খ্রি.)। ষণ্ডেশ্বরতলায় পাতালেশ্বর মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে বসানো মূর্তি পালযুগে নির্মিত বলে অনুমিত। বিষ্ণুনারায়ণ মূর্তিটি আঃ ২ ফুট উচ্চ ও চওড়ায় প্রায় ১ ফুট। বিগ্রহটির নীচের বাম হাতে শঙ্খ, ওপরের বামহাতে গদা এবং নীচের ডান হাতে পদ্ম ও ওপরের ডান হাতে চক্র। বিগ্রহের দু'পাশে ডাইনে লক্ষ্মী ও বামে সরস্বতী। ওপরে দু'পাশে দুটি উড্ডীয়মান গন্ধর্ব। বিষ্ণুমূর্তি সমস্থানক পাদভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। কিন্তু লক্ষ্মী ও সরস্বতী আভঙ্গরীতিতে দণ্ডায়মান। সরস্বতী বীণাবাদনরত। নারায়ণের মস্তকে কেয়ূর ও কর্ণে কুণ্ডল। দীর্ঘায়ত চক্ষুর্দ্বয় নাসিকাগ্রে স্থাপিত। চক্ষুর্দ্বয় অর্ধোন্মীলিত। হস্তের করতলে পদ্ম, চক্র প্রভৃতি চিহ্নিত। পরিধানে উরুদেশ পর্যন্ত অলংকৃত বস্ত্র। বক্ষোদেশে দুটি যজ্ঞোপবীত, গলায় দিব্যমাল্য। মূর্তিটি ভাস্কর্যশৈলীর এক সুন্দর নিদর্শন। বর্তমান লেখক জানতে পেরেছেন প্রায় ষাট বছর আগে (২০০০) ষণ্ডেশ্বরতলার জনৈক ভদ্রলোক ভাটপাড়া থেকে এই মূর্তিটি এখানে আনেন। তিনি দেখতে পান, ভাটপাড়ায় মূর্তিটিকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়ার উদ্যোগ করা হচ্ছে। তিনি তখন সেটি নিয়ে এসে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন।

এইসব অমূল্য প্রত্নসম্পদ প্রাচীন সুহ্ম ও রাঢ় দেশের অন্তর্গত হুগলি জেলার গৌরবময় ইতিহাসের স্মারক। তুর্কী আক্রমণে সেই গৌরবময় ইতিহাসের অবসান হয়। পাণ্ডুয়া ও সপ্তগ্রামে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, পাণ্ডুয়া ও মহানাদ সেকালে সমৃদ্ধ জনপদ ও অজস্র মন্দির দেবালয় অধ্যুষিত ছিল। অতএব মুসলমান শাসকদের দৃষ্টি হিন্দুদের পবিত্র দেবদেউল

ও দেববিগ্রহ ধ্বংসের দিকে সহজেই পড়ে। এর ফলে ঐ চারটি স্থানই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এবং ধ্বংস হয়। ভগ্ন ও অঙ্গহীন মূর্তিগুলি বহু প্রাচীন মন্দির-দেবালয়ে যে অধিষ্ঠিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন মন্দিরের অবশিষ্টাংশ বা ভগ্ন অংশ দিয়ে সুলতানী আমলে পূর্বোক্ত মসজিদ, সমাধিগৃহ ও দরগা তৈরি হয়েছিল। এগুলিও জেলার উল্লেখযোগ্য প্রত্নসম্পদ (এত প্রাচীন মসজিদ ও মাজার একমাত্র বড়পাণ্ডুয়া (মালদহ) ছাড়া পশ্চিমবাংলার আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। হুগলির আর অন্য কোথাও এ ধরনের ইসলামী ধর্মীয় সৌধ পাওয়া যায় নি। হুগলির আদি মধ্যযুগের স্থাপত্য বলতে এই মসজিদ, মাজার প্রভৃতি। সুলতানী আমলের পাণ্ডুয়ার বাইশ দরওয়াজা মসজিদ আনুমানিক খ্রিস্টীয় চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি হয় ঐখানে অবস্থিত সূর্যমন্দিরের বিভিন্ন অংশ নিয়ে। বর্তমানে ভগ্ন ও পরিত্যক্ত ঐ মসজিদটি খুবই বিশাল আকারে সে সময় নির্মাণ করা হয়। এই মসজিদ সম্পর্কে পার্সি ব্রাউন অনুমান করেন, যদি এটি চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের আগে তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে এই বাইশ গম্বুজ মসজিদটি বড় পাণ্ডুয়ার (মালদহ) আদিনা মসজিদের (১৩৬৯ খ্রি:) আদর্শ স্থানীয় ছিল।[১০] এর পার্শ্ববর্তী মিনারটি তৈরি হয় নারায়ণ মন্দিরের স্থানে ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। এটি সম্ভবত মুসলিম সন্ত শাহ্ সুরিউদ্দীন বিজয়স্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠা করেন সে সময় পাণ্ডুয়ার রাজাকে পরাজিত করে। কিন্তু ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, সূর্য ও নারায়ণ মন্দিরকে যথাক্রমে মসজিদ ও মিশরে রূপান্তরিত করেন বাংলার সুলতান রুকণউদ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৫ - ১৪৭৪ খ্রি:) পুত্র সামসুদ্দীন ইউসুফ সাহ (১৪৭৪ - ১৪৮১ খ্রি:)।[১১] নিকটবর্তী শাহ সুফীর দরগায় ভগ্ন সূর্যমূর্তিটির পিছনে আরবী লিপির পাঠোদ্ধারে জানা গেছে, 'বাইশ দরওয়াজা মসজিদ' ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে ১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়।[১২] মসজিদটিতে আগে বাইশটি দরজা ও বাইশটি গম্বুজ ছিল অনুমান করা যায়। গম্বুজগুলি সবই ভেঙে গেছে। মসজিদটি আয়তক্ষেত্রাকার এবং উত্তর - দক্ষিণে আয়ত। ইঁটে তৈরি। উত্তর দিকের দেওয়ালে বাইশটি 'মিহরাব' উপাসনার জন্যে নির্মিত হয়েছিল। দেওয়ালের কেন্দ্রস্থলে পাথরে তৈরি উচ্চ আসন। সিঁড়ি দিয়ে ঐ আসনে উঠতে হয়। পাথরের কারুকার্য খুব সুন্দর। সম্ভবত প্রাচীন মন্দিরটিতে এই আসনে সূর্যমূর্তি অধিষ্ঠিত ছিল। মিহরাবগুলির প্রতিটির দুপাশে দুটি ক'রে কুড্যস্তম্ভ (Pilaster)। কিছু কিছু পোড়ামাটির ফুল ও নক্শা এখনও আছে দেখা যায়। ইঁটের ওপর পলেস্তারা একেবারে উঠে গেছে। সম্ভবত মিহরাবের চারপাশে পোড়ামাটির ফুল ও লতাপাতার সুন্দর কাজ ছিল।)

মসজিদটির পার্শ্ববর্তী পূর্বোক্ত মিনার স্থানীয়ভাবে 'পেঁড়োর মন্দির' বলে পরিচিত। এটি পঞ্চতলযুক্ত একটি উচ্চ স্তম্ভ। মিনারটির প্রবেশপথ খুব প্রশস্ত নয় এবং নীচের তলের বামদিকের দেওয়ালের নীচে উল্টো করে সাজানো একটি পাথর প্রায় বঙ্গাক্ষরে (প্রোটো বেঙ্গলি) একসারি লিপি দেখা যায়। লিপিটি অস্পষ্ট। মিনারটির গোল সিঁড়ি দিয়ে প্রতি তলে ওঠা যায়। ভেতরের দেওয়ালের পলেস্তারা এখনও দৃঢ় আছে 'এনামেল' করা। এতে চুনই বেশি ও অল্প সুরকি আছে, ইঁটের গাঁথনিতে মশলা ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র মাটি ও খুব অল্প চুন। সিঁড়ির চারপাশে ছোট ছোট গর্তে আগে বাতি রাখার ব্যবস্থা ছিল, তার ফলে মিনারের অভ্যন্তর আলোকিত হয়ে উঠত। এ ছাড়া ওপর থেকে শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ করার জন্যে দেওয়ালের স্থানে স্থানে ছোট ছোট খোপও তৈরি করা হয়েছিল (গবাক্ষ)। প্রতিটি তলের একটি দ্বার দিয়ে চারপাশের গোল বারান্দায় যাওয়া যায়। দ্বিতীয় তল থেকে তৃতীয় তলের ব্যবধান অনেকটা। পঞ্চম তলটি বহু আগে (আ. ১৮৮৫) ভূমিকম্পে ভেঙে গেলে পরে আবার নতুন ক'রে তৈরি করা হয়। এর চারপাশের বারান্দা খুবই সংকীর্ণ। বহু প্রাচীন নারায়ণ মন্দির ধ্বংস ক'রে এই মিনার তৈরি হয় ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে।

পাণ্ডুয়ার উল্লেখযোগ্য অপর পুরাসম্পদ পূর্বোক্ত শাহসুফীর মাজার বা দরগা। এটি জি. টি. রোডের পার্শ্ববর্তী। মাজারটি ক্ষুদ্র, একগম্বুজ ও বর্গক্ষেত্রাকার। এটি পশ্চিমমুখী, পুবদিকেও দরজা আছে। ভেতরের প্রায় সবটা জুড়ে শাহ সুফীর সুলতানের কবর। ভেতরের ছাদ গোলাকার ভল্টে গঠিত, চারকোণে 'লহরা'র বিন্যাস। মাজারটির স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য হ'ল, এর ওপরের ছাদে মিনারের বদলে প্রতি কোণে (অবশ্য, নৈঋত কোণ বাদ) চারদিক খোলা ছোট্ট ছোট্ট 'চারচালা' কক্ষ স্থাপিত। চালাগুলির কার্নিশ বাঁকানো যা বাংলার গ্রাম - গঞ্জের আবহমানকাল ধরে চলে আসা প্রিয় 'চালা'র কথা মনে করিয়ে দেয়। তাছাড়া মূল দরগাটিও 'চালা' আকারের এবং এর 'ছাঁচাগুলিও বাঁকানো। মুসলমান শাসনের গোড়ার দিকে শাহসুফীর এই মাজারটির স্থাপত্য উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য 'চালা'র আদলে এই সমাধিগৃহটি তৈরি হয়েছিল। এরই প্রাঙ্গণে পূর্বোক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত সূর্যমন্দিরের সুন্দর কারুকার্যযুক্ত সূর্যমূর্তিটিকে মস্তকচ্যুত ক'রে রাখা হয়েছিল। এই মূর্তিটির পশ্চাদ্ভাগে একটি দীর্ঘ আরবীলিপি খোদিত। পঁচিশ বছর আগে (১৯৭৫) বর্তমান লেখকের সরেজমিন অনুসন্ধানকালে মূর্তিটি মাজারের পাশেই রাখা ছিল। সাম্প্রতিক পরিদর্শনে (২০০০ জানুয়ারি) সেটিকে দেখা গেল প্রাচীরে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। লিপিটি শুধু বাইরে আছে। কিন্তু পেছনের সূর্যমূর্তিটি দেওয়ালে চাপা পড়ে গেছে। একটি শক্ত কালো বেসল্ট পাথরে খোদিত ঐ মূর্তিটি সাতটি অশ্ববাহিত একটি রথে দণ্ডায়মান। সারথি অরুণ বল্‌গার দ্বারা ঘোড়াগুলিকে সংযত ক'রে রেখেছেন। সূর্যদেবের দু'পাশে দুই পার্শ্বদেবতা ও নীচে জনৈক ভক্ত প্রার্থনারত। বিগ্রহ ও পার্শ্বদেবতাদ্বয়ের পদযুগলে একধরনের জুতো যা অন্যান্য সূর্যমূর্তিতেও লক্ষ করা গেছে। বিগ্রহের হাঁটু পর্যন্ত পোষাক পরা দেখা যায়। এখানে আরও যে দু'একটি শিলালিপি লক্ষ্য করা গেছে, তাতেও দেবদেবীর মূর্তি যে ছিল, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)' - এ লিখেছেন :

> রুকনুদ্দিন বারবক শাহের পুত্র শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ কিছুদিন পিতার সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনি এককভাবে ১৪৭৬ - ৮১ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।
>
> য়ুসুফ শাহের যেমন স্বধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ছিল, তেমনি পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষও ছিল। তাহার প্রমাণ, তাঁহারই রাজত্বকালে পাণ্ডুয়ায় (হুগলি জেলা) হিন্দুদের সূর্য ও নারায়ণের মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত করা হইয়াছিল। এবং ব্রহ্মশিলা নির্মিত বিরাট সূর্যমূর্তির বিকৃতিসাধন করিয়া তাহার পৃষ্ঠে শিলালিপি খোদাই করা হইয়াছিল। পাণ্ডুয়ার (হুগলী) পূর্বোক্ত মসজিদটি এখন 'বাইশ দরওয়াজা' নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে হিন্দু মন্দিরের বহু শিলাস্তম্ভ ও ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডুয়া সম্ভবত য়ুসুফ শাহের রাজত্বকালেই বিজিত হইয়াছিল, কারণ এখানে সর্বপ্রথম তাঁহারই শিলালিপি পাওয়া যায়।' (১ম সং, ফাল্গুন ১৩৭৩, পৃ: ৬৪ - ৬৫)

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত (বা প্রকাশিত) 'লিস্ট এন্ড্ অ্যানসেন্ট মনুমেন্টস ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে বলা হয়েছে : "The old temple of Pandua was then destroyed and the present mosque built with its remains. The large tower was used as a Minarch or a Minaret (Call for Prayer). Every Hindu was driven out of the town. The Minar at Pandua is very curious structure quite different from all others that are generally to be found." এই স্থানের প্রতিটি তলা থেকে বহু বিষ্ণু ও সূর্য মূর্তি

আবিষ্কৃত হয়েছে। "এই স্থানের প্রতিটি স্তম্ভে, শিলাখণ্ডে, ইটের গায়ে হিন্দু সভ্যতা ও হুগলি জেলার মূর্তিমন্ত অতীত ইতিহাস খোদিত করা আছে।"[১৩]

সপ্তগ্রামেও সুলতানী আমলের পূর্বোক্ত ইঁটের ভগ্ন মসজিদটি মধ্যযুগের এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এর মাথায় ছাদ ও গম্বুজ বহুকাল বিনষ্ট। দুটি সুদৃশ্য থাম সেযুগের মসজিদ স্থাপত্যের পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য। গৌড়ের পুরানো মসজিদে যে ধরনের থাম দেখা যায় মসজিদটির দেওয়ালের টেরাকোটা' নকশা কিছু আছে, সেগুলি ফুল-লতা-পাতার। ওপরে কোন ছাদ বা গম্বুজ নেই। মসজিদের নীচের অংশ পাথরের। সম্ভবত এখানে একটি প্রাচীন মন্দির ছিল, তার প্রমাণ মন্দিরের বহু ভগ্ন অংশ মসজিদ প্রাঙ্গণে আছে। 'এই মসজিদ ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ৮৯২) তরবিয়ত খাঁ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে একটি উৎকীর্ণ আরবী লিপি থেকে জানা যায়।'[১৭] জাফর খাঁ গাজী সপ্তগ্রাম জয় করে হিন্দু রাজাকে পরাজিত করেন। হিন্দুদের সমস্ত মন্দির-দেবালয় ধ্বংস ক'রে তার উপাদান দিয়ে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীতে দুটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে জাফর খাঁ সপ্তগ্রামে একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন।[১৮] সপ্তগ্রাম মধ্যযুগে একটি অতিপ্রসিদ্ধ নগর ছিল। সরস্বতীর নাব্যতা কমে যাওয়ার পর থেকে এই স্থানের পতন ত্বরান্বিত হয়। ধীরে ধীরে হুগলি বন্দর গড়ে ওঠে। কিন্তু সপ্তগ্রামে একসময় যে বহু পুরাকীর্তি ছিল মাঝে মধ্যে তার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেও বেশির ভাগই লুপ্ত হয়ে গেছে। সপ্তগ্রামে পুরাতাত্ত্বিক উৎখনন আজও হয় নি। তাই এখানকার অতীতের পুরাসম্পদগুলি সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা কম।

আদি মধ্যযুগে হুগলিতে, বিশেষ ক'রে পনের শতক পর্যন্ত সুলতানী শাসন প্রবলভাবে কায়েম থাকায় মুসলিম ধর্মীয় সৌধ ও অন্যান্য ইমারত নির্মিত হওয়া ছাড়া হিন্দু কোন মন্দির দেবালয় নতুন ক'রে তৈরি হওয়ার সুযোগ পায় নি। পাল - সেন আমলে তৈরি মন্দিরগুলো এই সময়ের মধ্যে সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, বেশির ভাগ দেবমূর্তির অঙ্গহানি হয় এবং সলিলসমাধি ঘটে। প্রাচীন মন্দির চর্চার ধারা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, বিশেষ করে 'শিখর'- শৈলীর মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ঐ সময়ে 'চালা' শৈলীর কিছু কিছু মন্দির যদিও বা নির্মিত হয়ে থাকে, কিন্তু তার কোন নিদর্শন আজ আর নেই।

আনুমানিক খ্রিস্টীয় পনের শতক থেকে বাংলায় 'চালা' শৈলীর অভ্যুদয় ঘটে। এ সময়ে নির্মিত বলে অনুমিত সর্বপ্রাচীন 'চালা' রীতির মন্দির ছিল গৌড়ে 'কদমরসুলে'র পার্শ্ববর্তী ফৎখানের সমাধিগৃহ যা 'দোচালা' বা 'একবাংলা' রীতির। এটি পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় গৌড়ের রাজা কংসের সময় নির্মিত বলে কেউ কেউ মনে করেন। রাজা কংস ('কান্স') বা দনুজমর্দনদেব সুলতানী আমলে একমাত্র হিন্দু রাজা (১৪১০ - ১৪১২ খ্রি.) ছিলেন। মন্দিরটিতে হিন্দু দেব বিগ্রহ স্থাপিত ছিল। তার প্রমাণও আছে।[১৯] ঐ দোচালা সৌধটি বহু আগে তৈরি হলেও এর মধ্যে ঔরঙ্গজেবের কর্মচারী দিলির খানের পুত্র ফৎ খানের সমাধিটি স্থাপিত হয় আনুমানিক খ্রি. ১৬৫৭ থেকে ১৬৬০ খ্রি. এর মধ্যে। বাংলার একান্ত প্রিয় স্থাপত্য 'চালা' গৌড়ের পনের -ষোল শতকে নির্মিত মসজিদের ছাদের ওপরেও স্থান পেতে থাকে, যেমন 'ছোট সোনা মসজিদ' (আ ১৪৯৩ - ১৫১৯)। মসজিদের 'ছাঁচ'গুলোও 'চালা'র ন্যায় বাঁকানো হ'তে থাকে। পাণ্ডুয়ার (মালদহ) একলাখী সমাধিগৃহও কতকটা চালার আদলে তৈরি হয়। (আঃ ১৪২৫ খ্রী.)। পনের শতকের শেষদিকে তৈরি একটি প্রসিদ্ধ 'চারচালা' ঘাটালের কোন্নগর পল্লীর সিংহবাহিনীর মন্দির (১৪৯০ খ্রি.)। এখানে মূল মন্দির ও তৎসংলগ্ন 'চারচালা' জগমোহন দুটিরই চাল বেশ ঢালু ও ছাঁচা বক্রাকৃতি। চালার শ্রেণীভেদ হল, 'একচালা', 'দোচালা', 'চারচালা', 'আটচালা', 'বারোচালা'। 'চালা'র

সঙ্গে 'রত্ন' শৈলীর মন্দিরের উদ্ভব এ সময়ে বাংলার ধর্মীয়স্থাপত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর শ্রেণীভেদ হ'ল, 'একরত্ন', 'পঞ্চরত্ন', 'নবরত্ন', 'ত্রয়োদশরত্ন', 'সপ্তদশরত্ন', 'একবিংশতিরত্ন' ও 'পঞ্চবিংশতিরত্ন'। এই সঙ্গে 'চাঁদনি', 'দালান' এবং সরল 'রেখ' দেউল মন্দিরশৈলীর বহুল প্রচলন সারা বাংলায় লক্ষ করা যায়। এসব শৈলীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কাল খ্রি. ষোল শতক থেকে খ্রি. উনিশ শতক পর্যন্ত। উপরিউক্ত শৈলীগুলি ছাড়া আরও কিছু কিছু নতুন শৈলীর মন্দির,, যেমন, পদ্ম কোরকাকৃতি রত্ন, গির্জার চূড়ার আকারের 'রত্ন' যেগুলির বেশির ভাগই উনিশ শতকে তৈরি হয়।

হুগলি জেলার মন্দিরগুলি সবই প্রায় ইঁটের তৈরি। পূর্বোক্ত শৈলীর প্রায় সব মন্দিরই এই জেলায় দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরগুলির প্রায় দশ শতাংশ 'টেরাকোটা' অলংকরণে অলংকৃত। আরও বেশিও হতে পারে। মন্দিরের সংখ্যা কত বলা কঠিন। তবে আনুমানিক দু'হাজার বা তার বেশিও হতে পারে। বাংলার শেষ মধ্যযুগীয় মন্দির স্থাপত্যের ইতিহাসে হুগলির মন্দিরের গুরুত্ব যথেষ্ট। শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের দিক থেকেই নয়, স্থাপত্য ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের মন্দিরগুলি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরাকীর্তি হিসেবে এদের গুরুত্বও অপরিসীম। হুগলিতে একচালা মন্দির নেই বলা যায়। 'দোচালা' মন্দিরের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন চন্দননগরের নন্দদুলাল মন্দিরের সামনের 'জগমোহন' (মুখশালা)। মূল মন্দিরটি সমতল ছাদযুক্ত 'দালান' রীতির। 'জোড়বাংলা'ও কম। উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, গুপ্তিপাড়ার মহাপ্রভুর 'জোড়বাংলা (এটি বাংলার প্রাচীনতম 'জোড়বাংলা বলে কেউ কেউ মনে করেন), সেনেটের বিশালাক্ষী (১৮২২ খ্রি.) 'অন্নপূর্ণার জোড়বাংলা' মহানাদ ইত্যাদি। 'চারচালা'র সংখ্যাও কম, যেমন, সেলানপুর ও শ্যামবাজার (গোঘাট), বাখরপুর (পুরশুড়া), পারুল ও রাজহাটিতে (আরামবাগ) 'মুখশালা'রূপে চারচালা লক্ষ করা যায়।

মেদিনীপুর ও বর্ধমানের মতো হুগলিতেও 'আটচালা'র সংখ্যা বেশি, শ্রীরামপুরে পরিত্যক্ত 'হেনরি মার্টিনের প্যাগোডা' বলে পরিচিত 'আটচালা' (আঃ ১৬৭৭ খ্রি.) মাহেশের রাধাবল্লভ, গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির বিশাল আটচালার নিদর্শন। বারোচালা মন্দিরও খুবই বিরল। সেনহাট (আরামবাগ) ও ইলছোবায় (পাণ্ডুয়া) এর নিদর্শন পাওয়া যায়। 'রত্ন' মন্দিরের সংখ্যা এই জেলায় অনেক। 'একরত্ন'এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বাঁশবেড়িয়ার অনন্ত বাসুদেব (১৬৭৯ খ্রি.), গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্র (আ. ১৭ শতক) এবং গোপীনাথ (এর চারচালা একরত্ন)। 'পঞ্চরত্ন' এই জেলায় অনেক তৈরি হয়েছিল। যেমন, দশঘরার (ধনিয়াখালি) বিশ্বাসদের গোপীনাথ মন্দির (১৭২৯)। এছাড়া আছে হরিপাল, উত্তরপাড়া, দ্বারহাট্টা, গুড়াপ প্রভৃতি স্থানে। 'নবরত্ন' মন্দিরের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বাকসার (চণ্ডীতলা) রঘুনাথ (১৯ শতক), ক্ষীরকুণ্ডির লক্ষ্মীজনার্দন (১৮ শতক), বালী দেওয়ানগঞ্জের দুর্গা ('জোড়বাংলা'র ওপর 'নবরত্ন'), সুখাড়িয়ার নিস্তারিনী ও হরসুন্দরী কালীমন্দির, মহানাদের ব্রহ্মময়ী মন্দির ইত্যাদি। 'ত্রয়োদশরত্ন' মন্দিরের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ উদাহরণ বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী (১৮১৪ খ্রি.)। হুগলিতে সপ্তদশ ও একবিংশতিরত্ন দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দিরের একমাত্র নিদর্শন আছে সুখাড়িয়ার আনন্দভৈরবী বা আনন্দময়ী মন্দিরে (১৮১৩ খ্রি.)। এছাড়া 'দালান' ও 'চাঁদনি' মন্দিরও হুগলি জেলায় আছে। রাস ও দোলমঞ্চ আছে অনেক।

এই জেলায় বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের মতো প্রকৃত 'রেখ' দেউল আমাদের চোখে পড়ে নি। উক্ত 'রেখ দেউল ওড়িশী শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত যা একমাত্র ঐ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

হুগলিতে যে 'দেউল' মন্দিরগুলো পাওয়া যায়, তার বেশির ভাগেরই 'শিখর' আনুভূমিক ও অগভীর রেখা ও পটীর দ্বারা বিভাজিত। নীচের বর্গাক্ষেত্রাকৃতি 'রাঢ়'-অংশটি (গর্ভগৃহ) অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত আনুভূমিক রেখার দ্বারা বিভক্ত। 'রেখ' দেউলের প্রথাগত শৈলী এসব মন্দিরে অনুসৃত হয় নি। উল্লেখযোগ্য, এই 'দেউল' মন্দিরগুলি সবই এই ধরণের। যেমন, শ্রীরামপুরে মাহেশের জগন্নাথ এবং চৌধুরী পাড়ার গৌরাঙ্গমন্দির ও মহানাদের জটেশ্বরনাথ। লেখক বহুকাল আগে বৈঁচিগ্রামের গোকুলসিংহ প্রতিষ্ঠিত গোপালের মন্দিরটিও এই ধরণের লক্ষ করেছিলেন। কারও কারও মতে, সেটি ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ছিল। লেখকের পরিদর্শনকালে সেখানে কোন লিপি লক্ষ করা যায় নি। বিজলী লিপিটি দেখেছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন।[১৮] উপরিউক্ত দেউল মন্দিরগুলি সবই লিপিহীন, তবে এগুলি প্রাচীন বলে অনুমান করা যায় — আনুমানিক ১৭ - ১৮ শতকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। শুধুমাত্র বাঁকুড়া মেদিনীপুরের মতো সরলীকৃত 'দেউল' শৈলীর মন্দিরও বর্তমান লেখকের চোখে পড়ে নি। হুগলিতে এমন কি, 'রত্ন'- মন্দিরের 'রত্ন' গুলিও সমান্তরাল খাঁজকাটারূপে দেখা যায়। মেদিনীপুরের মতো উল্লম্বরেখ নয়। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে বর্তমান লেখকের এই ধরণের 'রত্ন' একটিও চোখে পড়ে নি, মেদিনীপুর বাঁকুড়ায় যা অনেক লক্ষ করা গেছে।

হুগলিতে বেশ কিছু মন্দিরকেন্দ্রিক স্থান আছে। সেগুলি এই জেলা, এমন কি পশ্চিমবাংলার উল্লেখযোগ্য ও প্রতিনিধিস্থানীয় মন্দিররূপে পরিচিত। এছাড়া স্বল্পপরিচিত, কিন্তু উল্লেখযোগ্য 'টেরাকোটা' শোভিত কোন কোন মন্দিরও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানলব্ধ সেই সব মন্দিরের মধ্যে স্বল্পজ্ঞাত মাত্র কয়েকটির বিবরণী এখানে দেওয়া হোল। যেহেতু প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি (গুপ্তিপাড়া, বাঁশবেড়িয়া) অনেকেরই জানা, সেকারণে সেগুলি এখানে আলোচিত হচ্ছে না।

ইদলবাটী (গোঘাট) : কোঙারদের রাধাদামোদরের 'আটচালা'। ইটের তৈরি এই মন্দিরে প্রচুর 'টেরাকোটা' আছে। লিপিটির বেশিরভাগ পাঠোদ্ধার করা গেছে।

'শ্রীশ্রী রাধাদামোদর জীউ
শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৪৯
সন ১১৩৪ সাল —
শ্রীরাম....

এই মন্দির থেকে বহু টেরাকোটা উধাও। সামান্য কয়েকটি লক্ষ করা যায়। মন্দির-লিপি অনুসারে প্রতিষ্ঠাকাল ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ।

খামারপাড়া (সাহাগঞ্জ) : সীতারাম দাস মহারাজের খামারপাড়া খেয়াঘাট আশ্রমের মধ্যে হুগলি নদী তীরবর্তী একটি পরিত্যক্ত 'আটচালা' মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটিতে প্রচুর 'টেরাকোটা' ও লিপি বর্তমান। টেরাকোটা ফলকে লিপিটি এখানে উদ্ধার করা গেল :

'১৬৪৭॥ শৈলবেদর্ত্তুচন্দ্রশাকরাজবত। সরেহকারিরুদ্রপাদপদ্ম মানিপত্যমন্দিরং' — লিপি থেকে জানা যায়, ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়। পরিদর্শনকালে (১৮ নভেম্বর, ১৯৭৫) লক্ষ করা গিয়েছিল মন্দিরের সামনের নীচের প্যানেল থেকে ওপরে কার্ণিশের নিম্নপর্যন্ত প্রচুর 'টেরাকোটা' মূর্তি ও ফুলকারি নকশা বর্তমান। খিলানের ওপরে একটিমাত্র প্রস্থে রাম-রাবণের একটি সুন্দর যুদ্ধদৃশ্য - প্যানেল — রামের পশ্চাতে বানর সেনানী, লক্ষ্মণ তীর ধনুহাতে আক্রমণোদ্যত ইত্যাদি। প্রবেশপথ খিলানের ঠিক ওপরে শিবের ষোলটি প্রতীক 'আটচালা' (ভেতরে শিবলিঙ্গ)। এই মন্দিরটি ঠিক প্রতীক 'আটচালা'র মতো দেখতে। এই মন্দিরে সামাজিক দৃশ্যের 'টেরাকোটা'র মধ্যে

অপরাধীকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার দৃশ্য অভিনব। তরবারিহস্তে এক ব্যক্তি হত্যা করতে উদ্যত, নীচে দুজন ঢাক ও করতাল বাদনরত। নদীর ওপর নৌকোর দুটি দৃশ্য, শিবলিঙ্গপূজা, বন্দুকধারী সৈনিক এবং হংসপংক্তি। এই মন্দিরের উত্তরদিকের দেওয়ালে দুটি 'রামমণ্ডলচক্র' আছে। এছাড়া পোড়ামাটির ছোট্ট ছোট্ট ফুল ও নীচে একটি মল্লযুদ্ধদৃশ্যও আছে। টেরাকোটা মূর্তিসমূহে রেখার বিন্যাস ও সূক্ষ্ম মল্লযুদ্ধদৃশ্যও আছে। টেরাকোটা মূর্তিসমূহে রেখার বিন্যাস ও সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই মন্দিরের বায়ুকোণে একটি আটকোণা রাসমঞ্চও বর্তমান। এখানে কোন 'টেরাকোটা' মূর্তি নেই। সম্ভবত পরবর্তীকালে নির্মিত।

খামারপাড়ায় বাঁশবেড়িয়া রাস্তার ঠিক পশ্চিমপাশে শিবের একটি 'নবরত্ন' মন্দির বর্তমান। সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির বহু মূর্তি আছে। ফুল লতা-পাতা ও গাছের নকশাও অনেক। একমাত্র প্রবেশপথের দু'পাশে দুটি ছোট্ট থাম। খিলানের ওপরের প্রস্থে ফুলের নকশাই বেশি। কিন্তু রাম রাবণের যুদ্ধদৃশ্যও আছে। কার্নিশের নীচে পোড়ামাটির মূর্তির প্যানেলগুলি খোপে খোপে সন্নিবেশিত। এতে দেবদেবীর মূর্তি আছে। নীচের প্যানেলসমূহে সামাজিক দৃশ্য কিছু কিছু আছে, যেমন ঝাম্পানে জমিদারের গমন ইত্যাদি। তবে অনেক মূর্তিই নষ্ট হয়ে গেছে। এই মন্দিরটির ঠিক উত্তরপাশে শিবের একটি 'পঞ্চরত্নে' ছোট্ট ছোট্ট টেরাকোটা মূর্তিফলক লক্ষ্য করা যায়। বেশির ভাগই দেবদেবী মূর্তি ও পোড়ামাটির ফুল। ছোট্ট ছোট্ট মূর্তির মধ্যে রেখার সুচারু বিন্যাস, নকশাগুলির সূক্ষ্মতা, মূর্তিগুলির অবয়বে স্থূলত্ব বর্জন লক্ষ করে এই মন্দিরদুটিকে অবশ্যই আঠার শতকের প্রথমার্ধে ফেলা যায়।

দশঘরা (ধনিয়াখালি) : এই গ্রামের বিশ্বাসপাড়ায় বিশ্বাসদের গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁটের তৈরি এই মন্দিরটি পশ্চিমমুখী, মন্দিরের দৈর্ঘপ্রস্থ সাড়ে উনিশ ফুট এবং উচ্চতা চল্লিশ ফুট। 'রত্ন' গুলি সমান্তরাল খাঁজকাটা ও 'ত্রিরথ'। সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথ। 'ইমারতি' থাম ও 'জোড়া দরুন' খিলান। কেন্দ্রীয় খিলানপ্রস্থের ঠিক ওপরে দুটি টালিতে চারসারি পোড়ামাটির লিপি আছে। প্রথম দু'সারি তেমন পাঠোদ্ধার করা যায় নি। ১ 'শ্রীরাম.... ২ .... ৩ সুভমস্তু সকাব্দা : ১৬৫১ ষোলসত ৪ একান্ন তারিখ ৪ চৌঠা শ্রাবণ'। অতএব মন্দিরটি ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটির বাইরের তিন দিকের দেওয়ালে প্রচুর 'টেরাকোটা' আছে। এছাড়া বাইরের দেওয়ালের চারকোণে ওপরে-নীচে স্থাপিত ঝুলন্ত 'টেরাকোটা' মূর্তি এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের অলংকরণ আমরা বর্ধমানের কালনার কোন কোন মন্দিরে এবং মেদিনীপুরের ও নদীয়ার কিছু কিছু মন্দিরে লক্ষ্য করেছি।

এই মন্দির লেখকের পরিদর্শনের (১৯৮০) তেতাল্লিশ বছর আগে (অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে) বহু টেরাকোটা মূর্তিফলক নষ্ট হয়ে গেলে আবার নতুন ক'রে কুমোরটুলির জনৈক শিল্পীকে (তারাপদ পাল) দিয়ে তৈরি করিয়ে মন্দিরগাত্রে বসানো হয়। যেমন যেমন দৃশ্য বা মূর্তি ছিল সেখানে সেই সেই দৃশ্য বা মূর্তি ঠিক ঠিক তৈরি করে বসানো হয়। ফলকগুলি ঠিক আগের মতো বলে কেউ কেউ বলেন। প্রথমে বাহান্নখানি নতুন টেরাকোটা মূর্তি ফলক বসানো হয়। তবে আরও বহু নতুন ফলকে ফুল ও অন্যান্য নকশা আছে। সেসময় কার্নিশের নীচেও বেশ কিছু ফলক বসানো হয়। পৃথক্ পৃথক্ দৃশ্য ও মূর্তির জন্যে পৃথক ছাঁচ তৈরি করা হয়। নতুন মূর্তিফলকগুলির মধ্যে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের সপারিষদ ও ভক্তবৃন্দসহ সংকীর্তন, দশভূজা মহিষমর্দিনী, লক্ষ্মী-সরস্বতী

প্রভৃতি আছে। সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরে তিনপ্রস্থে এবং থামের গায়ে প্রচুর টেরাকোটা বর্তমান। কেন্দ্রীয় খিলানের ওপরের প্রস্থে রাম-রাবণের যুদ্ধ, গাছপালা, ডাল ও পাথর নিয়ে বানরসেনার যুদ্ধ, সামনের ডানদিকে ওপরের প্রস্থে রাক্ষস ও রামলক্ষ্মণের যুদ্ধ, তৃতীয় খিলানের ওপরের প্রস্থেও ঐরূপ যুদ্ধদৃশ্য আছে। ওপরে কার্ণিশের নীচে খোপে খোপে চারপাশে নকশাকাটা ছোট ছোট টালিতে টেরাকোটা মূর্তি বর্তমান। কার্ণিশের গায়েও 'বাস - রিলিফে' অনেক মূর্তি আছে। বেশ কিছু তদানীন্তন সামাজিক দৃশ্যও বর্তমান, যেমন, স্ত্রীলোকের চরকাকাটা (নতুন ফলক)। মন্দিরের দক্ষিণ ও উত্তর দিকের দেওয়ালে মূর্তির বদলে ফুল ও লতাপাতার পোড়ামাটির ফলক সন্নিবেশিত। গর্ভগৃহ প্রবেশপথের চারপাশেও পোড়ামাটির টালিতে ফুল লতাপাতার নকশাই বেশি।

ভেতরের গঠন : বারান্দা সংকীর্ণ। বারান্দার ভেতরের ছাদ ভল্টে গঠিত। গর্ভগৃহের ভেতরের ছাদ দুটি খিলানের ওপর গোলাকার ভল্টে গঠিত। গর্ভগৃহ থেকে উত্তরদিকে একটি নিষ্ক্রমণ পথ আছে। আগে দ্বিতলে ওঠার সিঁড়ি ছিল। গ্রীষ্মকালে আগে গোপীনাথ জীউকে দ্বিতলে রাখা হ'ত। পরে দ্বিতলে ওঠার সিঁড়ি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়।

গোপীনাথ মন্দিরের সামনে যে নাটমন্দির, তাতে একটি লিপি আছে, 'সকাব্দ ১৭৫৮/ বঙ্গাব্দ/১২৪৩ ইং ১৮৩৬/ শ্রীরামধন মিস্ত্রী।' লক্ষণীয়, এখানে ইংরাজি সাল ও মিস্ত্রী রামধনের নাম দেওয়া আছে। নাটমন্দিরের সংস্কার হয় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে (১৯৪০)। নাটমন্দিরের পার্শ্ববর্তী 'দুর্গাদালান'। জানা যায় দুর্গাদালান তৈরি হয় ১৭৩৯ শকাব্দ বা ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। বাইরে একচূড়া দোলমঞ্চ ও রাসমঞ্চ। দোলমঞ্চটির কোন লিপি না থাকলেও গঠন ও ফুলের নকশা লক্ষ ক'রে অনুমান করা যায় এটিও পূর্বোক্ত গোপীনাথ মন্দিরের সমসাময়িক। কিন্তু রাসমঞ্চটি আরও পরবর্তী মনে হয়। এছাড়া এখানে শিবের একটি পশ্চিমমুখী 'আটচালা'ও আছে।

দশঘরার 'বামুনপাড়া'য় শিবের পশ্চিমমুখী 'আটচালা' মন্দিরটিও প্রাচীন। এর ওপরে কার্ণিশের নীচে লিপিটি উদ্ধার করা হ'ল। : 'শ্রীরাম সুভমস্তু। সকাব্দ ১৬৬৮' — অর্থাৎ ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে এটি স্থাপিত হয়। ইঁটের তৈরি এই মন্দিরের ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের তিন প্রস্থে পোড়ামাটির ফুলকারি নকশা এবং প্রতিকৃতি দেউলে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। টেরাকোটা ফুল ও সুন্দর সুন্দর নকশা ছাড়া কোন মূর্তিফলক এখানে নেই। পরিদর্শনকালে মন্দিরটি জীর্ণ ও বৃক্ষসমাকীর্ণ ছিল। এরই পাশে বিশালাক্ষীর 'জোড়বাংলা' মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। এখানে কোন লিপি ও টেরাকোটা নেই।

দশঘরার 'রায়বাড়ি' সমৃদ্ধ প্রাচীন প্রাক্তন জমিদার। এদের বাড়িও একটি প্রাচীন কীর্তি। রায়েদের একটি বড়ো ঘড়িও আছে।

শ্রীরামপুর : 'হেনরি মার্টিনের প্যাগোডা' বা পরিত্যক্ত রাধাবল্লভের 'আটচালা'। গঙ্গার ধারে প্রাচীন রাধাবল্লভের পরিত্যক্ত 'আটচালাটি 'হেনরি মার্টিনের প্যাগোডা' নামে পরিচিত। এটি বহুকাল পরিত্যক্ত। রাধাবল্লভজীউ শ্রীরামপুরের বল্লভপুরের একটি মন্দিরে স্থানান্তরিত। 'হেনরি মার্টিনের প্যাগোডা' নামে পরিচিত এই পরিত্যক্ত 'আটচালা' মন্দিরটি বিশাল। মন্দিরগর্ভগৃহের দেওয়ালে মার্বেল পাথরে যে লিপিটি আছে, সেটি এখানে উদ্ধার করা হ'ল : This building was/ occupied/by/The Missionary/Henry Martyn, 1806'। ১৮০৬ সালে খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারক হেনরি মার্টিন এই মন্দির ব্যবহার করতেন। তার আগে এটি পরিত্যক্ত হয়েছিল অনুমান করা যায়। এখানে বহু আগে ষোল শতকে একটি মন্দির ছিল, পরে তা গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত হয়। বর্তমান এই

তথাকথিত 'প্যাগোডা' ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বলে জানা যায়।[১১] আমাদের পরিদর্শনের সময় লক্ষ করা গিয়েছিল (৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৫) যে মন্দিরটি আগাগোড়া সিমেন্টের পলেস্তারায় ঢাকা, কারুকার্য বলতে কিছুই নেই। তবে দক্ষিণদিকের দেওয়ালের কিছু অংশে সিমেন্টের পলেস্তারার মধ্যে পোড়ামাটির ফুল, লতাপাতা, বাতিদান প্রভৃতির অংশ সংন্যস্ত। এর থেকে প্রমাণিত হয়, মন্দিরটির অন্তত সামনের দিকে ঐ ধরণের কারুকার্য প্রচুর ছিল, কিন্তু 'টেরাকোটা' মূর্তি কিছু ছিল কিনা সন্দেহ, কেননা, পলেস্তারায় সংলগ্ন অংশে এ ধরণের মূর্তির কোন চিহ্ন নেই। ইঁটের গড়ন এবং মূর্তি বিন্যাসের অভাব লক্ষ করে মধ্যযুগে টেরাকোটা শিল্পের একেবারে আদি পর্বে আনুমানিক ষোল শতকে এটি নির্মিত হয়েছিল বলা যায়। সতেরো শতকে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হলে টেরাকোটা মূর্তিশিল্পে ঐ স্বর্ণযুগে নকশার সঙ্গে মূর্তিবিন্যাসও নিশ্চয়ই স্থান পেত। কিন্তু সিমেন্ট পলেস্তারায় বেশ কিছু নকশা লক্ষ করা গেছে, কোন টেরাকোটা মূর্তিফলকের চিহ্নই নেই। ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলায় যে সব টেরাকোটা মন্দির তৈরি হতে থাকে, তার দেওয়ালে মূর্তির চেয়ে নকশাই প্রাধান্য লাভ করে, যেমন, বৈঁচিগ্রামের বয়েজ স্কুল প্রাঙ্গণে গোপালের পরিত্যক্ত দেউল মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলে কেউ কেউ মনে করেন। তাতে টেরাকোটা নকশা ছিল, কিন্তু মূর্তি ছিল না। এই ধর্মীয় সৌধটিও সেকারণে ঐ সময়ের বলে অনুমান।

স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য : এরূপ বৃহৎ 'আটচালা' রীতির মন্দির কমই দেখা যায়। এর গর্ভগৃহ বেশ প্রশস্ত এবং তার চারপাশ প্রদক্ষিণ পথ পরিবৃত্ত, কিন্তু পূর্ব পশ্চিম দিকে ঢাকা বারান্দা বিধ্বস্ত, তবে উত্তর ও দক্ষিণের প্রদক্ষিণ পথ ঢাকা। সিমেন্টের পলেস্তারা লাগানোর ফলে মন্দিরটির বর্তমান আকৃতিতে পরিবর্তন ঘটেছে, তবে সামগ্রিকভাবে 'আটচালা'র রূপটি স্পষ্ট। কিন্তু সংস্কারের জন্য নীচের চারটি চালের ছাঁচা বা কার্ণিশ লুপ্ত। এটি এখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি। মন্দিরটির গর্ভগৃহের ভেতরের ছাদ গোলাকার ভল্টে নির্মিত। উত্তর ও দক্ষিণের ভেতরের ছাদ হস্তিপৃষ্ঠাকৃতি (apsidal), তবে পশ্চিমের বারান্দায় সম্ভবত দুটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল, নৈঋত কোণে ভেতরের ছাদে গোলাকৃতি ভল্টের চিহ্ন বর্তমান। বায়ুকোণের দেওয়ালের কিছু অংশ কেটে পরবর্তীকালে গর্ভগৃহে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এটা বেশ বোঝা যায়, কেননা, যদি এই প্রবেশপথটি গোড়াতেই থাকত তাহলে ডানদিকে অর্থাৎ নৈঋত কোণেও অনুরূপ একটি প্রবেশপথ থাকত, কিন্তু তা নেই। তাছাড়া এই মন্দিরের অন্যান্য প্রবেশপথের আকারের সঙ্গে এই প্রবেশপথের কোন মিল নেই, অন্যান্য প্রবেশপথের খিলান 'হাইকোর্ট খিলান' আকারের। এই প্রবেশপথের ওপরে কোন খিলান নেই, পরন্তু দেওয়াল যে কাটা তা বেশ বোঝা যায়। এই মন্দিরের নীচের 'চারচাল'টির উত্তরদিকের চাল আছে এবং কার্ণিশও আছে, তবে অপর তিন দিকের কার্ণিশ সংস্কার বা ভগ্ন হওয়ার ফলে লুপ্ত। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, নবাব সিরাজদ্দৌলার গোলা বর্ষণের ফলে পুব ও পশ্চিমের দেওয়াল ভেঙে যায়। কিন্তু তা ঠিক বলে মনে হয় না। সম্ভবত গাছ হওয়ার ফলেই কালক্রমে ভেঙে যায় এবং মন্দিরটি পরিত্যক্ত হয়। রাধাবল্লভজীউ অতঃপর এই মন্দির ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার নয়ানচাঁদ মল্লিক নির্মাণ করান। নিম্নে এই মন্দিরটির বিবরণী দেওয়া হ'ল।

রাধাবল্লভের এই নূতন মন্দিরটিও 'আটচালা' রীতির, ইঁটের তৈরি ও দক্ষিণমুখী। মন্দিরের লিপিটি কিন্তু মার্বেল পাথরে খোদিত। 'শ্রীকৃষ্ণস্মরণার্থ। শুভমস্তু শকাব্দা: ১৬৮৬। দাতা নয়ান মল্লিক। শিল্পকার শ্রীকৃষ্ণদাস'। সম্ভবত মূল লিপিটি নষ্ট হয়ে গেলে এটি সংস্কারকালে সন্নিবেশিত হয়। ১৬৮৬ শকাব্দ = ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ। এই মন্দিরও একটি বৃহদাকার 'আটচালা'। ডেভিড্

ম্যাককাচ্চনের মাপে এটি দৈর্ঘ্যে ৬০ ফুট ও প্রস্থে ৪০ ফুট। গত ১৯৭৩ সালে 'বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্ট' এই মন্দিরের সংস্কার ও রঙ করান।

বৈঁচিগ্রাম : এই গ্রামে গোপালজীউর পরিত্যক্ত 'দেউল' (সম্প্রতি ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে শোনা যায়)। এটি হুগলির একটি অন্যতম প্রাচীন মন্দির ছিল। বর্তমান লেখকের পরিদর্শনকালে (১৭ নভেম্বর, ১৯৭৫ সোমবার) মন্দিরটি (বৈঁচি বিহারীলাল অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে) অক্ষত ছিল। সেসময় এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকালীন লিপি পাওয়া না গেলেও জানা যায়, মন্দিরটি ১৫০৪ শকাব্দ বা ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় যে মাপ নেওয়া হয়, তা ছিল দৈর্ঘ্য প্রস্থে সাড়ে সতের ফুট এবং উচ্চতায় প্রায় চল্লিশ ফুট। আগে এর চারপাশে চারটি দরজা ছিল। কিন্তু মন্দির পরিত্যক্ত হলে কোন কারণে সব দরজাই বন্ধ করে দেওয়া হয়। মন্দিরটির সামনের দক্ষিণদিকের অনেকটা অংশ পড়ে গিয়েছিল। লিপিটি এই সামনের দিকে ছিল, অতএব সামনের দিক পড়ে যাওয়ার সঙ্গে লিপিটিও নষ্ট হয়ে যায়। মন্দিরে খুব পাতলা ইঁটের ব্যবহার, সংকীর্ণ প্রবেশপথ, ইঁটের কারুকার্য ও টেরাকোটা অলংকরণের মধ্যে শুধুমাত্র ফুল ও লতাপাতার নক্শার (মনুষ্যমূর্তি নেই বললেই চলে) প্রাধান্য এবং সুক্ষ্ম কারুকার্য লক্ষ ক'রে মন্দিরটির ঐ সময় সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। কারণ, শেষ মধ্যযুগে নবপর্যায়ের টেরাকোটা অলংকরণের উদ্ভব চৈতন্যপরবর্তীকালে খ্রিস্টীয় ষোল শতকের শেষভাগ থেকে শুরু হয়েছিল (যদিও এই মত সর্বাংশে সত্য নাও হতে পারে)। প্রথম দিকে মূর্তির বদলে ফুল লতা পাতার নকশা, কোন কোন অদ্ভুত প্রাণী প্রভৃতির উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এই মন্দির তারই সাক্ষ্য বহন করেছিল। দক্ষিণদিকে প্রবেশপথের ওপরে ও চারপাশে পোড়ামাটির কয়েকটি ফুল, লতাপাতার কাজ, সাপজাতীয় লম্বা এক প্রাণী ও ছোট্ট দু'একটি অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্তি সন্নিবেশিত ছিল। সেগুলিতে সূক্ষ্ম কারুকার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জনৈক গোকুল সিংহ মন্দির প্রতিষ্ঠাতা বলে জানা যায়।

'শিখর' রীতির ঐ দেউলটি মাহেশ ও জটেশ্বরনাথের মতো সমান্তরাল খাঁজ বা বন্ধনীযুক্ত। নীচের 'বাঢ়' অংশটিতে (চতুষ্কোণ গর্ভগৃহ) তিনটি চওড়া 'পটী' বা 'বন্ধনী' ছিল। এরপর 'গণ্ডী' অংশ থেকে 'শীর্ষ' ভাগ পর্যন্ত মোট চব্বিশটি সমান্তরাল খাঁজ পর পর সন্নিবেশিত ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, দেউলের ইঁট গাঁথার মশলা ছিল মাটি!

গোপালজীউর দোলমঞ্চটি মন্দিরের অদূরবর্তী। এটিও ঐ মন্দিরের সমসাময়িক এবং উচ্চমানের কারুকার্যযুক্ত। একটি উচ্চ বেদির ওপর অবস্থিত এই মঞ্চটি চারদিকে চারটি 'ইমারতি' থামের ওপর একটি ক্ষুদ্রাকৃতি পূর্বোক্ত গোপালজীউর মত সমান্তরাল খাঁজযুক্ত 'শিখর' নিয়ে গঠিত। শিখরের নীচের তিন দিকের অংশে উচ্চ মানের নকাশি কাজ লক্ষ করা যায়, যেমন, পোড়ামাটির ফুল, লতাপাতা ও গাছের সূক্ষ্ম নকশা। কার্ণিশের নীচে ও থামের ওপরের প্রস্থের কিছু কিছু অংশে খুব ছোট ছোট মানুষ মূর্তি জোড়ায় জোড়ায় আছে। এগুলি সম্ভবত রাধাকৃষ্ণের। কয়েকটি স্থানে যুগল রাধাকৃষ্ণমূর্তি দেখা যায়। তবে মূর্তিগুলি খুবই ছোট। মূর্তিগুলির চেয়ে ফুল, লতা পাতার কাজই বেশি সুন্দর। পাতলা ও উৎকৃষ্ট ইঁট, ইঁটের ওপর সূক্ষ্ম ও উচ্চমানের নকাশিকাজ এই দুটি মন্দিরে যত বেশি চোখে পড়ে, বৈঁচিগ্রামের অন্য কোন মন্দিরে তেমন চোখে পড়ে না, যদিও পরবর্তীকালে নির্মিত অনেক টেরাকোটা মন্দির এই গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই দোলমঞ্চটি নকাশিকাজের সত্যিই এক সুন্দর নিদর্শন।

এই গ্রামে টেরাকোটা অলংকৃত যে মন্দিরগুলি আছে, সেগুলি হ'ল উত্তরপাড়া 'বড়মাকালী

তলা'য় তিনটি 'আটচালা' মন্দির। এর মধ্যে পশ্চিমমুখী 'আটচালা'টিতে ফুল লতাপাতার নকশা ছাড়া সামাজিক দৃশ্যের অনেক টেরাকোটা ফলক যেমন, সাম্পানে জমিদারের যাত্রা, শিকারদৃশ্য, যুদ্ধযাত্রা, অশ্বারোহী সৈন্য, কার্নিশের নীচে খোপে খোপে দেবদেবীর বহু মূর্তি আছে। রাধাকৃষ্ণের অনেকগুলি মূর্তি আছে। কোন লিপি নেই। তবে অলঙ্করণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে আঠার শতকে নির্মিত বলে মনে হয়। এখানে আরও কয়েকটি ভগ্ন 'আটচালা'য় টেরাকোটা বর্তমান। 'পাঁচমন্দিরতলা'র নকুলেশ্বরের 'আটচালা'য় যে লিপিটির আংশিক পাঠোদ্ধার করা গেছে, তা থেকে জানা যায় মন্দিরটি ১৬৩১ শকাব্দ বা ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য, মন্দিরটির সামনের দিকে দুটি 'রাসমণ্ডলচক্র' আছে। এখানে কার্নিশের নীচে ও দু'পাশে খোপে খোপে ছোট ছোট দেবদেবীর মূর্তি। এ ধরণের বহু ফলক নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে আরও দুটি 'আটচালা'য় ঐ একই রীতির টেরাকোটা অলংকরণ লক্ষ করা যায়। এই মন্দিরগুলি সবই স্থানীয় জমিদার করেদের প্রতিষ্ঠিত। বারোয়ারীতলায় শিবের 'আটচালা'য় ঐ একই ধরণের পোড়ামাটির অলংকরণ লক্ষ করা যায়। এখানে একটি 'রাসমণ্ডলচক্র' ও একটি মহিষমর্দিনী মূর্তি আছে।

পূর্বপাড়ায় তাম্বুলীজাতীয় সেনেদের প্রতিষ্ঠিত শিবের পরিত্যক্ত 'আটচালা'টি ১৬৩৭ শকাব্দ বা ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। এখানেও একই রকমের সুন্দর সুন্দর মূর্তি ও নীচের প্যানেলসমূহে সামাজিক দৃশ্য লক্ষ করা যায়, কিন্তু বেশির ভাগই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে। বুড়োশিবতলায় পরিত্যক্ত 'আটচালা'টি ১৬৪৯ শকাব্দ বা ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে তৈরি। জানা যায়, এটি পালেদের প্রতিষ্ঠিত। নীচের প্যানেলে সামাজিক দৃশ্য বর্তমান। বহু অংশ নোনা লেগে ক্ষয়ে গেছে। 'কর পুকুরে'র নৈঋতকোণে (পুবপাড়া) শিবের যে 'আটচালা'টি আছে, তার প্রবেশপথের চৌকাঠ পাথরে খোদাই করা। সেটি প্রাচীন কোন মন্দিরের অংশ ছিল অনুমান করা যায়।

বৈঁচিগ্রামে উপরিউক্ত মন্দিরগুলি সবই প্রায় একই ধাঁচের। টেরাকোটা মূর্তিগুলি ছোট ছোট ফলকে অঙ্কিত বা খোদাই করা। ফলকের চারপাশে সুন্দর নকসা। এমন সুন্দর মন্দির সচরাচর খুব কমই চোখে পড়ে।

আঁটপুর (জাঙ্গীপাড়া) : 'টেরাকোটা' মন্দিরের ক্ষেত্রে আঁটপুর খুবই প্রসিদ্ধ। এখানে টেরাকোটার জন্য সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মন্দির মিত্রদের রাধাগোবিন্দের বিশালাকৃতি 'আটচালা' ও তৎসংলগ্ন 'দোচালা' মণ্ডপ। ইঁটের এই মন্দিরটি পূর্বমুখী। কার্নিশের নীচে (সম্ভবতঃ) পাথরে খোদাই একটি লিপি আছে। কিন্তু লিপিটির আংশিক পাঠোদ্ধার করা গেছে। 'শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জয়তি ..... সকাব্দা ১৭০৮'। অতএব প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে। একটি উচ্চ বেদির ওপর মন্দিরটি অধিষ্ঠিত। সামনে প্রবেশপথের ওপরের তিনটি খিলানে, কার্নিশের নীচে এবং বামে ও ডাইনে খোপে খোপে অজস্র টেরাকোটা মূর্তি এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকের দেওয়ালে টেরাকোটামূর্তিফলক আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। 'টেরাকোটা' ফলকগুলিতে সুপরিচিত বিষয়গুলিই রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর রণে ব্যাপৃত বিশালাকার কালী মূর্তি খুবই উল্লেখযোগ্য।

আঁটপুরের প্রসিদ্ধ 'দোচালা' কাঠের চণ্ডীমণ্ডপটি রাধাগোবিন্দ মন্দিরের কাছাকাছি অবস্থিত। এই চণ্ডীমণ্ডপ কন্দর্প মিত্র নামে এক ব্যক্তি ১০৯০ বঙ্গাব্দে (১৬৮৩ খ্রি:) নির্মাণ করান। এতে সুন্দর কারুকার্যের এরূপ নিদর্শন বিরল। সামনে কাঠের বীম ও থামে অসাধারণ কারুকার্য আছে। আটটি কাঠের থামে (দু'কোণে দুটি খর্বাকৃতি স্তম্ভ) সূক্ষ্ম কারকার্য আছে। ওপরে কিছু কিছু মূর্তিরও খোদিত, যেমন, দশভূজা মহিষমর্দিনী, দশভূজা সিংহবাহিনী, ষষ্ঠী দেবী, কৃষ্ণবলরাম ইত্যাদি। বীমের

গায়ে অতি সূক্ষ্ম নকশা লক্ষ করা যায়। বীমে একটি 'কৃত্তিমুখ' অতি সূক্ষ্ম শিল্পের নিদর্শন। সামনে বাঁকানো কার্ণিশগুলোতেও সূক্ষ্ম দারুভাস্কর্যের নিদর্শন মেলে।

এছাড়া রামেশ্বরের বৃহৎ পূর্বমুখী 'আটচালা'য় প্রচুর 'টেরাকোটা' মূর্তি বর্তমান। কার্ণিশের নীচে চারসারি লিপির অনেকটা পাঠোদ্ধার করা গেছে : 'শ্রীরামঃ শরণং/শ্রীতারামেশ্বরস্য/.......শকাব্দঃ ১৬৯৫/শ্রীশ্রীতারাম মিত্র ১১৬৪'। এখানে শকাব্দ ও বঙ্গাব্দের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। মিত্রদের 'বড়পুকুরে'র ঘাটের দু'পাশে (পাকারাস্তার ধারে) ফুলেশ্বর ও জলেশ্বরের দুটি আটচালা' রীতির মন্দির বর্তমান। পশ্চিমমুখী ফুলেশ্বরের 'আটচালা'য় কার্ণিশের নীচে লিপি: 'শ্রীশ্রী দুর্গা/সন১১৭৬/সুভমস্ত/১৬৯১/লিপি অনুসারে প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ। জলেশ্বরের 'আটচালায় মার্বেল পাথরে ১৬৯১ শকাব্দ লেখা আছে।

আঁটপুরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যদের স্মৃতি বিজড়িত। রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সামনে একটি বকুল গাছের কাছে মিত্রদের বাড়িতে বালক গদাধর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। সেটা ১২৬১ বঙ্গাব্দ। তখন গদাধরের বয়স আঠার বছর। এই গ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বাবুরাম ঘোষের (স্বামী প্রেমানন্দ) জন্মস্থান। এখানেই তাঁর জন্মস্থানে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর একটি ধুনি জ্বালিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সহ শ্রীরামকৃষ্ণের নয়জন শিষ্য সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করেন। জায়গাটি সংরক্ষিত করা আছে।

আঁটপুরের কাছাকাছি অমরাবতী'তে শ্রীচৈতন্যপার্ষদ পরমেশ্বর দাসের একটি শ্রীপাট বর্তমান। শ্যামসুন্দর ও শ্রীমতী একটি 'দালান' মন্দিরে নিত্য পূজিত হন। 'দালান' মন্দির প্রায় দু'শবছরের পুরানো।

সুখুড়িয়া বা সুখাড়িয়া (বলাগড়) : আনন্দময়ী কালীর ঠাকুরবাড়ি। আনন্দময়ী বা আনন্দভৈরবীর দক্ষিণমুখী 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দির হুগলি জেলার একমাত্র পঁচিশচূড় মন্দির। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৬ ফুট ৪ই. এবং আনুমানিক উচ্চতা ৬০ ফুট। এই মন্দিরের দুপাশে ছয়টি করে বারটি মন্দির। প্রতি সারিতে প্রথমটি 'পঞ্চরত্ন' ও বাকীগুলি 'আটচালা' রীতির। পশ্চিমপাশে এক বিশাল দীঘি। এদিকের 'পঞ্চরত্নে' গণেশমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বাকী সব গুলিতে শিবলিঙ্গ। আনন্দময়ী মন্দিরের সামনে, পূর্ব ও পশ্চিমের দেওয়ালের কুলুঙ্গীতে অনেক 'টেরাকোটা' মূর্তি আছে। কিন্তু স্থূলাকৃতি ও নিম্নমানের কাজ। সোপানযুক্ত বেদির ওপর মন্দিরটি অধিষ্ঠিত। সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের তিনপ্রস্থে ফুল লতাপাতার বহু নকশা, টেরাকোটার বড় বড় ফুল, বহু কালীমূর্তি, অষ্টাভুজা সিংহবাহিনী, পঞ্চমুখ গণেশ, কৃষ্ণকালী, হনুমানের মাথার ওপর দশভুজা মহিষমর্দিনী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি সন্নিবেশিত। নীচে বেদির ওপর প্যানেলে ফুল ও হংসপংক্তি উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণদিকের দেওয়ালে বকাসুরবধ, মালাজপরত কৌপীনধারী মোহান্ত, পাশে ভাতপ্রস্তুতরত কৌপীনধারী সন্ন্যাসী, শিবলিঙ্গপূজা, ময়ূরকে খাদ্যদান, ফরসিবিলাসী জমিদার, তরোয়ালধারী অশ্বারোহীর হরিণশিকার, অশ্বশকটে জমিদারের গমন — সামনে লোকলস্কর, তিনটি হাতীর ওপর হাওদায় পাগড়ীধারী কয়েকজন ব্যক্তি, শ্রীকৃষ্ণের পুতনাবধ, কালীয়দমন, বনে ব্যাঘ্র ও হস্তী, তীরধনুহাতে পাগড়ী পরিহিত জনৈক ব্যক্তির হরিণশিকার, উপবিষ্টা অষ্টভুজা সিংহবাহিনী, কালী, চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, রামসীতা, বিভীষণ ও হনুমান, দশভুজা মহিষমর্দিনী এবং সিংহোপরি গণেশজননী।

বারান্দার ভেতরের দুদিকে দুটি দোচালা মণ্ডপ ও কক্ষ। গর্ভগৃহ প্রবেশপথের চারপাশে নানা

তলা'য় তিনটি 'আটচালা' মন্দির। এর মধ্যে পশ্চিমমুখী 'আটচালা'টিতে ফুল লতাপাতার নকশা ছাড়া সামাজিক দৃশ্যের অনেক টেরাকোটা ফলক যেমন, সাম্পানে জমিদারের যাত্রা, শিকারদৃশ্য, যুদ্ধযাত্রা, অশ্বারোহী সৈন্য, কার্নিশের নীচে খোপে খোপে দেবদেবীর বহু মূর্তি আছে। রাধাকৃষ্ণের অনেকগুলি মূর্তি আছে। কোন লিপি নেই। তবে অলঙ্করণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে আঠার শতকে নির্মিত বলে মনে হয়। এখানে আরও কয়েকটি ভগ্ন 'আটচালা'য় টেরাকোটা বর্তমান। 'পাঁচমন্দিরতলা'র নকুলেশ্বরের 'আটচালা'য় যে লিপিটির আংশিক পাঠোদ্ধার করা গেছে, তা থেকে জানা যায় মন্দিরটি ১৬৩১ শকাব্দ বা ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য, মন্দিরটির সামনের দিকে দুটি 'রাসমণ্ডলচক্র' আছে। এখানে কার্ণিশের নীচে ও দু'পাশে খোপে খোপে ছোট ছোট দেবদেবীর মূর্তি। এ ধরণের বহু ফলক নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে আরও দুটি 'আটচালা'য় ঐ একই রীতির টেরাকোটা অলংকরণ লক্ষ করা যায়। এই মন্দিরগুলি সবই স্থানীয় জমিদার করেদের প্রতিষ্ঠিত। বারোয়ারীতলায় শিবের 'আটচালা'য় ঐ একই ধরণের পোড়ামাটির অলংকরণ লক্ষ করা যায়। এখানে একটি 'রাসমণ্ডলচক্র' ও একটি মহিষমর্দিনী মূর্তি আছে।

পূর্বপাড়ায় তাম্বুলীজাতীয় সেনেদের প্রতিষ্ঠিত শিবের পরিত্যক্ত 'আটচালা'টি ১৬৩৭ শকাব্দ বা ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। এখানেও একই রকমের সুন্দর সুন্দর মূর্তি ও নীচের প্যানেলসমূহে সামাজিক দৃশ্য লক্ষ করা যায়, কিন্তু বেশির ভাগই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে। বুড়োশিবতলায় পরিত্যক্ত 'আটচালা'টি ১৬৪৯ শকাব্দ বা ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে তৈরি। জানা যায়, এটি পালেদের প্রতিষ্ঠিত। নীচের প্যানেলে সামাজিক দৃশ্য বর্তমান। বহু অংশ নোনা লেগে ক্ষয়ে গেছে। 'কর পুকুরে'র নৈঋতকোণে (পুবপাড়া) শিবের যে 'আটচালা'টি আছে, তার প্রবেশপথের চৌকাঠ পাথরে খোদাই করা। সেটি প্রাচীন কোন মন্দিরের অংশ ছিল অনুমান করা যায়।

বৈঁচিগ্রামে উপরিউক্ত মন্দিরগুলি সবই প্রায় একই ধাঁচের। টেরাকোটা মূর্তিগুলি ছোট ছোট ফলকে অঙ্কিত বা খোদাই করা। ফলকের চারপাশে সুন্দর নকসা। এমন সুন্দর মন্দির সচরাচর খুব কমই চোখে পড়ে।

আঁটপুর (জাঙ্গীপাড়া) : 'টেরাকোটা' মন্দিরের ক্ষেত্রে আঁটপুর খুবই প্রসিদ্ধ। এখানে টেরাকোটার জন্য সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মন্দির মিত্রদের রাধাগোবিন্দের বিশালাকৃতি 'আটচালা' ও তৎসংলগ্ন 'দোচালা' মণ্ডপ। ইঁটের এই মন্দিরটি পূর্বমুখী। কার্নিশের নীচে (সম্ভবতঃ) পাথরে খোদাই একটি লিপি আছে। কিন্তু লিপিটির আংশিক পাঠোদ্ধার করা গেছে। 'শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জয়তি ..... সকাব্দা ১৭০৮'। অতএব প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে। একটি উচ্চ বেদির ওপর মন্দিরটি অধিষ্ঠিত। সামনে প্রবেশপথের ওপরের তিনটি খিলানে, কার্নিশের নীচে এবং বামে ও ডাইনে খোপে খোপে অজস্র টেরাকোটা মূর্তি এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকের দেওয়ালে টেরাকোটামূর্তিফলক আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। 'টেরাকোটা' ফলকগুলিতে সুপরিচিত বিষয়গুলিই রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর রণে ব্যাপৃত বিশালাকার কালী মূর্তি খুবই উল্লেখযোগ্য।

আঁটপুরের প্রসিদ্ধ 'দোচালা' কাঠের চণ্ডীমণ্ডপটি রাধাগোবিন্দ মন্দিরের কাছাকাছি অবস্থিত। এই চণ্ডীমণ্ডপ কন্দর্প মিত্র নামে এক ব্যক্তি ১০৯০ বঙ্গাব্দে (১৬৮৩ খ্রিঃ) নির্মাণ করান। এতে কাঠের বীম ও থামে অসাধারণ কারুকার্য আছে। সুন্দর কারুকার্যের এরূপ নিদর্শন বিরল। সামনে আটটি কাঠের থামে (দু'কোণে দুটি খর্বাকৃতি স্তম্ভ) সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে। ওপরে কিছু কিছু মূর্তিরও খোদিত, যেমন, দশভুজা মহিষমর্দিনী, দশভুজা সিংহবাহিনী, ষষ্ঠী দেবী, কৃষ্ণবলরাম ইত্যাদি। বীমের

গায়ে অতি সূক্ষ্ম নকশা লক্ষ করা যায়। বীমে একটি 'কৃত্তিমুখ' অতি সূক্ষ্ম শিল্পের নিদর্শন। সামনে বাঁকানো কার্ণিশগুলোতেও সূক্ষ্ম দারুভাস্কর্যের নিদর্শন মেলে।

এছাড়া রামেশ্বরের বৃহৎ পূর্বমুখী 'আটচালা'য় প্রচুর 'টেরাকোটা' মূর্তি বর্তমান। কার্ণিশের নীচে চারসারি লিপির অনেকটা পাঠোদ্ধার করা গেছে : 'শ্রীরামঃ শরণং/শ্রীতারামেশ্বরাস্য/......শকাব্দঃ ১৬৯৫/শ্রীশ্রীতারাম মিত্র ১১৬৪'। এখানে শকাব্দ ও বঙ্গাব্দের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। মিত্রদের 'বড়পুকুরে'র ঘাটের দু'পাশে (পাকারাস্তার ধারে) ফুলেশ্বর ও জলেশ্বরের দুটি আটচালা' রীতির মন্দির বর্তমান। পশ্চিমমুখী ফুলেশ্বরের 'আটচালা'য় কার্ণিশের নীচে লিপিঃ 'শ্রীশ্রী দুর্গা/সন১১৭৬/সুভমস্ত/১৬৯১/লিপি অনুসারে প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ। জলেশ্বরের 'আটচালায় মার্বেল পাথরে ১৬৯১ শকাব্দ লেখা আছে।

আঁটপুরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যদের স্মৃতি বিজড়িত। রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সামনে একটি বকুল গাছের কাছে মিত্রদের বাড়িতে বালক গদাধর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। সেটা ১২৬১ বঙ্গাব্দ। তখন গদাধরের বয়স আঠার বছর। এই গ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বাবুরাম ঘোষের (স্বামী প্রেমানন্দ) জন্মস্থান। এখানেই তাঁর জন্মস্থানে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর একটি ধুনি জ্বালিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সহ শ্রীরামকৃষ্ণের নয়জন শিষ্য সন্যাস গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করেন। জায়গাটি সংরক্ষিত করা আছে।

আঁটপুরের কাছাকাছি অমরাবতী'তে শ্রীচৈতন্যপার্ষদ পরমেশ্বর দাসের একটি শ্রীপাট বর্তমান। শ্যামসুন্দর ও শ্রীমতী একটি 'দালান' মন্দিরে নিত্য পূজিত হন। 'দালান' মন্দির প্রায় দু'শবছরের পুরানো।

সুখড়িয়া বা সুখাড়িয়া (বলাগড়) : আনন্দময়ী কালীর ঠাকুরবাড়ি। আনন্দময়ী বা আনন্দভৈরবীর দক্ষিণমুখী 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দির হুগলি জেলার একমাত্র পঁচিশচূড় মন্দির। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৬ ফুট ৪ই. এবং আনুমানিক উচ্চতা ৬০ ফুট। এই মন্দিরের দুপাশে ছয়টি করে বারটি মন্দির। প্রতি সারিতে প্রথমটি 'পঞ্চরত্ন' ও বাকীগুলি 'আটচালা' রীতির। পশ্চিমপাশে এক বিশাল দীঘি। এদিকের 'পঞ্চরত্নে' গণেশমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বাকী সব গুলিতে শিবলিঙ্গ। আনন্দময়ী মন্দিরের সামনে, পূর্ব ও পশ্চিমের দেওয়ালের কুলুঙ্গীতে অনেক 'টেরাকোটা' মূর্তি আছে। কিন্তু স্থূলাকৃতি ও নিম্নমানের কাজ। সোপানযুক্ত বেদির ওপর মন্দিরটি অবস্থিত। সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের তিনপ্রস্থে ফুল লতাপাতার বহু নকশা, টেরাকোটার বড় বড় ফুল, বহু কালীমূর্তি, অষ্টভুজা সিংহবাহিনী, পঞ্চমুখ গণেশ, কৃষ্ণকালী, হনুমানের মাথার ওপর দশভুজা মহিষমর্দিনী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি সন্নিবেশিত। নীচে বেদির ওপর প্যানেলে ফুল ও হংসপংক্তি উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণদিকের দেওয়ালে বকাসুরবধ, মালাজপরত কৌপীনধারী মোহান্ত, পাশে ভাতপ্রস্তুতরত কৌপীনধারী সন্ন্যাসী, শিবলিঙ্গপূজা, ময়ূরকে খাদ্যদান, ফরসিবিলাসী জমিদার, তরোয়ালধারী অশ্বারোহীর হরিণশিকার, অশ্বশকটে জমিদারের গমন — সামনে লোকলস্কর, তিনটি হাতীর ওপর হাওদায় পাগড়ীধারী কয়েকজন ব্যক্তি, শ্রীকৃষ্ণের পুতনাবধ, কালীয়দমন, বনে ব্যাঘ্র ও হাতী, তীরধনুহাতে পাগড়ী পরিহিত জনৈক ব্যক্তির হরিণশিকার, উপবিষ্টা অষ্টভুজা সিংহবাহিনী, কালী, চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, রামসীতা, বিভীষণ ও হনুমান, দশভুজা মহিষমর্দিনী এবং সিংহোপরি গণেশজননী।

বারান্দার ভেতরের দুদিকে দুটি দোচালা মণ্ডপ ও কক্ষ। গর্ভগৃহ প্রবেশপথের চারপাশে নানা

রঙে 'পঙ্কের কাজ'। প্রধানত খয়েরী ও নীল রং ব্যবহৃত। ফুলগাছ, লতা ও পাতা খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত রয়েছে।

স্থাপত্য : মন্দিরটির চারটি তল। দ্বিতলে প্রতিকোণে তিনটি করে মোট চারকোণে বারটি সমান্তরাল খাঁজকাটা দেউল রত্ন। ত্রিতলে দুটি করে আটটি ও চতুর্থতলে ঐরূপ পাঁচটি 'রত্ন' সন্নিবেশিত।

এই ঠাকুরবাড়ির চারপাশ আগে প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। এখনও কিছু অংশে প্রাচীর আছে। প্রাঙ্গণে একটি চত্বরের চিহ্ন লক্ষ করা যায়। জানা যায়, ১৭৩৫ শকাব্দ বা ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সুখাড়িয়ার তৎকালীন জমিদার বীরেশ্বর মিত্র মুস্তৌফী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মুস্তৌফীদের বিশাল অট্টালিকা মন্দিরের কাছেই বর্তমান।

সুখাড়িয়ায় আরও দুটি ঠাকুরবাড়ির মধ্যে নিস্তারিনী কালীর 'নবরত্ন' মন্দিরটি ১২৫৪ বঙ্গাব্দ বা ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানেও মন্দিরের দুদিকে সাতটি ক'রে চোদ্দটি শিবমন্দির বর্তমান — প্রথম ও শেষটি 'পঞ্চরত্ন' এবং বাকীগুলি 'আটচালা' রীতির। মূল 'নবরত্ন' মন্দিরে দক্ষিণাকালী পূজিত হন। এখানে কোথাও কোন টেরাকোটা নেই। দ্বিতীয়টি হরসুন্দরী ঠাকুরবাড়ি। হরসুন্দরীর মন্দিরটি 'নবরত্ন' রীতির। এখানেও মোট চোদ্দটি শিবমন্দির আছে — দুটি করে 'পঞ্চরত্ন' ও বাকীগুলি 'আটচালা' রীতির। হরসুন্দরী মন্দিরের একটি লিপি থেকে জানা যায়, ১৭৩৫ শকে (১৮১৩ খ্রি.) এটি রামনিধি মুস্তৌফী প্রতিষ্ঠা করেন।

হুগলি জেলায় এই ধরণের অসংখ্য মন্দির আছে যেগুলি আমাদের অনন্য পুরাকীর্তি। এই ধর্মীয় পুরানিদর্শন বাংলার প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দুঃখের বিষয়, এগুলির বেশির ভাগই ধ্বংসের পথে। বহু 'টেরাকোটা' মন্দির দীর্ঘকাল গাছ গাছালিতে পূর্ণ হয়ে ভগ্নজীর্ণ হয়ে ক্রমশ অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু এখনও যা অবশিষ্ট আছে, তার সমীক্ষা আজও হয় নি।

ধর্মীয় পুরাকীর্তির মধ্যে গির্জা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বকথিত ভাগীরথীতীরবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন বিদেশী শক্তির উপনিবেশ স্থাপন এবং খ্রিস্টীয় মিশনারীদের উদ্যোগে বহু খ্রিস্টীয় ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পোর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকেরা ব্যান্ডেলে সর্বপ্রথম গির্জা স্থাপন করেন ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে। মূল প্রতিষ্ঠালিপি ফলকটি গির্জার পশ্চিমদিকের (জি.টি. রোডের দিকে) বন্ধ দ্বারের ওপরে ছিল। বেশ কয়েকবছর আগে সেটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রায় অস্পষ্ট ইংরাজি ১৫৯৯ সংখ্যাটি মূল প্রতিষ্ঠাকাল হলেও গঙ্গার দিকে পূর্বদ্বারে নতুন ১৫৯৯ সংখ্যা দেওয়া আছে। ঐ লেখাটি ক্ষয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় দীর্ঘকাল আগে ঐ গির্জার ভারপ্রাপ্ত জনৈক যাজকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বর্তমান লেখক। এই গির্জাটি মা মেরীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। পশ্চিম দিকের অংশটিই মূল গির্জার অংশ। সম্রাট শাজাহানের দ্বারা এক সময় গির্জা আক্রান্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে পূর্বের অংশটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়। গঙ্গার দিক থেকে লম্বা বারান্দা দিয়ে মূল ভজনালয়ে প্রবেশ করা যায়। প্রার্থনা গৃহের ভেতরে উত্তরদিকের বেদিতে শিশু যীশুকে কোলে করে কুমারী মেরী দণ্ডায়মানা। তাঁর পাশে দেবদূত। বেদির নীচে ডান ও বামে দুজন সেন্টের প্রতিমূর্তি। ডান দিকের সাধু আন্থনের জন্ম ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে। পাশে মণ্ডপে ডন বস্কোর মূর্তি, শিশুদের আদর করছেন। সামনে শিশু যীশু। সতের শতকে স্পেন থেকে প্রাগে শিশু যীশুর মূর্তি আনা হয়। পরে সারা পৃথিবীতে এই শিশু যীশুর মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়। পাশে মাদার তেরেজার মূর্তি। জন্ম ১৮৭৩ খ্রি. ও মৃত্যু ১৮৯৭ খ্রি.। ভজনালয়ের তিনটি অংশ উত্তর-দক্ষিণে

লম্বিত। পুব ও পশ্চিমের অংশে ষোলটি খিলানাকৃতি দ্বার। প্রার্থনার আসন। মেঝেতে কয়েকটি সমাধিফলক আছে। প্রাচীর বেষ্টিত দক্ষিণাংশে একটি স্বল্পায়তন সমাধিস্থান। এখানে রক্ষিত আছে ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দের সেই জাহাজের প্রসিদ্ধ মাস্তুল যে জাহাজের নাবিক বা বণিক সমুদ্রে বিপদে পড়ে মা মেরীর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে রক্ষা পান এবং জাহাজের মাস্তুলটি তাঁর উদ্দেশ্যে এখানে দান করেন। ওপরে দ্বিতলে দণ্ডায়মানা মেরীর মূর্তি। লেখা আছে 'Our Lady of Happy Voyage, pray for us.' মূল ভজনালয়ের বাইরে পুবদিকে লম্বিত করিডর, এরপর উত্তর-দক্ষিণে করিডর, মাঝে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। একস্থানে জনৈক স্লেটার নামে এক ভক্ত কর্তৃক নির্মিত পর্বতাকৃতি কক্ষ, সুড়ঙ্গের মতো, বাইরে মেরীর মূর্তি।

হুগলির আর একটি পুরানো গির্জা চুঁচুড়ায় আর্মেনীয় সেন্ট জন্‌স চার্চ। গির্জার বাইরের দেওয়ালে (পশ্চিম দিকে রাস্তার ধারে) লিপিটি হ'ল, 'Armenian/church/of/st. John/ chinsurah/constructed 1695'। অতএব ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রসিদ্ধ শোভাসিংহের বিদ্রোহের বছর এই আর্মানি গির্জাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। চুঁচুড়া তথা পশ্চিমবাংলার এটিও অন্যতম প্রাচীন খ্রিস্টীয় ভজনালয়। এক চূড়া বিশিষ্ট এই গির্জা সৌধটির ভেতরে দুটি প্রাচীনতম সমাধি আছে। এই সমাধিদুটির একটি ভজনালয়মঞ্চের ওপরে ওঠার সিঁড়ির ঠিক নীচেই স্থাপিত। সমাধিফলকে ষোল সতের সারির আর্মানী লিপিতে রচিত দীর্ঘ লিপি খোদিত আছ। সমাধিফলকের ওপরে 1697 লেখা আছে। অপর সমাধিফলকখানি ভজনালয়ের ভেতরের পশ্চিমপ্রান্তে স্থাপিত। ইহার নীচেও 1697 লিখিত। ভজনালয়ের ভেতরে আরও কয়েকটি সমাধিফলক আছে। গির্জাপ্রাঙ্গণে বহু সমাধি আছে। বেশির ভাগ সমাধিফলকেই আর্মানী লিপি লক্ষ্য করা যায়।

এই আর্মেনীয় গির্জাটি খাজা জোহানেস মার্সার নির্মাণ করেন। বেদিতে ওঠার সিঁড়ির ঠিক নীচে আর্মানী লিপি খোদিত যে বড় ফলকটি দেখা যায়, সেটি তাঁরই ফলক বলে জানা যায়। তিনি গির্জা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। এর পর তাঁর ভাই যোশেফ মার্সার গির্জাটি সম্পূর্ণ করেন। গির্জার বেদির ওপরে যীশুর বিশাল ক্রুশবিদ্ধ পট দেখা যায়। তার নীচে পেতলের একটি বড়ো ফলকে বাইবেলের বাণী আর্মানী লিপিতে খোদিত।

এই গির্জায় খ্রিস্টমাসে কোন উৎসব হয় না। তার বদলে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে (১৫ জানুয়ারি) উৎসব হয়। কলকাতার আর্মেনীয়ান চার্চের অধীনে এই চার্চটি যুক্ত। উৎসবের সময় কলকাতার আর্মেনীয় সম্প্রদায় এখানে বিপুলভাবে উপস্থিত হন।

গির্জার প্রাঙ্গণ ও ভেতরে প্রায় দু'শর মতো সমাধি বর্তমান। প্রায় সবগুলোই আর্মানী লিপিযুক্ত। অনেকগুলি লিপি ক্ষয়প্রাপ্ত। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সমাধি হ'ল বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক জে. ডি. বেগলার ও তাঁর পরিবারের লোকদের সমাধিগুলি। গির্জাপ্রাঙ্গণের দক্ষিণাংশে এগুলি লক্ষ করা যায়। জে. ডি. বেগলার ছিলেন বাংলার আর্কিওলজিক্যাল সারভেয়ার এবং তদানীন্তন পূর্তদপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার। তিনি সারা বাংলা পরিক্রমা ক'রে বাংলার পুরাকীর্তিগুলি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'Report of a tour through Bengal Province 1872'। বইটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে, এতে প্রায় মুসলিম বাংলার পুরাকীর্তি, বিশেষ করে পাল সেন আমলের মন্দিরগুলির প্রামাণিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তবে, শ্রীচৈতন্যোত্তর বাংলার যে অসংখ্য মন্দির আছে, তার কোন বিবরণ নেই। এমন কি, বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলোরও কোন উল্লেখ নেই। বেগলার সাহেবের মতে সেগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই তাঁর প্রতিবেদনে শেষ মধ্যযুগের মন্দিরের কথা উল্লেখ করা হয় নি। এই গির্জাপ্রাঙ্গণে বেগলার

সাহেবের ও তাঁর পরিবারের দু'জন সদস্যের সমাধিলিপি যথাযথ উদ্ধার করা হ'ল :

'In memory of Joseph, Son of David Feridonowitch
Melik Beglar OFF, Karabagh Late Executive Engineer,
P.W.D. Archaeological Surveyor, Bengal
Born 25th June, 1845, Died 24th April, 1907 at Chakdah''

জে. ডি. বেগলার চাকদহে (নদীয়া) মারা গেলেও সম্ভবত এখানে তাঁকে সমাহিত করা হয় অথবা তাঁর স্মরণে এই স্মারক প্রস্তর বসানো হয়। বেগলার - পরিবারের আরও দুটি সমাধিলিপি : 'In loving memory of beloved mother Mrs. Varthemi Joshephovna Melik - Beglar who died on Sunday the 5th March, 1911 at Chakdah.' অপর একটি লিপি, 'Thakuhi Davidovna Melik-Beglar OFF obit 2nd Jan 1883.' এদের সঙ্গে পুরাতাত্ত্বিক বেগলারের কি সম্পর্ক জানা যায় না। তবে বেগলার পরিবার যে চাকদহে থাকতেন এবং এরা তাঁর আত্মীয় ছিলেন তা বোঝা যায়। সমাধিলিপি থেকে জানা গেল, জে. ডি. বেগলার মাত্র বাষট্টি বছর জীবিত ছিলেন। চুঁচুড়ার এই আর্মানী গির্জায় যে অন্যান্য প্রাচীন সমাধিফলকগুলি পাওয়া যায়, সেগুলির কোন কোনটির তারিখ হ'ল, খ্রি. ১৭৬৬, ১৭৭৯, ১৭৮১, ১৭৯১, ১৭৯৪, ১৭৯৮, ১৮১৬। এখানের আর একটি প্রাচীন সমাধিলিপি : 'Sacred/To/The Memory/of/SARHAD LEON Esqr./Who Departed/This life on The/4th September 1836/Aged 70 years'. অপর একটি লিপি, 'In loving memory of/my dear father/HYRAPIET D. ANTHONY/Born in Julfa, Ispahan/on 27. January 1842/ Died at Dhanbad on 5 November, 1920/ Aged 78 years 9 months & 9 days/ "Chinsurah".

এই আর্মানী গির্জাটি চুঁচুড়ার 'আর্মানিটোলা'য় অবস্থিত। চুঁচুড়ায় কয়েকবছর আগেও ওলন্দাজদের একটি প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জা ছিল। বর্তমানে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। চূড়াবিহীন এই গির্জাটি ছিল এক সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন। ওলন্দাজ গভর্নর জি. ভারনেট (G. Vernet) ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন ওলন্দাজ গভর্নর সিটারম্যান এই গির্জার চূড়াটি নির্মাণ করান।[১০] তিনি এটা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। কিন্তু ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ঝড়ে এর চূড়াটি ভেঙে যায়। এই গির্জার ঘন্টাধ্বনি থেকেই পার্শ্ববর্তী ঘাটটির নাম হয় 'ঘন্টাঘাট'। এই ঘন্টাঘাটের পনেরটি সিঁড়ির পরে একটি তুলসী মঞ্চের গায়ে পাথরের ওপর অতি অস্পষ্ট একটি লিপির পাঠোদ্ধার বর্তমান লেখক করেছেন (পাঠোদ্ধারের তারিখ ২১ জুন, ১৯৮২) : 'সন ১১৩২ সাল/১৯ মাগ/শ্রী নৃসিংহদাসস্য'। অর্থাৎ নৃসিংহদাস এই ঘাট ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের (১৯৩৬) বৈশাখে এখানকার বটকৃষ্ণ মল্লিকের সহধর্মিনী কস্তুর মঞ্জরী দাসী এই ঘাটের সংস্কার করান। এই ঘাটের উত্তরদিকে ওলন্দাজ আমলের একটি পরিত্যক্ত ও ভগ্ন জেটির ধ্বংসাবশেষ আছে। চুঁচুড়ায় জেলাশাসকের কার্যালয়টি ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। কাপ্তেন বেল সাহেব এটি নির্মাণ করান। রামহরি সরকার ও শেখ তনু দফাদার এই নির্মাণকার্যে ছিলেন। দ্বিতলে উত্তর দিকের দেওয়ালের একটি লিপি থেকে এটা জানা যায়। লিপিটি যথাযথ (বানান ও সারি যেমন আছে) উদ্ধার করা হ'ল। 'শ্রীজুত কা বেল সাহেবে দ্বারায়/স্মীত/মিস্তি/শ্রীরামহরি সরকার সা চক্রবেড়/শ্রীসেখ তনু দফাদার সা চক্রবেড়/ এই সন ১৮২৯ বা সন ১২৩৬'। অতএব লিপি থেকে বোঝা যাচ্ছে, ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজ শাসন শেষ হলে ইংরেজ শাসন এখানে কায়েম হওয়ার পর এই সৌধটি নির্মিত হয়। কাজেই কোন কোন গ্রন্থে উল্লিখিত এটি ওলন্দাজ শাসকের আবাস ছিল, এই বক্তব্য ঠিক নয়।

চুঁচুড়ার ফুলপুকুর 'মিএগার বেড়ে'র গোরস্তানটি বেশ প্রাচীন। খুব প্রাচীন কয়েকটি সমাধি নষ্ট হয়ে গেছে। তবুও অনেক সমাধিতে লিপি পড়া যায়। কবরস্থানের উত্তর দিকের প্রবেশপথে প্রবেশ করে প্রথমেই হুগলি কলেজের অধ্যাপক এবং চুঁচুড়া চার্চের 'মিনিস্টার' (যাজক) রেভাঃ জেমস গ্রেভ্স এর সমাধি। লিপিটি এই :

> 'Sacred/To the memory of/Revd. JAMES GRAVES, B.A./ Minister of Chinsurah Church/And Professor of English Literature in the/ Hooghly College/born 17th october 1805/ Died 1st April, 1865.'

ওলন্দাজদের কয়েকটি প্রাচীন সমাধিও এখানে আছে। তার দু'একটির লিপি এখানে দেওয়া গেল : 'Hier Rust CORNELIS JOHANNES/VAN NIER OP/A 1793.' অন্য একটি সমাধি ডাচ গভর্নর জর্জ লুই ফার্নেটের বিধবা (Relict) এইচ. এ. বোরওয়াটারের। লিপিটি এখানে উদ্ধার করা হ'ল : 'To the memory of/Mrs. H. A. Borwater/ Relict of the Hon'ble George Louis Vernet/ci-devant director of/the Dutch E.I. Company in Bengal.obit 12th July, 1793.' আর একটি সমাধিলিপি : 'Hier Rust/Mevrouw C.C KLOPPENBURG/ Weduwe Van wwden den Heere/ GREGORIUS HERKLOTS / in beven opperhoold te Kassimbazaar/Obit 9th October 1820 oud 73/jaaren.'

চুঁচুড়ার 'ফিসকাল' (আইন আধিকারিক) গ্রেগরিয়াস হার্কলটস্‌কে এখানেই সমাহিত করা হয় ১৮৫২ সালে। গ্রেভ নং ২৪ এ তাঁর সমাধির ওপর একটি বড়ো লিপিফলক বসানো আছে : 'Beneath this stone lie the mortal remains of GREGORIUS HERKLOTS ESQ FISCAL OF CHINSURAH. He was born at Bremen, January 9th 1768; Arrived at Chinsurah in 1789; Resided there for a period of sixty three years and died May 26th, 1852, Aged 84. Employed in responsible officers by both the Dutch and English Governments, He discharged the duties of public life with unblemished integrity, fidelity and zeal. He rested with this most child like faith upon the promises of the Redeemer and made submission to his master's will the law of his life......

This memorial of his excellence is raised by the grateful affection of his surviving children."

চুঁচুড়া খাদিনা মোড়ের কিছু দক্ষিণে জি.টি. রোডের ধারে একটি উচ্চ সমাধিস্তম্ভ 'সাতবিবির সমাধি' নামে পরিচিত। এটি ইন্দো ডাচ স্থাপত্যের এক সুন্দর নিদর্শন বলে কেউ কেউ মনে করেন।[১১] সমাধিস্তম্ভটির দ্বিতলের কার্নিশের নীচে লিপিটি এখানে উদ্ধার করা হ'ল :

'MARIA • YEATS • C. E. BOORE • VERKERK • OBIIT • 12 MAY • ANNO 1809 – SUSANNA • ANNA'। (সরেজমিন অনুসন্ধানে লিপিটি এখানে যথাযথ উদ্ধার করা গেল।) কেউ কেউ এটি সুসানা আন্না মারিয়ার সমাধি বলে মনে করেন।[১২] কিন্তু লিপিটি দেখলে বোঝা যায়, আলাদা আলাদা করে এখানে চারজন য়ুরোপীয়ের নাম আছে যাঁরা ১২মে ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। সম্ভবত সুসান্না ও আন্না নামে দুই মহিলা এঁদের উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন।

এ প্রসঙ্গে চুঁচুড়ার দু'একটি মসজিদ পুরাকীর্তির প্রসঙ্গ এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। 'মতিঝিল' এলাকায় একটি মসজিদ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মসজিদটি সুদৃশ্য। চতুষ্কোণ দালানের চারকোণে চারটি গম্বুজ ও মাঝখানে একটি বড় গম্বুজ। মসজিদটি দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত। মূল প্রার্থনা গৃহের চারপাশে একটি প্রদক্ষিণপথ (Circumambulatory Passage) প্রতিদিকের বারান্দায় পাঁচটি করে দ্বার থাকায় মোট দ্বারের সংখ্যা কুড়ি। গর্ভগৃহের প্রবেশপথের ওপরের দেওয়ালে ফারসী লিপি লক্ষ করা যায়। সামনে কবরস্থান কিন্তু পাঠোদ্ধার না হওয়ায় প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় নি। বারান্দার বাইরের ওপরের দেওয়ালে অপর আর একটি লিপি সম্ভবত সংস্কারকালীন প্রাচীন লিপিটি প্রতিষ্ঠাকালের বলেই অনুমান। মসজিদের ঠিক পশ্চিমপাশে 'মক্কাপুকুর'। একটি প্রাচীন ঘাটও আছে। এক্সময় এর জল ভক্তেরা পবিত্র জ্ঞানে গ্রহণ করত। 'মক্কাপুকুরে'র ঠিক পশ্চিমে বিশাল 'মতিঝিল'। বর্তমান লেখকের এই তথ্য সংগ্রহ আজ থেকে প্রায় তেইশ বছর আগের (১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৭)। জানা যায়, চুঁচুড়ার জমিদার নসরৎউল্লা খাঁনের সময় মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি লর্ড ক্লাইভের পূর্ববর্তী ছিলেন বলে জানা যায়। নসরৎউল্লা বিস্তীর্ণ এলাকার জমিদার ছিলেন। ইংরেজরা জয়লাভ ক'রে তাঁর জমিদারী কেড়ে নেয়।

চুঁচুড়ার জোড়াঘাট লেনে তিন গম্বুজ এক প্রাচীন মসজিদ আছে। মসজিদের পেছনের অংশ প্রাচীন, তবে সামনের অংশ পরবর্তীকালের মনে হয়। মূল মসজিদের দেওয়ালে একটি প্রাচীন ফারসী লিপি বর্তমান। জানা যায়, মসজিদটি বর্ধমানের রাজা তেজচাঁদের সময়ের (১৭৭০ - ১৮৩২ খ্রি:)। মসজিদটির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য হ'ল, গর্ভগৃহের ছাদ তিনটি বড়ো খিলানের ওপর ভল্টে গঠিত। দেওয়ালে তিনটি কুলুঙ্গী বা 'মিহরাব'। মাঝের মিহরাবের কাছে দাঁড়িয়ে পুরোহিত নমাজ পড়েন। জানা যায়, মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর এই মসজিদের জন্যে কিছু পীরোত্তর সম্পত্তি দান করেন। মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা ও তৎসমসাময়িক কিছু ব্যক্তির কবর মসজিদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে বর্তমান।

শ্রীরামপুরে দিনেমারদের শাসনকালে (১৭৫৬ - ১৮৪৫ খ্রি.) দুটি গির্জা রোমান ক্যাথলিক ও সেন্ট ওলাফ গির্জা তৈরি হয়। ক্যাথলিক গির্জাটি ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে এবং সেন্ট ওলাফ গির্জা ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়। শ্রীরামপুর কোর্টের পার্শ্ববর্তী এই সেন্ট ওলাফ গির্জাটি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য। সামনের বারান্দা চারটি 'গথিক' রীতির জোড়া থামের ওপর ন্যস্ত। ওপরে ছাদের নীচে ত্রিকোণ 'পেডিমেন্ট'। ওপরের চূড়াটি দ্বিতল ও ক্রমসূক্ষ্ম হয়ে শীর্ষে মিলিত হয়েছে।

স্টেশনের নিকটবর্তী দিনেমারদের কবরখানায় বিখ্যাত উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সমাধি আছে।

হুগলিতে প্রাচীন গড়ের মধ্যে গড় মান্দারণের নাম উল্লেখযোগ্য। একটি উঁচু ঢিবি ও নীচে আমোদর নদী ছাড়া এই বিশালগড়ের এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অবশ্য আশপাশে কিছু ধ্বংসস্তূপও লক্ষ করা যায়। ঢিবির চারপাশে মাটির উঁচু প্রাচীর আছে। আগে চারপাশ পরিখাবেষ্টিত ছিল। দীর্ঘকাল তা ধানক্ষেতে পরিণত। গড়ের পূবদিকে বয়ে যাওয়া ছোট্ট আমোদর নদী এককালে প্রাকৃতিক পরিখার কাজ ক'রত। ঢিবির ওপরে ইসমাইল খাঁ গাজীর কবর। মান্দারণের পুরাণো নাম 'অপর-মন্দার'। ওড়িশার গঙ্গাবংশীয় রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ এই মন্দাররাজ্যের রাজধানী আরম্যনগরী জয় করেছিলেন। গড় মান্দারণ সেই রাজধানী ও আরামবাগ আরম্যনগরী ছিল। বর্তমান গড়ের ধ্বংসস্তূপের উচ্চতা প্রায় চল্লিশ ফুট। এই স্তূপের নীচের চারদিক মাকড়াপাথরে এবং ওপরের অংশ ইঁট দিয়ে তৈরি। মুঘল আমলে আকবরের সময় এই স্থানের নাম সরকার মান্দারণ হয়েছিল। ইসমাইল গাজী সুলতান হোসেন শাহের সময়ে (১৪৯৩ - ১৫১৯) বর্তমান ছিলেন। তিনি একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ। ঢিবির ওপর তাঁর সমাধিটি 'বড় আস্তানা' নামে পরিচিত। গড়ের কাছাকাছি প্রাচীন বাদশাহী রাস্তা অনেক

ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী।

ওপরের আলোচনায় হুগলি জেলার অল্প কিছু পুরাকীর্তির বিবরণী উপস্থিত করা হ'ল। এ ছাড়া, আরও বহু মঠ মন্দির মসজিদ দুর্গ এই জেলার গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে আছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এদের পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়। এগুলি থেকে পশ্চিমবাংলার এই অঞ্চলে প্রাচীন কাল থেকে সমৃদ্ধির সূচনা কতটা হয়েছিল, তা অনুমান করা যায়। মধ্যযুগে এই অঞ্চলে ঐতিহাসিক ঘটনা হ'ল, সপ্তগ্রাম বন্দরের অভ্যুদয়, মুসলমান আক্রমণ এবং বহিরাগত বিদেশী যুরোপীয় শক্তিগুলির ভাগীরথী সংলগ্ন অঞ্চলে আধিপত্য লাভের প্রয়াস। এসব ঘটনা বাংলার ইতিহাসকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল।

সূত্রনির্দেশ

১. ভট্টাচার্য নরেন্দ্রনাথ, হুগলি জেলার পুরাকীর্তি, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি জেলা সংখ্যা, ১৪০০, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃ: ৪৫।

২. ভট্টাচার্য নরেন্দ্রনাথ, হুগলি জেলার পুরাকীর্তি, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, প: ব: সরকার, ১৯৯৩ পৃ: ১১৩।

৩. ননীগোপাল মজুমদারের 'আর্কিওলজিক্যাল সারভে রিপোর্ট' ১৯৩৬ 'The village of Mahanad in the Hooghly district has form time to time yielded gots coins of Kushana and Gupta dynasties and its antiquity is proved also by the numerous mounds situated in this village and its neighbourhood as well as by fragments of stone sculptures that lie scattered all over the locality.' (ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃ. ১১৩)

৪. ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, ১৯৭৮, পৃ. ৩২৬।

৫. ভট্টাচার্য বিধুভূষণ, হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস (পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ৭১।

৬. মুখার্জি আর কে., হিস্টরি অব্ ইন্ডিয়ান পিপিল, পৃ. ১৬১ দ্রষ্টব্য. ভট্টাচার্য বিধুভূষণ ৭১।

৭. মিত্র সুধীরকুমার, হুগলি জেলার দেবদেউল প্রথম অপর্ণা সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ. ১৬৩।

৮. ভট্টাচার্য নরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।

৯. মিত্র, পৃ. ১৭১।

১০. ব্রাউন পার্সি, ইন্ডিয়ান আরকিটেকচার (ইসলামিক পিরিয়ড), ১৯৭৫, পৃ. ৩৫।

১১. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, হিস্টরি অব্ মেডিইভাল বেঙ্গল, ১৯৭৪, পৃ. ৪২।

১২. ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, বাংলার তীর্থ, পৃ. ৮৬ - ৮৭।

১৩. মিত্র সুধীরকুমার পৃ. ১৫৯।

১৪. মিত্র পৃ. ১৬০।

১৫. মিত্র পৃ. ১৬৩।

১৬. খানসাহিব, এম. আবিদ আলি খান, 'মেমোয়ার্স অব্ গৌড় অ্যান্ড পাণ্ডুয়া' রিপ্রিন্ট, প: ব: সরকার, ১৯৮৬, উদ্ধৃতি, 'It seems to the author that he building is of the time of the Hindu kings (possibly Raja Kans) and that it was used for a temple. An arrangement for hanging a chain and bell by an iron hook in the central part of the ceiling is still visible and the building itself lies north to the south. There are door openings on three sides only. From all these facts, it may be concluded that a Hindu god was worshipped here.' দ্রষ্টব্য, রায়, প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, ১৯৯৯, পৃ. ২৭।

১৭. রায়, প্রণব, তদেব, পৃ. ২৭।

১৮. ভট্টাচার্য নরেন্দ্রনাথ পৃ. ১০৬।

এ প্রসঙ্গে চুঁচুড়ার দু'একটি মসজিদ পুরাকীর্তির প্রসঙ্গ এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। 'মতিঝিল' এলাকায় একটি মসজিদ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মসজিদটি সুদৃশ্য। চতুষ্কোণ দালানের চারকোণে চারটি গম্বুজ ও মাঝখানে একটি বড় গম্বুজ। মসজিদটি দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত। মূল প্রার্থনা গৃহের চারপাশে একটি প্রদক্ষিণপথ (Circumambulatory Passage) প্রতিদিকের বারান্দায় পাঁচটি করে দ্বার থাকায় মোট দ্বারের সংখ্যা কুড়ি। গর্ভগৃহের প্রবেশপথের ওপরের দেওয়ালে ফারসী লিপি লক্ষ করা যায়। সামনে কবরস্থান কিন্তু পাঠোদ্ধার না হওয়ায় প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় নি। বারান্দার বাইরের ওপরের দেওয়ালে অপর আর একটি লিপি সম্ভবত সংস্কারকালীন প্রাচীন লিপিটি প্রতিষ্ঠাকালের বলেই অনুমান। মসজিদের ঠিক পশ্চিমপাশে 'মক্কাপুকুর'। একটি প্রাচীন ঘাটও আছে। একসময় এর জল ভক্তেরা পবিত্র জ্ঞানে গ্রহণ করত। 'মক্কাপুকুরে'র ঠিক পশ্চিমে বিশাল 'মতিঝিল'। বর্তমান লেখকের এই তথ্য সংগ্রহ আজ থেকে প্রায় তেইশ বছর আগের (১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৭)। জানা যায়, চুঁচুড়ার জমিদার নসরৎউল্লা খাঁনের সময় মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি লর্ড ক্লাইভের পূর্ববর্তী ছিলেন বলে জানা যায়। নসরৎউল্লা বিস্তীর্ণ এলাকার জমিদার ছিলেন। ইংরেজরা জয়লাভ ক'রে তাঁর জমিদারী কেড়ে নেয়।

চুঁচুড়ার জোড়াঘাট লেনে তিন গম্বুজ এক প্রাচীন মসজিদ আছে। মসজিদের পেছনের অংশ প্রাচীন, তবে সামনের অংশ পরবর্তীকালের মনে হয়। মূল মসজিদের দেওয়ালে একটি প্রাচীন ফারসী লিপি বর্তমান। জানা যায়, মসজিদটি বর্ধমানের রাজা তেজচাঁদের সময়ের (১৭৭০ - ১৮৩২ খ্রি.)। মসজিদটির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য হ'ল, গর্ভগৃহের ছাদ তিনটি বড়ো খিলানের ওপর ভল্টে গঠিত। দেওয়ালে তিনটি কুলুঙ্গী বা 'মিহরাব'। মাঝের মিহরাবের কাছে দাঁড়িয়ে পুরোহিত নমাজ পড়েন। জানা যায়, মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর এই মসজিদের জন্যে কিছু পীরোত্তর সম্পত্তি দান করেন। মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা ও তৎসমসাময়িক কিছু ব্যক্তির কবর মসজিদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে বর্তমান।

শ্রীরামপুরে দিনেমারদের শাসনকালে (১৭৫৬ - ১৮৪৫ খ্রি.) দুটি গির্জা রোমান ক্যাথলিক ও সেন্ট ওলাফ গির্জা তৈরি হয়। ক্যাথলিক গির্জাটি ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে এবং সেন্ট ওলাফ গির্জা ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়। শ্রীরামপুর কোর্টের পার্শ্ববর্তী এই সেন্ট ওলাফ গির্জাটি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য। সামনের বারান্দা চারটি 'গথিক' রীতির জোড়া থামের ওপর ন্যস্ত। ওপরে ছাদের নীচে ত্রিকোণ 'পেডিমেন্ট'। ওপরের চূড়াটি দ্বিতল ও ক্রমসূক্ষ্ম হয়ে শীর্ষে মিলিত হয়েছে।

স্টেশনের নিকটবর্তী দিনেমারদের কবরখানায় বিখ্যাত উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সমাধি আছে।

হুগলিতে প্রাচীন গড়ের মধ্যে গড় মান্দারণের নাম উল্লেখযোগ্য। একটি উঁচু ঢিবি ও নীচে আমোদর নদী ছাড়া এই বিশালগড়ের এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অবশ্য আশপাশে কিছু ধ্বংসস্তূপও লক্ষ করা যায়। ঢিবির চারপাশে মাটির উঁচু প্রাচীর আছে। আগে চারপাশ পরিখাবেষ্টিত ছিল। দীর্ঘকাল তা ধানক্ষেতে পরিণত। গড়ের পুবদিকে বয়ে যাওয়া ছোট্ট আমোদর নদী এককালে প্রাকৃতিক পরিখার কাজ করত। ঢিবির ওপরে ইসমাইল খাঁ গাজীর কবর। মান্দারণের পুরাণো নাম 'অপর-মন্দার'। ওড়িশার গঙ্গাবংশীয় রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ এই মন্দাররাজ্যের রাজধানী আরম্যনগরী জয় করেছিলেন। গড় মান্দারণ সেই রাজধানী ও আরামবাগ আরম্যনগরী ছিল। বর্তমান গড়ের ধ্বংসস্তূপের উচ্চতা প্রায় চল্লিশ ফুট। এই স্তূপের নীচের চারদিক মাকড়াপাথরে এবং ওপরের অংশ ইঁট দিয়ে তৈরি। মুঘল আমলে আকবরের সময় এই স্থানের নাম সরকার মান্দারণ হয়েছিল। ইসমাইল গাজী সুলতান হোসেন শাহের সময়ে (১৪৯৩ - ১৫১৯) বর্তমান ছিলেন। তিনি একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ। ঢিবির ওপর তাঁর সমাধিটি 'বড় আস্তানা' নামে পরিচিত। গড়ের কাছাকাছি প্রাচীন বাদশাহী রাস্তা অনেক

ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী।

ওপরের আলোচনায় হুগলি জেলার অল্প কিছু পুরাকীর্তির বিবরণী উপস্থিত করা হ'ল। এ ছাড়া, আরও বহু মঠ মন্দির মসজিদ দুর্গ এই জেলার গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে আছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এদের পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়। এগুলি থেকে পশ্চিমবাংলার এই অঞ্চলে প্রাচীন কাল থেকে সমৃদ্ধির সূচনা কতটা হয়েছিল, তা অনুমান করা যায়। মধ্যযুগে এই অঞ্চলে ঐতিহাসিক ঘটনা হ'ল, সপ্তগ্রাম বন্দরের অভ্যুদয়, মুসলমান আক্রমণ এবং বহিরাগত বিদেশী যুরোপীয় শক্তিগুলির ভাগীরথী সংলগ্ন অঞ্চলে আধিপত্য লাভের প্রয়াস। এসব ঘটনা বাংলার ইতিহাসকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল।

সূত্রনির্দেশ

১. ভট্টাচার্য নরেন্দ্রনাথ, হুগলি জেলার পুরাকীর্তি, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি জেলা সংখ্যা, ১৪০৩, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃ: ৪৫।

২. ভট্টাচার্য নরেন্দ্রনাথ, হুগলি জেলার পুরাকীর্তি, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, প: ব: সরকার, ১৯৯৩ পৃ: ১১৩।

৩. ননীগোপাল মজুমদারের 'আর্কিওলজিক্যাল সারভে রিপোর্ট' ১৯৩৩ 'The village of Mahanad in the Hooghly district has form time to time yielded gots coins of Kushana and Gupta dynasties and its antiquity is proved also by the numerous mounds situated in this village and its neighbourhood as well as by fragments of stone sculptures that lie scattered all over the locality.' (ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃ. ১১৩)

৪. ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, ১৯৭৮, পৃ. ৩২৬।

৫. ভট্টাচার্য বিধুভূষণ, হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস (পরিবর্তিত চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ৭১।

৬. মুখার্জি আর কে., হিস্টরি অব্ ইন্ডিয়ান শিপিং, পৃ. ১৬১ দ্রষ্টব্য, ভট্টাচার্য বিধুভূষণ ৭১।

৭. মিত্র সুধীরকুমার, হুগলি জেলার দেবদেউল, প্রথম অপর্ণা সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ. ১৬৩।

৮. ভট্টাচার্য নরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।

৯. মিত্র, পৃ. ১৭১।

১০. ব্রাউন পার্সি, ইন্ডিয়ান আরকিটেকচার (ইসলামিক পিরিয়ড), ১৯৭৫, পৃ. ৩৫।

১১. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, হিস্টরি অব্ মেডিইভাল বেঙ্গল, ১৯৭৪, পৃ. ৪২।

১২. ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, বাংলার তীর্থ, পৃ. ৮৬ - ৮৭।

১৩. মিত্র সুধীরকুমার পৃ. ১৫৯।

১৪. মিত্র পৃ. ১৬৩।

১৫. মিত্র পৃ. ১৬৩।

১৬. খানসাহিব, এম. আবিদ আলি খান, 'মেমোয়ার্স অব্ গৌড় অ্যান্ড পাণ্ডুয়া' রিপ্রিন্ট, প: ব: সরকার, ১৯৮৬, উদ্ধৃতি, 'It seems to the author that he building is of the time of the Hindu kings (possibly Raja Kans) and that it was used for a temple. An arrangement for hanging a chain and bell by an iron hook in the central part of the ceiling is still visible and the building itself lies north to the south. There are door openings on three sides only. From all these facts, it may be concluded that a Hindu god was worshipped here.' দ্রষ্টব্য, রায়, প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, ১৯৯৯, পৃ. ২৭।

১৭. রায়, প্রণব, তদেব, পৃ. ২৭।

১৮. ভট্টাচার্য নরেন্দ্রনাথ পৃ. ১০৬।

১৯. মিত্র, পৃ. ৮৪।

২০. 'লিস্ট অভ্ অ্যানসেন্ট মনুমেন্টস ইন বেঙ্গল' (গভর্নমেন্ট অভ্ বেঙ্গল) ১৮৯৬।

উদ্ধৃতি : 'Chinsurah Church - Dutch now English Church. This Church was erected in A.D. 1763 by G. Vernet, Then attached Governor entirely out of his own means. The steeple had been previously constructed by Mr. Schittermann in 1744 who was Governor at that time.'

দ্রষ্টব্য, মিত্র, পৃ. ১৮০।

২১. ভট্টাচার্য, পৃ. ৭২।

২২. ভট্টাচার্য, পৃ. ৭২।

(এই প্রবন্ধের বেশির ভাগ তথ্যই সরেজমিন অনুসন্ধানে সংগৃহীত হয়েছে।)

সহায়কগ্রন্থ

ম্যাক্‌কাচ্চন, ডেভিড - লেট মেডিইভাল টেম্পলস অভ্ বেঙ্গল, এসিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২, মিশেল, জর্জ (সম্পাদিত), ব্রিক টেম্পলস অভ্ বেঙ্গল, ১৯৮৩।

রায়, প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, ১৯৯৯।

ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, ১৯৭৮।

প্রবন্ধ

রায়, প্রণব, বাঙালির স্থাপত্যচর্চা : প্রাচীন ও মধ্যযুগ, ইতিহাস অনুসন্ধান ১৩।

রায়, প্রণব, মধ্যযুগের বাংলায় টেরাকোটাশিল্পের নতুন ধারা, ইতিহাস অনুসন্ধান, পৃ. ৯০ - ১০৮ পৃ. ১৮৪ - ১৯১।

সংযোজন : ভূপতিরঞ্জন দাস

ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজীর দরগা ও মসজিদ্

এই ত্রিবেণী এলাহাবাদের নিকটস্থ বিখ্যাত হিন্দু তীর্থ ত্রিবেণী নয়। এটি ভাগীরথী ও তার শাখানদী অধুনালুপ্ত যমুনা ও লুপ্তপ্রায় সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল। অবস্থান হুগলী জেলার সদর শহর চুঁচুড়ার মাত্র পাঁচ মাইল উত্তরে।

একদা বিভিন্ন ধর্মের তীর্থ ত্রিবেণী বর্তমানে তীর্থের চেয়েও তার বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র বা থার্মালপ্লান্টের জন্য অধিকতর পরিচিত।

জাফর খাঁর আস্তানা ও মসজিদের অবস্থান ভাগীরথীর তীরে লুপ্তপ্রায় সরস্বতী নদীর উপরে নোতুন তৈরী পুলের ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বেই। জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের ১৯২০ সালের ৬ষ্ঠ ভল্যুমে প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যায়, '৬৯৮ হিজরায় (১২৯৮ খ্রি.) জাফর খাঁ গাজী এই ত্রিবেণী মসজিদ নির্মাণ করেন; এই মসজিদটি বর্তমানে অবিভক্ত বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ।'

এই মসজিদের নির্মাণ কর্তা জাফর খাঁ -কে নিয়ে সাধারণ মানুষ, এমন কি ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। এই মসজিদ নির্মাণ করেন গাজী জাফর খাঁ। ঐ ঘটনার পনের বছর পর সাহাবুদ্দিন জাফর খাঁ এই আস্তানার অদূরে দার উল খয়রাৎ নামে ইষ্টক নির্মিত একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। কালের প্রভাবে ঐ মাদ্রাসা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অনেকেই এই দুই জাফর খাঁকে একই ব্যক্তি মনে করতেন। এটি ভুল বলে প্রমাণ করেন আচার্য যদুনাথ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসের দ্বিতীয় খন্ডে।

ত্রিবেণী পাল যুগের আগে থেকেই বৌদ্ধ তীর্থ হিসাবে গণ্য ছিল। সেই সময়ে ত্রিবেণীতে পাথরে গড়া বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত উপন্যাস বেনের মেয়ে এবং Literary History of Pala Period প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ত্রিবেণী সপ্তগ্রামকে কেন্দ্র করে রাঢ় অঞ্চলে দশম শতাব্দী থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মের প্রভাব বাড়তে থাকে এবং বৌদ্ধরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ঐ সময় থেকে ত্রিবেণীতে বহু হিন্দু মন্দির গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। মহীপালের রাজত্বকালে (৯৮৮-১০৩৮) রাজেন্দ্র চোল ত্রিবেণী পর্যন্ত জয় করেন। সেন রাজত্ব কালে হিন্দু প্রভাব আরও বেড়ে যায়। সম্ভবত: ঐ সময়ে আলোচ্য স্থানে একটি বৃহৎ বিষ্ণুমন্দির গড়ে ওঠে। ত্রয়োদশ শতকে উড়িষ্যা রাজ মুকুন্দদেব ত্রিবেণী অঞ্চল জয় করেন ও ত্রিবেণীর জগন্নাথ ঘাট নির্মাণ করেন। তিনি সরস্বতীর দক্ষিণতীরে বিষ্ণু মন্দিরের পাশে একটি সূর্যমন্দিরও (রেখ দেউল) নির্মাণ করেন।

ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, পাণ্ডুয়া, মহানাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ছোট ছোট হিন্দু সামন্ত রাজারা স্বাধীন রাজাদের মতো রাজত্ব করতেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে এই অঞ্চলে মুসলমান অভিযান আরম্ভ হয়। ত্রিবেণীর মান রাজার বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব দেন ধর্মপ্রচারক জাফর খাঁ গাজী। মান রাজা পরাজিত হন ও ধর্মান্তর গ্রহণ করেন। এরপর মহানাদের ভূদেব নৃপতির সঙ্গে জাফর খাঁ গাজী ও তার অনুগামীদের প্রচন্ড যুদ্ধ হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৪৭ সালের মে মাসের জার্নালে মনি সাহেব (D. Money) প্রকাশিত কুরসীনামা থেকে জানা যায় যুদ্ধক্ষেত্রেই জাফর খাঁ নিহত হন। যুদ্ধক্ষেত্রে তার ছিন্ন মুন্ড পড়ে থাকে। দেহটি ত্রিবেণীতে এই আস্তানায় সমাধিস্থ করা হয়।

'বীরভূম গাথা' গ্রন্থে দেখা যায় রামপুরহাটের তিন মাইল দূরে মাড়গ্রামে গাজী জাফর খাঁর মুন্ডের সমাধি আছে :

"ত্রিস্রোতা তীরে গাজী মারা যায় ছিন্ন মুন্ড খুঁজিয়া না পায়
ভগিনী তাহার করে হায় হায় দেহখানি নিয়ে কোলে
মাড়গ্রামে সেই গাজীর সমাধি দাঁড়ায়ে রয়েছে একাল অবধি..."

আচার্য যদুনাথ মনে করেন জাফর খাঁর পুত্র উলুগ খাঁ ও ভূদেব নৃপতির কাছে যুদ্ধে পরাজিত হন। তখন শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ্ সাহাবুদ্দিন জাফর খাঁ নামে এক সেনাপতিকে পাঠান। তিনি হিন্দু রাজাদের পরাজিত করে ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম অঞ্চলে মুসল মান শাসন প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী করেন।

গাজী জাফর খাঁর ভাই বড়খা গাজী ও জাফরের বংশধরেরা বহুকাল পর্যন্ত ঐ আস্তানা ও মসজিদের খাদেম ছিলেন। তারা মুসলমান শাসকদের কাছ থেকে সাহায্য, সুযোগ ও শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন। এঁরা হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ, অন্যধর্মের মন্দিরাদি ভেঙে তার মালমশলা দিয়ে মসজিদ, আস্তানা নির্মাণ করাকে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে মনে করতেন।

ঐতিহাসিকেরা ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজীর আস্তানাটিকে — 'মুসলিম উৎকীর্ণ লিপি ও হিন্দু স্থাপত্যের এক মিশ্র প্রদর্শনশালার (A mixed museum of Muslim epigraphy and of Hindu sculpture) সুন্দর নিদর্শন বলে মনে করেন।

উচু বিশাল ভূখণ্ডের উপর আস্তানা ও মসজিদের অবস্থান। আস্তানাটির দুটি ভাগ। পশ্চিম ভাগে জাফর খাঁ গাজী, তার ছেলে ও পুত্রবধূর সমাধি, পূর্বভাগে বড়খাঁ গাজি ও তার পুত্রেরা সমাধিস্থ। একটু দূরে পশ্চিম দিকে মসজিদ প্রাঙ্গণে স্তূপাকারে পড়ে আছে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মঠ মন্দিরের ভগ্ন অংশ ও প্রস্তরাদি। আস্তানার ভিত পর্যন্ত প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরের গঠন অক্ষত রয়েছে স্পষ্ট বোঝা যায়। উপরে দেওয়াল গাঁথা হয়েছে কিন্তু উপরে কোন ছাদ নেই। চারটি দরজাতেই হিন্দু ভাস্কর্যের ছড়াছড়ি। নিচের দিকে মূল গাঁথনির গায়ে গাঁথা হয়ে আছে দেবী ও যক্ষমূর্তি, বাইরের দেওয়ালে সারি সারি বিষ্ণুমূর্তি, নবগ্রহ মূর্তি। বেশ বোঝা যায় অন্য মন্দির ভেঙে যেমন যেমন হাতের কাছে পাওয়া গেছে তাড়াহুড়া করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ মূর্তি উল্টানো। কী আস্তানা কী মসজিদ কোনটি গাঁথবার আগে কোন সামঞ্জস্য করার চেষ্টা হয় নি। অবিন্যস্ত গাঁথুনি। বড় বড় দেব দেবী মূর্তি গুলি উল্টিয়ে গেঁথে তার উপর লিপিও উৎকীর্ণ করা হয়েছে। লিপি ও মূর্তি দেখে বোঝা যায় আস্তানাটি আদিতে ছিল বিষ্ণু মন্দিরের গর্ভকক্ষ, ভিত অক্ষুন্ন রেখে আস্তানা গড়া হয়েছে।

মূল ভিত্তি গাত্রে চক্রচিহ্ন ও মসজিদের স্তম্ভগাত্রে ভূমি স্পর্শ মুদ্রা বিশিষ্ট খোদিত বুদ্ধ মূর্তি দেখে অনেকে মনে করেন একদা বৌদ্ধ মঠের পাথর সংগৃহীত হয়েছিল বিষ্ণুমন্দির গড়ার জন্য। পরে সবই আস্তানা ও মসজিদে ব্যবহৃত হয়েছে বা প্রাঙ্গণে পড়ে আছে।

জাফর খাঁ গাজীর আস্তানা, মসজিদ দেখে ও আঙ্গিনার মধ্যে প্রোথিত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞপ্তি পড়ে বোঝা গেল অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভাঙা, এক ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা অন্যধর্মের ধর্মস্থানে আঘাত করা কোন নোতুন ঘটনা নয়। হিন্দুরা বৌদ্ধ মঠ ভেঙে মন্দির বানিয়েছে, মুসলমানরা হিন্দু মন্দির ভেঙে মসজিদ বানিয়েছে। কোনো ধর্মই দুর্বলের ধর্মস্থান নষ্ট করে নিজেদের প্রাধান্য জাহির করতে দ্বিধা করে নি।

যখন বৌদ্ধ মতবাদ দুর্বল, সবল মৌলবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদীরা চেয়েছে বৌদ্ধ মঠের পাথর কেড়ে আনো, গড়ব বিষ্ণু মন্দির। যখন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা হল দুর্বল; সবল ইসলাম, বৌদ্ধ, হিন্দু মঠ মন্দিরের রূপান্তর করে গড়তে চাইল মুসলমান আস্তানা মসজিদ।

এক কথায় যে কোনও ধর্মের মৌলবাদী হলে সে চায় গৃধঃ অপর ধর্মস্য ধনম্ কিন্তু বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের মত প্রকৃত ধর্মমতাবলম্বীর কাছে —

'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং .... মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্

মৌলবাদমুক্ত মনে জাফর খাঁ গাজীর দরগায় দাঁড়িয়ে প্রশস্ত ভাগীরথীর উদার বক্ষের দিকে তাকালে উপলব্ধি ঘটে; মঠ, মন্দির, দরগা, মসজিদ, গির্জা, গোম্ফা সবই সেই এক পরম পিতার উদ্দেশ্যে গড়া। এর যে কোনটার গায়ে আঘাত হানার অর্থ আমারই স্রষ্টার উদ্দেশ্যে আঘাত করা।



হুগলি : কাঠের কাজ

তারাপদ সাঁতরা

ভারতের নানাস্থানে নির্মিত দারু ভাস্কর্যের যে সব নিদর্শন দেখা যায়, সেগুলি যে দীর্ঘদিনের ধারাবাহিকতা বহন করে চলেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অনুরূপ বাংলাতেও যে কাষ্ঠশিল্পের ঐতিহ্য দীর্ঘদিন ধরে বর্তমান ছিল তা অবিভক্ত বাংলার নানা স্থানের দারুশিল্পের দিকে দৃষ্টি দিলে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। বিধ্বংসী অগ্নিকান্ড ও বন্যার প্লাবন এবং পোকামাকড়ের উপদ্রব ইত্যাদি নানা কারণে বাংলার প্রাচীন নিদর্শনের সম্পূর্ণ আজ আর অবশিষ্ট নেই। তাহলেও বাংলার দারু শিল্পের ঐতিহ্য যে একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়, তা বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংগৃহীত এই ধরনের কাঠের কাজগুলি থেকে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

প্রাচীনকালের কথা ছেড়ে দিলেও দারু-ভাস্কর্যের এই ধারাটি খ্রিস্টীয় সতের শতক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত যে অব্যাহত ছিল তার বেশ কিছু উদাহরণ রয়েছে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানের দেব বিগ্রহ, কাঠের রথ, চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দিরদ্বার প্রভৃতির বিবিধ অলংকরণে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আজও যেসব নিদর্শন অব্যাহত রয়েছে, তার মধ্যে হুগলি জেলার মত ছোট একটি জেলায় এই কাঠের কাজের ঐতিহ্য একান্তই উল্লেখযোগ্য।

বাংলার চিরায়ত এই কৃষ্টির উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাওয়া যেতে পারে হুগলি জেলার দুটি চণ্ডীমণ্ডপের দারু-ভাস্কর্যে। এর মধ্যে একটি হল আঁটপুরে (থানা - জাঙ্গীপাড়া) ও অন্যটি হল শ্রীপুরে (থানা : বলাগড়)। আঁটপুরের যোড়ো দোচালা চণ্ডীমণ্ডপটিতে আছে কাঠের অলংকৃত আটটি থাম। আর ঐ থামগুলির গায়ে নিবদ্ধ রয়েছে ফুল লতাপাতার অলংকরণযুক্ত কাঠের ব্র্যাকেট, যা শিল্পীদের পরিভাষায় 'গুঁড়ো' নামে খ্যাত। এ ছাড়া ঐ থামের উপর নিবদ্ধ হয়েছে আড়াআড়ি লাগানো আটটি খোদাই করা কড়ি এবং ঐ কড়ির সামান্য উপরে প্রয়োজনীয় খুঁটি সহযোগে ঐ একই ভাবে রাখা হয়েছে সমান্তরাল কড়ি। ঐ খুঁটিগুলিকে বলা হত 'বোঠে'। কড়ি ও খুঁটি বা 'বোঠে' গুলির উপর খোদাই করা হয়েছে ফুল-লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা। কিন্তু স্তম্ভশীর্ষে ও কড়ি-বরগার জোড়ের মুখে খোদাই কাঠের পূর্ণাবয়ব যে সব দেবদেবীমূর্তি নিবদ্ধ হয়েছিল, সেগুলিই ছিল এই চণ্ডীমণ্ডপটির শ্রেষ্ঠ অলংকরণ, সে সব মূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, কৃষ্ণ-রাধা, শিব-পার্বতী-গণেশ, দুর্গা-কালী-জগদ্ধাত্রী, ব্রহ্মা-ইন্দ্র-নারায়ণ, এ ছাড়া ময়ূর কোলে সুন্দরী বা সাহেব ও মেম মূর্তিরও অভাব নেই, এখানের এই চণ্ডীমণ্ডপের উৎকর্ষ বর্তমানকালের যে কোন দর্শককেই মুগ্ধ করবে।

হুগলির আঁটপুরের এই চণ্ডীমণ্ডপের মত শ্রীপুরেও মিত্র-মুস্তৌফীদের একটি চণ্ডীমণ্ডপ আছে। এটিও দোচালা, তবে বর্তমানে খড়ের চালের বদলে টিন দিয়ে চাল ছাইবার দরুণ মণ্ডপটির

সৌন্দর্য বহুলাংশে ব্যাহত। কিন্তু তা হলেও এখানের কাঠের নানা অলংকরণগুলিতে সেই প্রথাগত তক্ষণ শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেও কাঠের থামের গায়ে এবং সেইসঙ্গে কড়িতে খোদাই করা হয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ও বিশেষভাবে কৃষ্ণলীলার কাহিনী। কিন্তু দুঃখের কথা, বাঙ্গালী দারুশিল্পীদের কৃত এই অপূর্ব কাজের নিদর্শন আজ যেভাবে অবহেলা ও অযত্নে রয়েছে তার ফলে খুব শীঘ্রই যে এটি অবলুপ্তির পথে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্তত যেভাবে ঐ হুগলি জেলার সোমরার দেওয়ান রামচন্দ্র সেনের নির্মিত এই ধরনের একটি চণ্ডীমণ্ডপ আজ বিলুপ্ত হয়ে কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

আঁটপুর বা শ্রীপুরের মত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়াও হুগলি জেলায় আর একটি চণ্ডীমণ্ডপ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ চণ্ডীমণ্ডপটি হল ধনিয়াখালি থানার কাঁকড়াকুলি গ্রামে অবস্থিত। এক সময়ে এই খড়ো দোচালা চণ্ডীমণ্ডপটির খুঁটি ও কড়ি-বরগায় বেশ কিছু অলংকরণ ছিল। বর্তমানে ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এটির থাম ও কড়ি-বরগায় কিছু কিছু ফুলকারি নকসার অংলকরণ মাত্র দেখা যায়। এ ছাড়া হুগলি জেলার অন্যত্র হয়ত আরও অনেক দারু-ভাস্কর্যশোভিত চণ্ডীমণ্ডপ নির্মিত হয়েছিল যা আজ অবলুপ্ত হলেও সেগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রয়োজন। একদা কাঠ-খড়-বাঁশ দিয়ে কারুকার্য রচনায় বাস্তুশিল্পীদের অসাধারণ দক্ষতার উদাহরণ এই সব চণ্ডীমণ্ডপগুলি সেকালের অজানিত শিল্পীদের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়া হুগলি জেলার কাঠের রথ ও তার স্থাপত্য ভাস্কর্য সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। মন্দির নির্মাণের মত কাঠের রথ তৈরিতে শিল্পীসমাজ একদিকে যেমন রথের কাঠামো নির্মাণে শিল্প কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন তেমনি অন্যদিকে রথ সজ্জার প্রয়োজনে শিল্পীরা নির্মাণ করেছিলেন কাঠ খোদাই করে দুটি ধাবমান অশ্বের প্রতিকৃতি, সারথি, গরুড় ও বাদক-বাদিকা প্রভৃতির মূর্তি। এ ছাড়া রথ শিল্পীরা রথের গায়ে নানাবিধ চিত্রাঙ্কনও করে থাকতেন।

হুগলি জেলার উল্লেখযোগ্য যে সব রথের নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে একটি হল দশঘরার (থানা-ধনিয়াখালি) গোপীনাথ জীউর রথ। প্রথম এখানকার গোপীনাথের তিনটি রথ একসঙ্গে বের করা হত খ্রিস্টীয় আঠার শতকের প্রথম দিকে। এর মধ্যে একটি ছিল একুশ চূড়া আর একটি তের চূড়া ও শেষেরটি ন চূড়া। পরে ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে ঐ তিনটি রথের পরিবর্তে একটি রথ বের করা হয় এবং সেটিও পুরাতন হয়ে গেলে পরবর্তী ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে আর একটি সুদৃশ্য রথ নির্মাণ করা হয়, যা দশঘরার রথ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

হুগলি জেলার আর একটি সুবিখ্যাত রথ হল মাহেশের রথ (থানা-শ্রীরামপুর)। এখানকার রথ অনেকবার নতুন করে নির্মাণ করা হয়। শেষ কাঠের রথটি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়ায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান লোহার ফ্রেমযুক্ত রথটি নির্মাণ করা হয়।

হুগলি জেলায় একদা যেসব কাঠের তক্ষণকাজ সহ সুদৃশ্য রথ নির্মিত হয়েছিল তার অনেকগুলিই আজ আর টিকে নেই। কিন্তু সে সব রথের গায়ে নিবদ্ধ কাঠের মূর্তি এবং রথের গায়ে উৎকীর্ণ চিত্রাবলী বিভিন্ন সংগ্রহশালার সংগ্রহে আছে। হুগলির রাজবলহাটের অমূল্য প্রত্নশালায় এইভাবে সংগৃহীত হয়েছে কাছাকাছি পালিয়াড়া গ্রামের ছাত্রেশ্বরী দেবীর প্রাচীন রথের বেশ কিছু মূর্তি এবং রথের গায়ে চিত্রাঙ্কনের নিদর্শন। আলোচ্য সেসব মূর্তিগুলির মধ্যে দেখা যায় রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, বীণাবাদিকা, বেহালাবাদিকা প্রভৃতি এবং রথের গায়ে উৎকীর্ণ ছ'সাতটি রঙীন ছবির প্যানেল। সে সব চিত্রে রঙের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেলেও বিগত যুগের শিল্পীদের কারিগরী নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত

আমাদের চমৎকৃত করে।

হুগলি জেলার নানাস্থানে কাঠের নানাবিধ মূর্তি ও কাঠ খোদাই সহ রথ আজও বহু স্থানে দেখা যায়, যার মধ্যে আমরা সেকালের রথশিল্পীদের দারুতক্ষণ শিল্পের মুন্সিয়ানা সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। দুঃখের কথা, অবহেলা ও অনাদরে এইসব কাঠের রথ বর্তমানে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত।

ঠিক এমনিই দারু ভাস্কর্যের আর একটি উদাহরণ হল কাঠের মূর্তি। এক সময়ে বাংলায় পাথর খোদাই বহু দেবমূর্তি নির্মিত হয়েছিল কিন্তু চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনের প্রভাবে গরীব বৈষ্ণবেরা কাঠের ও মাটির মূর্তি তৈরি করিয়ে পূজার্চনা শুরু করে। এ ছাড়া চৈতন্য পরবর্তীকালে যে শুধু বৈষ্ণব ধর্মমতের কাঠের মূর্তি-বিগ্রহের চলন হয়েছে এমন নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের দেবদেবীর মূর্তিও নির্মিত হয়েছে।

হুগলি জেলার ক্ষেত্রে আমরা কাঠের যেসব মূর্তি ভাস্কর্য দেখি, তার তালিকাও বৃহৎ। মোটামুটি জেলার বিভিন্ন স্থানে এই সব কাঠের বিগ্রহ সম্পর্কে বা অনুসন্ধানে জানা যায় তা হল আলিশাগড়িয়া গ্রামে (থানা-বলাগড়) ওলেশ্বরী মূর্তি, গুপ্তিপাড়ায় বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে স্থাপিত গরুড় মূর্তি, সোয়ালুক গ্রামে (থানা- পুরশুড়া) গোপীনাথ ও রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, কৃষ্ণপুর গ্রামে (থানা-মগরা) শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাটে গৌর-নিতাই মূর্তি, সপ্তগ্রামে (থানা-মগরা) উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাটে গৌর নিতাই বিগ্রহ, গুপ্তিপাড়ায় (থানা- বলাগড়) জোড়বাংলা চৈতন্য ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মূর্তি এবং বৃন্দাবন চন্দ্র মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মূর্তি, আখনবাজার চুঁচুড়ায় জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা মূর্তি, কৃষ্ণনগরে (থানা-খানাকুল) বলরাম মূর্তি, গুপ্তিপাড়ায় রামচন্দ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা ও হনুমানের মূর্তি, ষণ্ডেশ্বরতলায় (থানা- চুঁচুড়া) ষড়ভুজ মহাপ্রভু-র জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি, বাঁশবেড়িয়ার (থানা-মগরা) হংসেশ্বরী মূর্তি, দিলাকাশ গ্রামের (থানা-জাঙ্গিপাড়া) ভৈরবী মূর্তি প্রভৃতি। শেষোক্ত ভৈরবী মূর্তিটি চতুর্ভুজা, তাঁর এক হাতে খাঁড়া ও অপরহাতে ছিন্ন মস্তক এবং অবশিষ্ট দুটি হাত অভয় ও বরাভয় মুদ্রায় দর্শিত। উল্লেখ্য যে, এখানেও দেবীর সঙ্গে রয়েছে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ। দুঃখের কথা, সমাজ রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-সংস্কৃতির এই মূল্যবান উপকরণ কাঠের বিগ্রহ বা মূর্তি নির্মাণের প্রয়োজনও আজ ফুরিয়েছে, সেই সঙ্গে কাষ্ঠ শিল্পীর শিল্প সাধনারও ইতি হয়ে গেছে। কিন্তু একদিন বংশানুক্রমিক অভ্যাসের ফলে কাঠ খোদাইয়ের মাধ্যমে বিগ্রহ নির্মাণের এই দুরূহ কাজটি কিভাবে শিল্পীরা যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন তারই সাক্ষী হয়ে রয়েছে হুগলি জেলার গ্রাম গ্রামান্তরে প্রতিষ্ঠিত এইসব মূর্তি-বিগ্রহ।

কাঠ খোদাইয়ের মত চারুকলায় এই সব কাঠের কাজের কারিগরদের আরও এক কৃতিত্ব হল, মন্দির দেবালয় এবং সাধারণ বাসগৃহে ব্যবহৃত দরজার উপর নকাশি অলংকরণ। মন্দিরের বহিরঙ্গ সজ্জায় যেমন শিল্পী-স্থপতিরা অলংকৃত 'টেরাকোটা' ফলক ব্যবহার করতেন, তেমনি মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারে ব্যবহৃত কাঠের দরজার পাল্লায় ফুল লতাপাতা ও পশুপাখির নানাবিধ নকশাসহ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিও খোদাই করে দিতেন। শিল্পাভিমুখী বাঙ্গালীজীবনে নকসা করা এমন রমণীয় কাঠের কপাটের চলন যে বহুদিন থেকেই তা কমললোচনের রচিত চণ্ডীমঙ্গলের বর্ণনাতেও পাওয়া যায় : "সেহিত ভুবন মাঝে স্ফটিকের স্তম্ভ সাজে দ্বারেতে কপাট মনোহর।"

মন্দিরের কাঠের কপাটে অলংকৃত এই ধরনের নকাশি সজ্জাযুক্ত যে কাঠের দরজা হুগলি জেলার নানাস্থানে দেখা যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : কোতলপুর গ্রামের (থানা-জাঙ্গিপাড়া) রাজরাজেশ্বর মন্দির, দশঘরা গ্রামের (থানা-ধনিয়াখালি) গোপীনাথ মন্দির, দেউলপাড়া গ্রামের

(থানা-পুরশুড়া) জয়চণ্ডীর মন্দির, পুরুষোত্তমপুর গ্রামের (থানা-সিঙ্গুর) ডাকাতে কালীর মন্দির, ভেলিয়া গ্রামের (থানা-আরামবাগ) রঘুনাথ জীউর মন্দির প্রভৃতি।

শেষোক্ত মন্দিরের কাঠের কপাটটি বর্তমানে রাজবলহাটের অমূল্য প্রত্নশালায় সংগৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ঐ মন্দির দরজায় অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে খোদিত হয়েছে বিষ্ণু, কালী ও মহিষমর্দিনীর প্যানেল।

দারুশিল্পের আর একটি নিদর্শন হল বৃষকাষ্ঠ। বাঙ্গালীর বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে চৌকো লম্বাটে ধরনের কাঠখোদাইযুক্ত যে স্তম্ভটি উৎসর্গ করা হয় সেটিকেই বলে বৃষকাষ্ঠ। এই কাঠের স্তম্ভের নিচের দিকটিতে থাকে নারী বা পুরুষের মূর্তি, যার মাথার উপরে থাকে বৃষের প্রতিমূর্তি এবং তার উপরে শিবলিঙ্গ শোভিত একটি মন্দির। হুগলি জেলার ক্ষেত্রে এই ধরনের কাঠখোদাইযুক্ত বৃষকাষ্ঠ এখনও আরামবাগ থানা এলাকার গ্রামগ্রামান্তরে দেখা যায়, যদিও ইতিমধ্যে এই ধরনের বহু স্তম্ভ কালের প্রভাবে বিনষ্ট হয়ে গেছে।

পরিশেষে, হুগলি জেলায় কাঠের নৌকো নির্মাণ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে। প্রাচীন বাংলায় কাঠের কারিগররা নৌশিল্পেও যে যথেষ্ট মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন, তা প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলির বর্ণনা থেকে জানতে পারা যায়। মঙ্গলকাব্য ছাড়াও বাংলার মন্দির গাত্রে পোড়ামাটির ফলকে নানা ধরনের যেসব বজরা ও নৌকার প্রতিচিত্র দেখা যায়, সেগুলি থেকে এইসব জলযানের নির্মাণ ও অলংকরণ সম্পর্কে দেশীয় শিল্পীর কৃতিত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এখনও হুগলি জেলার নদীতীরবর্তী শ্রীপুর বলাগড়ে নানাবিধ আকারের নৌকা নির্মাণের মধ্যে কাঠশিল্পীরা সেই আবহমান কালের ধারাটিকেই টিকিয়ে রেখেছেন।

হুগলী জেলার এই শ্রীপুর (বলাগড়) বর্তমানে নৌশিল্পের এক বিখ্যাত স্থান। কে জানে হয়ত সেকালের প্রাচীন সপ্তগ্রাম বন্দরে বিভিন্ন জলযান তৈরীর যে কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল, তারই ধারাবাহিকতা রক্ষায় শ্রীপুরের এই নৌশিল্প কেন্দ্রটি এখানে স্থানান্তরিত হয়ে সেই ট্রাডিশনটিই বজায় রেখে চলেছে। অন্তত অনুমান তাই।

আলোচ্য শ্রীপুরে বর্তমানে নির্মিত হয় কেবলমাত্র দাঁড়টানা নৌকো ও ডিঙ্গি এবং তা হয় বিভিন্ন আকৃতির। একসময়ে নৌকো তৈরির কারিগর ছিলেন 'সূত্রধর' সম্প্রদায়। তবে শ্রীপুরে যারা বর্তমানে নৌকো তৈরির কারিগর হিসাবে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা সকলেই প্রায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের 'বারিক' পদবীধারী। তখন নৌকো তৈরির কাঠ ছিল শাল, সেগুন, আসনা প্রভৃতি কাঠ। বর্তমানে বাবলা কাঠই বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের এখানে নৌকোর দৈর্ঘ্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয় 'পদ' কথাটি। অর্থাৎ ৬" x ৬" হল এক পদের হিসাব। সে হিসাবে ৮ পদের নৌকোর দৈর্ঘ্য হল ২২/২৩ হাত লম্বা এবং ১২ পদের নৌকো ২৮/৩০ হাত লম্বা। এখানের এই নৌশিল্প কেন্দ্রটিতে তৈরি নৌকো পশ্চিমবাংলার নানাস্থানে চালান যায়। বিশেষ করে এখানে প্রস্তুত ছোট সালতি (যার সামনেটা লঞ্চের মত এবং পিছনটা সাধারণ নৌকোর মত) তৈরি হয়ে চালান যায় ওড়িশার চাঁদিপুর, কসাফুলি ও বলরামগোড়ি প্রভৃতি স্থানে। এ ছাড়া দক্ষিণবঙ্গের অর্থাৎ সুন্দরবন এলাকার নদীতে ব্যবহারের জন্য নৌকোর ধরণটি আবার উত্তরবঙ্গের অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের লালগোলা ও বহরমপুরের নদীতে ব্যবহৃত নৌকোর আকৃতির সঙ্গে পৃথক। এখন এখানে নৌকো তৈরি তেমনভাবে হচ্ছে না বলে এখানকার নৌকোর কারিগররা মেদিনীপুর জেলার পেটুয়াঘাট, রসুলপুর, নীলপুর, দহগোড়া এবং দক্ষিণ চব্বিশপরগনা জেলার কাকদ্বীপ, বাসন্তী ও পাথরপ্রতিমার নানাস্থানে

নৌকো তৈরির কাজ পেয়ে সেখানে নৌকো তৈরীতে নিয়োজিত আছেন। তবু এই শিল্পটির বর্তমানে নাভিশ্বাস উঠলেও এখনও কোনমতে কয়েকঘর নৌশিল্পীর উদ্যোগে যে টিকে আছে সেটাই সান্ত্বনার বিষয়।

এতক্ষণ হুগলি জেলার বিভিন্ন স্থানের কাঠখোদাইয়ের নিদর্শন সম্পর্কে যে আলোচনা করা হল, এবার স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে এইসব দারু ভাস্কর্যের শিল্পী ছিলেন কারা? সরজমিন তদন্তে বা মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা গেছে, এ দেশের সূত্রধর সম্প্রদায়ই মূলত ছিলেন এই ঐতিহ্যগত দারু-তক্ষণ শিল্পের কারিগর। 'সূত্রধর' কথাটির মধ্যে তাঁদের পেশাগত চরিত্রটি ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ সুতো ধরে মাপজোখ করে কাজ করতে হয় বলেই সামাজিক নাম সূত্রধর। এ ছাড়া কাষ্ঠ, পাষাণ, মৃত্তিকা ও চিত্র — এই চার মাধ্যমের কাজেই যুগপৎ তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন। এর ফলে সমাজে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল স্বীয় যোগ্যতা অনুসারে স্থপতি, ভাস্কর ও চিত্রকর হিসাবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে এবং যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বংশপরম্পরায় এই সূত্রধর শিল্পীদের পূর্ব ঐতিহ্য বজায় রাখা সম্ভবপর হয় নি। তাই পরবর্তীকালে দক্ষতার অবনতির কারণে আজ তাঁরা 'ছুতোর' হিসাবে শুধুমাত্র আসবাবপত্র নির্মাণের মধ্যেই তাঁদের কাজ সীমাবদ্ধ রেখেছেন। সে কারণে দারু-তক্ষণ শিল্পের অসামান্য নৈপুণ্য আজ অস্তমিতপ্রায়। কিন্তু তা হলেও হুগলি জেলার গ্রামগ্রামান্তরে তাদের কৃত এইসব দারু ভাস্কর্যের অমূল্য নিদর্শনগুলি প্রতিকূল আবহাওয়া ও পোকামাকড়ের সঙ্গে লড়াই করে এখনও যে টিকে থেকে গৌরব ঘোষণা করে চলেছে সেটাই আশ্চর্য।

হুগলি : সংগ্রহশালা

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন কালে ভারতীয়গণ ইতিহাস সচেতন ছিলেন না। সে কারণে আমাদের দেশের ইতিহাস রচনাকালে উপকরণের বড়ই অভাব অনুভূত হয়। পলিমাটির দেশ বাংলা — পাথরের অভাবে এদেশে ঐতিহাসিক সৌধ ইষ্টক নির্মিত, ফলে স্বল্পস্থায়ী। শিলালিপির অভাবে তাম্রলিপি, ভগ্নপ্রস্তর মূর্তি, পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শন, তালপাতার পুঁথি, কিংবদন্তী বা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের ইতিহাস রচিত হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যেও কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

শতাধিক বছরেরও অধিককাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' (অগ্রহায়ণ, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় লিখেছিলেন — "বাঙালির ইতিহাস চাই। ......বাংলার ইতিহাস চাই, না হলে বাঙালীর ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙালী তাহাকে লিখিতে হইবে। ....আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাংলার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের আক্ষেপ স্মরণ করে ও তাঁর প্রদর্শিত পথে আমরাও ইতিহাসের সন্ধানে বাংলার পথে ঘাটে বারবার বাহির হয়েছি। ইতিহাসের উপকরণ কেবল পুঁথির পাতায় নেই — আছে পরিত্যক্ত নদীগর্ভে, ভগ্নবিগ্রহের পাদপীঠে, ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপে, তাম্রশাসনে ও জনশ্রুতিতে। উপকরণের অধিকাংশ নষ্ট বা বিলুপ্ত — এখনও যা আছে তার সন্ধানে জেলার সংগ্রহালয়ে ঘুরে ঘুরে জেলার ইতিহাসের রেখাচিত্র অঙ্কনের প্রচেষ্টার ফল বর্তমান নিবন্ধ।

হুগলি জেলার ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণগুলি অধিকাংশ ইংরেজ আমলে সংরক্ষিত হয়েছে কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে। বেশ কিছু ইংল্যান্ড-ফ্রান্স-জার্মানির সংগ্রহালয়ে স্থান পেয়েছে। কিছু চোরাপথে আমেরিকার ধনকুবেরদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ও সরকারী সংগ্রহালয়ে আশ্রয় পেয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য - প্রত্নশালা প্রভৃতি সংগ্রহালয়েও স্থান পেয়েছে। আমাদের জেলার সংগ্রহালয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, — (১) অমূল্য প্রত্নশালা, রাজবলহাট, (২) প্রভাসচন্দ্র পাল সংগ্রহশালা, মহানাদ, (৩) সারদাচরণ মিউজিয়াম, শেওড়াফুলি (৪) হুগলি জেলা পরিষদের সংগ্রহশালা, চুঁচুড়া (৫) ইন্সটিটিউট দ্য চন্দননগর, চন্দননগর, (৬) রাজেন্দ্র সংগ্রহশালা, দ্বারবাসিনী, (৭) ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ। এছাড়া জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে বহু উপকরণ আছে যা সাধারণের নিকট সহজলভ্য নয়।

হুগলি জেলার বর্তমান সীমারেখার মধ্যে আমরা আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখতে ইচ্ছুক নই। কারণ ইতিহাসকে কোনো জেলার সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। দ্বিতীয়ত আমাদের জেলার হ্রাস-বৃদ্ধি বারবার ঘটেছে। আমরা বর্ধমান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে জেলার পত্তন

করেছি, আবার আমাদের থেকে হাওড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে নূতন জেলায় পরিণত হয়েছে। আমরা আঞ্চলিক ও কালানুক্রমিক উভয়দিক দিয়েই ইতিহাস সন্ধানে প্রয়াসী হব। জেলার ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন তিনটি বলয়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত, বলয়গুলি নদীর অববাহিকা ও গতিপথকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রাচীনকালে নদীই ছিল সমাজজীবনের চালিকাশক্তি। নদীর উত্থান-পতনের সঙ্গে জনজীবন নিয়ন্ত্রিত হত। নদীর গতিপথেই গড়ে উঠত প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অধিষ্ঠানভূমি।

জেলার নদীকেন্দ্রিক বলয়গুলি হচ্ছে — (ক) আমোদর-দ্বারকেশ্বর নদীর গতিপথে গড়মান্দারন বলয়। (খ) দামোদর ও শাখাগুলির গতিপথে মহানাদ-দ্বারবাসিনী-পান্ডুয়া বলয়। (গ) গঙ্গা-সরস্বতী নদীর গতিপথে সপ্তগ্রাম-হুগলি-সিঙ্গুর বলয়। কালানুক্রমিক ভাবে জেলার ইতিহাসকে কয়েকটি যুগে ভাগ করা যায়। (ক) খ্রিস্টপূর্ব যুগ, (খ) খ্রিস্টীয় প্রথম হতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত দ্বিতীয়যুগ, (গ) ষষ্ঠ শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তৃতীয় যুগ (ঘ) মুসলমান শাসনের প্রথমার্ধে পাঠানযুগ, (ঙ) মুসলমান শাসনের দ্বিতীয়ার্ধে মোঘলযুগ, পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত।

(ক) খ্রিস্টপূর্ব যুগ

বাংলাদেশ অনার্যকৌমদের বাসভূমি ছিল। আর্যভারত বঙ্গকেন্দ্রিক পূর্বভারতকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার চক্ষে দেখে এসেছে। পূর্বভারতে বেদবিরোধী বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার অধিবাসীরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বৌদ্ধ ও জৈনদের ধর্মের লীলাভূমি ছিল বৈশালী, মগধ ও রাঢ়দেশ। প্রাচীন রাঢ়ভূমির প্রান্তসীমায় পরেশনাথ পাহাড়। চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্করদের মধ্যে তেইশজনই পরেশনাথ পাহাড় বা সমেত শিখরে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীর বর্ধমান সশিষ্যপথহীন, আচারহীন বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমিতে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। এই তথ্য জৈনধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গসূত্র'-এ উল্লেখিত হয়েছে। সুহ্মভূমির এই প্রথম ঐতিহাসিক স্বীকৃতি। বহুপরবর্তীকালে রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ী "পবনদূত" কাব্যে সুহ্মদেশের ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন, — "রসময়ো সুহ্মদেশ"। ধোয়ীর প্রশংসাবাণী নিম্নরূপ :

"গঙ্গাবীচিপ্লুত পরিসর সৌধমালাবতংসো
বাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ॥"

অর্থাৎ গঙ্গার তরঙ্গপ্লাবিত সুরম্য হর্ম্য নিকরশোভিত, সরস সুহ্মদেশে গমন করিলে তুমি বিস্ময়ে অভিভূত হইবে।

কবি কালিদাসের 'রঘুবংশ'-এ রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সুহ্মদেশের কথা বলা হয়েছে। সিংহলী পালিগ্রন্থ 'দীপবংশ' ও 'মহাবংশ'-এ বঙ্গরাজ সীহবাহুর কাহিনী আছে। সীহবাহুর বা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ লঙ্কাজয় করেন। সিংহবাহুর রাজধানী ছিল হুগলি জেলার সিংহপুর বা সিঙ্গুরে। প্রাচীন কালে গ্রীক ও রোমান বণিকগণ সমুদ্রপথে গঙ্গে বন্দরে বাণিজ্য করতে আসতেন। এই সব ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থন সূচক উপকরণ আমাদের অঞ্চলে সংগ্রহশালাগুলিতে নেই। প্রাচীন পুঁথিপুস্তকে এর উল্লেখমাত্র আছে।

'দেশান্তর জাতক' প্রদত্ত তথ্য হতে জানা যায় যে, প্রাক্ বৌদ্ধযুগে রাঢ়দেশে দুটি রাজ্য ছিল — শিবিরাজ্য ও চেতরাজ্য। গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমির মানচিত্রে চেতরাজ্যের উল্লেখ আছে। শিবিরাজ একটি নবধর্ম শিবিধর্ম প্রচার করেন। স্বয়ং গৌতম বা সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে পাঁচবৎসর শিবিদেশে বাস করে শিবিধর্ম আয়ত্ত করেন। বৌদ্ধধর্ম শিবিধর্মের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। দামোদর নদ শিবিরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তখন এর নাম ছিল কন্টিমার নদী এবং রূপনারায়ন

নদের নাম ছিল কেতুমতী নদী। কেতুমতী নদীর পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে ছিল চেতরাজ্য। অর্থাৎ আমাদের হুগলি জেলা খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে চেতরাজ্যের পূর্বসীমা ছিল ভাগীরথী নদী।

খ্রিস্টপূর্ব যুগের ঐতিহাসিক নিদর্শন আমাদের অঞ্চলের সংগ্রহশালাগুলিতে নেই। কেবল চন্দ্রকেতু গড় অঞ্চলে কিছু গ্রীক ও রোমান মুদ্রা পাওয়া গেছে, যা থেকে বোঝা যায় গ্রীক ও রোমানদের সঙ্গে গঙ্গে বন্দরের মাধ্যমে সুহ্ম অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত।

(খ) খ্রিস্টীয় প্রথম হতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগ

দ্বিতীয় যুগে সুহ্ম অঞ্চল প্রথমে মৌর্য পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহানাদ অঞ্চলে কুষাণ ও গুপ্তযুগের কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে। মহানাদে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকালে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর স্টুকো মূর্তি, মৃৎপাত্রে ভগ্নাংশ, একটি পুরুষ মূর্তি ও কিছু কুষাণ ও গুপ্ত যুগের মুদ্রা পাওয়া গেছে। যেগুলি বর্তমানে কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই যুগে গঙ্গে বন্দরের পতন ঘটে ও তাম্রলিপ্ত বন্দরের উত্থান ঘটে। তাম্রলিপ্ত বন্দরের ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে এবং গঙ্গাসাগরের তীর্থযাত্রাকালে উত্তরভারতের বণিক ও তীর্থযাত্রীগণ হুগলি জেলার বুক দিয়ে যাতায়াত করতেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, ইত সিং ও হিউয়েন সাং ভাগীরথীর পশ্চিম তীরপথে তাম্রলিপ্ত বন্দরে যান। অধুনা বিলুপ্তপ্রায় দ্বারিক জাঙ্গাল পথটি ছিল প্রাচীন বণিক ও তীর্থযাত্রীদের গমনাগমনের পথ। রাজা শশাঙ্কদেবের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল হুগলি জেলার সীমান্তবর্তী ভুরিশ্রেষ্ঠ অঞ্চলে কানাসোনা গ্রামে। এই যুগের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আমাদের জেলার সংগ্রহালয়গুলিতে প্রায় কিছুই নেই বলা চলে।

সম্প্রতি পাণ্ডুয়া থানার বৈঁচি গ্রামে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা সম্বন্ধে একটি সংবাদ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ — "পুরানো ইটের স্তূপের ভেতর থেকে গুপ্তযুগের সাতটি স্বর্ণমুদ্রা পায়। ......মুদ্রাগুলি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগে রক্ষিত আছে।" (মুখপত্র — চুঁচুড়া, ৬ সেপ্টেম্বর'৯৬)

(গ) ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তৃতীয় যুগ

মহারাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে শতবর্ষব্যাপী অরাজকতা দেখা দেয়। ইতিহাসে এই অরাজকতাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হয়। বাংলাদেশে শান্তি স্থাপিত হয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজবংশের চারশত বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে। আমাদের জেলায় পাল ও সেন যুগে সর্বাধিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। পালরাজগণ পরম সৌগত অর্থাৎ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত নানা বৌদ্ধ মঠ ও বিহারে রক্ষিত বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, লোকেশ্বর মূর্তি পাওয়া গেছে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সুহ্ম অঞ্চলে জৈনধর্ম কিছুটা বজায় ছিল। জৈন তীর্থঙ্করদের নানা মূর্তি জেলার নানাস্থানে পাওয়া গেছে। ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদ গাত্রে কিছু কিছু ভগ্ন জৈনমূর্তির নিদর্শন ছিল। শেওড়াফুলির সারদাচরণ মিউজিয়ামে পার্শ্বনাথের মূর্তি রক্ষিত আছে।

জেলায় প্রাপ্ত নানা বৌদ্ধ মূর্তি বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। প্রাপ্ত মূর্তিগুলির মধ্যে ভান্ডারহাটি গ্রামে প্রাপ্ত বোধিসত্ত্ব মূর্তি ও চণ্ডীতলার নিকটবর্তী সরস্বতী নদীগর্ভ হতে প্রাপ্ত বজ্রাসনে উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি উল্লেখযোগ্য। সপ্তগ্রামে পালযুগের শেষদিকে প্রতিষ্ঠিত একটি বৌদ্ধবিহার ছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে ঐ যুগের কল্পচিত্র এঁকেছেন। সপ্তগ্রামে রূপারাজা নামে এক বৌদ্ধরাজা ছিলেন। সপ্তগ্রামের বৌদ্ধবিহারে বিখ্যাত সিদ্ধাচার্য দ্বারিক পা প্রধান আচার্য ছিলেন। আমাদের অনুমান দ্বারিক জাঙ্গাল রাস্তাটি (বাঁধ) সম্ভবত বৌদ্ধ আচার্য দ্বারিক পা'-র স্মৃতিবহন করে চলেছে।

পালরাজত্বের শেষদিকে দশম-একাদশ শতাব্দীতে এবং সেন রাজত্বকালে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের নানা দেব-দেবীর মূর্তি — প্রভাস পাল সংগ্রহ (মহানাদ), সারদাচরণ সংগ্রহালয় (শেওড়াফুলি) ও জেলার অন্যান্য সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। মূর্তিগুলি অধিকাংশ পাওয়া গেছে মহনাদ, দ্বারবাসিনী, পাণ্ডুয়া, ত্রিবেণী ও সুদর্শন গ্রামে। সূর্যদেবের দণ্ডায়মান মূর্তি দ্বারবাসিনী (রাজেন্দ্রভবন, দ্বারবাসিনী), ত্রিবেণীর সন্নিকটে ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কারখানার ভূমিগর্ভে দণ্ডায়মান সূর্যমূর্তি ও ভগ্নসূর্যমূর্তির নিম্নাংশ (দ্বারবাসিনীতে প্রাপ্ত ও ফণিভূষণ সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত)। জেলায় প্রাপ্ত কুষাণ বা শক প্রভাবে প্রভাবিত পাদুকাযুক্ত সূর্যমূর্তিটি বর্তমানে কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

সেনরাজগণ পরম ভাগবত বা বৈষ্ণব ছিলেন। সেনযুগের বহু বিষ্ণুমূর্তি জেলা ও বাইরের নানা সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাদড়া গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি, মহনাদে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি, পুনাজগড়ে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি, দ্বারবাসিনী গ্রামে বিষ্ণুমূর্তির ভগ্নাংশ, বাহিরখণ্ডে ত্রিশফুট গভীর নদীগর্ভ হতে প্রাপ্ত উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্তি। সিঙ্গুরের কাছে বালিখাদ খননকালে কালো কষ্টিপাথরের ভগ্নহস্ত লক্ষ্মীমূর্তি পাওয়া গেছে। পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী কানুর গ্রামে প্রাপ্ত তিনটি একই রকমের বিষ্ণুমূর্তি এবং একটি ভগ্নবিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে যা বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ঐ সংগ্রহালয়ে দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কৃত সেনযুগের কিছু বিষ্ণুমূর্তি রক্ষিত আছে।

বিষ্ণু ও সূর্যমূর্তির কিছু নিদর্শন জেলা ও জেলার বাইরের সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্বারবাসিনীর 'রাজেন্দ্রভবনে' রক্ষিত বিষ্ণু ও সূর্যমূর্তি। অমূল্য প্রত্নশালায় রক্ষিত সাটিনান গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি। মগরা অঞ্চলে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী বালিখাদে প্রাপ্ত আড়াই ফুট উচ্চ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্তি বর্তমানে ইনস্টিটিউট দ্য চন্দননগরে রক্ষিত আছে। পারাম্বুয়া গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণু ও সূর্যমূর্তি বর্তমানে আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত।

কৈকালা গ্রামের নিকট কৌশিকী নদীগর্ভে চতুর্ভুজ দত্তাত্রেয় বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটির পশ্চাদপটে উপবিষ্ট বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মূর্তি খোদিত আছে। একই প্রস্তরপটে ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিবের ত্রিমূর্তি পরিকল্পনা দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের। বাদামী, হালেবিড ও আজমীরে দত্তাত্রেয় বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে — কৌশিক ঋষি তাঁর পত্নী কৌশিকী দেবীর সাধনায় অভিশাপমুক্ত হন। কৌশিকী নদীর অববাহিকায় প্রাপ্ত দত্তাত্রেয় বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে ভারতের নানাস্থানের দত্তাত্রেয় মূর্তির স্থানগত ও কালগত যোগসূত্র আছে। মধ্যভারতের কলচুরি রাজবংশ দত্তাত্রেয় বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। সেনরাজগণ ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে সর্বভারতীয় ধ্যানধারণার অঙ্গীভূত করেছিলেন। কৈকালা গ্রামে প্রাপ্ত দত্তাত্রেয় মূর্তিটি বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

দক্ষিণভারতীয় ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার আর একটি নিদর্শন মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি। সেনযুগেই কর্নাটকের আইহলের মন্দিরে প্রাপ্ত মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তির-র আদলে বাংলাদেশে শক্তিপূজার বিশিষ্ট রূপটি প্রচলিত হয়। জেলায় প্রাপ্ত মহিষাসুরমর্দিনীর বহু মূর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সরাইগ্রামে প্রাপ্ত দশম শতাব্দী ধূসর কৃষ্ণবর্ণে পাথরে নির্মিত চতুর্ভুজা মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি। চন্দননগরের ইনস্টিটিউট দ্য চন্দননগর সংরক্ষণশালায় রক্ষিত মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি, মগরা অঞ্চলে সরস্বতীর তীরে গভীর বালিখাদে পাওয়া যায়। চারফুট উচ্চতা ও আড়াই ফুট প্রশস্ত মূর্তিটির হস্তদ্বয় ভগ্ন। জেলায় প্রাপ্ত কয়েকটি মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। দ্বারিকাচণ্ডী শক্তিদেবীর আরেকটি বিশেষরূপ। দ্বারহাট্টাগ্রামের নামকরণ হয়েছে দ্বারিকাচণ্ডীর নামে। মালদা জেলার গৌড়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে দ্বারবাসিনী দেবীর নামাঙ্কিত স্থান আছে।

বাংলাদেশে গণপতি বা গণেশ দেবতার মূর্তি বিশেষ পাওয়া যায় না। মূলত দক্ষিণ ও পশ্চিমভারত হতে গণপতি পূজা বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছিল। শ্রীরামপুরের ফনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে গঙ্গাগর্ভ হতে প্রাপ্ত একটি পিতলের চতুর্ভুজ গণেশ মূর্তি আছে। পূর্বভারতে প্রচলিত গণেশমূর্তির সঙ্গে ঐ মূর্তির বিশেষ মিল নেই। মূর্তিটির বৈশিষ্ট্য হাতির উপর ইঁদুর, তার উপর গণেশ মূর্তি। মূর্তিটির নির্মাণকাল একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী অর্থাৎ সেনযুগে। স্পষ্টতঃই সেনরাজগণের মাধ্যমে দক্ষিণভারতীয় গণপতি উপাসনা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীদের মূর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিবেণী গ্রামে প্রাপ্ত চতুর্ভুজা গঙ্গামূর্তি।

মহানাদ তথা দ্বারবাসিনী গ্রামে প্রাপ্ত প্রস্তর নির্মিত বরাহমূর্তি সম্বন্ধে কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সম্প্রতিকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার 'হুগলি জেলা' সংখ্যায় D(C)2/139 নং সাদা-কালো পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবির তলদেশে — "বড়াহ মূর্তি : মহানাদ" পরিচয়লিপি মুদ্রিত আছে। সম্ভবত মুদ্রণপ্রমাদের জন্যই বরাহমূর্তিকে 'বড়াহমূর্তি' বলা হয়েছে। গ্রন্থমধ্যে কিন্তু ঐ বড়াহ (বরাহ) মূর্তির কোনো পরিচয় ব্যাখ্যা করা হয় নি। মূর্তিটি নারী মূর্তি, সেকারণে এটি বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মূর্তি বলা চলে না। আমাদের অনুমান এটি বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী বজ্রবারাহীর। এই মূর্তি প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, — "দ্বারবাসিনীতে পাওয়া গেছে ....একটি বারাহী মূর্তি। মূর্তিটি বিষ্ণুর বরাহ অবতার মূর্তি বলে সকলের ধারণা ছিল, কিন্তু তা নয়। ....স্ত্রী মূর্তি যখন তখন বরাহমুখী দেবী বারাহী ছাড়া অন্য কোনো মূর্তি নয়।"

বাংলাদেশ শৈব-শাক্তভূমি। পালযুগের শেষ দিকে বুদ্ধদেব শিবে পরিণত হন। তাঁর সাধারণ নাম হয় বুড়োশিব। সহজিয়া বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মের মধ্যে শিব আপন স্থান করে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশে একসময় শৈবগণের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। বহু শৈব আচার্য সারাভারতে বিশেষ করে দক্ষিণভারতে আচার্যের আসনগ্রহণের জন্য গমন করেছিলেন। রাজেন্দ্র চোলদেবের তিরুমালাই লিপি ও অন্য আরেকটি শিলালিপি (বর্তমানে মাদ্রাজ সরকারী মিউজিয়ামে রক্ষিত) থেকে জানা যায় যে রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাতীরে ত্রিবেণী অধিকার করে বহু শৈব আচার্যকে চোলদেশে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। তামিল গ্রন্থসূত্র হতে জানা যায় সুহ্ম ভূমির অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্তী ত্রিবেণী হতে শৈব-আচার্য উমাপতিদেবকে রাজ গুরুপদে অভিষিক্ত করে রাজেন্দ্র চোল নিজরাজ্যে নিয়ে যান। আরও উল্লেখ করা হয়েছে — রাজগুরু উমাপতিদেবের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে রাজেন্দ্র চোল সিংহল জয় করেন।

(ঘ) মুসলমান শাসনের প্রথম পর্ব (ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে পঞ্চদশ শতাব্দী)

রাজা লক্ষ্মণসেন দেব ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দ হতে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালের শেষদিকে বাংলাদেশে মুসলমান আক্রমণ ঘটে। রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণের সময়কাল নিয়ে মতভেদ আছে। তবে মনে করা হয় ১১৯৯ থেকে ১২০২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই আক্রমণ ঘটেছিল। ঐতিহাসিক মীনহাজ-ই-সিরাজ ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে রচিত "তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থে মুসলমান আক্রমণের বিবরণ দিয়েছেন।

মীনহাজের মতে ১২০২ খ্রিস্টাব্দের কার্তিক মাসে বক্তিয়ার খিলজী নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। নবদ্বীপের পতন ঘটে ও রাজা লক্ষ্মণসেন দেব পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। নবদ্বীপের পতন ঘটলেও দক্ষিণ রাঢ় বা সুহ্মভূমি অঞ্চলে স্বাধীন কল্প হিন্দু সামন্ত নৃপতিবর্গ সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়া, মহানাদ, ভুরশুট ও গড় মান্দারণ অঞ্চলে স্বাধীনতা বজায় রেখেছিলেন। অবশ্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে

দক্ষিণ রাঢ়ের অধিকাংশ স্থান মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়। মুসলমান শাসনের প্রথমদিকে বীরভূমের লখনৌর নগর পরে সপ্তগ্রাম অঞ্চলে প্রশাসনিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে। সাতগাঁও-এ টাকশাল স্থাপিত হয়। ঐ টাকশালের মুদ্রিত মুদ্রা এবং ভগ্ন হিন্দু দেবায়তনের উপর স্থাপিত মসজিদের লিপি থেকে ঐ যুগের ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করা হয়।

মীনহাজের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, উড়িষ্যার জাজনগরের রায়ের (রাজা) সঙ্গে যুদ্ধে তুর্কীরা পরাজিত হয়। গড় মান্দারণ অঞ্চল তাদের হস্তচ্যুত হয়। জাজনগরের রায়ের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল মান্দারন। মীনহাজ লিখেছেন, — "মালিক ইউজবেক্ দিল্লীর সুলতানের সাহায্য নিয়ে রায়ের রাজধানী উরমদন আক্রমণ করে। রায় যুদ্ধে হেরে পালিয়ে যান। তাঁর সম্পত্তি, হস্তীসমূহ ও আত্মীয়-স্বজনবর্গ মুসলিমদের হস্তগত হয়।" — উরমদন আসলে মান্দারণের বিকৃত উচ্চারণ।

হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত মান্দারণ অঞ্চলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ইতিপূর্বে নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল হওয়ার জন্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মান্দারণ অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' গ্রন্থে রামপালের বিজয়াভিযানে অংশগ্রহণকারী রাজন্যবর্গের মধ্যে মান্দারণ অঞ্চলের সামন্ত নৃপতি লক্ষ্মী শূরের উল্লেখ করেছেন, — "সমগ্র আরণ্য সামন্ত চক্রচূড়ামণি অপার মন্দারপতি মধুসূদন লক্ষ্মী শূর।" (মূল পুঁথি এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।)

মালিক ইউজবেকের আক্রমণের সময় ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দ (হিজরাসন ৬৫৩)। উরমদন লুণ্ঠন করে প্রাপ্ত অর্থ হতে সুলতান ইউজবেক্ তুঘরীল লখনৌতির (গৌড়) টাকশাল হতে রমজান মাসে নূতন মুদ্রার প্রচলন করেন। বর্তমানে ঐ মুদ্রার একটি কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ঐ মুদ্রার সাক্ষ্য হতে বোঝা যায় হুগলি জেলার আরামবাগ অঞ্চল ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তুর্কীদের হস্তগত হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে শাহ সুফিউদ্দীন কর্তৃক পাণ্ডুয়ার হিন্দুরাজা পাণ্ডু পরাজিত হন। তার ফলে পাণ্ডুয়া, মহানাদ, দ্বারবাসিনী, সুদর্শন অঞ্চল মুসলমানদের করায়ত্ব হয়। ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদ ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপর স্থাপিত হয়। রুকনুদ্দিন কৈকায়নের সেনাপতি জাফর খাঁ ত্রিবেণী সপ্তগ্রামের ভূদেব নৃপতির সঙ্গে যুদ্ধে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন।

গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের সময়ে আরামবাগের বাজুয়া গ্রামে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদের প্রতিষ্ঠাকাল হিজরা সন ৯৩৮। মসজিদের শিলাফলক বর্তমানে ভারতীয় যাদুঘর কলকাতায় রক্ষিত আছে। আরামবাগের মায়াপুর গ্রামে হোসেন শাহের রাজত্বকালে নির্মিত একটি মসজিদ আছে। মায়াপুরের বিখ্যাত মায়াচণ্ডীর মন্দির ভেঙ্গে সেই উপকরণ নিয়ে মৌলানা সিরাজুদ্দিনের মক্বারা নির্মিত হয়। রুকনুদ্দিন বারবাক্ শাহের রাজত্বকালে কোরেশ বংশীয় মক্কার অধিবাসী ইসমাইল গাজী গড়মান্দারণের গঙ্গ বংশীয় রাজাকে আক্রমণ করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি নিজে সুলতান বারবকের আদেশে ৮৭৮ হিজরা সনে নিহত হন। তাঁর দেহ গড় মান্দারণে আজও সমাধিস্থ রয়েছে। জন রীমস্ ইসমাইল গাজী সংক্রান্ত একটি ফার্সী ভাষায় লেখা শিলালিপি মান্দারণ হতে সংগ্রহ করে কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত করেন।

সপ্তগ্রাম টাকশালে মুদ্রিত কয়েকটি মুদ্রা লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহের একটি শিলালিপি সপ্তগ্রামে পাওয়া গেছে। তাঁর রাজত্বকাল ১৪৩৬ - ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তাঁর পুত্র বারবক শাহ যুবরাজ থাকাকালীন সপ্তগ্রামে ঐ লিপি খোদিত

হয়। বারবাকের পুত্র ইউসুফ শাহ (রাজত্বকাল ১৪৭৪ -৮১) পাণ্ডুয়ার হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেন। তাঁর সময়ে রচিত একটি শিলালিপি আমাদের জেলায় পাওয়া গেছে। নসরৎ শাহের মুদ্রা হোসেনাবাদ (মগরা-সপ্তগ্রাম) হতে মুদ্রিত। ঐসব মুদ্রা কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

হুগলি জেলার নানাস্থান হতে মসজিদের গায়ে রক্ষিত নানা শিলালিপি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাঁতগাঁ, সন্তোষপুর, মোল্লা-সিমলা প্রভৃতি গ্রামের মসজিদের শিলালিপি। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পাণ্ডুয়ার শাহ্ সুফিউদ্দীনের সমাধিতে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি রক্ষিত আছে। জর্জ ক্যানিংহাম ঐ শিলালিপিটি সংগ্রহ করে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দান করেন। শিলালিপির সময়কাল ১৫ এপ্রিল ১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দ (হিজরা সন ১লা মহরম, ৮৮২)। সুলতান সামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলে (১৩০১ - ১৩১২ খ্রিস্টাব্দ) রচিত ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদ থেকে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। আচার্য যদুনাথ সরকার ত্রিবেণীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন : Tribeni – "A museum of Muslim Epigraphy."

(ঙ) মুসলমান শাসনের দ্বিতীয় পর্ব — মোঘল যুগ

বাংলাদেশের মুসলমান শাসনের দ্বিতীয় পর্বে পাঠান সুলতানদের হাত থেকে মোঘল সম্রাট আকবর বাংলাদেশ জয় করেন। মোঘল পাঠান দ্বন্দ্বের প্রথম পর্বে পাঠানরা সহজে বাংলাদেশে অধিকার ত্যাগ করে নি। তারা উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে মাঝে মাঝেই মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার আরামবাগ অঞ্চলে আক্রমণ চালাত। আমাদের জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাজায়-রাজায় যুদ্ধে উলু-খাগড়াদের জীবন সংশয় হয়ে উঠেছিল। সেই অরাজকতার কিছু পরিচয় কবিকঙ্কন মুকুন্দরচিত চণ্ডীমঙ্গলে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে মোঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলে সরকার সাঁতগাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র সপ্তগ্রাম থেকে হুগলিতে স্থানান্তরিত হয়। হুগলির ফৌজদার পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ও সামরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন।

পাঠান সুলতানী আমলের শেষদিকে পর্তুগীজরা প্রথমে সপ্তগ্রামে পরে ব্যান্ডেল-হুগলিতে তাদের বাণিজ্যকেন্দ্র ও ধর্মপ্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলে। তারপর পর্তুগীজের পদানুসরণ করে বিভিন্ন ইউরোপীয় বাণিজ্য গোষ্ঠী একে একে ব্যবসাবাণিজ্যসূত্রে এদেশে এসে হুগলি জেলার গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলে তাদের বাণিজ্যকুঠি গড়ে তোলে। সেই বাণিজ্য কুঠিগুলি মোঘল আমলের শেষদিকে দুর্গ ও সেনানিবাসে পরিণত হয়। পর্তুগীজরা হুগলিতে উপনিবেশ করে একটি শক্তিশালী সামরিক কেন্দ্র গড়ে তোলে। ডাচেরা চুঁচুড়ায় ফোর্ট গাস্টেভাস, ফরাসিরা চন্দননগরে ফোর্ট অর্লেয়াঁ, জার্মান-প্রাশিয়ানরা তেলিনীপাড়ায়, ডেনেরা চন্দননগরের অন্তর্গত দিনেমারডাঙা ইত্যাদি স্থানে বাণিজ্যকুঠি ও সামরিক কেন্দ্র গড়ে তোলে। হুগলি থেকে কোন্নগর পর্যন্ত গঙ্গার তীরে নানাস্থানে বিদেশী বণিকরা ঘাঁটি গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এই বিদেশী বণিককুল হুগলি জেলার এই ঘাঁটিগুলি কেন্দ্র করে তাদের ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত করে।

সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে এবং অষ্টাদশের মাঝামাঝি সময় থেকে হুগলি জেলার উপর দিয়ে দুটি দীর্ঘস্থায়ী সামরিক অভিযান বয়ে যায়। চেতয়া-বরোদার বিদ্রোহী সামন্ত শোভাসিংহ ও তার ভাই হিম্মৎ সিংহ বারবার হুগলি জেলার নানা অঞ্চলে আক্রমণ চালায়। শোভাসিংহের অত্যাচার বন্ধ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নাগপুরের ভোঁসলা বংশীয় শাসকবর্গ বিহার উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে অভিযান শুরু করে। মারাঠা সৈন্যদের বর্গী বলা হয়, তাই বর্গীদের এই বারবার আক্রমণকে 'বর্গীর হাঙ্গামা' বলা হত। বর্গীর হাঙ্গামার বিবরণ বর্ধমান রাজসভার কবি বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের 'চিত্রচম্পু' কাব্যে ও গঙ্গারাম (দত্ত) রচিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' কাব্যে পাওয়া যায়, ঐ

দুটি কাব্যের কোনো পুঁথি আমাদের জেলার সংগ্রহশালায় নেই কিন্তু বর্ধমান রাজদরবারের গ্রন্থাগারে ও কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লার আমলে পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি অনেকটাই ঘটেছিল হুগলি জেলায়। চন্দননগরের ফরাসি কর্তৃপক্ষ নবাবের পক্ষপাতী ছিলেন বলেই ইংরাজরা পলাশীর যুদ্ধের পূর্বেই চন্দননগর আক্রমণ করে ফোর্ট অর্লেয়াঁ দুর্গ ধ্বংস করে। ফরাসিদের সংগৃহীত অস্ত্রসমূহ পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজপক্ষের সহায়ক হয়। ফরাসি গভর্নর দুপ্লে গৌরহাটিতে যে ফ্রেঞ্চগার্ডেন প্রস্তুত করেছিলেন, ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ করে সেটি দখল করে এবং ঐ ফ্রেঞ্চ গার্ডেন হতে ক্লাইভ ও অন্যান্য ব্রিটিশ সেনাপতিগণ পলাশীর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। চন্দননগরের ফরাসি সামরিক শক্তির ধ্বংসের সঙ্গে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে হুগলির ফৌজদার ছিলেন মহারাজ নন্দকুমার। তাঁর নিষ্ক্রিয় ভূমিকা ইংরেজদের চন্দননগর ধ্বংসের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু হলে তার প্রাক্‌সূচনা ঘটেছিল ইংরাজদের চন্দননগর অভিযানের মধ্য দিয়ে।

বিভিন্ন বিদেশী বাণিজ্য কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কেন্দ্রে ইতিহাস রচনার যে উপকরণ সঞ্চিত ছিল তা সামরিক আক্রমণে বিনষ্ট হয়। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট সাজাহানের আদেশে বাংলার সুবেদার ব্যান্ডেল ও হুগলির পর্তুগীজ উপনিবেশ ধ্বংস করে। পরবর্তী কালে ডাচেদের গাস্টেভাস দুর্গ ও ফরাসিদের অর্লেয়াঁ দুর্গ ধ্বংস হবার পরে ঐ সময়ের ব্যবসাবাণিজ্য, প্রশাসনিক ও সামরিক ইতিহাস রচনার উপকরণ বিনষ্ট হয়। চন্দননগরে 'ইন্সটিটিউট দ্য চন্দননগর' নামক সংগ্রহালয়ে চন্দননগরের ফরাসিশাসনের প্রায় আড়াইশত বৎসরের কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগৃহীত আছে। মুল ফরাসি দলিল পত্র পন্ডিচেরী বা ফ্রান্সে স্থানান্তরিত হয়েছে। চন্দননগরে ফরাসি গভর্নরের বাসভবন 'দি রেসিডেন্সি' স্বাধীনতা অর্জনের পর 'ইন্সটিটিউট দ্য চন্দননগর' নামে ফরাসি শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র নামে গঠিত হয়েছে। ইন্সটিটিউটে ইংরাজী ও ফরাসি পুস্তক সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার আছে। চন্দননগর হতে প্রকাশিত নানা পত্র-পত্রিকার নিদর্শন রক্ষিত আছে। নানা ঐতিহাসিক ঘটনার ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের তৈলচিত্র আছে। চন্দননগরের প্রাচীন মানচিত্র ও অর্লেয়াঁ দুর্গের নক্সা এখানে রক্ষিত আছে। ফরাসি শাসকদের ব্যবহৃত নানা সামগ্রী এই সংগ্রহালয়ের মূল্যবান সম্পদ বিশেষ করে ডুপ্লে ব্যবহৃত পালঙ্ক ও নানা আসবাবপত্র দুইশত বৎসর পূর্বের ইতিহাসকে জীবন্ত করে ফুটিয়ে রেখেছে। ইন্সটিটিউটে সংগৃহীত প্রাচীন কালের নিদর্শন হিসাবে দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি উল্লেখযোগ্য। ভগবান তথাগত বুদ্ধদেবের মুন্ডহীন ভূমিস্পর্শ মুদ্রার মূর্তিটি হরিহর শেঠ ইন্সটিটিউট-কে দান করেন। মগরার সরস্বতী নদীগর্ভে প্রাপ্ত মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটি ভাস্কর্য শিল্পের অনুপম নিদর্শন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিটি হুগলির জেলাশাসক সংগ্রহালয়কে দান করেন। উভয় মূর্তিই পালযুগের ও সেনযুগের নিদর্শন।

মোঘল আমলের ঐতিহাসিক নিদর্শন আমাদের জেলার কোন সংগ্রহালয়ে নেই। চন্দননগরের ফরাসি শাসন সংক্রান্ত কিছু উপকরণ একমাত্র 'ইনসটিটিউট দ্য চন্দননগরে' আছে।

ইতিহাসের সন্ধানে আমাদের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা সমাপ্ত প্রায়। জেলা ও দেশবিদেশের সংগ্রহালয়ে সরেজমিনে ও পুঁথিপত্রের মাধ্যমে এই পরিক্রমা চলেছে। ইতিহাসের সন্ধানে বেরিয়ে ইতিহাসের খন্ডিত রূপ দেখেছি জেলার পথেপ্রান্তরে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মণি মাণিক্যগুলি সংগ্রহ করে মণিহার গাঁথতে হবে। এখন দক্ষ ও উদ্যমী মণিকারের অপেক্ষা।

বিজ্ঞানশিক্ষার পূর্ণতা শ্রেণীকক্ষে নয় প্রয়োগ শালায়। ইতিহাসচর্চায় পুঁথিপুস্তক যথেষ্ট নয় - প্রয়োজন সংগ্রহালয়ের। পুঁথিপুস্তকের সঙ্গে সংগ্রহালয়ের শুভসংযোগ ঘটলেই - মৃত তথ্য প্রাণচাঞ্চল্যে

ভরপুর সজীব ইতিহাসে পরিণত হবে। সেই শুভলগ্নে আমাদের ইতিহাসের সন্ধান সার্থক হবে। আমরা সত্যকাম হবো - সিদ্ধকাম হবো - পূর্ণকাম হবো।

সহায়ক পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ তালিকা

১. দেশান্তর ভাতক

২. বেনের মেয়ে : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৩. হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ (১,২,৩) : সুধীর কুমার মিত্র

৪. হুগলি জেলার দেব দেউল : সুধীর কুমার মিত্র

৫. হুগলি ও হাওড়া জেলার ইতিহাস : বিধুভূষণ ভট্টাচার্য

৬. আরামবাগের ইতিকথা : চুনীলাল বসু

৭. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : বিনয় ঘোষ

৮. হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি : তারাপদ সাঁতরা

৯. পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (১-৫ খণ্ড) : অশোক মিত্র

১০. বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর - স্বাধীন সুলতানদের আমল : সুখময় মুখোপাধ্যায়

১১. বাংলায় ভ্রমণ (১ম ও ২য় খণ্ড) : ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

১২. গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি : প্রভাত কুমার ঘোষ

১৩. ভারতের প্রদর্শশালা : সি শিবরামমূর্তি

১৪. বাঙ্গালীর ইতিহাস : নীহাররঞ্জন রায়

১৫. তবকাত-ই-নাসিরী — মীনহাজ-ই-সিরাজ : বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৬. বাংলার ইতিহাস — সুলতানী আমল : আব্দুল করীম (বাংলা একাডেমী, ঢাকা)

পত্রিকা

১৭. বঙ্গদর্শন পত্রিকা (অগ্রহায়ণ, ১২৮৭) — সম্পাদক : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮. অমূল্য প্রত্নশালা - প্রবাসী (চৈত্র ১৩৬১, আষাঢ় ১৩৬৩) এবং দেশ পত্রিকা

১৯. পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা — হুগলি জেলা সংখ্যা - তথ্যবিভাগ, প. বঙ্গ সরকার

২০. West Bengal District Gazetteers : Hooghly – Amiya kr. Bandyopadhyay.

২১. Ramacaritam - Sandhyakar Nandi – Translated by Dr Radhagobinda Basak.

২২. Rajendra Chola – Balram Srivastava.

২৩. Glimpses of Muslim Art and Architecture – Syed Mahmudul Hasan (Islamic Foundation, Dacca).

২৪. Corpas of Bengal Inscriptions – Ramaranjan Mukherjee & Sachindra Kumar Maity.

হুগলি : যাত্রা চর্চা

প্রভাতকুমার দাস

বৈঠকখানায় বাবুদের পট্‌রা চলিতেছে, এমন সময় আসরে কেষ্ট নামলেন। আর বাবুদের রাখে কে অমনি নেমে এসে 'বাবারে হনু! তুই লঙ্কা পোড়ালি কেমন করে বল?' বলে চেঁচাতে লাগলেন। শুনেই অধিকারীর চক্ষু স্থির! কোথায় মানভঞ্জন, আর কোথায় লঙ্কাকান্ড! কি করে, অধিকারী কাজেই আপনি হনুমান সেজে দেখা দিলেন। তখন আর পেলার ভাবনা রইল না। গ্রামের ছেলেমেয়েরা যাত্রা শুনতে এসেছিল, এসে তারা বাবুদের মজাই দেখতে লাগলো! ক্রমে বাবুদের ভাব গাঢ় হয়ে এলো। সুতরাং সকলেই হাত ধরাধরি করে হনুকে ঘিরে নাচতে লাগলেন।' বাংলার প্রাচীনতম লোকনাট্যকলা কৃষ্ণযাত্রার এই শোচনীয় অবস্থা তথা দুর্গতি যখন বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে, তখন রুচিবিকৃতি ও সাংস্কৃতিক অবনতির কথা ভেবে সার্বিক পরিবর্তনের দিকে গভীরভাবে মনোযোগী হয়েছিলেন চন্দননগরে মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়। যিনি তাঁর সমকালে মদন মাস্টার নামে সমধিক পরিচিত হয়েছিলেন। আধুনিক বাংলাযাত্রার তিনিই প্রথম প্রবর্তক।

মদনমোহনের পূর্বে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা এবং গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। গোবিন্দ অধিকারী, নিজে ভাল গান গাইতে না পারলেও, বৈষ্ণব ভক্ত ও কবি ছিলেন, তাঁর রচিত গীতগুলি দীর্ঘকাল যাত্রামোদীদের আকর্ষণ করেছে। 'আদিরসাশ্রিত প্রীতিপ্রদ গীতিস্রোতে যখন বিদ্যাসুন্দর যাত্রার চটুল আয়োজনে চারদিক ভাসমান, সেসময় গোবিন্দ, 'সকরুণ বক্তৃতায় ও সুমধুর প্রেম গানে' সমস্ত বঙ্গদেশকে মাতিয়ে তোলেন এবং যাত্রা আসরে তাঁর প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়ে ওঠে। তাঁর যাত্রা দলটি কালীয় দমন যাত্রা দল নামে সুপরিচিত ছিল। তাঁর গুরু বদন অধিকারীর বাড়ি ছিল হুগলির জিরাট গ্রামে, পুরাতন প্রথার কৃষ্ণযাত্রার তিনিই সর্বশেষ যাত্রাওয়ালা। গোবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন, হুগলি জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের কাছে জাঙ্গীপাড়ায়। সংলাপ ও সংগীত রচনার ক্ষেত্রে তিনি নতুনত্ব সঞ্চার করে কৃষ্ণযাত্রাকে সমকালীন দর্শক সমাজের কাছে সমাদরযোগ্য করেছিলেন। কলকাতা শহরেও একদা তাঁর যাত্রাগান বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। গোবিন্দ অধিকারীর অনুকরণে অনেক দল সৃষ্টি হয়েছিল। গোবিন্দর মৃত্যুর পর, তাঁর প্রধান ও প্রিয় শিষ্য ব্রজমোহন দাস কিছুদিন তাঁর দলটি চালনা করেন, পরে তাঁর নামেই দলটি খ্যাতি প্রাপ্ত হয়। প্রথমে 'কালীয় দমন', পরে 'কৃষ্ণ-মঙ্গল', 'মানভঞ্জন', কলঙ্কভঞ্জন', ও মাথুর পালা অভিনয় করেন। গোপালচন্দ্র অধিকারী নামে আর এক ব্যক্তি ওই সব পালা গান করতেন। কৃষ্ণযাত্রা গান করে গোবিন্দ প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত জমিদারি পর্যন্ত খরিদ করেছিলেন। তাঁর সময় 'প্যালা' দেওয়ার রীতি অত্যন্ত আবশ্যিক হয়েছিল, দর্শকরা

যাত্রাগানে মুগ্ধ হয়ে রুমালে টাকাটা শিকাটা বেঁধে আসরে নিক্ষেপ করতেন। গোবিন্দ অধিকারী কোনো কোনো আসরে শতাধিক টাকা 'প্যালা' পেতেন, কখনো ধনবানদের কাছ থেকে বখশিস পেতেন শালের জোড়া, ধনী-গৃহিনীরা উপহার দিতেন স্বর্ণালঙ্কার।

যাত্রার আসরে অকারণ ভাঁড়ামি ক্রমে অশ্লীলতায় পর্যবসিত হয়ে কখনো কখনো নিছক 'প্যালা' আদায়ের লক্ষ্যে যাত্রাভিনয়ের পরিবর্তে কোন একটা হৈ হট্টগোল তৈরি হত। মদনমোহন যাত্রায় এই 'প্যালা'-প্রথা বন্ধ করে দেন। যেজন্য প্রকৃত যাত্রানুরাগী দর্শকরা যাত্রার প্রতি পুনরায় আকর্ষণ বোধ করেন। মদনমোহনকে অনুসরণ করে অপরাপর দলও এই 'প্যালা' নেওয়ার রীতি তুলে দিয়েছিলেন। নাচ-গান-অভিনয়-যাত্রা গানের প্রধান তিনটি উপকরণের সর্বাত্মক পরিবর্তন সাধন করে, যাত্রা-সংস্কারকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রচলিত সংগীত রীতি মতিলাল রায় ও ব্রজমোহন রায় তাঁদের পালায় বিশেষভাবে অনুসরণ করেছিলেন। ব্রজমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন হুগলি জেলার জিরাটের বলাগড় তেঁতুলিয়া গ্রামে। শৈশবে পিতৃহীন ব্রজমোহন, সংগীতপ্রেমী, পাঁচালি নিয়ে খ্যাতি পেয়েছিলেন। নিজে পরে একটি যাত্রা দলও করেছিলেন। মতিলাল রায়ের চেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ হয়েও, মতিলাল-এর প্রভাবে তিনি নিজেকে পুষ্ট করেছিলেন। তাঁর নিজস্বতাও নিঃসন্দেহে সমকালে নন্দিত হয়েছিল পালাকার হিসেবে।

যাত্রার আসরে খ্যামটা নাচের প্রচলন হয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে চন্দননগর চুঁচুড়া অঞ্চল থেকে। 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার খ্যামটা নাচের প্রভাবে যাত্রার কিছুটা অবনতি দেখা দেয়, কলকাতা নিবাসী বীরনৃসিংহ মল্লিকের দলের জন্য হুগলির সিঙ্গুর নিবাসী ভৈরবচন্দ্র হালদার 'বিদ্যাসুন্দর' পালার জন্য গান রচনা করে দিয়েছিলেন সেই গান গেয়ে কাশীনাথ ওরফে কেশে ধোপা গোপাল উড়ের দলে মালিনী সেজে নাচে গানে আসর মাত করে দিতেন। তাঁর মতো সুগায়ক ও নর্তক সেকালে আর কেউ ছিল না। গোপাল নিজেও গাইতেন। গোপালের দলটিও প্রথমে চন্দননগরে ছিল, পেশাদার দলে পরিণত হওয়ার পর।

সমগ্র বঙ্গদেশে যখন পেশাদার যাত্রার প্রবল জনপ্রিয়তা দেখা দেয়, তখন চন্দননগর (ফরাসডাঙায়) ক্রমান্বয়ে পেশাদার যাত্রার একটি বাজার গড়ে ওঠে। গোপাল উড়ের যাত্রার পর শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী রিষড়া গ্রামের কৈলাসচন্দ্র বারুই 'বিদ্যাসুন্দর' পালার দল, সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। ক্রমান্বয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার মধ্য দিয়ে প্রকৃত রাগরাগিনী বিসর্জিত হয়ে মিশ্র বা জংলা সুর সমাদৃত হতে শুরু করে এবং অবধারিতভাবে সেই পথেই রুচি বিকৃতি ঘটতে থাকে। সুর, তাল, লয়, মান, বেশবিন্যাস, কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি অরুচিকর না হলেও এক নৃত্যের উদঘটনে যাত্রার সমগ্র শোভাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। 'বিশ্বকোষ'এর ভাষায় : "কি মেহতর, কি ভিস্তি, কি মালিনী, কি বিদ্যা সকলেই নৃত্য দ্বারা দর্শকমণ্ডলীর তৃপ্তিসাধন করিতে প্রয়াস পাইত। যাত্রায় কৃষ্ণের নৃত্য, রাধার নৃত্য, রাবণের নৃত্য, সীতার নৃত্য, কৈকেয়ীর নৃত্য, প্রভৃতি অরুচিকর ও সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত এবং অসম্ভাবজনক ব্যাপারের অবতারণা বড়ই শ্লেষকর। রাধা, সীতা প্রভৃতি দেবোপম কুলবধূর, বিদ্যার ন্যায় সম্ভ্রান্ত বংশীয় রাজকন্যার এবং মালিনীর ন্যায় বৃদ্ধা ফুলওয়ালীর পক্ষে এরূপ নৃত্য যে কিরূপ বীভৎস রসের ব্যঞ্জক তাহা সহজে অনুমান করা যায় না।"

যাত্রার এরকম অধঃপতনের কালে সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মদনমোহন। এর পূর্বে গুরুপ্রসাদ বল্লভের চণ্ডীযাত্রা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল, দীনেশচন্দ্র সেন এবং অনাথকৃষ্ণ দেব, গুরুপ্রসাদকে অদ্বিতীয় যশস্বী হিসেবে আখ্যাত করেছিলেন। পেশায় শিক্ষক মদনমোহন, 'কর্মসূত্রের কুচক্রে' পড়ে

সখের যাত্রার দল সংগঠন করেছিলেন। তাঁর দলে 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'ধ্রুবচরিত্র', 'দুর্গামঙ্গল', 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী', 'রামবনবাস' ও 'হরিশ্চন্দ্র' অভিনীত হত। কেউ কেউ বলেন তাঁর দলে 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রাও গীত হয়েছে। চন্দননগরের বেশোহাটা শিবতলায় প্রথম 'প্রহ্লাদ চরিত্র' অভিনীত হয়। বহুদিন ধরে বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে সুকৌশলে তিনি দল পরিচালনা করে সুনাম অর্জন করে, মূলত আর্থিক কারণে দলটিকে পেশাদার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর যাত্রা সংস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখ্য কৃতিত্ব হল তিনিই যাত্রাদলে প্রথম 'জুড়ি'র ও 'ছোকরা'র গানের প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। পূর্বে যাত্রায় সংগীতের সংখ্যাই অতিরিক্ত ছিল, মদনমোহন গানের সংখ্যা কমিয়ে কথোপকথনের অংশ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরই প্রভাবে অপরাপর যাত্রা দলে 'প্যালা' গ্রহণের কুপ্রথা বর্জিত হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, তিনি সখের দল থাকা অবস্থায় প্যালা গ্রহণ করলেও, চুঁচুড়ার এক সুবর্ণবণিক ধনীগৃহে যাত্রা করার সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর প্যালা নেবেন না। মদনমাস্টারের পর তাঁর পুত্র নবীনমাস্টার কিছুকাল দল চালিয়ে খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন, আবার নবীন-এর মৃত্যুর পর তাঁর অসামান্য বুদ্ধিমতী পত্নী কৈলাসকামিনী যে দলের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সেটি 'বউমাস্টারের দল' নামেই সর্বত্র পরিচিতি লাভ করে। সেসময় পর্যন্ত মদনমোহনের সুনাম বাহিত হয়ে দলটি বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। অনেকদিন ধরে 'বউমাস্টারের' দলের পালাগুলি সমাদরের সঙ্গে অনেক যাত্রার দলে গীত হয়েছে। মাস্টারের দলে কালী ও কৃষ্ণ নামে দুই যমজ ভ্রাতা স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ে অত্যন্ত যশস্বী হয়েছিলেন, তাঁরাই পরে দলের পরিচালক হিসেবে কাজ করতেন। তাঁরই প্রভাবে পরবর্তীকালে নবদ্বীপের বিখ্যাত যাত্রা অধিকারী নীলমনি কুণ্ডুর পত্নীও দল সংগঠনে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন যা 'বউ-কুণ্ডুর' দল হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। মদনমাস্টারের সমসাময়িক কালে বেন্দা চাঁড়াল নামে এক ব্যক্তি একটি যাত্রার দল করেছিলেন — তিনি অবশ্য কেবল 'দুর্গামঙ্গল' গাইতেন। এ দলের সঙ্গে মদনমোহনের দলের কোনো সম্পর্ক ছিল না। 'বউমাস্টারের' দলের সময়ে আর দুটি দলও খ্যাতির অধিকারী হয়েছিল, অবশ্য মাস্টারের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ঢোল বাদক হিসেবে মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং অন্যজন নবীনচন্দ্র গুই। রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি মদনমোহনের দলেরই 'জুড়ি' ছিলেন তিনিও একটি দল করেছিলেন। আবার রামচন্দ্রর দলে রামলাল চট্টোপাধ্যায় পৃথক দল করেন। এদের পর যাদু গুঁই, রাধামাধব মুখোপাধ্যায়, কালী রায়, দোয়ারি যুগী, দুর্গাচরণ নিয়োগী, নবীন ঘোষ, শ্যামাচরণ ঘোষ, সীতানাথ জেলে, কালী হালদার, গয়ারাম কোঙার, লালু আচার্য, সন্ধ্যা বাউরি, দয়াল চন্দ্র প্রমুখ আরো অনেকেই যাত্রার দল করেছিলেন। এদের অনেকেই মদনমোহনের দলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। দুর্গাচরণ নিয়োগীর দলটি প্রথমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উমেশ আচার্য। এ দলে প্রথমে 'শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ' ও পরে 'রাম বনবাস' অভিনীত হয়েছিল।

অনেকে মনে করেন, দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অর্থানুকুল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় চন্দননগরের কবিগান ও যাত্রাদলগুলি বিশেষ ভাবে সমাদৃত হত। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন গীতবাদ্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ সর্বজনবিদিত ছিল, তখন যাত্রাদলগুলির প্রভাব অত্যধিক না হলেও, তাঁর অনুসরণে পরবর্তীকালে যাত্রাচর্চার ক্ষেত্রেও একটা প্রবল আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ফরাসডাঙার যাত্রাদলের খ্যাতি এমনই বর্ধিত হয়েছিল যে, বাইরের দলগুলিও সেই পরিচয়কে অত্যন্ত গৌরব জনক মনে করতেন, ব্যবসার পক্ষে লাভজনক হবে এই বিবেচনায় তারা এক এক করে চন্দননগরে নিজেদের প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। দাশরথী রায় চন্দননগরের অধিবাসী না হলেও তাঁর দলের 'আখড়া' বা কার্যালয় চন্দননগরে স্থাপিত হয়েছিল। প্রসন্ন নিয়োগীর দল ঠিক এই অঞ্চলেই প্রথম স্থাপিত হয়, তিনি চন্দননগরের লোক ছিলেন। তাঁর দলের ম্যানেজার ছিলেন

বাঘনাপাড়া নিবাসী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি ভাল অভিনেতাও ছিলেন। যাত্রাদল চালাতে গিয়ে প্রচুর ঋণ হওয়ার জন্য গণেশ ঘোষ-এর কাছে দলটি বিক্রি হয়ে যায়। পরে দলটি গণেশ অপেরায় পরিণত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে চন্দননগরে যে কয়েকটি সখের দলও বেশ পরিচিতি লাভ করে তার মধ্যে 'চন্দননগর নাট্য সমাজ', 'চন্দননগর সংগীত-সমাজ', 'বারাসাত বান্ধব-নাট্য সমাজ', লালবাজার ও গোন্দলপাড়ার পালাদলগুলিই বিশেষ উল্লেখ্য। লালবাজারের দলের অধ্যক্ষ ছিলেন নীলমণি দত্ত, সে দলে প্রথম 'তরণীসেন বধ' অভিনীত হয়। 'চন্দননগর নাট্য সমাজ' ১৩০৮ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রী রাধাকান্ত জীউর ঠাকুরবাটীতে প্রথম 'জনা' অভিনয় করেন। এ দলের অধ্যক্ষ ছিলেন রাধানাথ দে, যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, নারায়ণচন্দ্র দে ও শশীভূষণ চক্রবর্তীর নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। মাত্র পাঁচ রাত্রি অভিনয় করে সে দল বন্ধ হয়ে যায়, পরে, ১৩২২ বঙ্গাব্দে পুনরায় সেটি চালু হয়। তাঁদের দলে 'জনা' 'প্রভাবতীমিলন', 'গয়াসুর' ও 'কলি-পরাজয়' বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। সমসাময়িককালে বারাসাতের দলটিও বেশ পরিচিতি লাভ করেছিল, দলটির প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা ছিল গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চূড়ামণি দে, প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সংগীত-সমাজ', প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রফুল্লনাথ অধিকারী, সে দলে অভিনীত হয় 'জনা', 'ভীষ্ম', 'প্রতিজ্ঞাপালন'। এ দলের সম্পাদক ছিলেন সতীশচন্দ্র শেঠ। গোন্দলপাড়ার দলটিতে অভিনীত হয় 'পাণ্ডব গৌরব'।

চন্দননগর তথা ফরাসডাঙ্গায় যাত্রার বাজার প্রসারিত হওয়ার আর একটি প্রধান কারণ, কলকাতায় পেশাদার রঙ্গালয় স্থাপিত হলে তদানীন্তন দর্শকরা এই নতুন নাট্যমাধ্যমটির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, তখন কলকাতায় স্বাভাবিক ভাবেই যাত্রার পসার কিছুটা কমতে থাকে। সুতরাং ফরাসডাঙাকে কেন্দ্র করে যাত্রার অধিকারী সম্প্রদায় নিজেদের বাণিজ্য ক্ষেত্রটিকে জমজমাট করার অভিলাষী হন। দেখা যায় জাজপুরের গোবিন্দপাঠক, হেজলোক গ্রামের পীতাম্বর দাস, শাহানগরের দুর্লভ দাস, সায়রাবেড়ের অদ্বৈত পাল, বাঁকুড়া জেলায় চন্দ্রকোণার দ্বিতীয় গোবিন্দ অধিকারী, মেদিনীপুর জেলার শ্রীমন্তপুরের শ্রীনাথ চক্রবর্তী ও গিরিশ চক্রবর্তী ফরাসডাঙাতে কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসা করতেন। হুগলির সিঙ্গুর অঞ্চলের হরিদাস মন্ডল, এবং হুগলিরই গোপীনাথপুর নিবাসী কৃত্তিবাস মন্ডল, দুজনেই মহাভারতের পালাভিনয়ে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। কলকাতায় নবীন ডাক্তারের দল যাঁরা 'সীতার পাতাল প্রবেশ' গান গেয়ে অত্যন্ত সুনাম পেয়েছিলেন, তারাও ফরাসডাঙাতেই তাদের গদিঘর স্থাপন করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফরাসডাঙায় যে দলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটি তাঁর নামেই বিখ্যাত হয়েছিল, তাছাড়া হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'কালাপাহাড়' অভিনয়ে তাঁদের এমন সুখ্যাতি হয়েছিল যে দলটি 'কালাপাহাড়ের দল' নামেও অভিহিত হত। এ ছাড়া, গুরুপ্রসাদ বল্লভের দলটিও বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, কৃষ্ণযাত্রাগানের জগতে কিংবদন্তীপুরুষ নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, যিনি শ্রোতৃসমাজে 'কণ্ঠ' বা 'কণ্ঠমহাশয়' নামে সমধিক পরিচিতি পেয়েছিলেন, তিনি গোবিন্দ অধিকারীর দলে দীর্ঘকাল অভিনয় করে সুখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর জন্ম হুগলি জেলায় না হলেও, তাঁর প্রয়াণ হয়েছিল ত্রিবেণীর গঙ্গাতীরে।

জন্মসূত্রে অবশ্য আধুনিক কালের কৃতবিদ্য একজন যাত্রাপালাকার, নির্দেশক অভিনেতা ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের নাম উল্লিখিত হতে পারে, যিনি মাস্টারমশাই হিসেবে একটি সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, তাঁর জন্ম হয়েছিল হুগলি জেলার চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত গরলগাছা গ্রামে মাতুলালয়ে। এই জেলার অন্তর্গত সোমরা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন আর একজন পালাকার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি 'দক্ষিণা' এবং 'ভদ্রাপরিণয়' নামে দুটি পালা লিখেছিলেন। পাকড়ি গ্রামনিবাসী বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আর একজন সুনামী পালাকার, যিনি ব্যক্তিগত জীবনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক

ছিলেন। তাঁর পালায় দেশপ্রেম, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, দেশের অব্যবস্থা ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ মূর্ত হয়েছে, কলকাতার পেশাদার যাত্রাদলে তাঁর অনেক রচনাই যথেষ্ট বিখ্যাত হয়েছিল। প্রখ্যাত পালাকার নন্দগোপাল রায়চৌধুরীও তাঁর শেষ জীবনের কয়েকবছর অতিবাহিত করেন বেগমপুরে। এরই সমসাময়িক জনপ্রিয় নট ও পালাকার আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন হুগলি জেলার গোপালপুর-এর আঁকুনি গ্রামে। ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র সমকালে আনন্দময় পালারচনায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়ে নিজের একটা স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলেন, কলকাতার পেশাদার যাত্রায় পালাকার হিসেবে তিনি দীর্ঘকাল ধরে সুনাম রক্ষা করেছেন। বাংলা যাত্রার ঐতিহাসিক পালা লিখে খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন গৌরচন্দ্র ভড়, যিনি হুগলি জেলার ধনিয়াখালি সোমসপুরের অধিবাসী ছিলেন।

হুগলি জেলার সেওরা-আমডোবার প্রভৃত ভূসম্পত্তির মালিক কলকাতার স্বর্ণব্যবসায়ী শ্রীচরণ ভান্ডারী 'সিমুলিয়া নাট্য সমাজ' নামে একটি যাত্রার দল খুলেছিলেন, যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, তার সমস্ত এস্টেট ক্রয় করে নিয়ে মতিলাল রায়ের অনুকরণে বালক অভিনেতাদের মাথার টুপিতে দলের নাম 'শ্রীচরণ ভান্ডারী' লেখা থাকত। বিশের দশকের শুরুতে দলটির নামকরণ হয় ভান্ডারী অপেরা নামে। পরে তাঁর পুত্র মাধবচন্দ্র দলের অধিকারী হন। এই ভান্ডারী অপেরায় বলাগড় নিবাসী 'পঞ্চুনাগা' বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বলাগড়েরই আর একজন কীর্তিমান অভিনেতার নাম কালীকিংকর গুহ। যাত্রার সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে নারায়ণচন্দ্র দত্ত-র নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে — তিনি হুগলি জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগর অঞ্চলের চক্রপুর গ্রামের অধিবাসী। যাত্রার নতুন গৎ প্রচলনকারী নারায়ণ, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'ভৃগুচরিত' পালায় প্রথম ক্লারিওনেট বাঁশি প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি মথুরানাথ সাহা থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি, নবদ্বীপ বঙ্গ নাট্যসমাজ, ভবতারিণীর দল, প্রসন্ন নিয়োগীর দল প্রভৃতি সংস্থায় দীর্ঘকাল বংশীবাদক হিসেবে কাজ করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন।

ইদানীন্তনকালে, অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে বাংলা যাত্রার যে নতুন জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছিল, তা অনেক প্রতিভাবান অভিনেতার আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে দুই বিপরীত ধরনের, কিন্তু প্রায় সমানভাবেই সমাদৃত হয়েছিলেন দুই বলিষ্ঠ অভিনেতা। একজন দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, দীর্ঘকাল ধরে 'সোনাই দীঘি' পালার ভাবনাকাজী চরিত্রায়ণেই তিনি খ্যাতির শীর্ষস্থানে আরোহণ করেছিলেন, প্রধানত খলচরিত্রের অভিনয়েই তাঁর খ্যাতি, কিন্তু অন্যান্য চরিত্রেও তাঁর পারদর্শিতা সর্বজনবিদিত। হুগলি জেলায় চকবাজারে এক প্রখ্যাত জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সত্তরের দশকে 'গণনাট্য' নামে একটি যাত্রার দলের প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রয়াণের সাতবছর আগে, নব্বই-এর শুরু পর্যন্ত যাত্রাভিনয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নামের সঙ্গে 'নটসূর্য' এই উপাধি ব্যবহৃত হয়ে তাঁর অভিনয়-গৌরব বাংলা যাত্রার দর্শকদের কাছে স্মরণীয় হয়েছিল। তাঁর জীবিতাবস্থাতেই পুত্র সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় যাত্রায় নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। চুঁচুড়ার বড়বাজারে সমসাময়িক কালের আর এক প্রখ্যাত অভিনেতা রাধারমণ পাল-এর নামও স্মরণযোগ্য, কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চেই কৌতুক অভিনেতা 'হাস্যার্ণব' হিসেবেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। যাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন মঞ্চের 'মিশরকুমারী' নাটকের 'কাকাতুয়া'র জনপ্রিয়তা নিয়ে। যাত্রাতেও তাঁর খ্যাতি অক্ষুন্ন ছিল, শুধু তাই নয় আসরের অভিনয়ে হাস্যরস পরিবেশনে তিনি সম্পূর্ণ নতুন ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। বর্তমানে তাঁর একমাত্র পুত্র প্রীতম পাল সেই ধারা অক্ষুন্ন রেখে

পেশাদার যাত্রায় খ্যাতিমান কৌতুক অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়েছেন। এঁদের পাশাপাশি মূলত অভিনয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন পান্না চক্রবর্তী, হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। একদিকে বাচনিক অভিনয়ে তাঁর খ্যাতি অন্যদিকে শারীর অভিনয়ে তাঁর দক্ষতা, যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে একটা নতুন যুগ সৃষ্টি করেছিল। যাত্রাজগতের সৌভাগ্য এখনো তিনি সেই প্রবীণদের মধ্যে অন্যতম, যিনি আজো যাত্রা জগতের সঙ্গে অভিনেতা-নির্দেশক হিসেবে যুক্ত হয়ে আছেন। বর্তমান যাত্রাজগতে ফণি ভট্টাচার্য, যিনি প্রধানত খলপুরুষচরিত্রে রূপদান করেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, একদা তিনি যাত্রাভিনয়ে পুরুষরানি হিসেবেই সমাদৃত হয়েছিলেন। বিশেষত প্রখ্যাত নট্ট কোম্পানি যাত্রাদলে তাঁর নারী চরিত্রের অভিনয় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল। চন্দননগরে দীর্ঘকাল ধরে বাস করছেন আর এক প্রতিভাবান পালাকার-অভিনেতা-নির্দেশক নির্মল মুখোপাধ্যায়, জন্ম পূর্ববঙ্গে হলেও, যাত্রায় তাঁর খ্যাতি শুরু হয়েছে বলা যায় চন্দননগর থেকেই। আধুনিককালে পালাকারদের মধ্যে তিনি শুধু অন্যতম একজন নন, 'মুক্তঅঙ্গন' নামে যাত্রাদলটির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও তাঁর নাম সর্বজনবিদিত। আর একজন তরুণ পালাকার জ্যোতির্ময় দে বিশ্বাসও চন্দননগরেই দীর্ঘকাল ধরে বাস করছেন।

চন্দননগরকে কেন্দ্র করে যাত্রার যে বাণিজ্যিক প্রসার ঘটেছিল, তাতে অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তিও যাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। হুগলি নাটাগড়ের জমিদার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বীণাপাণি নাট্যসমাজ, তবে তাঁর দলটির প্রধান কার্যালয় ছিল কলকাতার পাথুরিয়া-ঘাটা স্ট্রিটে। সাম্প্রতিক কালে বহুবিখ্যাত 'ভারতী অপেরা'র স্বত্বাধিকারী প্রয়াত কালিপদ ঘোষ-এর জন্মস্থান আরামবাগের ভাদুর গ্রাম। তিনি নিজেও একজন কৌতুক-অভিনেতা হিসাবে আঞ্চলিক কয়েকটি দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দল সংগঠক ও ম্যানেজার পদেও তিনি তাঁর দক্ষতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তারই ফলশ্রুতি নিজেই 'ভারতী অপেরা' নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন আরামবাগে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সে দলটিকে কলকাতায় নিয়ে আসেন স্থায়ীভাবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কালিপদ, তাঁর বন্ধু জানকী মেদ্দার প্রচেষ্টায় দ্রুত খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন দলটিকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উক্ত ভাদুর গ্রামেই আর একজন কালীপদ ঘোষ ছিলেন বলে তাঁকে সবাই বড় কালীপদ বলতেন, তিনি মিরিয়াম চরিত্রের অভিনয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন। যাত্রার বুকিং এজেন্ট হিসেবে খুব দক্ষ একজনের নাম করা দরকার, তিনি আশুতোষ গাঙ্গুলী - হুগলি জেলার ভৈরবপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। মাত্র ষোলো বছর বয়স থেকে তিনি যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পঞ্চাশ বছরের অধিককাল কাজ করেছেন। হুগলি জেলার মুলটি গ্রামে বাড়ি করেছিলেন। আটাত্তর বছরে সেইখানে তাঁর প্রয়াণ ঘটে, খন্যান স্টেশন বাজারে 'অমর এজেন্সি' নামে একটি যাত্রা বায়না প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন তিনি। আরামবাগ মহকুমার কুলকি-র ডাক্তার ননি চাণক্য একজন জনপ্রিয় অভিনেতা, স্থানীয় অনেক দলেই তিনি রাজা চরিত্রের অভিনয় করে সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন। কুলকি-র বীরেন্দ্র রায় ছিলেন নারী চরিত্রে একজন নামজাদা অভিনেতা। প্রখ্যাত অভিনেতা জগবন্ধু মন্ডলের বাড়িও ছিল কুলকি-তে। নারী চরিত্রে কামারপুকুরের হরিনারায়ণ সিং, বিজনকোলা-র কানাই মল্লিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। বেঙাই-এর সন্নিকটে শালিঙ্ক্ষা গ্রামে রামশশি ঘোষাল এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকমল ঘোষাল দুজনেই ভালো অভিনেতা ছিলেন। কুলকি-তে 'রঘুনাথ অপেরা' নামে একটি বিখ্যাত যাত্রাদল ছিল। ওই দলে এবং গোঘাটের 'স্বরূপনারায়ণ অপেরা' নিজেদের সুনামবৃদ্ধির জন্য কলকাতার নামকরা অনেক অভিনেতাকে দলভুক্ত করতেন। আরামবাগ থেকে মাইল ছ-সাত দূরে সন্তোষপুরের অনুকূল মন্ডলের দল একদা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এখন যেমন কামারপুকুরের 'জগদ্ধাত্রী অপেরা'। কলকাতার যাত্রার চাহিদা পূরণের জন্য অনেক ছোটছোট দল প্রতিবছর

নিজেদের গড়ে তোলেন, এমন কি কলকাতার বন্ধ হয়ে যাওয়া দলগুলির খ্যাতি আত্মসাৎ করে একই নামে দল গঠন করেছেন এমন নজিরও আছে। যেমন 'নিউ জনতা অপেরা' নামে দলটি আসলে কলকাতার জনতা অপেরা নামটি অনুকরণ করে গড়ে উঠেছিল।

আরামবাগকে কেন্দ্র করে ইদানীং কালে যাত্রাচর্চার বিস্তার দেখে কেউ কেউ অঞ্চলটিকে চিৎপুরেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে অভিহিত করেন। পেশাদার এবং সৌখিন দলের সংখ্যা খুব নগণ্য নয়, এমন কি এই যাত্রাব্যবসার প্রসারটি অনুভব করা যায় স্থানীয় অনেক পোষাকের দোকান দেখলে। কামারপুকুর, তারকেশ্বর, জামালপুর, শ্রীরামপুর, মাহেশ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর সংখ্যক পোষাকের দোকান আছে।

বাংলার যে যাত্রাভিনয় আজ নানাভাবে সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে, দীর্ঘকাল আগে তার অঙ্কুরোদগম হয়েছিল হুগলিতে, যাত্রাচর্চার ধারাবাহিকতায় সেটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় যাত্রা সংস্কারের ক্ষেত্রে যে প্রবর্তকের ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তারই উত্তরাধিকার পরবর্তীকালে প্রায় দেড়শত বছরের অধিক সময় ধরে নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে। তাঁর রচিত যাত্রাপালাগুলির সন্ধান পাওয়া যায় নি, মুখে মুখে প্রচারিত সেসব রচনা যুগের অবসানের সঙ্গে লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু অসাধারণ দক্ষতা নিয়ে যাত্রার সার্বিক উন্নয়নে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন।

অস্বীকার করার উপায় নেই বর্তমান শতাব্দীর শেষ দুটি দশক যাত্রা বাণিজ্যের পক্ষে ক্রমান্বয়ে হতাশামুখী হয়ে উঠছে, অনেকটা দিশাহারা অবস্থা। বাণিজ্যিক ব্যর্থতার দায় বহন করতে-করতে যাত্রার অবনতি, এই মাধ্যমটিকে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই চরম দুর্দিনে, যাত্রার বিগত দিনের গৌরবময় ইতিহাসটি স্মরণ করার সঙ্গত কারণ আছে। বিশেষত হুগলি জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে একদা যাত্রাগানের যে নবমুক্তি ঘটেছিল, সেই প্রবহমান প্রাচীন প্রাণশক্তির থেকেই একালে যাত্রাপথিকদের নতুন করে দীক্ষিত হতে হবে আবার।



হুগলি : নাট্য চর্চা

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

[প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষক প্রাবন্ধিক প্রয়াত বিনয় ঘোষ যখন যুগান্তর পত্রিকায় পাঁচ বছর (১৯৫০-৫৪) ধরে 'কালপেঁচার বঙ্গ দর্শন'' রচনা প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রেন-বাস-রিক্সা ছাড়া পায়ে হেঁটে ও সাইকেলে পরিক্রমণ করেন তখন তাঁর প্রধান সহকারী রূপে আমি হুগলি জেলার (১৯৫১-৫৪) দেখা-শোনা-জানা-শেখার কাজে নাট্যচর্চার প্রাথমিক মালমসলা সংগ্রহ শুরু করি। যাঁদের অপরিসীম সহযোগিতা পেয়েছিলাম তাঁদের মধ্যে মহনাদের প্রভাস পাল ছাড়া বাকি সকলেই প্রয়াত (আরামবাগের ডা: রাধাকৃষ্ণ পাল, চন্দননগরের হরিহর শেঠ, চুঁচুড়া-হুগলীর প্রাণতোষ চট্টোপাধায়, বিজয় মোদক, সিরাজুল হক, হামিদুল হক, গোপেশ চন্দ্র মল্লিক ও হুগলি মহসীন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য) বিগত ১৫/১৬ বছর ধরে বেশ কয়েকটি নিবন্ধও প্রকাশ করেছি। সাম্প্রতিককালে জেলার নাট্যচর্চা প্রসঙ্গে ২/৩ জন কিছু ভুল তথ্য প্রকাশ করেছেন। শিক্ষিতজনদের এই ভুল ভবিষ্যতের গবেষণাকর্মীদের খুবই অসুবিধেয় ফেলবে। কিছুটা অন্যপ্রসঙ্গ হলেও একটি উদাহরণ দিই। ১৮৮১ -৮২ খ্রিস্টাব্দে এগারো মাস বঙ্কিমচন্দ্র পি. এ. টু ডিভিশনাল কমিশনার, বর্ধমান রূপে চুঁচুড়া জোড়াঘাটের একটি বাড়ীতে ভাড়াটিয়ারূপে অবস্থান করেন। সেই বাড়ীর প্রাচীরগাত্রে কয়েকবছর আগে মার্বেল ফলকে খোদিত হয়েছে ''এখানে বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম-এর সাধনা করেন।'' একেবারেই ভুল তথ্য। ১৮৭৬ -এ নৈহাটি কাঁঠালপাড়ার বৈঠকখানাঘরে বঙ্কিম বন্দেমাতরম রচনা করেন। তাঁর ও তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের ডাইরি বঙ্কিমসংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে। বিখ্যাত শরৎ গবেষক গোপাল রায় উক্ত সংগ্রহশালার কিউরেটর। যে কেউ ওখানে গিয়ে দেখে ও জেনে আসতে পারেন। সরকারী আধিকারিকদের নিয়োগ ও বদলী সংক্রান্ত সংবাদ যেখানে ছাপা হয় সেই ক্যালকাটা গেজেটের সমসাময়িক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় ১৮৮১-৮২ এগার মাস বঙ্কিম পি. এ. টু ডিভিশনাল কমিশনার রূপে হুগলীতে থাকেন। ১৮৮২-৮৩ তে আনন্দমঠ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রেসে যায় এবং বঙ্কিম ঐ গ্রন্থে বন্দেমাতরম্ গানটি সন্নিবেশিত করেন।

আলোচ্য নিবন্ধে আমি মোটামুটি প্রামাণ্য তথ্যাদিই নিবেদন করার চেষ্টা করেছি। সাধারণভাবে হুগলি জেলার এবং বিশেষভাবে হুগলি-চুঁচুড়া অঞ্চলের নাট্য চর্চার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা স্থান পেয়েছে। — প্রবন্ধকার।]

এক

সম্প্রতি জনৈক প্রবন্ধ লেখক বলেছেন ১১-১২ শতকের শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র (সংস্কৃত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের রচয়িতা) হুগলি জেলার মানুষ। ভুল কথা -কোনো প্রমাণ নেই। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ কৃষ্ণ মিশ্র আদৌ বাঙালী কিনা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন — অবিভক্ত বাংলার কোনো জায়গার তিনি অধিবাসী ছিলেন এমন কোনো বক্তব্য তাঁরা রাখেন নি। তবে প্রসঙ্গত স্মরণীয় (আমি দীর্ঘ কয়েক বছর গবেষণা করে জেনেছি) 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের প্রথম বঙ্গানুদিত গ্রন্থ ''আত্মতত্ত্বকৌমুদী''-ই মুদ্রিতাকারে সর্বপ্রথম বাংলা নাট্য গ্রন্থ (১৮২২) এবং পরবর্তীকালে (১৮৬২) শ্রীরামপুরের জনৈক পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের বঙ্গানুবাদ ''মনোযাত্রা নাটক'

প্রকাশ করেন। অবশ্য কৃষ্ণ মিশ্রের মূল নাটকে "বঙ্গাল" ও "বঙ্গালী" শব্দের একাধিক উল্লেখ পাওয়া যায়।

নাট্যচর্চায় বাঙ্গালীর হাজার বছরের লোকনাট্য যাত্রাগানের কথা অবশ্যই স্মরণীয়। যাত্রাগানের ইতিহাসে অন্তত শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) পরবর্তীকালে হুগলি জেলার (তদানীন্তন কালে বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত) গ্রামাঞ্চলে অন্তত যে যাত্রাগানের জনপ্রিয় প্রচলন ছিল তা না মানার কোনো উপায় নেই — বিশেষ করে এই অঞ্চলে বৈষ্ণব প্রভাব যখন উল্লেখযোগ্য এবং কৃষ্ণযাত্রার প্রবর্তক শিশু অধিকারী এবং গোবিন্দ অধিকারী এই জেলারই মানুষ ছিলেন।

দুই

মহাদেশকল্প ভারতবর্ষে হুগলি-চুঁচুড়াই একমাত্র শহর বা জনপদ যেখানে পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-আর্মেনী--ফরাসি-ইংরেজ ইত্যাদি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ঘাঁটি স্থাপন করেছে এবং নিজেদের স্বার্থেই এ অঞ্চলের সামাজিক কর্মজ্ঞানপ্রয়াসে অংশগ্রহণ করে কিছু না কিছু কীর্তি রেখে গেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের (১৭৯৩) অব্যবহিত পরে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় বৎসর অন্তত দুটি কারণে — (১) রাজনৈতিকভাবে হুগলি জেলার প্রবর্তন (২) গেরাসিম স্টেফানোভিচ লেবেদেফ (সম্প্রতি কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি "লিয়েবেদেফ" বানান ব্যবহার করেছেন) নামে জনৈক রুশ দেশীয় শিল্পী কর্তৃক কলকাতা ডুমতলা লেনে প্রথম বাংলা থিয়েটার ও থিয়েটারী নাটক "কাল্পনিক সংবদন -এর মঞ্চ উপস্থাপনা (২৫ নভেম্বর ১৭৯৫ খ্রি:) হুগলী-চুঁচুড়া প্রসঙ্গে উল্লেখ্য লেবেদেফের বাংলা থিয়েটার প্রবর্তন ও থিয়েটারী নাটক প্রয়াসে এবং তারও পূর্বে লেবেদেফের সংস্কৃত বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যাপকতা হুগলি জেলার তিনজন বাঙালীর সর্বতোমুখী সহযোগিতা — (১) গোলকনাথ দাশ — যিনি লেবেদেফের নাটক রচনা ও প্রযোজ্য মহিলা চরিত্রে এদেশীয় মহিলা শিল্পীদের সংগ্রহ করেন এবং পরবর্তীকালে রামমোহন রায়ের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে অন্যতম সহকারী হন। (২) ত্রিবেণীর শ্রুতিধর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন যিনি লেবেদেফের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শিক্ষার অন্যতম গুরু (৩) গুপ্তিপাড়ার অধিবাসী এবং পরবর্তীকালে কলকাতার জজ পণ্ডিত জগমোহন ভট্টাচার্য — যিনি লেবেদেফের ব্যাকরণ শিক্ষার শিক্ষক ছিলেন। আমাদের জানা আছে, বাংলা থিয়েটার ও থিয়েটারী নাটক রচনায় (ইংরাজি 'দি ডিসগাইজ' নাটকের বঙ্গানুবাদ) প্রবর্তকরূপে লেবেদেফ স্মরণীয় ও বরণীয় হলেও তদানীন্তন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্ণধারগণ কর্তৃক লেবেদেফ লাঞ্ছিত অপমানিত ও এদেশ থেকে বহিষ্কৃত (১৭৯৭) হবার পর ৩০/৩৫ বছর বাঙালী সামাজিকবৃন্দ বাংলা নাটক রচনা ও থিয়েটারী প্রয়াসে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি — যদিও বিচ্ছিন্নভাবে শ্রীরামপুরের পাদ্রিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে (১৮০১ - ১৮০২) জনৈক মন্টন সাহেব ক্লাস-একসারসাইজ রূপে কিছু কিছু ইংরাজি নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রয়াসে প্রয়াসী হন এবং পরে ১৮২২ থেকে ১৮২৯ -এর মধ্যে কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হুগলি মহসীন কলেজের মিনিট্স্ -এ অন্যান্য তথ্যাদি থেকে জানা যায় — কলকাতা হিন্দু কলেজের (ডিরোজিও - রিচার্ডসনের নেতৃত্বে) নাট্যচর্চার অনুসারী বেশ কিছু প্রয়াস দেখা যায়। বেশীর ভাগই ইংরাজি নাটকের অংশবিশেষের অভিনয়।

উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে পারিবারিক মঞ্চে কলকাতায় বাংলা ও বাঙালীর নাট্যচর্চার সূচনা হলেও হুগলির প্রথম নাট্যব্যক্তিত্ব হলেন বৈষ্ণচরণ আড্য যিনি কলকাতায় ইংরেজদের সাঁসুচি থিয়েটারে মূল ইংরাজিতে ওথেলো নাটকের নাম ভূমিকায় (১৮৪৮) অসাধারণ অভিনয় করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

বাংলা প্রথম মৌলিক নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' রচনার প্রায় একই সময়ে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হুগলির সন্তান হরচন্দ্র ঘোষ সেক্সপীয়ারের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'-র বাংলা রূপান্তর "ভানুমতী চিত্তবিলাস" প্রকাশ করেন এবং শিক্ষিত বন্ধুদের নিকট চুঁচুড়া বড়বাজারের এক বাড়ীতে পাঠ করে শোনান। আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। মুদ্রিত গ্রন্থের ১ম সংস্করণের আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে — "হুগলি স্কুলের পূর্ব ছাত্র হরচন্দ্র ঘোষ।..... হরচন্দ্রের জন্ম হুগলিতে, পৈত্রিক নিবাস খানাকুল কৃষ্ণনগরে, বাল্যশিক্ষা হুগলি বিদ্যালয়ে। এর পরে তিনি কলকাতা হিন্দু কলেজের অন্যতম কৃতীছাত্র। ভানুমতী চিত্তবিলাস গ্রন্থাকারে প্রকাশের অব্যবহিত পরে তিনি মালদহে আবগারী বিভাগের সুপারিনটেনডেন্টরূপে বদলী হন।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই শনিবার চুঁচুড়ায় নরোত্তম পালের গৃহপ্রাঙ্গণে "কুলীনকুলসর্বস্ব" নাটকের সর্বপ্রথম অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ব্যবস্থাপক হিসেবে ছিলেন রামচন্দ্র দীক্ষিত। সঙ্গীতরচয়িতা ও গায়ক ছিলেন সে যুগের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রূপচাঁদ পক্ষী। কর্মাধ্যক্ষ, সভাপতি, সহকারী ব্যবস্থাপক ও কোষাধ্যক্ষরূপে ছিলেন যথাক্রমে ব্রজনাথ চন্দ, ভগবতীচরণ লাহা, প্রবোধ চন্দ্র মণ্ডল ও নিমাই চরণ শীল। প্রায় ন'শজন শ্রোতা এ অভিনয় দর্শন ও উপভোগ করেন। ১১ জুলাই ১৮৫৮-র সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় 'কদাচিৎ চুঁচুড়া নিবাসী দর্শকস্য-র পত্র থেকে জানা যায় — "অভিনয় প্রদর্শন অতি সুচারুরূপে হইয়া গিয়াছে, অভিনেতাদের অঙ্গভঙ্গি ও বাক্যকুশল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া দর্শক মাত্রেই আমোদী হইয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সাহিত্য সম্ভার থেকে জানা যায় "রূপচাঁদ পক্ষীর বাঁধা গান হাটেবাজারে গীত হইতে থাকিল" বিশেষ করে 'অধীনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে?" বলাইবাহুল্য তদানীন্তন সামাজিক পরিবেশে এই অভিনয় সমগ্র অঞ্চলে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড সৃষ্টি করেছিল হিন্দু পেট্রিয়টের ভাষায় যাকে বলা যায় 'I'll executed burlesque টির representation এর মাধ্যমে'।

এরপর তিনটি নাট্যাভিনয়ের (হুগলী-চুঁচুড়ায়) সংবাদ মাত্র পাওয়া যায়। বিস্তৃত বিবরণ কিছু লভ্য হয় নি —

(১) চন্দ্রাবতী নাটক — হুগলি ঘুঁটিয়াবাজার (১৫/১০/১৮৭০)

(২) ধ্রুবোপাখ্যান ও যেমন কর্ম তেমন ফল — হিন্দু ন্যাশনাল (১৩/৯/১৮৭৩)

(৩) মোহন্তের এই কি কাজ? হিন্দু ন্যাশনাল ১৩/৯/৭৩ প্রথমটি সম্বন্ধে প্রয়াত জননেতা গোপেশ চন্দ্র মল্লিকের উইয়ে খাওয়া পুরানো ডাইরীর খাতা থেকে জানা যায় ঘুটিয়াবাজার মল্লিক বাড়ীর পূজার দালানে স্থাপিত সাধারণ মঞ্চ বঙ্গরঙ্গ মঞ্চে অনুষ্ঠানটি হয়। মল্লিক জানান এর একটি প্রোগ্রাম তিনি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন কিন্তু প্রায় দশ বৎসর কারাভ্যন্তরে থাকাকালীন সেটি উইয়ে কেটে শেষ করে দিয়েছে আরো অনেক মূল্যবান কাগজপত্রের সঙ্গে। তৃতীয়টি প্রহসন নাটিকা সমসাময়িক তারকেশ্বরের মহান্ত সতীশ গিরি এক বিধবা এলোকেশীর সঙ্গে কিভাবে অবৈধপ্রণয়ে লিপ্ত হন সেই কাহিনীকে ভিত্তি করে রচিত।

দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটকের বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত নাট্যরূপ - এর অভিনয়ানুষ্ঠান ১৮৭২ এর গুডফ্রাইডের দিন হুগলি ঘুটিয়াবাজারে প্রসাদদাস মল্লিকের (জননেতা গোপেশচন্দ্র মল্লিকের চিকিৎসক পিতা যাঁর নামে বর্তমানে গঙ্গার ধারের রাস্তাটি নামাঙ্কিত হয়েছে) গৃহপ্রাঙ্গণে (বঙ্গরঙ্গ মঞ্চ) অনুষ্ঠিত হয়। দর্শক ও শ্রোতারূপে উপস্থিত ছিলেন এমন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন — কলকাতা থেকে স্বয়ং দীনবন্ধু মিত্র, যশোহরের গঙ্গাচরণ সরকার, ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য-পণ্ডিতগণ, কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, মহারাজা দুর্গাচরণ পাল এবং রসরাজ অমৃত লাল বসু সহ কলকাতা বাগবাজারের 'নীলদর্পণ' অভিনয়কারী দলের সদস্যবৃন্দ। "অক্ষয় রচনা সম্ভার"

থেকে জানা যায় "খুব চুটিয়ে অভিনয় হল; লীলাবতীর মুখে মনোহরণকারী সুর শুনে সকলে অশ্রুপাত করেন। মহারাজ দুর্গাচরণ কাঁদিয়া আকুল হয়ে যশোহর জেলার ঢঙ-এ আশীর্বাদ করে বললেন 'যেমনটা শ্রোত ছিলাম, তেমনটা দ্যাখলাম। শ্রীনাথ মামার ভূমিকার রসিক চূড়ামণি সুকণ্ঠ গায়ক দীননাথ ধরের অভিনয় সুন্দর হয়েছিল।' সঞ্জীবচন্দ্র এই অভিনয়ের জন্য অনেকগুলি গান রচনা করেছেন। দীনবন্ধুবাবু নাকি নাটকের ছাঁটকাটে ব্যথিত হয়েছিলেন তবে বলেছিলেন — 'বঙ্কিমভাই আর অক্ষয় ছেলে, ইহাদের ভালবাসি বলিয়া আমার শরীরে জ্বালা নাই।"

এরপর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর চুঁচুড়া কদমতলায় সরকার বাড়ীতে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' অভিনীত হয়। এই অনুষ্ঠানেও নাট্যকার স্বয়ং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। নাটকের প্রধান চরিত্র নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্রীরামপুর কলেজের তদানীন্তন খ্যাতনামা ইংরাজি অধ্যাপক বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়। নাট্যকার নাট্যাভিনয়ের সুখ্যাতি করেন তবে নিমচাঁদের ভূমিকাভিনয় সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য 'ডেলিভারি ভাল, কিন্তু তার পার্ট খোলে নি। .... পাঁড় মাতাল নিমচাঁদ অমন আড়ষ্ট কেন? ছোকরা কি মাতাল দেখেনি? দুমাস পরে দ্বিতীয় অভিনয়ে 'ভাবের অভিব্যক্তিতে তিনি (বিষ্ণুবাবু) নিমচাঁদকে মাতালের শিরোমণিরূপে পরিস্ফুট করিলেন। দর্শকগণ নির্বাক বিস্ময়ে হাততালি দিতে ভুলিয়া গেলেন — দীনবন্ধু বাবু আহ্লাদে আটখানা হইয়া নিমে দত্তকে জড়াইয়া ধরিলেন।"

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে (বর্তমান মাধবীতলায় ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন) পুরানো ডাচ ডান্সিং হল স্থানীয় যুবকবৃন্দ পুনর্নির্মাণে তৎপর হন। তাঁরা তখন সুবিস্তৃত ও সুদৃশ্যমঞ্চ গঠন করে "গৌরাঙ্গ নাট্যসমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন। এবং এই মঞ্চে সমসাময়িককালের প্রচলিত মঞ্চসফল পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটকগুলির নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এঁদের অভিনীত নাটকগুলি গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল প্রমুখের প্রশংসা লাভ করে। এই সংস্থা প্রযোজিত বিভিন্ন নাটকে যাঁরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য (সকলেই প্রয়াত) নৃত্যগোপাল রায়, নিমাইচাঁদ দত্ত, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র পাল, পূর্ণচন্দ্র আঢ্য, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, রাধাশ্যাম দত্ত, বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, নীলমণি গুপ্ত এবং 'চুঁচুড়া-বার্তাবহ' পত্রিকার সম্পাদক ও নাট্যকার নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। ১৮৯৩ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত একাদিক্রমে বিভিন্ন নাট্যকাব্যের মঞ্চসফল নাটকের নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করে সেযুগে গৌরাঙ্গ নাট্য সমাজ এ অঞ্চলে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় ও মর্যাদাসম্পন্ন নাট্য সংগঠনের গৌরব লাভ করেছিল।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১৩১৬ সাল, ফাল্গুন) নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় চুঁচুড়া বড়বাজার থেকে প্রকাশিত হয় "শিল্প সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রিকা। মুখ্যত নাটক ও সঙ্গীতের ওপর রচনাদি থাকত, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালায় বছর ত্রিশ আগেও আমি দুটি সংখ্যা দেখেছি। তাঁর রচনা পৌরাণিক "গায়ত্রী" সামাজিক নাটক "ঝর্ণা"। নিতাই চাঁদ চুঁচুড়ায় ফুটবল খেলার প্রবর্তক, তাঁকে সেই সময়ে ফুটবলের যাদুকর বলা হত।

তিন

নাট্য চর্চার আলোচনায় যাত্রাপালা রচনা ও পালাগান পরিবেশনের কথা অবশ্য স্মরণীয়। সম্ভবত সমগ্র জেলায় যাত্রা পালার সর্বপ্রথম সাংগঠনিক প্রয়াস শুরু হয় শতাধিক বর্ষ পূর্বে স্থাপিত (১৩০৪ সাল) হুগলি তাঁতিপাড়া অবৈতনিক গীতিনাট্য সমাজ — যাঁদের প্রথম যাত্রাপালা 'সাবিত্রী সত্যবান" - এর রচয়িতা ছিলেন চুঁচুড়ার কিম্বদন্তী কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায়। রায় মহাশয় আরো কয়েকটি পালাগান ও মঞ্চনাটকের রচয়িতা। ব্রজবল্লভের মতো খ্যাতকীর্তি ও ব্যস্ত কবিরাজের এই কৃতিত্ব নদীয়ার কৃষ্ণনগরের

বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অমিয়নাথ সান্যালের কৃতিত্বের সমতুল্য। সান্যাল মহাশয় মার্গ সঙ্গীতের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগে একজন গুণী শিল্পী ছিলেন — যাঁর কাছে ভারত বিখ্যাত বহু কৃতবিদ্য ধ্রুপদী সঙ্গীত শিল্পীরা (ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সহ) যাতায়াত করতেন। (সান্যাল মহাশয়ের একেবারে শেষ বয়সে বর্তমান প্রবন্ধকারের সৌভাগ্য হয়েছিল সঙ্গীত সম্পর্কে কিছু আলোচনা ও পত্রালাপের) সাবিত্রী সত্যবান পালার পরিচালক ও যমের ভূমিকাভিনেতা ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যবানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন কার্তিকচন্দ্র দে। সবকটি স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকায় পুরুষরাই অভিনয় করেন — যাদের মধ্যে সাবিত্রী চরিত্রে প্রফুল্লকুমার রায়ের অভিনয় ছিল স্মরণীয়। এই গোষ্ঠীর গৃহমঞ্চের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বেতার নাট্য পরিচালক শ্রীধর ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথি ছিলেন অভিনেতা ভানু চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধন হয় ১৯৭০ এর ২৩শে জানুয়ারী। স্বভাবতই আশা করা যায় এই সংগঠনের বর্তমান পরিচালকবৃন্দ আগামী বছর (১৪০৪ সালে) যথাযথ মর্যাদায় তাঁদের প্রতিষ্ঠানের শতবার্ষিকী পালন করবেন।

হুগলির চৈতন্যসমাজ যাত্রাসংস্থার পরিকল্পক-পরিচালক-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশ্বরূপ গোস্বামী। অবিভক্ত বাংলায় যাত্রাভিনয়ে মহিলাচরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করতেন ৪০ বছর আগে পর্যন্ত। বিগত একশো বছর ধরে হুগলি চুঁচুড়া থেকেই অধিকাংশ মহিলাচরিত্রে যারা অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন হলেন — বিনোদবিহারী মান্না, প্রফুল্লকুমার রায়, পাঁচকড়ি দাস, মন্মথ নাথ দে, হিরু বোস, চুনিলাল রক্ষিত, কুঞ্জবিহারী দে, হরিসাধন দত্ত, জ্যোতিষচন্দ্র দাস, সনাতন পাল, সনাতন সাধু, কালোবরণ শেঠ, বিনয় নাথ। বিগত ৫০/৬০ বছরে অন্তত দুজন যাত্রাশিল্পী (এই অঞ্চলের) সারাবাংলায় দারুণ জনপ্রিয় হয়েছেন — প্রথমজন প্রয়াত দীপ্তাংশু পালিত এবং দ্বিতীয় জন এখনো জীবিত সত্তরোর্ধ বয়সের যাত্রাজগতের নটসূর্য্য দিলীপ চট্টোপাধ্যায়।

আবার থিয়েটারের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। ১৯০৫ থেকে ১৯০৯ -এর মধ্যে চুঁচুড়ায় যে কয়েকটি উল্লেখ্য অভিনয় সম্পন্ন হয় তা হোলো — ১৯০৫ এ শ্যামবাবুর ঘাটের বাঁধা স্টেজে ক্ষীরোদ প্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য'। কনকশালির অক্ষয় সরকারের বাড়ীতে কিম্বা মহেন্দ্র বসুর বাড়ীতে অভিনীত হয় ১৯০৬ -এ চন্দ্রশেখরের 'নাট্যরূপ', ১৯০৯ -এ 'মেবার পতন' ও 'কৃপণের ধন'। এই সময়ে মাধবীতলার হরেন মণ্ডলের বাড়ীতে পঞ্চাননতলার ভারতীভবন নাট্য সংস্থা মঞ্চস্থ করেছিলেন কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায়ের মঞ্চনাটক "স্বপত্নী সম্ভোগ"। কুড়ির দশকের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে ডিউক ক্লাবের মাঠে, রায়েরবেড় অঞ্চলে, শ্যামবাবুর ঘাটে রাধিকা ব্যানার্জির বাড়ীতে ঐতিহাসিক পৌরাণিক অনেক নাটক মঞ্চস্থ হয়। বর্তমানে কৈরী টকিজের তদানীন্তন নাম ছিল নিয়তি নাট্য মন্দির। এখানে দ্বিজেন্দ্র লালের 'বিরহ' এবং স্থানীয় নাট্যকার অমর চট্টোপাধ্যায়ের "জহর ব্রত"-র সম্মিলিত অভিনয়ের কথা স্মরণীয়। এই সময়ের দুটি উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্থা মিলন নাট্যমন্দির ও চিনসুরা থিয়েট্রিক্যাল ইনস্টিটিউট। দীর্ঘস্থায়ী কেউই হয় নি। আরো দুটি সংস্থা সরস্বতী ক্লাব ও বীণাপাণি নাট্যসমাজেরও কিছু নাট্যপ্রয়াসের সংবাদ পাওয়া যায়। মিলন মন্দির নাট্যসংস্থা, সুহৃদ সংঘের নাট্য চর্চা ষাটের দশক পর্যন্ত চলে। এঁদের নাট্য প্রয়াসে যুগোপযোগী রাজনৈতিক - সামাজিক সচেতনা, সংগ্রামী শ্রমিককৃষক - মধ্যবিত্তের সমস্যা তুলে ধরার প্রবণতা ছিল।

এইসময়ে জগদানন্দ গোস্বামী, দীপ্তাংশু পালিত (যাত্রা ও মঞ্চনাটকে) গুরুপদ মুখার্জীর মতো শক্তি মান অভিনেতারা কলকাতার বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্বদের প্রশংসা অর্জন করেন। দেবু চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ সুর সংযোজনা এবং তাঁর সুযোগ্যা স্ত্রী পারুলের গান ছিল এসময়ের হুগলি চুঁচুড়ার মহাসম্পদ। স্থানীয় পূজামণ্ডপে ও মেলায় মুখ্যত দুটি সংস্থা মেরী ফ্রেন্ডস্ ক্লাব ও এডওয়ার্ড ড্রামাটিক ক্লাব গিরিশ

চন্দ্র ও অমৃতলালের প্রহসনগুলি মঞ্চস্থ করতেন।

এইসময়ে (১৯২৫) বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার, হমিদুল হক, শৈলেন সোম ও সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় বান্ধব সমিতি। এঁরা নোতুন আঙ্গিকে চন্দ্রগুপ্ত, প্রতাপাদিত্য, কর্ণার্জুন প্রভৃতি নাটকগুলি মঞ্চস্থ করেন। সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পরিচালনায় এ সময় সত্যচরণের চাণক্য ভূমিকাভিনয় স্মরণীয়কীর্তি।

বিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁর পারিবারিক জীবনের সূচনা করেন হুগলির চকবাজারের এক ভাড়া বাড়ীতে। তাঁরই তত্ত্বাবধানে এবং হুগলি বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে যুক্তদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' মঞ্চস্থ হয়। মফঃস্বল বাংলায় রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক প্রযোজনা সত্যিই উল্লেখ্য ব্যাপার। এর মূল কারণ অবশ্যই বিদ্রোহী কবির সান্নিধ্যে স্থানীয় নাট্যকর্মীদের মানসিকতার গুণগত পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের প্রভাবে পরবর্তী দুই দশক ধরে দেশাত্মবোধক নাটক মেবারপতন, সিরাজদ্দৌলা, বঙ্গেবর্গী, পলাশীর অভিশাপ, রাণাপ্রতাপ প্রভৃতি একের পর এক অভিনীত হতে থাকে। এই সময়েই হুগলি শিবতলায় যোগেন নন্দীর বাড়িতে ঘূর্ণায়মান মঞ্চে সংগ্রাম ও শান্তি নাটকটি মঞ্চস্থ হয় — যা কিনা একমাত্র ঢাকা ছাড়া আর কোনো মফঃস্বল শহরে অবিভক্ত বাংলায় সম্ভব হয় নি। ঐ দুই দশকে উল্লেখযোগ্য নাট্যব্যক্তিত্বরা হলেন সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ সরকার, শম্ভু বড়াল, রাসবিহারি শূর, শম্ভু নিয়োগী, কেশব পাল, নিমাই শীল, ফেলুরাম চক্রবর্তী, প্রফুল্ল হালদার, চিত্ত ভট্টাচার্য, শৈলেন অধিকারী, ভূষণ শীল, কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র আঢ্য প্রমুখ।

চার

১৯৩৯ - ৪৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪২ -এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৩ -এ ভয়ঙ্কর মন্বন্তর, ১৯৪৬ -এ ভ্রাতৃঘাতী বীভৎস দাঙ্গা এবং সর্বোপরি বিশশতকে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পাপ ভারতবিভাগ এই অঞ্চলের নাটক রচনা ও প্রযোজনায় আমূল পরিবর্তন আনে। এলো নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন সামাজিক দায়িত্ববোধ। অবশ্য সনাতনধারা-পৌরাণিক ঐতিহাসিক (রোমান্টিক) নাটক করার প্রবণতা একেবারে উঠে যায় নি। নতুন ভাবধারায়, প্রেরণায় কলকাতায় বিজন ভট্টাচার্য্যের "নবান্ন" প্রযোজনার কয়েকমাসের মধ্যেই কামারপাড়া দুর্গাপূজা মণ্ডপে অধুনালুপ্ত প্রগতি নাট্য সংঘ 'নবান্ন' প্রযোজনা করে সাড়া ফেলে দিল। দেশবন্ধু স্কুলের স্থায়ী মঞ্চে বোসের ঘাটের গিরিশ বসুর বাড়ীতে কিম্বা চাঁপাতলা - কামারপাড়া - দাসপাড়ার মাঠে মাচা খাটিয়ে সমাজের নীচুতলার মানুষদের সুখদুঃখের কাহিনীভিত্তিক কিম্বা দেশবিদেশের বিদ্রোহ - বিপ্লবের কাহিনীকেন্দ্রিক নাটকগুলি, 'কয়লা কাটে যারা,' 'শেষ কোথায়', 'মৌচোর', 'অরুণোদয়ের পথে', এবং পরের দশকে 'সংক্রান্তি', রাহুমুক্ত (যাত্রা) ধারাবাহিকভাবে জগদানন্দ গোস্বামী, মীর্জা মহম্মদ প্রমুখ খ্যাতনামা অভিনেতাদের নির্দেশনায় অভিনীত হতে থাকে।

এই সময় চুঁচুড়ার রূপবাণী নাট্যসংস্থা প্রায় দুই দশক ধরে বছরে কমপক্ষে একটি নাটক কামার পাড়ার মণ্ডলবাড়ীর উঠোনে মঞ্চস্থ করতে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য নাট্যদলও মিলিত হতেন। তাঁদের পরীক্ষানিরীক্ষার নাটকগুলি ছিল রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা' ও 'চিরকুমার সভা', রূপবাণী সংস্থার শিল্পী অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনূদিত জুলিয়াস সীজারের অংশবিশেষ, ঋত্বিক ঘটকের অনুবাদ নাটক, ব্রেখটের গ্যালিলেও গ্যালিলেই। ১৯৫৮তে হুগলি কৃষ্টি পরিষদ মণ্ডলবাড়ীর উঠোনে 'মুক্তধারা' প্রযোজনা করেন। নির্দেশক ছিলেন গোরাচাঁদ আঢ্য।

পঞ্চাশের দশকে পঞ্চাননতলার আঢ্য বাড়ীর কিছু নাট্যমোদী মানুষ তাঁদের ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণটি বিভিন্ন নাট্যদলের মহলা ও অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করতে দেন। তাছাড়া এখানে প্রতিবছর পারিবারিক

দুর্গোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন নাট্যদলের শিল্পীদের সমন্বয়ে এবং প্রয়োজনমত পেশাদারি অভিনেত্রী সংগ্রহ করে অভিনয়ের ব্যবস্থা হত। চুঁচুড়ার কিশোর প্রগতি সংঘ অন্যান্য সেবা ও উন্নয়ন মূলক কাজ ছাড়াও বছরে অন্তত একবার নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, বিগত চল্লিশ বছর ধরে।

পাঁচের দশকে এখানে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সূচনা করেন তিনটি দল (১) কল্লোল (১৯৫৩) (২) বন্ধুমহল (১৯৫৭) ও (৩) চিনসুরা স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন (১৯৫৮)। কল্লোলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে পাঁচুগোপাল দাস (প্রয়াত), বিমল গুহ, শুকদেব চট্টোপাধ্যায় ও শান্তি দে। পরে আরো প্রবীণ-নবীন নাট্যানুরাগী এই সংস্থায় জড়ো হন। প্রয়াত পাঁচুগোপাল দাসের উদ্যোগে কল্লোল অনুজ বিভাগ এবং পরে কুঁড়ি-কোরক গোষ্ঠি অসংখ্য শিশুনাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রয়াত দয়াল কুমার ছিলেন এই সংস্থার বন্ধু ও প্রধান উপদেষ্টা। অগ্রজ কল্লোল গোষ্ঠির অন্যতম পরিচালক সুধীরচন্দ্র নন্দীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হুগলি-চুঁচুড়ার গণনাট্য আন্দোলনের ধারা পরিস্ফুট হয়। এবং শ্রী নন্দীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ছিলেন গণনাট্যকর্মী রাসবিহারী ঘোষ, মানবেন্দ্র পাল ও সুশীল শূর।

বন্ধুমহল ১৯৫৭তে প্রতিষ্ঠিত হবার পর কবয়, বিশে জুন, সূর্যহারা, রাতের অতিথি ও সমাধান, রবীন্দ্রনাথের কালের যাত্রা এবং আরো বেশ কয়েকটি সমাজসচেতন নাটক পরিবেশন করেন। অধিকাংশ নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন অমরেশ চট্টোপাধ্যায়। উৎপল দত্ত বন্ধুমহলের মহলায় মাঝে মাঝে উপস্থিত থেকে উৎসাহ ও পরামর্শ দিতেন।

নির্দেশক অমরেশ চট্টোপাধ্যায় পরে 'উদ্যোগী' নামে একটি নাট্যদল গঠন করে নিজে নাটক ছাড়াও উৎপল দত্ত এবং সমসময়িক প্রগতিশীল নাট্যকারদের নাটক নিয়মিত অভিনয় করতেন। সম্প্রতি উদ্যোগীর উদ্যোগ নানাকারণে বন্ধ আছে। চিনসুরা স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন ১৯৬৮তে প্রতিষ্ঠিত হবার পর নিয়মিতভাবে রক্তকরবী, মালিনী, জ্বালা, মৃত্যুর চোখে জল, এরাও মানুষ, জিওর্দানো ব্রুনো, কুকুর ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। এঁদের সদস্যা বুলা কোলে এতদঞ্চলে শক্তিময়ী অভিনেত্রীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

জরুরী অবস্থার সময় সবচেয়ে সাহসের সঙ্গে কল্লোল নাট্য সংস্থা এতদঅঞ্চলের প্রতিবাদী নাটকের নিয়মিত অভিনয় করে সামাজিক মানুষের মনে আশা ও বিশ্বাস এনেছিলেন। এ সময়ে সরকারী নির্যাতনের খাঁড়া বেশ কয়েকবার এঁদের ওপর নেমে আসে। ১৯৭৭ -এ বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের নামকরণ হয় তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। বর্তমান প্রবন্ধকার সংস্কৃতি শাখার দায়িত্বে থেকে বেশ কিছু গঠনমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণে তৎপর হন। ১৯৮০ তে সর্বপ্রথম সরকারের তরফে ধারাবাহিক নাট্যচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতার দশটি এবং মফঃস্বলের দশটি নাট্যদলের প্রত্যেকে যথাক্রমে পাঁচ হাজার ও তিনহাজার টাকা অনুদান প্রদত্ত হয়। ছয়ের দশকের শেষ থেকে আটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কল্লোল কুড়ি বছর ধরে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন — যাতে বেশ কয়েক বছর বর্তমান প্রবন্ধকার বিচারকরূপে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে হুগলি জেলার বেশ কয়েকটি নাট্য সংস্থা ভবিষ্যতে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনে কার্যকরী অবদান রেখে চলেছেন। ১৯৬৪তে স্থাপিত 'উদ্যোগী' এবং পরবর্তীকালে উত্তর চন্দননগরের কষ্টি সংঘ, চুঁচুড়ার কিশোর প্রগতি সংঘ এবং সম্প্রতি ব্যান্ডেলের আরোহী নাট্যসংস্থা আমন্ত্রণমূলক একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন মাঝে মাঝে করেছেন বা করছেন। হুগলি-চুঁচুড়ার পৌরসভা কর্মীসংঘও বিগত ৩/৪ বছর ধরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে চলেছেন।

কলকাতার একটি নামী পত্রিকায় হুগলি জেলার জনৈক লেখক সম্প্রতি এক প্রবন্ধে বলেছেন —

"হুগলি জেলার ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয় — ১৯৫৬ সালে।" একবারে ভুল কথা — বলা উচিত ছিল "কলকাতার মতো হুগলি জেলাতেও দ্বিতীয় পর্যায়ের গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৬তে।" প্রগতি সাহিত্য - সংস্কৃতি আন্দোলন, ফ্যাসী বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ এবং গণনাট্যসংঘের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক ড. সুধী প্রধানের বিভিন্ন রচনা থেকে এবং জেলার শ্রেষ্ঠ সংগঠক প্রয়াত দয়াল কুমার, গণকবি দুলাল রায় এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি স্থানীয় প্রামাণ্য ঘটনা প্রমাণ করে কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে এবং কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে আরো পূর্বে হুগলি জেলাতে গণনাট্যের কর্ম প্রচেষ্টা চলতে থাকে। উদাহরণ দেওয়া যাক।

দয়ালকুমার লিখেছেন — "১৯৩৮ -এ এ্যাডাল্ট্ এডুকেশন বিগ্রেড গড়ে শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব প্রসারের কাজে এগিয়ে গেল ছাত্র ফেডারেশন হুগলি জেলায়। এডগার স্নো -র রেডস্টার ওভার চায়না-য় চায়না স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের গণনাটকের (এখন আমরা যাকে বলি পোস্টার ড্রামা) কাহিনী পড়ে হুগলির ছাত্র ফেডারেশনের দাবি পূরণে আমি লিখলাম একটি ছোট নাটক 'মুক্তি অভিযান'। এ্যাডাল্ট্ এডুকেশন ব্রিগেড তাই নিয়ে গ্রামে গ্রামে তাদের অভিযান চালায়। সম্ভবত সেই হল আমাদের বাংলাদেশে প্রথম গণনাটক।" এছাড়া দয়ালকুমারের লেখা 'আলোর পথে' গণনাটক বর্ধমানের ছাত্ররা অভিনয় করেন এবং গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডিত হয় অভিনেতৃবৃন্দ। কয়েকমাস পরেই ব্রিটিশ সরকার "মুক্তির অভিযান" নাটকটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ দেয়।

আরামবাগ অঞ্চলে ক্ষেতমজুরের ঘরের ছেলে (এখনো জীবিত অশীতিপর বৃদ্ধ) গণকবি দুলাল রায় ১৯৩৭-৩৮ এ কৃষকসভার সদস্যরূপে কৃষকজীবনের যন্ত্রণা-বেদনা এবং শোষকশ্রেণীর শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনী সঙ্গীতাকারে রচনা করে গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াতেন। ঢাকার রাজপথে দেশীয় ফ্যাসীবাদী ঘাতকদের হাতে প্রকাশ্য দিবালোকে ২১ বছরের তরতাজা সাহিত্য-সংস্কৃতি কর্মী (সমগ্র ভারতে সম্ভবত প্রথম সাহিত্যিক শহীদ) সোমেন চন্দ নিহত হলে সমগ্র হুগলি জেলাতে তার প্রতিবাদে বেশ কয়েকটি সভাসমাবেশ হয়। কবি প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় সোমেনের হত্যার ঘটনার প্রেক্ষিতে একটি নাটক লেখেন "চিঠি", সমগ্র জেলায় এই প্রতিবাদী নাটকের বেশ কয়েকটি অভিনয় সম্পন্ন হয়।

১৯৪৮-এ কমুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে বেশ কিছু গণসঙ্গীত রচনা ও গাওয়ার অপরাধে ছাত্র ফেডারেশন ও গণনাট্য সংঘের কর্মীরূপে মহসীন কলেজের ছাত্রাবাস থেকে গ্রেপ্তারবরণ করেন হরিদাস সিংহ রায়, শৈলজা রায় এবং বর্তমান প্রবন্ধকার। নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত ১৯৪৮ -এ গণনাট্য সংঘের কনভেনশনের জন্য কাজ করার অপরাধে হরিদাসদার দুবছর এবং শৈলজা ও আমাদের বিনা বিচারে আটমাস কারাগার বাস হয়। তদানীন্তন হুগলি-চুঁচুড়া অঞ্চলের প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির গোপন আড্ডার সংগঠক সরিৎ শর্মাও (কবি ও গণগীতিকার) কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৯ -এর ডুবির ভেড়ীর ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় মনোরঞ্জন হাজরা -র 'দ্বীপ হতে দীপান্তর' নাটকটিও সাড়া জাগানো প্রয়াস - যে নাটকে গণনাট্যের মহিলাকর্মী সন্ধ্যা চ্যাটার্জীর অবিস্মরণীয় অভিনয় আজো অনেকের স্মৃতি পটে উজ্জ্বল আছে। ১৯৫৩-৫৪ তে হুগলির চকবাজারে প্রবীর সেনগুপ্ত, চিত্ত দাস, রূপচাঁদ পাল প্রমুখের উৎসাহ ও তৎপরতায় গণনাট্য সংঘের একটি শাখা উদ্বোধিত হয়। জগদানন্দ গোস্বামীর নির্দেশনায় বেশ কিছু জীবনধর্মী নাটক এঁরা পরিবেশন করেন। গণনাট্যসংঘের মাইলস্টোন সদৃশ কীর্তি 'নবান্ন' প্রযোজনা দিয়েই পাঁচের দশকের প্রথম দিকে চুঁচুড়ার চাঁপাতলা মাঠে প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মীরা তাঁদের চিন্তা চেতনার সমৃদ্ধি প্রমাণ করেন।

বর্তমানে সমগ্র জেলাতে ১৪/১৫টি শাখা সক্রিয় ভাবে বর্তমান আছে — এই কথা নিবেদন করেই গণনাট্য প্রসঙ্গের আলোচনার ইতি টানা যাক।

গোপাল আড্যের নির্দেশনায় বৈশাখী নাট্য সংস্থা ধারাবাহিক ভাবে বেশ কিছু প্রগতিশীল নাট্য প্রযোজনা উপহার দিয়েছেন। সাতের দশকের প্রতিষ্ঠিত জাগরণ নাট্য সংস্থার প্রযোজনা 'দাদন' একসময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। স্বপন চক্রবর্তী এবং পরবর্তীকালে প্রভাত দাশের পরিচালনায় এঁরা নিয়মিত না হলেও মাঝে মাঝে কিছু ভালো নাটক উপহার দিয়েছেন। কাজল দে নির্দেশিত বিভিন্ন নাট্যপ্রতিযোগিতায় প্রশংসিত খামারের গপ্পো, ইপাতিয়া প্রভৃতি একাঙ্ক নাটকগুলি সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠিত গণসংযোগের উল্লেখ্য উপস্থাপনা, এঁদের নিয়মিত সদস্যা শান্তি দে (জানা) একজন শক্তিময়ী অভিনেত্রী। শংকর বসু ঠাকুরের লেখা (অধিকাংশই নাট্যরূপ বা বাংলা রূপান্তর) স্টেইনবেক, বেকেট, প্রেমচাঁদ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের নাট্যরূপ, মলিয়ের, এ্যারিস্টোফেনিসকে মফঃস্বল বাংলায় ঘরে ঘরে হাজির করেছেন 'এষণা' সংস্থা দিলীপ বসু ঠাকুরের পরিচালনায়। চুঁচুড়ার লোকবিচিত্রা সংস্থা বিভিন্ন স্বাদের পরীক্ষাধর্মী নাট্যকর্ম নিবেদন করেছেন। হুগলি রথতলার 'আমরা ক জন' নাট্যসংস্থা সাতের ও আটের দশকে মদন মালিকের নির্দেশনায় বেশ কিছু নাট্য প্রযোজনা উপহার দিয়েছেন যার মধ্যে রাজা অয়দিপাউস ও নবান্ন উল্লেখযোগ্য।

ছয় ও সাতের দশকের বেশ কিছু নাট্যদল (যাঁরা বর্তমানে সচল নেই) রানার, নক্সা, ঐকতান, প্রভাতী, বলাকা, সংসপ্তক, মৈত্রী সংঘ, গীতিছন্দম, রূপারূপ, দর্পণ। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রূপারূপ ও গীতিছন্দম্ সংস্থার প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্পের নাট্যরূপ (নাট্যরূপদাতা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়) ও শাস্তি (নাট্যরূপ বীরু মুখোপাধ্যায়) মীর্জা মহম্মদ আলির নির্দেশনায় সমগ্র জেলায় (পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহেও) ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। মীর্জার কাবুলিওয়ালা এবং মন্দিরা চট্টোপাধ্যায়-এর (সোম) মিনি আজো স্থানীয় মানুষ মনে রেখেছেন। মফঃস্বল বাংলায় প্রথম সার্থক একক অভিনয়ের কৃতিত্ব ১৯৬৫তে চুঁচুড়ার দর্পণ সংস্থার উদ্যোগে নির্দেশক অভিনেতা অনন্ত দে কর্তৃক কিরণ মৈত্রের 'নায়ক ও একটি টেলিফোন' নাটকের। সংসপ্তক, প্রভাতী, মৈত্রী সংঘও বেশ কিছু সুন্দর প্রযোজনা উপহার দিয়েছেন।

আট ও নয়ের দশকে প্রতিষ্ঠিত বেশ কয়েকটি নাট্য দল জেলা প্রদেশ, এমনকি প্রদেশের বাইরের ভূগোলে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন তাঁরা হলেন হুগলির মোনালিসা সাংস্কৃতিক সংস্থা (নির্দেশক প্রদ্যুৎ বৈরাগী), মোনালিসা সাংস্কৃতিক চক্র (নির্দেশক - সমীর মুখোপাধ্যায়) মনন ও সারথী (পরিচালক — সমীর সেনগুপ্ত), আরোহী (নির্দেশক — রঞ্জন রায়), চিনসুরা কালচারাল সেন্টার (নির্দেশক — মলয় সেন), ঋকৃত (পরিচালক — দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়), নাট্যফেরী (নাট্যকার - পরিচালক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়), চিনসুরা ক্রিয়েটিভ কালচারাল সেন্টার (নির্দেশক — রাজা চক্রবর্তী)।

অর্পণ-স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন-ঋত্বিক-নটরাজের সমবেত প্রয়াস মারীচ সংবাদ। দিলীপ স্মৃতি নাট্য সংস্থা (হুগলি), এছাড়া তরুণ সংঘ, থিয়েটার ভিউ, নটরাজ, সি.এল.টি, নান্দনিক চিনসুরা আর্ট সেন্টারের কিছু কিঞ্চিৎ নাট্যপ্রয়াসও উল্লেখ্য। তবে বলতেই হবে সারথী ও চিনসুরা কালাচারাল সেন্টারের ১০/১২ বছরের ধারাবাহিক নাট্যপ্রয়াস স্থানীয় মানুষের প্রশংসা ও সহযোগিতা লাভে সবচেয়ে সার্থক।

প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারদের পাশাপাশি দুই প্রতিশ্রুতিবান নাট্যকার শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও অমিতাভ চক্রবর্তী স্থানীয় নাট্যদলের সম্পদ রূপে দেখা দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ও আনুকূল্যে হুগলি মহসীন কলেজের উত্তর-পশ্চিমে স্থাপিত রবীন্দ্রভবন স্থানীয় নাট্যমোদী মানুষের বহুদিনের অভাব দূর করে নাটকের পরীক্ষা - নিরীক্ষার সুযোগ এনে দিয়েছে বটে কিন্তু উপযুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থা ও পরিচালন ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধার

ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজন। ১৯৮৪ তে স্থানীয় কিছু মানুষ ও শিল্পী কলকাতার বেশ কয়েকজন নামী শিল্পীর সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে প্রয়াত সতীন্দ্র ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' নাট্যরূপ পেশাদারী ভিত্তিতে অভিনয়ের চেষ্টা করেন। ৪/৫টি প্রদর্শনের পর যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে দর্শক সমাগমের অভাবে এই প্রয়াস পরিত্যক্ত হয়।

পাঁচ

"কৈ কালা" (কালাচাঁদ কোথায় গেলেন অর্থে) শ্রীচৈতন্যের নীলাচল যাত্রার পথে দিনেকের অবস্থানে ভাবোন্মাদাবস্থায় উক্তি থেকে গ্রামনাম কৈকালা — হুগলি জেলার এক অসাধারণ গণ্ডগ্রাম। এখানেই দেখেছি ট্র্যাডিশনাল যাত্রাপালাগানের নিষ্ঠাবান চর্চা — যা কি না বিশ শতকের ছয়ের দশকের থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টির পেশাদারী দক্ষতাকে (ফর্ম ও কনটেন্টে) আদৌ আমল দেওয়া হয় নি। ৭/৮ ঘন্টা ব্যাপী না হলেও ৩/৪ ঘন্টা ব্যাপী ট্র্যাডিশনাল যাত্রাগান (বিবেক চরিত্রের গান ও ব্রিজ - এ্যাকটিং যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং মঞ্চ নির্মাণ ও আধুনিক আলোকসম্পাত কলাকৌশল যাঁরা বর্জন করেন) কৈকালা কেন হুগলি জেলার অনেক গ্রামেই বর্তমান আছে। তা ছাড়া কৃষ্ণযাত্রার (সূতিকাগার হুগলি জেলা) বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবেষণ তো আছেই এবং সগৌরবে।

হুগলি জেলার অন্যান্য অংশের অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা বর্ণনায় উপরের উক্তিগুলি আমাদের স্মরণে রাখতেই হবে। আমার সংগ্রহে হুগলি জেলার তিন শতাধিক নাট্য দলের তালিকা আছে — যাঁদের সবকটি অবশ্যই সাংস্কৃতিক অন্যান্য শাখার সঙ্গে নাট্যচর্চা যাঁদের অন্যতম প্রয়াস। বেশ কয়েকটি সংস্থা পশ্চিম বঙ্গ সরকার, বিভিন্ন পৌরসভা এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের আর্থিক আনুকূল্য পেয়ে থাকেন। সরকারী অর্থানুকূল্য ও ব্যবস্থাপনায় চুঁচুড়া ছাড়াও শ্রীরামপুর, চন্দননগর, আরামবাগ, কোন্নগর (রেললাইনের পশ্চিমদিকে নবগ্রামের মহাদেশ পরিষদ -এ) প্রভৃতি স্থানে রবীন্দ্রভবন আছে। আছে উত্তরপাড়ায় গণভবন — যেখানে মিটিং সেমিনার ছাড়া নাট্যচর্চার ব্যবস্থা আছে। মঞ্চনাটকের চর্চা যেমন গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরবর্তী স্থানে মুখ্যত শহর ও শহরতলী অঞ্চলে বহমান তেমনি চারটি মহকুমার (হুগলি সদর, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ) বিভিন্ন গ্রামে ট্র্যাডিশনাল যাত্রাগান, কৃষ্ণযাত্রা, মনসা যাত্রা ও কালী যাত্রা থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপালারও চলন আছে।

নিজস্ব গৃহ বা মঞ্চ আছে এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা হল —

(১) বৈদ্যবাটি ইয়ংমেন্স্ এ্যাসোসিয়েশন (স্থাপিত ১৯০৮)
(২) উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মেলন (১৯০৯)
(৩) মহাদেশ পরিষদ — নবগ্রাম, কোন্নগর।
(৪) ভারত সংঘ — কামারকুণ্ডু
(৫) সুহৃদ সংঘ — শান্তি পল্লী, চন্দননগর (১৯৫০)
(৬) সান্ধ্য [illegible] পান্ডুয়া (১৯৫৮)
(৭) বলাকা — রিষড়া
(৮) সুচারু — রিষড়া
(৯) [illegible] সংস্থা — বাঁশবেড়িয়া
(১০) লাইফ থিয়েটার গ্রুপ — চন্দননগর
(১১) স্বামিজী সংঘ — হরিপাল
(১২) নবশিল্পীবৃন্দ — হরিপাল

অসংগঠিত ও ক্ষণস্থায়ী প্রয়াস হলেও উত্তরপাড়া-কোন্নগর অঞ্চলে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রথম যাত্রাদল স্থাপন করেন 'চন্দ্র হাস' যাত্রাপালা গান দিয়ে। ১৮৮০ তে প্রচুর অর্থব্যয়ে 'সরোজিনী' অভিনীত হয় বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। এই সময়ে উত্তরপাড়া নাট্যসমাজের উপহার 'সীতার বনবাস' এবং বিপিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ''রাবণ বধ'' উল্লেখ্য। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ১৮৮০তে নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন করেন। তাঁর ইউনিয়ন প্রেস থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক 'অশ্রুমতী' এবং দীনবন্ধু মিত্রের ''নবীনতপস্বিনী'' মুদ্রিত হয়। অন্যান্য বেশ কিছু সাহিত্যগ্রন্থ ইউনিয়ন প্রেস থেকে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। উত্তরপাড়ার তারক চন্দ্র চূড়ামণি শ্রীহর্ষের সংস্কৃত নাটক রত্নাবলীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।

উনিশ শতকের শেষদিকে উত্তরপাড়ায় আধুনিক থিয়েটারের প্রবর্তন পিকউইক ড্রামাটিক ক্লাব। এঁদের প্রযোজনায় পৌরাণিক নাটক জনা, হরিশ্চন্দ্র, নলদময়ন্তী প্রভৃতি। বিশ শতকের একেবারে গোড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় ড্রামাটিক ক্লাব মঞ্চস্থ করেন সীতার বনবাস - পলাশীর যুদ্ধ - অন্ধমুনি।

উত্তরপাড়ায় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রতিষ্ঠিত দুটি নাট্যদলের কথা জানা যাচ্ছে, লক্ষ্মীনারায়ণ নাট্যসম্মিলনী ও ইউনিভার্সাল মিউজিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন। সমসাময়িককালের মতিগতি অনুযায়ী অপেরাধর্মী নাটক করতেন এঁরা — যেমন কিনা কোন্নগরের কোন্নগর অপেরা পার্টি। কোন্নগর অপেরা পার্টির সঙ্গীত পরিচালক তথা নাট্যশিক্ষক ছিলেন কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। পেশায় উকিল হলেও সঙ্গীত ও নাট্যে উৎসাহী মানুষটি কংসবধ, কল্কি - বিজয় প্রভৃতি অপেরা নাট্যে (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দিনে আসর বসত) যাঁদের তৈরী করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন — যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব গঙ্গোপাধ্যায় ও গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯১৮ তে উত্তরপাড়ায় পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে একটি সমবেত প্রয়াসে 'শাজাহান' অভিনয়ের আসর বসে। নামভূমিকায় সুধীর মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য পুরুষ ও মহিলা চরিত্রে কয়েকজন পুরুষ উপাধ্যায় অংশ নেন। নিজস্ব স্টেজ ও ঐক্যতান বাদনের ব্যবস্থাসহ লক্ষ্মীনারায়ণ ক্লাব ১৯২৩ -এ প্রতাপাদিত্য মঞ্চস্থ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে লক্ষ্মীনারায়ণ নাট্য সম্মিলনী অপেরা মঞ্চস্থ করা সাব্যস্ত করে। রিষড়ায় গঠিত বামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের পৌরাণিক অপেরা 'কুরুক্ষেত্র সমরাবসান' অভিনয় করে দলটি এত জনপ্রিয় হয় যে কলকাতায় মনমোহন থিয়েটারে আমন্ত্রিত অভিনয় করেন। ১৯২৫ -এ এঁরাই রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা অভিনয় করেন। একের পর এক এঁরা রবীন্দ্র নাটক প্রযোজনা করে (ফাল্গুনী - ডাকঘর - রক্তকরবী) প্রচণ্ড খ্যাতি অর্জন করেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় শিশিরকুমার কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে ১৯২৭ -এ রক্তকরবী মঞ্চস্থ করতে তৎপর হন। নাচঘর পত্রিকার বিজ্ঞপ্তিও প্রচারিত হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিশিরকুমার তাঁর সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন।

১৯৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠা উত্তরপাড়া বান্ধবসমাজ ও ফ্রেন্ডস্ ড্রামাটিক ক্লাব সমসাময়িক কলকাতার মঞ্চসফল নাটকগুলিই মঞ্চস্থ করতে থাকে। ১৯৩৭-৩৮ নাগাদ কানপুরের বাঙালী সমাজের আমন্ত্রণে বান্ধব সমাজ মন্মথ রায়ের বাজেয়াপ্ত নাটক 'কারাগার' অভিনয় করে সুখ্যাতি লাভ করেন।

শতাধিক বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুরের চাতরা ক্লাব অপেরাধর্মী নাটক করতেন। প্রখ্যাত টপ্পাগায়ক পঞ্চানন সান্যাল ছিলেন এঁদের মুখ্য গায়ক। ১৯১২ তে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর ক্লাব চিন্তাচেতনায় আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে ইংরাজিতে হ্যামলেট অভিনয় করেন। বর্তমান শ্রীরামপুর টকিজের পূর্বনাম ছিল শ্রীরামপুর পিকচার হাউস। এই হাউসের মালিক সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নাট্যানুরাগী। তাঁরই উদ্যোগে হ্যামলেটের বঙ্গানুবাদ 'হরিরাজ' গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবগৌরব' 'বলিদান' প্রভৃতি নাটকগুলো

মঞ্চস্থ হতো। প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন গিরিশপুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) এবং নাট্যকার পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই সময়েই 'রুবী ক্লাব' নামে একটি দল গড়ে ওঠে। চৈতন্য লীলা - কর্ণার্জুন - আলমগীর - প্রফুল্ল প্রভৃতি কলকাতার মঞ্চসফল নাটকগুলি মঞ্চস্থ করেন। তারপরই উৎসাহ শেষ। শ্রীরামপুর পৌরভবনের নিকট নাট্যরঙ্গম নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এঁরা নাট্য প্রযোজনায় মহিলা চরিত্রে মহিলা নিয়োগ করে গঞ্জনার শিকার হন। ১৯৩৩-৩৪ -এ প্রতিষ্ঠিত জুয়েলস্ ক্লাব, ১৯৩৯ -এ স্থাপিত খেয়ালী সংঘ এবং শশীভূষণ ঘোষ লেনের উদয় সংঘ ষাটের দশক পর্যন্ত প্রযোজনা - প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। উদয়সংঘ প্রথম থেকেই মহিলা চরিত্রে মহিলা শিল্পীদের এনে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেন।

হুগলি জেলার নাট্যচর্চায় হরিপালের অবদান অবশ্যই স্মরণীয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চের গ্যারিক নামে খ্যাত নটগুরু গিরিশ চন্দ্র ঘোষ হরিপালের বিখ্যাত ঘোষ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ -এ গিরিশ যখন বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার নাট্যরূপ দেন তা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে নিজের সকল উপন্যাসেরই নাট্যরূপ দেওয়ার অনুমতি তিনি গিরিশকে দেন। গিরিশচন্দ্র যতগুলি (৮৫/৮৬টি) নাটক রচনা করেন সম্ভবত সারা পৃথিবীতেই আর কোনো নাট্যকার তা করেননি। মধুসূদনের আশা "I should like very much to see Blank Verse gradually introduced in our dramatic literature." গিরিশই তাঁর বিখ্যাত 'গৈরিশছন্দে' সার্থক প্রয়োগ করেন।

হরিপালের থিয়েটার ও যাত্রার চর্চা শতাধিক বৎসরের। সঙ্গীত সমাজ, মিলন সমিতি সবচেয়ে প্রাচীন নাট্যসংস্থা। তারপর বসন্ত নাট্যসমিতির অবদান স্মরণীয়।

গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অধিকাংশ নাটকই এঁরা ধারাবাহিকভাবে উপহার দেন। পথের শেষে নাটকটি যাত্রার আঙ্গিকে সারারাত্রি ধরে বহুরজনী অভিনীত হয়। মহাদেব ভট্টাচার্য, বিশ্ব গঙ্গোপাধ্যায়, কান্টু গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি স্মরণীয় অভিনেতাদের কর্মকৃতি এখনো হরিপালের প্রাচীন মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে স্থাপিত পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ধারাবাহিকতার ঐতিহ্যবাহী দুটি সংস্থা বান্ধব নাট্যগোষ্ঠি ও শিল্পীতীর্থ। বান্ধব নাট্য গোষ্ঠীর যাত্রা শুরু ১৯৩৯ -এ। স্থানীয় সমস্ত নাট্যরসিক মানুষকে আকৃষ্ট করে এঁরা পৌরাণিক ঐতিহাসিক সামাজিক নাটক সার্থকভাবে উপস্থিত করেছেন। এই গোষ্ঠীর বর্ষীয়ান অভিনেতা - শিক্ষক জানকীবল্লভ পাল এখনো সক্রিয়। অসাধারণ কণ্ঠ সম্পদের অধিকারী এই মানুষটি সমগ্র হরিপালের স্মরণীয় নাট্যব্যক্তিত্ব।

প্রায় একই সময়ে একদল উৎসাহী যুবককে নিয়ে গড়ে ওঠা শিল্পীতীর্থ যথার্থ মহিলাশিল্পীদের নিয়ে সুরুচিসম্পন্ন মঞ্চ সাজিয়ে নাট্যপ্রযোজনার ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন। নাট্যকার ও সুঅভিনেতা শিবাজী সিংহ রায়ের তত্ত্বাবধানে সহদেব চৌধুরী, শ্রীশ চৌধুরী, দেবকুমার চট্টোপাধ্যায়, বারীন চট্টোপাধ্যায়, দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা গড়ে ওঠেন। রাজদূত ছদ্মনামে শিবাজীবাবু পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেন। এই সংস্থায় জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহিলা চরিত্রে বিস্ময়কর অভিনয় এখনো অনেকে স্মরণ করেন। পরবর্তীকালে পরিচালক রূপে দেবসুন্দর রক্ষিতের তত্ত্বাবধানে স্মরণীয় অবদান রাখেন দুলাল মিত্র, অনিল মিত্র প্রমুখ অভিনেতারা।

নাট্যচর্চায় (যাত্রা ও থিয়েটার) জাঙ্গীপাড়া, কৈকালা, আঁটপুরের অবদানও কম না। চণ্ডীতলা, পুরশুড়াতেও এককালে নাট্যচর্চার ধারাবাহিক রেওয়াজ ছিল। কৈকালায় অনিল মিশ্রর কৃষ্ণযাত্রার দল, বাদল রায়ের রামযাত্রার দল আশে পাশের অনেকগ্রামেই আজো স্মরণীয় সুখস্মৃতি বহন করে চলেছে। জাঙ্গিপাড়া ফাল্গুনী নাট্যসমাজ এবং রসিদপুর যাত্রাসমাজ স্থানীয় মানুষের গর্বের অবদান রেখেছে। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত জাঙ্গিপাড়ায় ভারতী নাট্য সংস্থা দশবছরের অধিক সময় ধরে নাট্য প্রতিযোগিতার

আয়োজন করে খ্যাত হন। কৈকালা নাট্য সমাজ ও যুবনাট্য সমাজ প্রতিষ্ঠার পর বন্ধ হয়ে আবার সচল প্রয়াস শুরু করেছে।

গণচেতনার নাট্য প্রয়াস হুগলি জেলার অধিকাংশ স্থানে বিশ শতকের ষাটের দশকে সুরু হয়। ১৯৫৬ -র পর দ্বিতীয় পর্যায়ের গণনাট্য আন্দোলন এ ব্যাপারে দিশারীর কাজ করে।

ছয়

কলকাতায় প্রকৃত অর্থে গ্রুপ থিয়েটার চারের দশকের শেষদিকে বহুরূপী, লিটল থিয়েটার প্রমুখের নেতৃত্বে শুরু হলেও হুগলি জেলাতে মোটামুটি ষাটের দশকের শেষদিকে তার সূচনা।

হরিপালের ভেঙে যাওয়া শিল্পীতীর্থের অনেক নাট্যকর্মী ১৯৫৯ তে গড়ে তোলেন নবশিল্পীবৃন্দ নাট্যগোষ্ঠী। কৈকালা পাঠাগার মঞ্চকে কেন্দ্র করে এঁদের উদ্যোগ শুরু হলেও সম্প্রতি এঁরা নিজস্ব সংস্থা গৃহ নির্মাণ করে নিয়মিত নাট্যচর্চা করে যাচ্ছেন। পূর্ণাঙ্গ একাঙ্ক দুই ধরণের নাটক করাতে এঁদের খ্যাতি আছে। প্রগতিশীল নাটকই এঁদের পছন্দ অবশ্য কিছু হাস্যরসের নাটকও এঁরা মঞ্চস্থ করেছেন। হরিপালের উজ্জ্বল নাট্যব্যক্তিত্ব রমেন দে এঁদের পরিচালক। শ্রী দে পরবর্তী সময়ে স্থায়ীভাবে উদয়তীর্থ নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক হয়েছেন।

হরিপালের সুগম্ভীর কণ্ঠসম্পদের অধিকারী হয়ে অভিনেতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত শৈলেন পাত্র। এ ছাড়া অভিনেতা 'মৃত্যুঞ্জয়' ঘোষ এবং গায়ক- নায়ক-পরিচালক নাট্যকার অজয় মুখোপাধ্যায়ও উল্লেখযোগ্য নাট্যব্যক্তিত্ব। উদয়তীর্থ (প্রতিষ্ঠা ১৯৬৪) নাট্যসংস্থার প্রগতিশীল নাট্যপ্রযোজনা হরিপালের সীমানা ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষকেও আকর্ষণ করে। হরিপাল পোদ্দার মোড়ের নবসংঘ (পরিচালক - অশোক রায়), স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে আশ্রমিক গোষ্ঠি, স্বামিজী সংঘ এবং গণনাট্য সংঘের হরিপাল জাগরনী শাখা হরিপালের নাট্যচর্চায় বিগত ৩০/৪০ বছর ধরে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। এরই পাশাপাশি শীতলামাতা যাত্রাসমাজ, কৃষ্ণপুর শীতলা মনসা নাট্যসমাজ, রাধাগোবিন্দ নাট্য সমাজ, বিশাল পল্লী নাট্য সমাজ, দুলেপাড়া নাট্য সমাজ, হাজরাপুর কালী মাতা নাট্য সমাজ, গোরাইপুর নাট্যসমাজের পৌরাণিক ঐতিহাসিক - সামাজিক যাত্রাপালা গানের কথাও স্মরণীয়।

জেলার বিভিন্ন প্রান্তে থিয়েটার ও যাত্রাচর্চা কম বেশী মনে থাকলেও উল্লেখ্য প্রয়াসরূপে স্মরণীয় নবগ্রামের অশনি, সমন্বয়, কিংশুক গোষ্ঠি, গুপ্তিপাড়ার রঙ্গপীঠ, হিন্দমোটরের আর্ট থিয়েটার, ফ্রেন্ডস ইউনিট, শেওড়াফুলির উজান নাট্য দল, বাঁশবেড়িয়ার জার্মিনাল ও বৃশ্চিক নাট্যসংস্থা, সিঙ্গুরের ইসক্রা, ডানকুনির শিল্পীমন, আরামবাগের নরকগুলজার, নতুনত্ব, বৈঁচি ও বৈঁচিগ্রামের বহুরূপী নাট্যসংস্থা, ঋক নাট্যগোষ্ঠি এবং মঞ্চমুখী, চন্দননগরের শিল্পায়ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি, নিশানা, অভিযাত্রী, গণমুখ, উন্মেষ, গণসংযুগ, চেনাঅচেনা, সাংস্কৃতিকী থিয়েটার ও ক্লাসিক থিয়েটারের নাট্য প্রযোজনা। পুরশুড়ার উত্তরণ, কানাইপুরের কৃন্তন ও নাট্য সংসদ উল্লেখযোগ্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। শহীদ শিল্পী সফদর হাসমীর স্মরণে কানাইপুরে একটি মুক্ত নাট্য মঞ্চ নির্মিত হয়েছে। ভদ্রকালীর ইউনিটি থিয়েটার ও থিয়েটার প্রসেনিয়ামের নাট্যপ্রয়াসও স্মরণীয়। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার ত্রিশ বছরেরও অধিক সময় ধরে নাট্য প্রতিযোগিতার (একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ) বিচারকের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ভদ্রকালীর ইউনিটি থিয়েটারের "হচ্ছে টা কি ?" নাট্যপ্রযোজনা একই বছরে শতাধিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হয় — যে কৃতিত্ব সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় রহিত। ইউনিটি থিয়েটার যতদূর জানি এখন আর নেই। বৈদ্যবাটির প্রেরণা, ত্রিবেণীর নটনিকেতন, উত্তরপাড়ার সীমান্তিক, হরিনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার বেশ কিছু নাট্য প্রয়াস উপহার দিয়েছেন। কোন্নগরের ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ক্লাব, বীণাপাণি ড্রামাটিক ক্লাব, ভিলেজ রিক্রিয়েশন ক্লাব, সানডে ক্লাব, কোন্নগর ক্লাব, রাজরাজেশ্বরী যুব সমিতি, কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটি, কাদের

ক্লাব, শ্রীরঙ্গরূপম, উজ্জয়িনী নাট্য সমিতির বিচ্ছিন্ন নাট্য প্রয়াসও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। ১৯৫১-৫২ তে প্রতিষ্ঠিত উত্তরপাড়া টাউন ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর আলমগীর (নাম ভূমিকায় তিনি নিজে অভিনয় করেন) প্রযোজনা স্মরণীয় ঘটনা। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধটি থেকে আরো বেশ কয়েকটি নাট্যদলের নাম জানা যায়। তারা অধিকাংশই বন্ধ হয়ে গেছে, অবশ্য কোনো কোনোটি এখনো সচল আছে যেমন কোন্নগরের কাদের ক্লাব, সঙ্কারী, শিল্পীভূমি, মহাদেশ পরিষদ, সেবক সংঘ ও জেহাদ, হুগলির সূচনা, চুঁচুড়ার পদক্ষেপ প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে নাট্য একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন জেলাতে যে নাট্য শিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয় সেই কর্মকাণ্ডে চন্দননগর ও চুঁচুড়াতে ইতিমধ্যে শিবির পরিচালিত হয়েছে — যেখানে বহু উদীয়মান ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা আধুনিক নাট্য শিক্ষণে সমৃদ্ধ হয়েছেন।

এছাড়া সাম্প্রতিককালে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নাট্যচর্চায় সাংগঠনিক সহযোগিতা দিয়ে চলেছেন হুগলি জেলা গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘ এবং গণনাট্য সংঘের জেলা দপ্তর।

সাত

সাম্প্রতিককালে অধিকাংশ নাট্য সংস্থাই বিশ্বাস করেন নাটক হল — মানুষের চলমান সংগ্রামী জীবনের প্রত্যক্ষ কল্পরসরূপ। তাই, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর কাঙ্খিত সামাজিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতালাভের জন্য সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার রূপে নাটককে ব্যবহার করবার সর্ববিধ প্রয়াসে প্রচেষ্ট আছেন জেলার নট-নাট্যকার-নির্দেশকগণ। বলাইবাহুল্য, এ ব্যাপারে নট-নাট্যকার-পরিচালক প্রয়াত উৎপল দত্ত এবং শহীদ শিল্পী সফদর হাসমীর অবদান সকলের নিকটই প্রেরণাস্বরূপ। মৌলিক সামাজিক নাটক (পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক) রচনা ও প্রযোজনার পাশাপাশি দেশবিদেশের ক্লাসিক্যাল নাটক ও প্রগতিশীল সংগ্রামী জীবনের নাটকগুলির অনুবাদ বা রূপান্তরের প্রয়োগ প্রয়াস অব্যাহত গতিতে চলমান আছে এই জেলাতে। নাট্য প্রতিযোগিতা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রদর্শনী, বিতর্ক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বাংলা নাটক রচনা ও প্রযোজনার মূলস্রোতের অনুসারী উল্লেখযোগ্য অংশভাগীরূপে হুগলি জেলার নাট্যকর্মীরা সতত যুক্ত আছেন।

ঋণস্বীকার

প্রয়াত দয়াল কুমার ও গোপেশচন্দ্র মল্লিক।

জেলার অসংখ্য সহৃদয় নাট্যকর্মী বন্ধু।

বাঙালীর সারস্বত অবদান : দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য

হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ (দুই খণ্ড) : সুধীর কুমার মিত্র।

বাংলা সংবাদ পত্রে সমাজচিত্র : বিনয় ঘোষ।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : বিনয় ঘোষ

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ড. সুকুমার সেন।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চ শতবর্ষ উদযাপনে হুগলি- চুঁচুড়া (১৮৭২-১৯৭২)

এছাড়া —

আমার লেখা বাংলা অনুবাদ নাটক সমীক্ষা এবং হরচন্দ্র ঘোষের জীবনী, ভারত কোষ, ৪র্থ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

হুগলি : সংগীত চর্চা

অসিত দত্ত

প্রবন্ধটির মুখবন্ধে স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ। তাছাড়া ইতিহাস কখনো সম্পূর্ণ হয় না। তা বহমান এবং ঘটমান। কিছু কিছু প্রাচীন ঘটনা এবং রটনা নিয়ে ইতিহাসের উপাদানের নির্মিতি হয় তবু ইতি হয় না ইতিহাসের। কালক্রমে কিছু কিছু ঘটনা ইতিহাসে পর্যবসিত হয়। ঘটমান বর্তমানের অনেক কিছুকেই তাই ইতিহাস বলছি না। বিশেষ ভাবে নথিবদ্ধ হয়ে ইতিহাসের শরীরের নির্মিতি পেতে গেলে কিছু ঘটনাকে অপেক্ষা করতে হয়। কালের কষ্টি পাথরে তার বিচার হয়। তাই বলাই বাহুল্য বেশির ভাগ অতীতকেই এই বিনম্র প্রবন্ধের উপাদান রূপে বেছে নিয়েছি। সেই সব উপাদান আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও অনুসন্ধান - ব্রতের পরিধির মধ্যে যত গুলো পেয়েছি তাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। এর বাইরেও অনেক তথ্য থেকে যাবে। পরবর্তী কোনো গবেষক সেসব ঘাটতি পূরণ করবেন এটা আশা করতে পারি। জায়মান ঘটনার খবর নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো সম্ভব নয় — তা ছাড়া বর্তমানকে ইতিহাস বলার অধিকার আমার নেই। কাল-ই তার বিচারক। কাউকে অক্ষুন্ন করতে গিয়ে কেউ কেউ ক্ষুন্ন হতে পারেন সেটা একটা ভাবনার বিষয়। আলোচ্য ইতিহাস নিয়ে কেবলমাত্র ওই প্রসঙ্গে কোনো গ্রন্থ আমার নজরবৃত্তে আসে নি। সঙ্গীত হলো সংস্কৃতির একটা অঙ্গ এবং আঞ্চলিক মনোমুকুর।

এই মুকুরে অনেক প্রসঙ্গের সঙ্গ করা যাবে না, অনেক প্রবাদপুরুষ বাদ চলে যেতে পারেন, সেই পরমাদ পরমাপৃত করবেন না অনেকেই। সে দায়ভাগ অধম লেখকের। কাজটি হাতে নিয়ে কলমের মুখ থেকে প্রকাশ করা একটু দুঃসাহসিক এবং কতখানি সবেদন শ্রমসাপেক্ষ তা অস্থিসন্ধিগুলো প্রত্যয় দিচ্ছে।

সঙ্গীত বলতে এখন আমাদের কাছে খানিকটা স্পষ্ট ধারণায় আমরা বুঝি পুঁথিগত কিছু শিক্ষিত মানুষের শৈল্পিক কাজকর্ম যার মধ্যে লিখিত আকারে গান, তার সুরের স্বরলিপি, তার সঙ্গে কণ্ঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু নৃত্যগীতবাদ্যনাট্যের এই পরিমার্জিত অবস্থা কিন্তু একদিনে আসেনি। এককালে সংস্কৃতির আদিমযুগে সঙ্গীতের সব কিছু ছিল রুক্ষ রূঢ় অবস্থায়। কর্ষণকর্ম এবং সাধনার যুগযুগান্তের পরম্পরাগত অবস্থায় আজকে আমরা সঙ্গীতের এক প্রাণপ্রবুদ্ধ পরিশীলিত নান্দনিক রূপ পাই।

হুগলি জেলার শুধু নয়, কোনো সঙ্গীতের আদিমতম ইতিহাস জানা যায় না। উৎসসঙ্গীতের সব চিন্তার রূপকল্পই অনুমান নির্ভর। মানব সৃষ্টির আদিম কাল থেকে সঙ্গীত বা গান ছিল লোকমুখের গীতি। মানবমনের মধ্যে যে নান্দনিক সম্পদ রয়েছে তার প্রথম প্রকাশ ঘটে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। প্রথমে ছিল কণ্ঠগীতি। পরে মানুষ যান্ত্রিক ধ্বনিতেও সঙ্গীত সৃষ্টি করতে থাকে। ক্রমশ দেখা গেল সঙ্গীতের

ব্যবহার লৌকিক অঞ্চল থেকে আশ্রমিক ব্যবহারেও মানুষের কাজে লাগতে নাগলো - সেখানে সঙ্গীত হয়ে উঠলো মন্ত্রের সাধনের মত। সেখানে আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন আন্তরিক প্রেরণাই ছিল সঙ্গীতের উৎস। আশ্রমিক জীবনে সঙ্গীতের ক্রিয়াসিদ্ধ রূপপ্রমাণ আমরা পাই বেদপুরাণের সামগানে। ক্রমে সঙ্গীতকে দুটি ধারায় প্রবাহিত হতে দেখা গেল। লৌকিক ও আশ্রমিক। এই আশ্রমিক সঙ্গীতকে আধ্যাত্মিক এবং পারমার্থিকও বলা যায়, যদিও অনেক লৌকিক সঙ্গীতের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার পরিচয় মেলে - তাই কোনো-কোনো লোকসঙ্গীতকে আধ্যাত্মিক সঙ্গীতও বলতে হয়।

আশ্রমিক মানুষ নগরায়নে যখন শহুরে হলো তখনও সঙ্গীত দুই ধারায় প্রবাহিত হতে দেখা গেল। পল্লীগীতি ও নগরগীতি। যে সঙ্গীত-এ দখল পেতে গেলে চাই সময় ও শিক্ষা ও সাধনা, সেই সঙ্গীতকে আখ্যা দেওয়া হলো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নামে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে ভারতে দুই ভাগে দেখানো হয়। দক্ষিণ ভারতীয় এবং উত্তর ভারতীয়। প্রথম প্রকরণ অর্থাৎ কর্নাটকী সঙ্গীতের চর্চা হুগলি জেলাতে নেই। উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চা হুগলিতে প্রভূত পরিমাণে হয়েছে। প্রসঙ্গান্তরে সেই আলোচনায় আমরা পরে আসবো। পারপার্শ্বিক স্বাভাবিক সহজিয়া অবস্থা থেকে যে সঙ্গীতের জন্ম, ব্যাপক চর্চা — অনুশীলন ও শিক্ষা গ্রহণ ব্যতিরেকেই পল্লী বাংলার মানুষের দখলে যে গান তারই নাম পল্লী-গীতি। এখন অবশ্যই ব্যাপক অনুশীলন হচ্ছে আত্মপ্রচার ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সম্প্রচারণের কল্যাণে। পরে পল্লী বাংলার এই গান শহরে এসে আর পল্লীবাংলার আকার থাকলো না। ব্যাপকতা পেয়ে নোতুন নাম পেল লোকগীতি। বাংলা গানের নানা রকম প্রকরণের দফা ধরে ধরে আলোচনা ক্রমশ এগিয়ে যাবে। যেমন যাত্রা, পাঁচালী, তর্জা, কবি গান, বাউল শিবের গান, পীরের গান, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, ফকির-সুফীর গান, কথকতা, টুসু গান, সাঁওতালী ঝাঁপান গান ইত্যাদি।

এক সময়ে হুগলি জেলাকে বলা হতো 'মনীষার শ্রীক্ষেত্র'। তাই সঙ্গীত মনীষাও এখানে কম শ্রী সম্পন্ন ছিল না। অনুসন্ধান যত বিতত হচ্ছে, সেই প্রত্যয় তত দৃঢ় হচ্ছে। ভাষা, শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে হুগলি জেলার প্রভাব সমগ্র বঙ্গদেশে তথা ভারত সমাজে এককালে সুদূর প্রসারী ছিল। সুতরাং সংস্কৃতি এবং সঙ্গীতের সংস্থানেও সেই প্রভাব ছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভাবনীয়, অনবদ্য এবং অভূতপূর্ব যদিও সেই জোয়ারে মাঝে মাঝে ভাটার মন্দা দেখা গেছে।

শুধু হুগলি জেলাতেই নয় বঙ্গদেশেই কবে থেকে সঙ্গীতের চর্চা বা চলন হলো সে কথা বলা মুস্কিল। সঙ্গীত চর্চার ইতিহাসকে যদি তিনটি যুগে ভাগ করা হয় তবে খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলে বাংলা গানের আদিযুগ। আর সেই থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত চলে মধ্যযুগ। আর এই বিংশ শতাব্দী থেকে চলছে বঙ্গ সঙ্গীত চর্চার বর্তমান যুগ। তার আগে কণ্ঠ সঙ্গীত ছিল সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায়। এ কথা বলাই বাহুল্য বাঙলা ভাষা সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই বাঙালী তথা হুগলিবাসীর সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চা চলে সমান্তরালভাবে। ভৌগোলিক সীমা যখন এখনকার মতো ছিল না তখনকার রাঢ় বঙ্গের অন্তর্গত ছিল এই হুগলি জেলা। তারও অনেক আগে থেকে আমাদের দেশে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের এবং সঙ্গীতশাস্ত্রের যে ধারা চলে আসছিল, ক্রমে তা কোনো কারণে অবলুপ্তির পথে চলে যায়। বাংলা ভাষার উষালগ্নে প্রাকৃত ভাষা ও জয়দেবের গীতগোবিন্দকে অনুসরণ করে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সূত্রপাত করেন চর্যাপদ বা চর্যাগীতির। বাংলা ভাষা তথা বাংলা সঙ্গীতের জননীই হলো এই চর্যাপদ। এর রচনাকাল সঠিক জানা যায় না। খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দী থেকে এই গান দিয়েই বাংলাবাসীর সঙ্গীতচর্চার হাঁটি হাঁটি পা পা শুরু হয়েছিল। চর্যাগীতি তথা চর্যাপদ বা পদাবলীকে তাই বলা হয় আদিম বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা গান। এই চর্যাগীতিকে বলা হয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধন ভজনের গান। হুগলি জেলাতেও হাজার বছর আগে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। বৌদ্ধদের এইসব

ভক্তিগীতি নেপালের রাজদরবারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করেন। বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বসূরী এইসব চর্যাগীতি প্রথমে লোক পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে পুরাতন বাংলাভাষায় এ গুলো লিখিত আকারে পাওয়া যায়। এখান থেকেই বাংলা গানের সূত্রপাত। এ গুলোকে গীতি কবিতা বা গীতি সাহিত্য -এর মর্যাদা দেওয়া হয়। চর্যাগীতিকে বৌদ্ধগান বা বৌদ্ধ দোঁহা বলা হয়। হুগলিতে গানের সূচনা কবে থেকে হয় তা স্থিরীকৃত ভাবে নির্ণয় করা এখন সম্ভব নয়। কোনো সঙ্গীত ইতিহাস গ্রন্থেও সে কথার উল্লেখ দেখি নি। প্রাচীন কালে হুগলি অঞ্চলে একটা সময়ে হিন্দু ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের বাস ছিল না। অতএব অনুমান করা যায় আদিমকালে হুগলিবাসীরাও সংস্কৃত ভাষায় সাম গান, বেদগান করতেন। কারণ বৈদিক যুগের মানুষজন অন্যান্য সকল বেদাভ্যাস-বিদ্যার, সমভিব্যাহারে একটি বিশেষ বিদ্যার অনুশীলন করতেন, তার নাম 'দেবজন বিদ্যা'। নৃত্য গীত শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি এই দেবজন বিদ্যার এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। তারপরে সব কিছু কালের করাল গ্রাসে পড়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। খ্রিস্ট পূর্ব পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক অবধি ভারতবর্ষে যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন ছিল, তার প্রভাব হুগলি অঞ্চলেও ছিল। বাঙালীর সঙ্গীত প্রবণতার কথা মনে রেখে অনুমান করা যায় হুগলিতেও বৌদ্ধ গান ও দোঁহার প্রচলন ছিল। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না রাঢ়বঙ্গের সঙ্গীত চর্চার আদিরূপ খুব প্রাঞ্জল নয় এবং সেই সময়ের সঙ্গীত চর্চা নিয়ে ইতিহাসবিদদের পর্যালোচনা খুবই অল্প। সময়ানুক্রমিক সঙ্গীতচর্চার ইতিহাসও সুলভ নয়। চর্যাপদ থেকে শুরু করলে দেখানো যায় হুগলি অঞ্চলে দশম শতাব্দীর বহু প্রত্নমূর্তি আবিষ্কৃত হয়ে সংরক্ষিত আছে। তার মধ্যে ভাণ্ডারহাটি থেকে পাওয়া বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বর মূর্তি হলো সবচেয়ে বেশি মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য। *(পৃ: 1148 সু.মি.)*

বন্দীপুরের নদীগর্ভে বুদ্ধদেবের কয়েকটি মূর্তি পাওয়া যায়। *(পৃ: 1090 সু.মি.)* হুগলি জেলার মহানাদ গ্রামের প্রভাস চন্দ্র পাল তাঁর পাল সংগ্রহে প্রাচীন অনেক মূর্তির মধ্যে দুটি বুদ্ধমূর্তিও রক্ষা করেছেন।

"প্রাচীন বৌদ্ধযুগের দুইটি নিদর্শন : প্রত্নশালায় বৌদ্ধযুগের পাথরের দুটি মূর্তি সংগৃহীত হইয়াছে। একটি পাথরের ছোট বৌদ্ধ বিহার (চৈৎ বা স্তূপ)। তাহার মধ্যে বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ হইয়া রহিয়াছেন। বিহারটি সাদা বেলে পাথরের। মাপ ৬।। + ৫ ইঞ্চি; অপরটি সাদা পাথরের চতুষ্কোণ খণ্ডের মধ্যে বড় হইতে ছোট দ্বাদশটি বুদ্ধের মূর্তি খোদিত রহিয়াছে।" *(ঐ পৃ: 1300)* এতো গেল পাথরের মূর্তির কথা। যেহেতু এই অঞ্চলে পাথর দুর্লভ, পোড়ামাটির বুদ্ধমূর্তিও নিশ্চয় ছিল। এতদিনে তা অবলুপ্ত। হুগলি সহ বঙ্গভূমির তৎকালীন একটা সমাজচিত্র চর্যাগীতির মধ্যে উপলব্ধ। সদ্যোজাত বাংলাভাবা বা সন্ধ্যা ভাষায় রচিত এই চর্যাগীতিকে বলা যায় মানুষের ধর্মতৃষায় সঙ্গীতের ব্যবহার বা প্রয়োগের উদাহরণ। যাকে ধর্মগীতি বলা যায়। যাঁরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিচ্ছেন কেবল তাঁদের কাছে নিগূঢ় সাধন পদ্ধতি পৌঁছে দেবার জন্য সহজিয়া মতের বৌদ্ধ আচার্যগণ কয়েকটি গান রচনা করেন। সাধকদের চর্য অর্থাৎ আচরণ বিষয়ক গীত তাই চর্যাগীত। আবার যে সব আচরণ করা উচিত নয় তাকে বলে অচর্য। তাই একে আর এক নামে বলা হয় চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। কোন পদ কি রাগিনীতে গাইতে হবে তাও লেখা আছে। উচ্চকোটির মানুষজনের অন্নচিন্তা ছিল না। তাই তাঁরা অন্য চিন্তা অর্থাৎ অবসর বিনোদনের অবাধ সুযোগ পেতেন। বীণাবাদন, দাবা খেলা ও নৃত্যগীত অভিনয় উপভোগে তাঁদের জীবন তখনকার দিনে বেশ আরামেই কাটতো। বস্তুত চর্যাপদে তৎকালীন বঙ্গজনজীবনের যে সাংস্কৃতিক চর্চার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় শবর ডোম প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষজনেরও সঙ্গীতচর্চা অনায়ত্ত ছিল না। নীচ জাতির মহিলারাও নৃত্যগীত বাদ্যে পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁরা ধনী ব্যক্তিদের মনোহরণ করতেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যকাল পর্যন্ত রাঢ়বঙ্গের সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক জগতে একটা বন্ধ্যা সময় উপস্থিত ছিল। প্রায় দুইশত বছরের অন্ধকার সময়ের কারণ

হিসেবে বঙ্গদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থাকে দায়ী করেছেন ইতিহাসবিদগণ। যেমন তুর্কী আক্রমণের ধ্বংসলীলায় কত শত মঠ মন্দির ধূলিসাৎ হয়েছিল, কত লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। ধর্মান্তরিত হয়ে কিছু হিন্দু মুসলমান হয়ে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল। বহু লোক পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি ছেড়ে দেশান্তরী হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল। এমন প্রাণান্তকর অবস্থায় কোনো কিছুই ভালোভাবে হয় না। সংস্কৃতিচর্চা তো দূরের কথা। চর্যাগীতির সেই সাধন সঙ্গীতগুলি নির্মম অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কোনো না কোনো সিদ্ধাচার্য সেগুলিকে নেপালে রাজবংশের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় সাতশত বছর এই সঙ্গীত সম্পদগুলো নেপাল রাজগণ বংশপরম্পরায় রক্ষা করে এসেছেন। তবে এই সাংস্কৃতিক অধোগতি চিরদিন থাকলো না। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের অবস্থা ধীরে ধীরে থিতিয়ে এল। সামাজিক জীবন অনেকটা স্থিতিশীল হয়ে এলে রাঢ়বঙ্গের নীরব হয়ে যাওয়া সংস্কৃতি আবার মুখর হয়ে উঠলো।

রাঢ়বঙ্গে যেমন বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিলুপ্ত হলো, তেমনি পাশাপাশি দুটি সংস্কৃতি বা সঙ্গীত ধারা নতুনরূপে সৃষ্ট হয়ে প্রবাহিত হতে লাগলো। যেমন বৈষ্ণবকাব্য ও মঙ্গলকাব্য। বৈষ্ণবকাব্য পরে আলোচ্য। আগে মঙ্গলকাব্য বিশেষ করে ধর্মমঙ্গলের প্রসঙ্গ আসবে, কারণ অনুমান করা হয় সে যুগের ধর্মঠাকুরও বৌদ্ধ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন নি। বুদ্ধদেবের ধর্মের বিলীন অবস্থা থেকেই হয়তো ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি এবং বুদ্ধদেবের অপর নাম ধর্মও বটে। অবলুপ্তির যুগে বৌদ্ধধর্ম একসময়ে হিন্দু ধর্মের আশ্রয়ে অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট হয়, তখন বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার রূপে পূজা পেতে থাকেন এবং তখন ধর্মঠাকুরের ধ্যানধারণার মধ্যেও হিন্দু পৌরাণিক দেবতার প্রভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলসাহিত্যের ঐতিহাসিক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে — "ধর্মপূজা আদিম সূর্যপূজা ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সম্পর্ক পরবর্তী কালে স্থাপিত হইয়াছিল।"

"বাংলার বলিষ্ঠতম গুরুবাদী ধর্ম নাথ ধর্ম। কালক্রমে নাথধর্মের প্রভাববশত বাংলার অন্যান্য যে সকল ধর্মমতের মধ্যে গুরুবাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম অন্যতম। এই সকল সূত্র হইতে গুরুবাদ বাংলার ধর্ম চিন্তায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল।"

লোকসঙ্গীত রত্নাকর - আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃ: ১১১।

"শিবের এক নাম আদ্য, সেই জন্য শিবের গাজনকেও আদ্যের গাজন বলা হয়। তবে বিশিষ্ট দেবতা অর্থে আদ্য শব্দটি বৌদ্ধ ধর্ম বিশেষত মহাযান বৌদ্ধধর্ম হইতে আসিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে বুদ্ধের নাম আদিনাথ, আদিদেব বা আদ্য। রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম ঠাকুরের গাজনকে আদ্যের গাজন বলা হয়। যেমন 'কত পদ্য বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে' (ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল)। গাজন প্রধানত লৌকিক ধর্মমূলক অনুষ্ঠান, ইহার বিভিন্ন আচার পালনের সময় বিভিন্ন সঙ্গীত গীত হয়।" (ঐ পৃ: ১০৫)

"ত্রিনাথ বলিতে মীন নাথ, হাঁড়িপা এবং গোরক্ষনাথকেই মনে করা হয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ এই তিনজন নাথ গুরুই বাংলার নাথ সমাজে বিশেষ প্রভাবশালী। হিন্দুধর্মের ত্রয়ী (TRINITY) বৌদ্ধধর্মের ত্রিশরণ বা ত্রিরত্নের মত ত্রিনাথও তিনের সমষ্টি এবং সমষ্টিগতভাবেই তাহাদের গুণ কীর্তন করা হয়।" (ঐ ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা: ৯১৯)

ঐ উদ্ধৃতিগুলো পরবর্তী গাজনের গান, ধর্মঠাকুরের গান নাথ সম্প্রদায়ের গানের প্রসঙ্গেও কাজে লাগবে। হুগলির বহু অঞ্চলে এইসব আচার গীতির প্রচলন দেখা যায়।

তুর্কী আক্রমণের ফলে যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে, তাতে সমাজের নিম্নবর্গের জনজীবনের ততটা ধাক্কা লাগেনি, যতটা উচ্চশ্রেণীর মানুষদের জীবনে লেগেছিল। তবে মানুষ নানা কারণে পূজিত

দেবতাদের ওপরে আস্থাহীন হয়ে পড়ে এবং মাঝে মাঝে উৎসবের উপলক্ষ্যের বদলও চায়। একটা তরঙ্গের পরে আর একটা তরঙ্গ আসে। পৃথিবীতে কতরকমের যে ধর্মতরঙ্গ আছে! বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই নব নব দেবদেবীর সন্ধান বা আবিষ্কার করতে সমর্থ হলো। মনসা, চণ্ডী ধর্ম প্রভৃতি দেবতাদের বলা হতে লাগলো মঙ্গলদেবতা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক নির্যাতন, রাজনৈতিক অত্যাচার প্রভৃতি সকল রকমের বিপর্যয় বিপদ থেকে রক্ষা করে যে সব দেবতা সমাজের মঙ্গল করেন, তাঁদের বলা হয় মঙ্গলদেবতা। তাই সর্পের দেবী মনসা, ঝঞ্ঝা বন্যার দেবী চণ্ডী, দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে অন্নদানের দেবী অন্নদা, ধবল ও কুষ্ঠ রোগের ধন্বন্তরি ধর্মঠাকুর, খোসপাঁচড়ার অসুখ সারান ঘেঁটুদেবী, কলেরার ওলাবিবি, বসন্তের শীতলা ঠাকুরুণ, বাঘের কবল থেকে রক্ষা পাবার দেবতা দক্ষিণ রায় প্রমুখের সৃষ্টি হলো। এইসব মঙ্গলদেবতার পূজাপদ্ধতির আচার আচরণ ও মাহাত্ম্য কথা দীর্ঘকাল ছড়ার আকারে সুর সহযোগে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছিল। পূর্বে ভাগীরথী থেকে পশ্চিমে ছোটনাগপুর ও উত্তরে ময়ূরাক্ষী থেকে দক্ষিণে দামোদর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাকে রাঢ়বঙ্গ বলা হতো। হুগলি যেহেতু এই রাঢ়অঞ্চল, সেই কারণে বহু প্রাচীন কাল থেকে এখানে পরাক্রমী আর্যেতর জাতির বাস ছিল। এখনো আছে। মঙ্গলদেবতার পূজার্চনার সিংহভাগ এদেরই দখলে।

ধর্মপূজারীরা পৌত্তলিক নয়। একটুকরো পাথর হলো এদের দেবতা-মূর্তির প্রতীক। একে বলে ধর্মশিলা। এই পাথর এক এক জায়গায় এক এক আকারের। গ্রামের বাইরে কোনো ফাঁকা জায়গায় গাছের নীচে এই ধর্মশিলা স্থাপন করা হয়। সাধারণত ডোম জাতীয় মানুষ এর পূজারী হয়। পরের দিকে ব্রাহ্মণরাও পুরোহিত হয়েছে। নানারকম বাসনা কামনা পূরণের মানত নিয়ে — যেমন নিঃসন্তানের সন্তান কামনা, মৃতবৎসার তখনকার সন্তানের দীর্ঘ জীবন কামনা, কুষ্ঠসহ নানান রকম রোগমুক্তি কামনা, খরা বন্যা সহ দুর্ভিক্ষ মহামারীর কবল থেকে বাঁচার আশায় সাধারণ মানুষ ধর্মদেবতার নামে পূজা মানত করে। মাথা ন্যাড়া করে চুল দেয়, ছোট ছোট জন্তু বলিও দেয়। বলির সময় গানবাজনা হয়। ছাগল মুরগী পায়রা শুয়োর ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। শিবের গাজনের মতো এখানে ধর্মের গাজন হয়। প্রধান সন্ন্যাসীকে উপবাসী থেকে নানারকম কৃচ্ছ্র সাধন করতে হয়। তার নাম শালেভর। পুজো শেষ হলে ঢাক ঢোল কাঁসি সহ করতাল বাদ্যযোগে ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য কথা ভক্তিভরে গান করা হয়। ধর্মপূজার যেসব মন্ত্র আছে তা ছড়ার আকারে তৈরী, এসব নিয়ে বই লেখা আছে। তার নাম ধর্মপুরাণ বা শূন্যপুরাণ। পূজার থানে বারোদিন ধরে এই দেবতার মাহাত্ম্য গান গাওয়া হয়। একজন মূল গায়েন বা মুখ্যগায়ক পায়ে নূপুর বেঁধে হাতে চামর নিয়ে গান করার রীতির সঙ্গে সাকরেদ বায়েনরা মৃদঙ্গ মন্দিরা বা মাদল করতাল কাঁসি বাজিয়ে ধুয়ো ধরেন। গানের আসরের সামনেই থাকে ধর্মের ঘট। ঘটের মধ্যে দেবতা অধিষ্ঠান করে এইসব ধর্মগান শুনছেন, এইরকম একটা ধর্ম বিশ্বাস এখানে কাজ করে। তবে লোকাচার এবং দেশাচারে ভেদ আছে। স্থান বিশেষে রীতির বদল হয় একটু আধটু।

কাহিনী, আখ্যান বা আখ্যায়িকামূলক অন্যান্য গানের সঙ্গে এই মঙ্গলকাব্যকেও আখ্যানগীতি বলা হয়। এই গীতধারাকেও পৌরাণিক এবং লৌকিক দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। শুদ্ধ পৌরাণিক কাহিনীর বাইরের লোকজীবনের গানসহ পৌরাণিক চরিত্রগুলিও যদি লৌকিক বা জনজীবনের রূপ পায় তবে তাও লৌকিক আখ্যান গীতি হয়ে ওঠে। এদের কোনোটা গান (Song), আবার কোনটা গীতিকা (Balad)। এইসব কাব্য সুরে বলা হয়; তাই তারা Lyric বা সুরগীতি হয়ে ওঠে। জীবনিক সত্য নিয়ে একসময়ে মঙ্গলকাব্য নামে যে বিপুল সুরগীতিমালার সার্থক সৃষ্টি হয়েছিল, নানা কারণে সেই গীতিজোয়ারও এক সময়ে স্তিমিত হয়ে আসে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ পরবর্তী পর্যায়ে বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাব পরশের প্রতি জনগণের নির্ভরতা। আসলে এ-ও সেই উপলক্ষ্যের তরঙ্গ। জনতা এক জিনিস নিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম থাকে না। পরিবর্তনের জোয়ার আসে। আসলে কোনো

দেবতা বা ধর্মনেতাই চিরন্তন বা শাশ্বত নন। ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবতার জোয়ারও বিলোপের পথে বা সীমাবদ্ধতার পর্যায়ে এসে থমকে আছে। আজকাল আর এইসব আখ্যান গীতি রচিত হয় বলে শোনা যায় না। প্রত্যন্ত গ্রামদেশে হয়তো গাওয়া হয়। মেলা উৎসবের গ্রামীণ চেহারাও এখন বৈদ্যুতিন প্রভাবে পালটে গেছে। তাই গান গাওয়ার হাওয়া এখন অন্যরকম। পাওয়া যায় না ওইসব গান। চাওয়াও হয় না। টিভি, ট্র্যানজিস্টার আর ক্যাসেট প্লেয়ারে ছাওয়া এখন গ্রাম বাংলা।

পাল রাজাদের সঙ্গে রাঢ়ভূমের লোকেদের হামেশাই যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো। ধর্মমঙ্গল কাব্যকে বলা হয় পালরাজাদের বিদ্রোহ প্রশমনের আখ্যান গীতি। সেই সময় ডোম জাতি ছিল রাঢ়ের প্রতাপশালি সম্প্রদায়। সুতরাং ধর্মমঙ্গল কাব্যগীতিকে ডোমজাতির বিজয়গাথা বলা হয়। রাঢ়ভূমেই ধর্ম ঠাকুরের উদ্ভব। এই রাঢ় অঞ্চলেই এই ভক্তিগীতির বিস্তার লাভ শুধু নয়, ধর্মমঙ্গল গানের কবিরাও সবাই প্রায় রাঢ় অঞ্চলের লোক। খ্রিস্টীয় নবম শতকে রামাই পণ্ডিত প্রথম ধর্ম ঠাকুরের পূজাপদ্ধতির প্রচলন করার পরে বহুবছর এইসব কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হতে থাকে। জাত যাবার ভয়ে উচ্চবর্ণের লোকেরা প্রথমটায় মাতামাতি করতো না। কালক্রমে মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী রচিত হবার পরে ধর্মমঙ্গল কথা কাব্য আকারে রূপ পায়। ইতিহাসবিদগণ বলেন পঞ্চদশ শতকে ধর্মমঙ্গল কাব্য প্রথম রচিত হয় এবং সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই গীতিকাব্য ধারার সুবর্ণযুগ। কবি ময়ূরভট্ট ছিলেন এই মঙ্গলকাব্যের পথিকৃৎ। তার পরে নাম পাওয়া যায় মানিক গঙ্গোপাধ্যায়, রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রমুখের যাঁদের অনেকেই হুগলি অঞ্চলের বাসিন্দা।

কপালে চন্দনের টীকা পরানো আর একটা ব্যাপার, সঙ্গে চিনি দিয়ে তৈরী লেদো মন্ডা দিয়ে পূজার উপকরণ সাজানোর প্রথা থাকে রাঢ় অঞ্চলের ধর্মঠাকুর বা শ্রীশ্রী ধর্মরাজ জীউ -এর উৎসবে। এই আচার পালন উপলক্ষ্যে যে অনুষ্ঠান গীতি হয় তাকে বলে টীকা পাবনের গীত। এটাকে বলে আচার সঙ্গীত। উদাহরণ —

নাট গীত করে গতি এ চারি প্রহর রাতি
অমর অসুরী লয়ে করে
বেদ-মন্ত্র আহ্বান কৈল টীকা প্রতিষ্ঠান
রচিয়া যে শ্রী ধর্ম দুয়ারে

— আ: ভ: লোকসঙ্গীত (পৃ: ৮৪১)

পোলবা অঞ্চলের পাউনান গ্রামে শিবমন্দিরের কাছে ধর্মরাজের আস্তানা আছে। কৈলাশ চন্দ্র পণ্ডিত ডোম এখানকার শেষ ডোম পূজারী ছিলেন।

"বৌদ্ধধর্ম-প্রাধান্যের অবসানের পর হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানে ক্রমশ ক্রমশ পূজাপার্বণের বহুল প্রচলন শুরু হয়। সেই সময়ে চুঁচুড়া ধরমপুরে ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল। অদ্যাপি ভগ্নাবশেষ মন্দিরে তথাকথিত ধর্মরাজের পূজা নিয়মিত হইয়া আসিতেছে। আনুমানিক তিন শত বৎসর পূর্বে স্থানীয় অধিবাসীগণ শক্তিপূজায় আগ্রহান্বিত হইয়া শ্রীশ্রীমহিষমর্দ্দিনী মাতার পূজার প্রবর্তন করিলে ধর্মরাজ ঠাকুরের উৎসব ক্রমে ম্লান হইয়া আসে।" সু.মি. পৃ: ৬০৪

"বাঙ্গলায় 'বারমতী' ও 'গৃহভরণ' গাজনই সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয়। বারমতী অর্থাৎ গাজনের বারটি অধ্যায় ও তাহার আনুষঙ্গিক উৎসব প্রচলিত আছে। গৃহভরণ গাজন ধর্মপুরাণ মতে চলিয়া আসিতেছে। ...পূজায় চণ্ডীপাঠ এবং রমাই পণ্ডিতের 'শূণ্য পুরান' পাঠ কোন কোন স্থানে বিধি আছে। ধর্ম পণ্ডিত ভক্ত্যা কামিনীগণ (মেয়ে ভক্ত্যা) দ্বারায় ধর্মের পূজা করান হয়। এই উৎসবে ধর্মমঙ্গলের গান হয়। নিম্নে ধর্মপুরাণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

ধর্ম গৃহানুভরণে যে ফল পায় সবে।
শুনিলে সংজাত খন্ড সেখ ফল লভে॥
পুণ্যদিনে গঙ্গাস্নানে শত ধেনু দান।
ততোধিক ফল পায় শুনিলে পুরাণ॥
দ্বিতীয় চরিত্র খন্ড অতি সুললিত।
তাহাতে আছয়ে লাউসেনের চরিত॥
পিতামহ তোমার লাউসেন গুনধর।
তাহার চরিত্র যত অতি মনোহর॥
বারমতী নামে খ্যাত শ্রীধর্মপুরাণ।
কহিব তোমারে সেই অপূর্ব আখ্যান॥
লাউসেন চরিত্র খন্ড নাম বারমতী।
সকল মঙ্গলব ধর্মের প্রিয় অতি॥ (১৮)

ঐ পৃ: ২৫৪।২৫৫

"ধনিয়াখালি থানার শ্রীরামপুরের গাজন মেলা বা 'সালেভর' দুই সপ্তাহ যাবৎ ধর্মের গান, পুরাণ পাঠ প্রভৃতির মধ্যে সমাপ্ত হয়" *ঐ পৃ: ২৮*

"বন্দীপুরে ধর্মঠাকুর শ্যাম রায় প্রসিদ্ধ। বুদ্ধদেবই বঙ্গদেশে ধর্মঠাকুর নামে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। সমগ্র বঙ্গদেশে অগণিত ধর্মঠাকুরের মধ্যে বন্দীপুরের শ্যামরায় ও বাঁকুড়ার যাত্রা সিদ্ধিরায়ই প্রসিদ্ধ। শ্যামরায়ের পূজারীরা জেলে জাতীয়, উপাধি পণ্ডিত। ইহারা শ্যাম রায়ের নামে জলপড়া ও নানা রোগের ঔষধ দেন। এই স্থানে নদীগর্ভে বুদ্ধদেবের কয়েকটি মূর্তি পাওয়া যায়।" *ঐ পৃ: ১০৭০*

হুগলিতে ধর্মমঙ্গলের গান যেখানে যেখানে হতো বা এখন অবলুপ্তির পথে তার কয়েকটি দেখা যাক — কোন্নগর অরবিন্দ রোডের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে আড়াই শত বছরের পুরাতন ধর্মপূজার থান আছে।

— কোন্নগরের ইতিহাস : রামকৃষ্ণ সরকার

দশঘরার কাছে জাড়গ্রামের কালু রায় সম্বন্ধে কবি রামদাস আদক লিখেছেন —

জাড়গ্রাম বন্দিলাম ঠাকুর কালুরায়।
যাঁহার কৃপায় কবি রামদাস গায়॥

"প্রতি বছর গাজনের সময় 'বুড়ো রায়'-কে বাদ্য ও শোভা যাত্রা সহকারে দিঘিড় গ্রামে আনা হয় এবং পূজার পর জাড়গ্রাম ফিরাইয়া আনা হয়। প্রতিবৎসর এই গ্রামে বৈশাখ মাসে তের দিন ধরিয়া কালু রায়ের গাজন হয়।" — *সু. মি. পৃ: ৮২৪*

দ্বারবাসিনী ব্রাহ্মণপাড়ায় এবং পুইনানে ধর্মঠাকুরের পূজারী হলেন ডোম। পোলবার আমনান গ্রামে ধর্মঠাকুরের উৎসব হয়। পাণ্ডুয়া থানার বেলুন গ্রামে ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত তিনটি মূর্তি অবস্থিত হয়েছে। এখানে ধর্মঠাকুরকে 'যাত্রাসিদ্ধি' নামে অভিহিত করা হয়। ভদ্রকালীতে ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে। শ্রীরামপুর ও চাতরায় ধর্মতলা নামের দুটি এলাকা আছে। রাস্তা আছে ধর্মতলা লেন। সেখানে কোনো মন্দির বা থান নেই। তবে গবেষকদের অনুমান পুরাকালে এখানে ধর্মঠাকুরের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।

কোতরং ভদ্রকালীতে ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে। এখানে উল্লেখ্য, এই ভদ্রকালীতে ধর্মঠাকুরের প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে। *(ঐ পৃ: ১১৪৭)* গড় ভবানীপুর, আগে হুগলিতে ছিল — সেখানে ধর্মঠাকুরের উৎসব হয় *(ঐ পৃ: ১২৮৩)*। ভাঙ্গামোড়া গ্রামে প্রাচীন দেবতা বাঁকুড়া রায় ধর্মঠাকুরের গাজন উৎসব খুব সমারোহের সাথে হতো।

এই প্রসঙ্গে কবি সহদেব চক্রবর্তী লিখিত 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে লেখা আছে —

"বন্দিব বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গামোড়ায় স্থিতি।
অনুপম গুণ ধাম অনন্ত মুরতি।। ঐ পৃ. ১০০৮

খানাকুল এক সময়ে ধর্ম ঠাকুরের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। নন্দনপুরে ধর্মের মন্দির এবং রথ নির্মাণ করে দেন রূপচাঁদ ভূক্তা নামে গাঁয়ের এক কৃতি সন্তান। কামারপুকুরের কাছে মান্দারণের দুই মাইল দূরে পশ্চিমপাড়া গ্রামে ধর্মমঙ্গল প্রণেতা খেলারাম চক্রবর্তী এবং চার মাইল দূরে বেলডিহা গ্রামে আর এক মঙ্গলকাব্য প্রণেতা মানিক গাঙ্গুলীর জন্ম হয়। শিয়াখালার গোপীনাথ বসু মুসলমান শাসক দরবারে 'মল্লিক পুরন্দর খান' উপাধি পান। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তার ধর্মমঙ্গল ১৬২৬ সালে প্রথম গীত হয়। তিনি 'অনাদি মঙ্গল' বা ধর্মপুরাণ গ্রন্থও রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে কিছু কিংবদন্তীর ঘটনার উল্লেখ কবির ধর্মপুরাণে পাওয়া যায়।

"ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া রামপ্রসাদ যখন মুমূর্ষু অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন, তখন ব্রাহ্মণবেশী ধর্ম স্বর্ণ ঝারিতে গঙ্গাজল আনিয়া তাহাকে পান করিতে দিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন।

জলপানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি।
ধর্মের সঙ্গীত গাও, কিছু শুনি আমি।।
পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া।
গোধন চড়াই মাঠে রাখাল লইয়া।।
খেলাচ্ছলে ধর্মপূজা কর্ম কাণ্ডহীন।
জানি না ধর্মের গীত, তায় অর্বাচীন।।

ইহার পর মূর্খ রামদাস দিব্য পুরুষের অনুগ্রহে শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। পাড়বাগনান গ্রামে সিপাইয়ের বেশে ধর্ম ঠাকুর রামদাসকে দেখা দেন বলিয়া কথিত আছে।

আজ হতে রামদাস কবিবর তুমি।
জাড়গ্রামে কালুরায় ধর্ম হই আমি।।
আসরে জুড়িবে গীত আমার সোঙর বলে।
সঙ্গীত করিতে ভাষা আসিবে বদনে।।
এত বলি ঠাকুর ধরিয়া ডান কর।
মহামন্ত্র লিখে দেন দ্বাদশ অক্ষর।। ঐ পৃ. ১০০৫

এই সব লোক কথা যেন রূপকথার মত মোহময়। কেউ গাইলে শুনতেও ভালো লাগে। রূপকথার সাথে সাথে আমরা এইসব গাথাও ভুলে গেছি। এই গীতিকার রামদাস আদক এত বড়ো বিখ্যাত কবি ছিলেন যে তার বংশধরদের দেওয়া ভূখণ্ডে ১৩৭৩ সালে প্রফুল্লচন্দ্র সেন একটি স্মৃতিফলক সংস্থাপন করেন।

শিয়াখালার দেবী উত্তরবাহিনী ব্যাপক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নিয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যে কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের দিগবন্দনাতে আছে —

"খপানে বন্দিলাম শ্যামা করুণা বরণী।
সেই খালায় বন্দিলাম উত্তরবাহিনী।"

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন —

"বর্ধমানে বন্দি গাবো সর্বমঙ্গলা
উত্তরবাহিনী বন্দো গ্রাম শেয়াখালা।"

ধর্মমঙ্গল প্রণেতা খেলারাম চক্রবর্তীও আরামবাগ গোঘাট -এর কাছে পশ্চিমপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। এই ধর্মমঙ্গল আটটি পালা গীতে সম্পূর্ণ। এই কাব্য ১৪৪৯ শকে রচিত।

তাঁর কাব্যগীতির নমুনা —

> "ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
> খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥
> হে ধর্ম এ দাসের পুরাও মনস্কাম।
> গৌড় কাব্যে প্রকাশিত বান্ধে খেলারাম॥" ঐ পৃ. ১০০৪

মঙ্গলকাব্যের এইসব গ্রন্থগুলিকে আখ্যানগীতির আদিযুগ বলা যায়। এর পরে আসবে সংস্কার যুগ। সে আলোচনা এই পরিসরে এখন সম্ভব হলো না। এখন দেখা যাক মনসামঙ্গল।

লাউসেনের চেয়ে চাঁদ সদাগর-লক্ষীন্দর আমাদের কাছে বেশি পরিচিত। শিক্ষিত অশিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই গত কয়েক শতক ধরে মনসামঙ্গলের অশ্রুসজল কাহিনী উপভোগ ক'রে আনন্দ পেয়ে এসেছে। ধনী নির্ধন আবালবৃদ্ধবনিতা রসপিপাসু বাঙালী আজও চাঁদসদাগর তথা বেহুলা লখিন্দরের চিরন্তন সংগ্রাম-কাহিনী সমান ভাবে মনে রেখেছে। সংগ্রাম এখানে বিবিধ। কাহিনীর মধ্যে যে সংগ্রাম তা ভাগ্যের বিরুদ্ধে। শত অত্যাচারেও দেবতার কাছে মানুষ বশ্যতা স্বীকার করছে না। চাঁদসদাগর অর্থাৎ চন্দ্রধর হলেন সেই সংগ্রামী পুরুষাকারের প্রতীক - প্রতিভূ। নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন অসহায় এক নারীও। তাঁর নাম বেহুলা। ভোগসুখের অজস্র প্রলোভন ছেড়ে বাংলার এই যুবতী গৃহবধু কৃচ্ছসাধন করে স্বর্গ থেকে অমৃত আহরণ করে এনে স্বামীকে বাঁচানোর কাহিনী আমরা কে না জানি? এই আখ্যানগীতি তাই বাঙালীকবির চরিত্রকল্পনা এবং বলিষ্ঠ কাব্যশক্তির পরিচায়ক। জনপ্রিয়তার প্রমাণ আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে এই কাহিনী নিয়ে যাত্রাপালা গান অভিনীত হয়। হুগলি জেলার ত্রিবেণীর দিকে বেহুলা নামের একটা ছোট নদী এবং রেলস্টেশন আছে।

আগেই বলা আছে সর্পের দেবী হলেন মা মনসা। এখনো হুগলির অনেক বাড়িতে মনসা পূজা এবং পাঁচালী গান সুর করে বলা হয়। "কেউটে গোখুরা শঙ্খচূড় প্রভৃতি বিষধর সর্প এইস্থানে বহু দেখিতে পাওয়া যায়। গোখরো সাপ নানা জাতীয় আছে — তন্মধ্যে জাত সাপ, কাল সাপ, কেউটে সাপ প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণত ধানের ক্ষেতের আলের পার্শ্বে এবং জলের ধারে ইহারা থাকে। সাপুড়ে ও বেদেরা এই ভীষণ সাপগুলিকে ধরিয়া সর্বত্র বহুপ্রকারের খেলা দেখাইয়া বেড়ায়।" সু.নি. পৃ: ১০৭

সুতরাং এই হুগলি অঞ্চলে সর্পের দেবীর পূজা ও উৎসব হবে এটা স্বাভাবিক। সাধারণত শ্রাবণমাসের সংক্রান্তির দিনে গ্রাম বাংলায় মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। রাঢ়বঙ্গের বহুগ্রামে এর চলন আছে। সাপুড়ে বেদে তো আছেই। বাউড়ি বাগদি তাঁতি লোহার সম্প্রদায়ের মধ্যে মনসাভক্তি দেখা যায়। হুগলীর বহু গ্রামে আজও মনসার থান আছে। মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর ঝাঁপান উৎসব হয়। এই উৎসবে ওঝাগুনিনরা হুড়পির মধ্যে করে সাপ এনে খেলা দেখায়। সেই সঙ্গে চলে লোকসঙ্গীত -এর পালা। হুগলি জেলার বহু গ্রামে এই ধরনের মেলা উৎসবের ঘটনা আছে। যেমন চড়ক, গাজন ইত্যাদি উৎসবে সাধারণ মানুষেরা এবং লোকশিল্পীরা গান গায়। এই ঝাঁপান উৎসবেও ঝাঁপ গান হয়। এই সব উৎসব ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্মের সঙ্গে সংশিষ্ট বলেই ভীড় হয় খুব বেশি। উৎসবের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত কৌতূহলী জনসাধারণের সামনে জীবন্ত সাপ সহ সাপুড়ে ওঝা গুনিনরা একত্র হয়ে সাপের বিষ দূর করা বা বিষ ঝাড়ার কৌশল দেখান। সেই থেকেই বিরাট মেলার অধিবেশন। এই অনুষ্ঠানে ওঝা

সাপুড়েরা যে গান করেন তাকে বলা হয় ঝাঁপান গান। এই সব গানকে বিষহরীর গানও বলা হয়। বিষ হরণের ব্যাপার তাই বিষহরী নাম। এ সবই চাঁদসদাগর ও বেহুলাসতীর কাহিনী ঘটিত। যেমন —

চম্পক নগরে ঘর চাঁদ সদাগর।
মনসার সাথে বাদ করে নিরন্তর।।
দেবীর কোপেতে তার ছয় পুত্র মরে।
তথাচ দেবতা বলি না মানে তাহারে।।
মনস্তাপ পায়, তবু না নোয়ায় মাথা।
বলে চেঙমুড়ি কৌ কিসের দেবতা।। — ইত্যাদি।

পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গলকে বলা হয় বিষহরীর পরিমার্জিত রূপ। এই গান গাওয়ার বিশেষ কতকগুলো ধরণ আছে। মূল গায়েনের হাতে চামর থাকে। দুজন খোলবাদক, দুজন খাপি বাদক এবং দুজন বংশীবাদক — মোট এই ছয়জন সহচর থাকে। প্রথমে মনসা বন্দনা দিয়ে মূল গান আরম্ভ হয়। নমুনা —

মা, মনসা মন আশা পিপাসা পুরাও জননী।
আমি অতি মূঢ়মতি ভজন সাধন নাহি জানি।।
তমফুলে গেঁথে মালা, এনেছি মনসা বালা,
দিয়ে মন্ত্র বরণ ডালা, পুজিব চরণ দুখানি।।
করুণা করে কটাক্ষে, অহিকুল করেছ রক্ষে
নির্দয় যেন পুত্রের পক্ষে, হয়ো না বিশ্বরঙ্গিনী।। ইত্যাদি

এইভাবে বন্দনাভূমিকা শেষে কাহিনীর মজা এসে জমজমাট হয়। আর একটি উদাহরণ। এটি বেহুলার ভাষ্য —

উহুহু - হায় হায় লাজে মরি।
আমার মরণ কেন হয় না হরি।
আমার পতির মরণ সাপের বিষে
আমার মরণ কি সে গো। ——

মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে তিনজন খুব প্রসিদ্ধ। নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। এঁরা প্রায় সকলেই পূর্ববঙ্গ নিবাসী, -একমাত্র কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ হলেন রাঢ়বঙ্গের বাসিন্দা। দামোদর তীরস্থ কাঁদড়া গ্রামে এঁর জন্ম। কেতকাদাস এবং ক্ষেমানন্দ একই না ভিন্ন ব্যক্তি, তা নিয়ে মতভেদ আছে। তিনি বর্দ্ধমান না হুগলির তা নিয়েও সংশয়ের নিরসন হয় নি। তাঁর বা তাঁদের রচনার নাম 'মনসার ভাসান'। এই গ্রন্থে বর্ধমান এবং হুগলির বহু গ্রামের কথা উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের মধ্যেকার সামাজিক আচার ব্যবহারও রাঢ়বঙ্গেই সমধিক প্রচলিত। কবি নারায়ণ দেব-এর আত্মপরিচয়-ভণিতা থেকে জানা যায়, তাঁর বৃদ্ধপিতামহ রাঢ়দেশ থেকে এসে ময়মনসিংহ বসতি স্থাপন করেন। তাঁর লেখা পদ্মাপুরাণ খুব বিখ্যাত। একটু উদাহরণ —

যদি বেউলা হম সতি   সাহসে জিয়াব পতি
যেন জল থোয়য়ে সংসারে
জাইব দেবের পুরি,   রক্ষাইব বিষ হরি
আমি জাইয়া জিনিব মনসারে।।

মনসা পূজা উৎসবকেন্দ্রিক ঝাঁপান। বিষহরির গান হুগলির বেশ কিছুস্থানে শোনা যায়। যেমন — পোলবার দুলে পাড়ার মনসা মন্দিরের কাছে ভাদ্রমাসের শেষভাগে প্রায় সপ্তাহ ব্যাপী ঝাঁপান মেলা হয়, গ্রাম্য প্রাচীন দেবতা শ্রীশ্রী বিষহরি বা মনসা দেবীর পূর্বমন্দির জীর্ণদশাগ্রস্ত হলে অনিলচন্দ্র বসু ১৩৩৮ সালে তা পুনর্নির্মাণ করে দেন। বলাগড়ের ইছুরা গ্রামে মা মনসার ঝাঁপান মেলা হয়। লালচাঁদ ঘোষের উদ্যোগে দ্বারবাসিনী গ্রামে বিষহরী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়। শোনা যায় ইনি নাকি খুব জাগ্রত দেবী। চন্দননগরের গড়বাটিতে ঝাঁপান উৎসব হতো। এখন কমে যাচ্ছে। দ্বারহাট্টার হাটতলার পশ্চিমে কানা দামাদরের তীরে কামদেবপুর গ্রামে জাগ্রতা মনসা দেবী আছেন। সিঙ্গুরে মনসা মন্দির আছে। আর আছে গুড়াপের গুড়বাড়ি আর পুইনানে।

ভাদ্রমাসের শেষদিনে প্রতিবছর হুগলি জেলার সব জায়গায় একটি দেশাচার হয়। তার নাম অরন্ধন অর্থাৎ সেদিন রান্নাবান্না হবে না। প্রচলিত নাম আরন্দ। রান্না নেই বলে খাওয়া নেই তা নয়। গিন্নীরা আগের দিন রান্না করে রাখেন সেদিন ইলিশ মাছ অবশ্যই চাই সঙ্গে আগের দিনের পান্তাভাত। আরন্দের সঙ্গে মনসা দেবীর সম্পর্ক আছে। আরন্দের দিনে উনুন জ্বালতে নেই। বরং উনুন সংস্কার করে গৃহিনীরা ভেতরে বাইরে আল্পনা দেন এবং ঘরে ঘরে মনসা পুজো করেন। ব্রতকথা পাঠ হয়। উনুন পুজোও হয়। লোকসংস্কার আছে, আরন্দের দিনে রান্না করলে সাপে কামড়ায়। সংস্কারটি ভালো, সারাবছরের অপরিস্কার হেঁসেল-এরও সংস্কার হয়।

"ত্রিবেণীর অনতিদূরে মগরা থানার অন্তর্গত বন্দীপাড়া ভাগীরথী তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে একখানি পাথর আছে, ইহাকে নেতা ধোপানীর পাট বলা হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, বেহুলার স্বামী লখিন্দর এইস্থানে পুনর্জীবন লাভ করেন। এই পবিত্র পাথর খানি দর্শন করিবার জন্য প্রত্যহ বহু ভক্তের এই গ্রামে সমাগম হয়"। সু. মি. ৯২৫

আগেই বলেছি এই অঞ্চলের নদীর নাম বেহুলা। পাণ্ডুয়া থানার বেলুন গ্রামে —" এতদ্ভিন্ন নাগ চিহ্নিত একটি ক্ষুদ্র মনসা মূর্তিও আবিস্কৃত হইয়াছে। ইহা এক মনসা বৃক্ষতলে স্থাপিত হইয়াছে। সুদর্শন বক্ষে প্রস্তরময় দুইটি পালযুগের এবং একটি সেনযুগের মনসা মূর্তি আবিস্কার করিয়াছি (পাল যুগের মনসা মূর্তিদ্বয়ের মধ্যে একটি মূর্তি হুগলি শহরস্থ কালীতলা ঘাটে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে)। ইহাতে বেশ প্রমাণিত হয় — এতদঞ্চলে ধর্মপূজার ন্যায় মনসা পূজারও প্রচলন সমভাবে বিদ্যমান ছিল।" ঐ পৃ: ৯১০

"একদা রাঢ়ভূমির সর্বত্র বিশেষ করিয়া হুগলি জেলায় নাগপঞ্চমীতে অনুষ্ঠিত মনসা পূজার প্রধান অঙ্গই ছিল ঝাঁপান উৎসব। আসল উৎসবের এখন বিলুপ্তি ঘটিয়াছে, তবে কোন কোন স্থানে এই উৎসব রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া এখনও টিকিয়া আছে।" ঐ পৃ: ২৬১

এই রূপান্তর প্রসঙ্গটা আমি আগে স্পর্শ করেছি। কোনো সংস্কৃতিই চিরদিন এক রকমের থাকে না। সেটা আমরা আলোচনাক্রমে ক্রমশ বুঝতে পারবো। জগৎই শুধু পরিবর্তনশীল তা নয় সাংস্কৃতিক রূপরেখাও সময়ের পরিস্থিতির প্রয়োজনে রূপান্তরিত হয়। এখন দেখা যাক 'মনসা বিজয়' গীতিকাব্যের রূপকার বিপ্রদাস কি লিখেছেন —

"এক শত শিষ্য সদা সাপের যোগান।
বান্ধিয়া ছত্রিশবানা নাগের ঝাঁপান।।
তবির উপরে চড়ে নাগ আভরণ
বিষম শঙ্খ আর ঢাকের বাজন।।"

একজন বিদেশী ফরাসি চিত্রশিল্পী তাঁর LES HINDOUS নামের এক সচিত্র গ্রন্থে ঝাঁপানের সঙ্গীতময়তার বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

"তাঁহার চিত্রে বংশনির্মিত একটি মঞ্চকে কয়েকজন লোক বহন করিয়া চলিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মঞ্চের উপর বহুসর্প বিভূষিত একটি বালক উপবিষ্ট আছে। শোভাযাত্রায় আরো বহুলোক সাপের ঝাঁপি লইয়া চলিতেছে এবং ঢাক ঢোল কাঁসর ঘন্টা বাজিতেছে দেখা যায়। শিল্পীর নাম PAR F BATTAZARD SOLVYNS .....এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে JAUPAN বা MUNSAH POOJAH একটি চিত্র আছে। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্যারী নগরী থেকে এই খন্ডটি প্রকাশিত হয়। চিত্র পরিচিতিতে বলেছেন:

"Jaupan is the feast of serpents...... when the Jaupan or Munsah Poojah is to be celebrated several Mauls are hired for the purpose and one of their children is dressed up in the best manner possible, after which they seat him upon bamboos and the other Mouls carry him in procession, escorted by an immence concourse of people and many musicians"............ ঐ পৃ: ২৬২

ঝাঁপান উৎসব হলো সঙ্গীতময় উৎসব। তবে দুঃখ এই, মজা কৌতুহল আর সঙ্গীতের সাগ্রহ সমাবেশের এই উৎসব এখন কমে আসছে। তখনকার দিনে হুগলি অঞ্চলে সঙ্গীতজ্ঞ অর্থাৎ Musician এর অবস্থিতি সাহেবদেরও নজরে এড়ায়নি। কিছু কিছু পূজা উৎসবের কথা জানা যায় — যা ছিল হিন্দু মুসলমানদের মিলিত অনুষ্ঠান — যেমন, ওলাইচন্ডী বা ওলাইবিবির পূজার সময় পুরোহিত থাকতেন নিম্নশ্রেনীর হিন্দু অথবা মুসলমান। এঁরা সারা বছর অন্য জীবিকায় ব্যস্ত থাকেন। পূজা উৎসবের সময় হুগলি জেলার অনেকগ্রামেই ওলাইচণ্ডীর থান আছে। বছরে একবার বা বিশেষ করে কলেরা বা ওলাওঠার মড়কের সময় উৎসব সহকারে গানবাজনা সহ ওলাইচণ্ডীর পূজা হয়। পশুবলির সঙ্গে ওলাইচণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে একশ্রেণীর পাঁচালী গান করা হয় তার নাম ওলাইচণ্ডীর গান। মূল গায়েন এর সঙ্গে বায়েনরা মৃদঙ্গমন্দিরা বাজিয়ে গান করেন। তাদের দোহার বলে। আজকাল কলেরা উঠে গেছে তাই ওলাইচণ্ডী বা ওলা বিবির প্রতিপত্তি কমে গেছে। তার বদলে নাম হয়েছে আন্ত্রিক বা Gastro enterities. তা এমন দিন আসতে পারে হয়তো, যখন দেখা যাবে আন্ত্রিকা বিবি বা চণ্ডীর উদ্ভব হয়েছে এবং সেই নামে পাঁচালী তৈরী হচ্ছে। মুসলমানগণ ওলাওঠার দেবীকে বলে ওলাবিবি। অবশ্য উভয় সম্প্রদায়ই নির্বিশেষে যে নামেই হোক এই দেবীবিবির পূজা করেন। ওলাবিবির চেহারার একটা বর্ণনা পাওয়া যায়।

"তাহাদের কোন কোন স্থলে একটি মৃন্ময়ী মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। মূর্তিটির আকৃতি কোন মুসলমান সম্ভ্রান্ত পরিবারের কিশোরীর ন্যায় - নারী মূর্তি হওয়া সত্ত্বেও মাথায় টুপী ও পায়জামা পরা, পায়ে নাগরা জুতা, নানা অলঙ্কারভূষিতা ...... তাঁহার মাহাত্ম্য সূচক গানই ওলাবিবির গান। অনেক সময় ওলাবিবি একাকিনী না থাকিয়া সাত ভগিনী এক সঙ্গে বাস করেন, সাত ভগিনীর মাহাত্ম্যসূচক সঙ্গীত এক সঙ্গেও শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে সাত বিবির গানও বলা হয়। সাতবিবির গান মধ্যযুগের লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক গানের অন্তর্গত।"

আশুতোষ ভট্টাচার্য : লোকসঙ্গীত পৃ: ১১২

হুগলির বারমাসে তের পার্বণ প্রসঙ্গে ওলাইদেবীবিবির কথা —

"ওলাইবিবি বা ওলাইচণ্ডী কলেরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যাহার পুরোহিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বা মুসলমান। নিমগাছের নিচে ডাল ঘট রাখিয়া যাহার পূজা রাখা হয়। পূজার পদ্ধতি শীতলার অনুরূপ। পূজার পর

ঢোল বাজাইয়া গান করা হয়। মুসলমান পুরোহিতই সব চেয়ে অদ্ভুত কারণ। পূজা নিশ্চয়ই প্রাগ মুসলমান যুগের।" সু. মি. পৃঃ ২৬৩

এখানে অদ্ভুত ভেবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই গ্রাম বাঙলার সাধারণ মানুষ এই ভাবেই ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা সম্প্রদায়িক ধর্মগুরুর অপেক্ষা রাখেন নি। এক ঈশ্বর, এক মানুষ, এক ত্রাতা। ধর্মান্তরিত হয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মুসলমান হলো — ধর্মীয় নেতারা চিত্র থেকে চলে গেল — কিন্তু মানুষের ধর্মীয় সংস্কারের লোকাচার দেশাচারগুলো থেকে গেল। রোগ মহামারীর সময় সব ধর্মের মানুষই এক। রোগ হিন্দু মুসলমান বেছে বেছে আক্রমণ করবে তা তো নয়। এই চিত্র আমরা পীরের দরগার সময় পীরের গানের বেলাতে দেখবো। শ্রীরামপুরে শীতলা মন্দিরেও দেখেছি, আমার পরিচিত রোগীজন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বসন্তরোগে জল পড়া খেয়েছে। এর ভালোমন্দত্বের বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নেই। বক্তব্য হলো সঙ্গীত ও সংস্কৃতি অনেকক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানিক ধর্মীয় লক্ষ্মণ গণ্ডী অতিক্রম করেছে। শ্রীরামপুরের মানিক পীরের মাজারে এখনও দেখি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এসে মানত করছে, মোমবাতি জ্বালিয়ে দুধ ঢালছে। গানের জলসায় মিলিত হয়ে বিরিয়ানী খাচ্ছে।

যে কথা হচ্ছিল, সাধারণত শীতলা দেবীর থানের কাছে ওলাইচণ্ডীর উৎসব হয়ে থাকে। গান উৎসবের ধরণটাও একই রকম সেটা আমরা জেনেছি। আমরা জানি বাড়িতে বসন্ত রোগ হলে এখনও অনেকে শীতলা মন্দিরে যায়। পূজা দেয়। বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম শীতলা। এই দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করেও অনেক আখ্যান গীতি রচিত হয়েছে। মঙ্গলগীতির অন্তর্গত এই সব গানকে বলা হয় শীতলা মঙ্গল গান বা শীতলা পূজার গান। এগুলোকে শীতলার পাঁচালীও বলা হয়। এই পাঁচালীতে শীতলামাতার উৎপত্তি কাহিনী বর্ণিত আছে।

"কলির পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নহুষ রাজন।
কত মুনি ঋষি আইল কে করে গণন॥
নির্বিঘ্নে করিয়া যজ্ঞ দিলেক আহুতি।
হইলেক পূর্ণ যজ্ঞ শান্ত মতি॥
যজ্ঞপূর্ণে নিভাইল যজ্ঞের অনল।
তাহে জনমিল এক কন্যা সমুজ্জ্বল॥
মস্তকে ধরিয়া কুলা বাহির হইলা।
দেখি প্রজাপতি তারে যতনে সুধাইলা॥
কে তুমি সুন্দরী কন্যা কাহার দুহিতা।
কি হেতু অগ্নিতে ছিলা কহ সে কাহিনী॥
দেবী কন, অগ্নি কুণ্ডে মম জন্ম হইল।
কোথা যাই কি করিব পরাণ বিকল॥
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলা বচন॥
যজ্ঞ শীতলের কালে তোমার জনম
সেহেতু শীতলা নাম তোমার হইল।
মম বাক্যে যাহ তুমি শীঘ্র ভূমণ্ডল॥"

ভারি সুন্দর আকর্ষক কাহিনী। যেমন ওলাইচণ্ডী তেমনি শীতলাকে বলা হয় বসন্তচণ্ডী। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে শীতলা মায়ের যে যে রূপ আমরা দেখতে পাই তাকে সুন্দরী কন্যা সমুজ্জ্বল বলতে পারি না। হয়তো ভূমণ্ডলে এসে স্বর্গের দেবীর এই দুর্দশা হয়েছে।

"একটি উলঙ্গ স্ত্রীমূর্তি মুখে অসংখ্য বসন্তের দাগ গাধার পৃষ্ঠে উপবিষ্টা, মাথায় একটা ছাতা, এক হাতে একটি পাত্র ও অন্য হাতে ঝাঁটা এইরূপ মূর্তি লওয়া হয়। চাল ফল মিষ্টি বিশেষ ক্ষেত্রে ছাগল ও ভেড়া ভোগ দেওয়া হয়। বাতাসা নাকি দেবীর খুব প্রিয়। যখন কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয় মেয়েরা দেবীর মন্দিরে গিয়া বৃক্ষমূলে বা বারান্দায় জলদান করে শঙ্খধ্বনি করে। অনেক লোক তিন দিন ধরিয়া দেবীর বন্দনা করিয়া গান করে। পূজা দেওয়া হয়।" সু. মি. পৃ: ২৬৯

ব্রহ্মা আর সাবিত্রীর কন্যা এই শীতলার পূজার সময় শীতলা মঙ্গলের গান আজকাল উঠে গেছে। চৈত্রমাসে শীতলা পূজার সময়ে মন্দিরে মাইকসহযোগে ফিল্মিগানা বাজে। আলোকসজ্জা হয়। দিনকাল পাল্টেছে। গান বদলেছে তবে শীতলা থানের জলপড়া খাওয়ার রেওয়াজটা এখনো আছে।

পুরাতন লোকগীতির রেওয়াজটা শুধু অনুপস্থিত। শ্রীরামপুরে কমপক্ষে তিন চারটি শীতলামন্দির আছে। যেখানে প্রতিদিন লোকসমাগম হয়। বাৎসরিক উৎসব হয়। চাতরার একটি সুবৃহৎ অঞ্চলের নাম শীতলাতলা। এ ছাড়া তারকেশ্বর বালিগড়ি, বাকসা, পুইনান, ভদ্রকালীতে বিখ্যাত শীতলা মন্দির আছে। ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত আলা গ্রামে শীতলার থানের পাশাপাশি মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত ওলাইচণ্ডীতলা আছে। সেখানে অনেক উৎসব হয় এবং লোকসমাগম হয়। বালিদেওয়ানগঞ্জ এলাকায় —"প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর দিন ও পরবর্তী অষ্টম দিবসে শ্রী শ্রী শীতলা মাতার স্থানেও একটি মেলা হয়। ইহা রথের মেলা বলিয়া খ্যাত। সেইজন্য শীতলা মাতার পূজা ও নগর সংকীর্তন এই স্থানের একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব।" সু.মি. পৃ: ১৩৩০

মঙ্গলকাব্য তথা আখ্যানগীতি বা মঙ্গলগান প্রসঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল -এর প্রসঙ্গ আসে। ঝড় ঝঞ্ঝা বন্যা দুর্যোগের দেবী চণ্ডী হলেন প্রচণ্ড এক দেবী। আর্যদের বৈদিক দেবী চণ্ডীর সঙ্গে এই চণ্ডীর ভিন্নতা আছে। আর্যের সমাজে এই দেবতার পূজা বহুদিন থেকে চলে আসছে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস সামান্যতম কারণে দেবী অসন্তুষ্ট হলে জগতে মহাসর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। তাই দেবতানির্ভর মানুষ চণ্ডী শব্দের সঙ্গে মঙ্গল শব্দ যোগ করে দেবীকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে। সেইযুগে এই দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডী। আর এক দেবী আছেন। তিনি দেবী চণ্ডী। ইনি মনোবাঞ্ছা পূরণকারিণী, হারিয়ে যাওয়া প্রিয় বস্তুর উদ্ধারকারিণী এবং শত্রুনাশিনী। বৌদ্ধ ধর্ম যখন হিন্দু ধর্মের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছিল, সেইসময় অনার্য এই দেবীমঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী বজ্রতারার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী এই উভয় লৌকিক দেবতারই পূজা রাঢ় অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ছিল এবং এঁদের মাহাত্ম্যগাথা এবং এই প্রসঙ্গের ব্রতকথা মুখে মুখে ছড়াগানের আকারে চলে আসছিল।

"চণ্ডীতলা জনাই-এর দক্ষিণ পূর্ব কোণে, প্রায় দুই মাইলের কিছু দূরে অবস্থিত। এখানে প্রসিদ্ধ চণ্ডীর দেউল আছে। শৈব ধর্মের আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালে, অর্থাৎ যে সময়ে সেনরাজগণ এ দেশে রাজত্ব করিতেন, সেই সময় হইতে মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবীর ব্রতকথায় ধনপতি সদাগর ও তৎপুত্র শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহলযাত্রা প্রভৃতি বিষয়ের উপাখ্যান চলিয়া আসিতেছে। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাহা অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিদধিক চারশত বর্ষ হইল আপনার লিপিকৌশলে অপূর্ব চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।" ঐ পৃ. ১২৪৯

"সরস্বতী তীরবর্তী বুইতা গ্রামে বেহুলা লখীন্দরের ঘটস্থাপিত চণ্ডীদেবী একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষমূলে এরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, বৃক্ষের শিকড়গুলি ঘটটিকে আবৃত করিয়া যেন গৃহমধ্যে রাখিয়া দিয়াছে।" ঐ পৃ. ১২৫৬

এ ছাড়াও হুগলি জেলার বহুস্থানে চণ্ডীর মণ্ডপ ও মন্দির আছে। বলাগড়ে পঞ্চমুণ্ডির আসনযুক্ত চণ্ডী মন্দির বলয়োপপীঠ নামে প্রসিদ্ধ। চন্দননগরের গ্রাম্য দেবতা শ্রীশ্রী বড়াইচণ্ডী খুব জাগ্রত। দ্বারহাট্টা

গ্রামে আছেন দ্বারিকা চণ্ডী। এ ছাড়া বালি, দেওয়ানগঞ্জ, ত্রিবেণী, পুইনান, দ্বারবাসিনী, গোলবা থানার আমনান গ্রাম, পাণ্ডুয়া থানার বেলুন, বলাগড়, জীরাট, বুইতা, আঁটপুর, মায়াপুর প্রভৃতি স্থানে চণ্ডীর থান আছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যরচয়িতা কয়েকজন হুগলিবাসীর নাম —

ক) 'চণ্ডী' রচয়িতা পরাশরপুত্র সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

খ) 'চণ্ডীমঙ্গল' রচয়িতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তারকেশ্বরের নিকটে দামুন্যা গ্রামে (এখন বর্ধমানে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মভিটাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর মুকুন্দমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে গত কয়েক বছর ধরে।

গ) মাধবাচার্য ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম বঙ্গভাষায় চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন।

ঘ) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র হুগলি জেলার ভুরসুট পরগণায় ১৬৩৪ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখা চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল বিখ্যাত।

এবারে কীর্তন প্রসঙ্গ। প্রাক চৈতন্য যুগে কি কীর্তন ছিল? এই প্রশ্ন অনেকের মনে আসতে পারে। কীর্তন শব্দটা ছিল। কারণ চর্যাগীতির হাত ধরে সাহিত্য ও সঙ্গীত পাশাপাশি চলছিল। বাংলা সাহিত্য আদিকালে ছিল গীতিকাব্যমূলক। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র যথা খোল করতাল মন্দিরা বাজিয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে দলবদ্ধ বা এককভাবে গানের মাধ্যমে কাব্য পাঠ করা হতো। চর্যাপদের পরেই বাংলায় যে গীতিকাব্যটির সন্ধান পাওয়া যায়, তার নাম শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। এই কাব্যগীতির লেখকের নাম চণ্ডীদাস। এই চণ্ডীদাস নিয়ে নানা রকমের কুয়াশার দাবী রয়েছে। কোন চণ্ডীদাস? কত যে চণ্ডীদাস নামের পদকর্তার সন্ধান পাওয়া গেছে! বড়ু, দীন, দ্বিজ, সহজিয়া প্রমুখ। আসলে চণ্ডীদাস একটি জনপ্রিয় নাম বা প্রতিষ্ঠানের মত হয়ে গিয়েছিল — যা গীতিপ্রিয় বা কাব্যপ্রিয় মানুষকে টানতো। পদকর্তাগণ গীতিকাব্যের শেষে ভনিতার সময় 'চণ্ডীদাস' নাম ব্যবহার করতেন। এই হুগলি অঞ্চলেও তখন হয়তো বহু আখ্যান গীতি এবং অন্যান্য পদাবলীর গীতিপদগুলি রচিত হয়েছে — কারণ বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্লাবন সেই সময় হুগলি জেলাতেও প্রবল ছিল। পরবর্তী আলোচনাকালে সেটা আমরা দেখতে পাব। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রচিত হয়েছিল শ্রী চৈতন্যদেবের পাদপ্রদীপে আসার আগে। বড়ু চণ্ডীদাসের এই গীতিনাট্যটিতে জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে যে গীতগোবিন্দ রচিত হয়, সেই গীতকাব্যের মধুর পদগুলি বাঙালীর সঙ্গীত ভাণ্ডারকে এক সময়ে সমৃদ্ধ করেছিল। তৎকালীন হুগলি অঞ্চলেও তার রসসিক্ততা ছিল, সেটা নির্ভরযোগ্য ভাবে অনুমান করা যায়। চণ্ডীদাস যেখানকার মানুষই হন, হুগলির সঙ্গীতচর্চার ইতিহাসে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামের গীতিসাহিত্য কীর্তিটির প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে আনা মোটেই ধান ভানতে শিবের গীত হবে না; কারণ রচনাটি মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার পরিকাঠামোর ভাবমূর্তি ছিল — যাকে বলা যায় সাধারণ মানুষের কথ্যভাষা। ফলে গীতিকাব্যের মধ্যে একটা জীবনজোয়ার ছিল কারণ এর বিষয়বস্তু ছিল লৌকিক রাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলা। বস্তুগুলির বিষয় এমন যা লোকরঞ্জন করবেই, যেমন দান লীলা, নৌকাবিলাস ইত্যাদি কবির নিজস্ব সংযোজন। এগুলো এত লোকপ্রিয় কারণ লোকায়ত এমন অনেক কিছু এই গীতগ্রন্থে আছে যা পুরাণে ভাগবতে নেই, কিন্তু বঙ্গবাসীর মস্তিষ্ক প্রসূত এইসব লৌকিক রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বহুদিন থেকেই এদেশে লোকপরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছিল। জনপ্রিয় হবার আর একটা কারণ পরকীয়া প্রেমঘটিত নাট্যরস। এই নাটকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আছেন রাধা, চন্দ্রাবলী এবং বড়ায়ি (রাধার মায়ের পিসি)। নায়ক বাঁশি বাজিয়ে নায়িকাকে ডাকছেন। পরস্ত্রী রাধার সঙ্গে পরকীয়া প্রেম জনচিত্তকে তো আকর্ষণ করবেই। এই কৃষ্ণকীর্তনে শ্রীরাধার পরিচয়েরও কিছু বদল করেছেন চণ্ডীদাস। পুরাণের বৃষভানু - কীর্তিদার নন্দিনী রাধা নন —

এ রাধা এখানে সাগর গোয়ালা ও পদ্মা (পদুমা)-র তনয়া। পরবর্তীকালে রাধা ও চন্দ্রাবলী পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিনী — প্রেম সেখানে ত্রিকোণ। এখানে কবি ঐ দুই নামকে এক করে রাধা-চন্দ্রাবলীরূপে পরিচিত করেছেন। একটু নমুনা —

"কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি কালিনী নঈকুলে।
কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশির শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পায়ে নিশিবোঁ আপনা।।—
আঝর ঝরএ এ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী।।

এটা রাধার ভাষ্য বলাই বাহুল্য। বড়ায়িকে ডেকে বলছেন, কালিন্দী নদীকূলে এমন মধুর সুরে কে বাঁশী বাজাচ্ছে বড়ায়ি? গোষ্ঠ গোকুলে কে এমন করে বাঁশি বাজায়? আমার শরীর আকুল হয়ে উঠেছে, মন বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। রান্না বান্না সব এলোমেলো হয়ে গেছে। এমন ঘর ভোলানো কাজ পন্ডানো বাঁশি না জানি কেমন জন বাজায়! আমি দাসী হয়ে তার পায়ে আত্মসমর্পণ করবো। বাঁশি শব্দে আমার অশ্রু জল ঝরছে, বড়ায়ি পরান বুঝি হারিয়ে যায়। শুধু মন নয়, শরীর এখানে লোকরঞ্জক হিসাবে বর্ণিত। প্রেমিক কৃষ্ণ আরেক জায়গায় প্রেমিকা রাধাকে বলছেন "পুঁটুলি বান্ধিয়া রাখো নহলি জৈবন।" এইসব কারণে কাজ করতে করতেও একসময় মানুষ কর্মসঙ্গীতের মত করে এইসব গান গাইত। এইসব নানা কারণে কাব্যগুণান্বিত গীতিকাব্যের ভাবরসে সমৃদ্ধ এই সংগীত রাঢ় বঙ্গের সমস্ত অঞ্চলে নৃত্যবাদ্য ও সুরসহযোগে গীত হতো। দূরের দেবতাকে মানুষ এই বোধ হয় প্রথম ঘরের লৌকিক মানুষ হিসাবে পেল। এই লোকনাট্যের অতিপ্রাচীন নিদর্শন। এই রচনা চৈতন্যদেবের সময়ের আগের। ভাগবত বহির্ভূত যেসব কাহিনী এখানে বর্ণিত আছে তা লৌকিক সুর থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল।

"ইহার ভাষা খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর রাঢ়ের ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বাংলার লোকগীতির ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন রূপে এখানে তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করা যায় —

ভরিয়ুরে পসার সত্ত খী
নেত বাস ও হারুন নির্মা।। ল রাধা।।
সব সখিজন মেলি রঙ্গে।
এক চিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে।। ল রাধা।।
নিতি জাএ সর্বাঙ্গ সুন্দরী।
বন পথে মথুরা নগরী। ল রাধা।। — লোক সঙ্গীত : আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃ: ১৮০

এই কৃষ্ণকীর্তন প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে আসে - অনেকে এই গ্রন্থকে প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন কৃষ্ণ যাত্রার পুঁথি বলে অভিহিত করেছেন। লৌকিক কাহিনীকে পৌরাণিক আভিজাত্য দিয়ে পরবর্তীকালে অনেক অনেক পালাকার কৃষ্ণযাত্রার পালাগান রচনা করে অভিনয় করিয়েছেন। এখন দেখা যাক হুগলি অঞ্চলে কোথায় কোথায় কৃষ্ণযাত্রার প্রচলন ছিল। প্রতিটি বৈষ্ণব প্রভাবিত প্রতিষ্ঠান, হরিসভা পাটবাড়ি রাধাকৃষ্ণের মন্দিরেই হতো। ভদ্রকালীর দোল উৎসবে এক সময়ে কৃষ্ণযাত্রার অনুষ্ঠান হতো। চন্দননগরে একসময়ে প্রচুর সংখ্যক যাত্রাওয়ালার নিবাস ছিল। জাঙ্গীপাড়ার কৃষ্ণনগর অন্তর্গত বাহিরগড় গ্রামে বাংলাদেশের অন্যতম কৃষ্ণযাত্রার প্রবর্তক ভক্ত গোবিন্দ অধিকারী জন্মগ্রহণ করেন।

"কেবল যাত্রাগান নয়, পালাগান রচনায় তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। তিনি তাঁহার বাড়ির পাশে অভিনেতাদের জন্য একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। গোবিন্দ অধিকারী ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুজামণ্ডপে স্থানীয় ব্যক্তিগণ একটি 'নাটমন্দির' করিয়াছেন। উহাতে প্রতি বৎসর অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গোবিন্দ অধিকারীর 'কালীয় দমন' যাত্রার নাম শুনিলে আবালবৃদ্ধবনিতা বহু দূরবর্তী গ্রামে যাইতেও কুণ্ঠাবোধ করিত না।" সু.মি. পৃ: ১২৮৭

এ ছাড়া এই ভক্ত গোবিন্দদাস স্বরচিত পদাবলী রচনা করে কীর্তন গান করতেন। পদকর্তা মহাজন ও সুগায়ক হিসেবে এই অঞ্চলে তাঁর খুব নাম ডাক ছিল। দূরদুরান্তে গান গাইতে যেতেন এই জীবিকায় তিনি ধনী ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। বর্ধমানের মহারাজার খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন বলে নিষ্কর জমিজমা ও অর্থপুরস্কার তিনি গোবিন্দ দাসকে দান করেছিলেন।

"তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের চেষ্টায় কবির বাস্তুভিটায় সম্প্রতি 'শান্তি কুটির' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঐ স্থানে কবিগান, যাত্রা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়।' ঐ পৃ: ১২৮৬

দশঘরার দানবীর বিপিনকৃষ্ণ রায় প্রত্যেক বৎসর জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা ও দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে কৃষ্ণকীর্তনের ব্যবস্থা করতেন। এ ছাড়া আর কোথায় কোথায় যাত্রা এবং কৃষ্ণযাত্রার আসর বসতো বা বসে, সেটা আমরা 'যাত্রা' প্রসঙ্গে পরে দেখবো।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় বা তার আগে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি জয়দেব প্রমুখের পদাবলী কীর্তন গাওয়া হতো। নিমাই পণ্ডিত এইসব সঙ্গীতের রস আস্বাদন করতেন। একে পদকীর্তন বলা যায়। তারপরে চৈতন্যযুগের সময় একে রসকীর্তন, নামকীর্তন, লীলাকীর্তন (যাকে বলা হয় বৈষ্ণব সাধনার অন্যতম অঙ্গ) প্রভৃতির প্রচার আরম্ভ হয়। চৈতন্যপূর্বকালে কীর্তনীয়া নামটি বা এমন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না বলে মনে হয়। চৈতন্যযুগে কীর্তনের যে প্লাবন বয়ে গিয়েছিল বর্তমানে তা স্তিমিত হয়ে এসেছে। মানুষ গান ছাড়েনি তবে অন্য তরঙ্গে ভেসেছে। সেই রকম একটা স্তিমিতভাব বঙ্গদেশে মুসলমান শাসনকালেও ছিল। এমন একটা সময় ছিল যখন কীর্তনগান কেউ গাইত না। আজ থেকে পঞ্চাশতাধিক বছর আগে বঙ্গভূমির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট কেমন ছিল সেই আলোচনার অবকাশ-পরিসর এখানে নেই। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কিঞ্চিৎ রূপান্তর, প্রেম ও অহিংসার বাণীর সমভিব্যাহারে জাতীয় নবজাগরণে শ্রীচৈতন্যদেবের ভূমিকা এবং অবদান আমরা অনেকেই জানি। আমরা আমাদের আলোচনা-পর্যবেক্ষণ 'কীর্তন' গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো।

"শ্রীচৈতন্য একটি নোতুন সঙ্গীত ধারার জন্ম দিলেন যার নাম 'নাম কীর্তন'। একে আমরা প্রথম গণসঙ্গীত বলতে পারি। তার সূচনা নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গই প্রথম করেন; সেই সঙ্গে গণনৃত্যও। এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। সঙ্গীত ও নৃত্য তখন গৃহের পরিধির আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে বাহিরবিশ্বে পথে প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনুরাগী পার্ষদদের নিয়ে গৌরাঙ্গদেব যে নামকীর্তনের প্রবর্তন করেন, পরবর্তী কালে আমরা দেখতে পাই ঠাকুর নরোত্তম দাস তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেন গৌরচন্দ্রিকার সঙ্গে লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন। এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেছেন। বৈষ্ণবভাবের প্রবল জোয়ার-এ ধর্মসাধনা বা ধর্মীয় রসভোগের ব্যাপারটা একটা গণতান্ত্রিক রূপ পেল। গণসঙ্গীতের আকারে সারাবাংলা ও বহির্বঙ্গেও নামকীর্তনের ব্যাপক চর্চা হতে লাগলো। সভায় আসরে নয়, পথে প্রান্তরে নগর সংকীর্তন। সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মেলক কণ্ঠে দিকে দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।'

— শ্রীচৈতন্য ও উত্তরকাল (শ্রীরামপুর সমাচার)

জানা যায় মহাপ্রভুর হুগলি পরিক্রমার কথা। বৈদ্যবাটীর নিমাইতীর্থ ঘাটে তিনি সপার্ষদ নামকীর্তন করেছিলেন। ১৫১৫ সালে তিনি এখনকার এক ভক্ত ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে এসেছিলেন। আর এসেছিলেন চাতরার (শ্রীরামপুর) দোলতলার মন্দিরে। সেই সালের ১৪ ফাল্গুনে আসেন তৎকালীন শ্রীপুরে-এখনকার শ্রীরামপুরে। বল্লভপুর হয়ে তিনি আসেন মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে। মহাপ্রভুর সাথে তাঁর অন্যতম পার্শ্বচর ভক্ত কমলাকর পিপ্পিলাই ছিলেন। সেখান থেকে রিষড়া হয়ে শ্রীচৈতন্য নগর সংকীর্তন করতে করতে নাম প্রচার করতে করতে চলেছিলেন নীলাচলের পথে। পথে পড়লো বক্তিয়ারপুর। ভক্ত সহচরবৃন্দ তখন সে স্থানের নাম জানতেন না। সেখানে তখন নাচগান রঙ্গ তামাসার আসর চলছিল। প্রভুকে সহচরগণ সেই নতুন অচেনা জায়গার নাম জিজ্ঞেস করায়, তিনি নাকি বলেছিলেন দেখছো না এখানে কত রঙ্গ। শোনা যায়, তার এই 'কত রঙ্গ' থেকেই নাকি সেই অঞ্চলের নাম হয় কোতরঙ। সে যাই হোক, এখান থেকেই খেয়া পেরিয়ে চৈতন্যদেব গেলেন খড়দহ, পাণিহাটি, বরাহনগর এলাকায়। বরাহনগরে বিশাল এক পাটবাড়ি আজও সচলভাবে বিদ্যমান। সেই সময় হুগলির সেইসব এলাকায় না জানি কতই নগরসংকীর্তনের বন্যা বয়ে গিয়েছিল!

"শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ শ্রীমদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী সপ্তগ্রামের 'অধিকারী' বা রাজার একমাত্র পুত্র ছিলেন এবং তিনি বুদ্ধদেবের ন্যায় পিতামাতা, স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্যই হুগলি জেলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইয়া, গ্রামে গ্রামে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ শিথিল হইয়া যায়। 'শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ-শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ'। বাঙ্গলা দেশের দ্বাদশ পাটের মধ্যে চারটি পাটই হুগলি জেলায় অবস্থিত। সাধক শ্রেষ্ঠ অভিরাম স্বামী খানাকুলে, কমলাকর পিপলাই মাহেশে, উদ্ধারণ দত্ত কৃষ্ণপুর - আদিসপ্তগ্রামে এবং পরমেশ্বর ঠাকুর বিষখালি (তড়া-আঁটপুর) গ্রামে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়া এই জেলাকে ধন্য ও পবিত্র করেন।

অভিরাম পূর্বে সুদাম খানাকুলে স্থিতি।
খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নামে খ্যাতি।।
আকনা মাহেশে তার জগেশ্বরে স্থিতি।
কমলাকর পিপলাই এই যে নিশ্চিতি।।
কমলাকর মহাবল পূর্বনাম হয়।
উদ্ধারণ দত্তের বাস কৃষ্ণপুর কয়।।
হুগলির নিকট হয় কৃষ্ণপুর গ্রাম।
উদ্ধারণ সুবাহু জানিহ পূর্বনাম।।
পরমেশ্বর দাস পূর্বে স্তোক কৃষ্ণ ছিল।
বেলখানাতে নাগর পুরুষোত্তম জন্মিল।।
সাতড়াতে পরমেশ্বর দাসের বসতি।
পরমেশ্বর অর্জুন-সখা পূর্বে এই খ্যাতি।।

দ্বাদশ-পাট ব্যতীত শ্রীচৈতন্য ভক্তগণ বঙ্গদেশে আরো সতেরোটি শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সতেরটি শ্রীপাটের নিম্নোক্ত পাটবাড়ি হুগলি জেলার মধ্যে অবস্থিত।

পঞ্চদশ দ্বাদশ পাট সপ্তদশ হয়।
ভক্তগণের সপ্তদশ সহ চৌত্রিশ পাট কয়।।
চারটী বল্লভপুরে দেখা অনুপম।
ভক্তগণ যে যে ছিল কহি তার নাম।।
কাশীশ্বর শঙ্করারণ্য শ্রীনাথ আর।

শ্রীরুদ্র পণ্ডিত আদি বাস সবাকার।।
বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর।
বগনপাড়াবাসী শ্রীরামাঞী ঠাকুর।।
গোপতি পাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী।
বৃন্দাবন চন্দ্র সেবন করিয়া পিরীতি।।
জিরাটে মাধবাচার্য আর গঙ্গাদেবী।।
যশড়াতে জগদীশ নিত্যবেনোদী।।
খানাকুল কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস।
কেয়ড় গ্রামেতে বেনগর্ভ পরকাশ।।
ভগমোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম।
পরম বিদ্বান বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান।।
দ্বীপ গ্রামে স্থিতি কৃষ্ণানন্দ অবধূত।
সোনাতলা বঙ্গদেশে রন্দন কৃষ্ণদাস নিশ্চিত।।
রাধানগরেতে বাস যদু হালদার।
হীরা মাধব দাস স্থিতি অনন্তনগর।।
মহেশ গ্রামেতে বাস গোপালদাস নাম।
কেটরাতে বাস অদ্ভুত পণ্ডিত আখ্যান।

— সুমি পৃ: ২২৩, ২২৭

হুগলিতে সেইসময় ব্যাপক কীর্তনচর্চা হতো, এই ঘটনা বোঝানোর জন্য এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হলো। অভিরাম দাস বিরচিত পাটপর্যটন এর-ই অংশে যে রুদ্ররাম পণ্ডিত এর কথার উল্লেখ আছে তিনি শ্রীরামপুর নিবাসী এবং তিনি মানিকতলা বল্লভপুরের রাধাবল্লভ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। শ্মশান ঘাটের কাছে তাঁর নামে একটা রাস্তা আছে। কীর্তন একটি ধর্মীয় আচার এবং অবশ্যকরণীয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভয়ে এবং ভক্তিতে এই কীর্তনকে এখনো ধরে রেখেছেন। শ্মশানযাত্রী অনেকে শবযাত্রার সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করেন। আমার বাড়ি থেকে অদূরে শ্মশান অবস্থিত বলে শ্রীরামপুরে এই কীর্তন প্রায়ই শোনা যায়। যতদিন বৈষ্ণব সম্প্রদায় থাকবে ততদিন কীর্তন গানের চর্চা থাকবে, কারণ চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে স্বীকার করে জপ ও কীর্তনকে এই নবধর্ম সাধনার আচার অনুষ্ঠান রূপে প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে এমন বহু মঠ ও আখড়া গড়ে ওঠে, এখনো আছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ মূর্তির সহঅবস্থানে গৌরনিতাই -এর যুগলমূর্তিই মুখ্য এবং সেখানে নিয়মিত কীর্তন গান দিয়েই সাধনভজন করা হয়। যাকে বলে নিত্যকীর্তনের মাধমে নিত্য সেবা। শ্রীরামপুরের বটতলার হরিসভায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় কীর্তন গান হয়।

শ্রী চৈতন্যের অন্যতম পরিকর শ্রীপাদ খণ্ডভগবান আচার্যের সময় থেকে পোলবা থানার গোস্বামী মালিপাড়ায় গোস্বামীগণ বসবাস করেন। প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থাবলীতে তাঁর নাম উল্লেখ আছে। গোস্বামী-মালিপাড়ায় হরিসভার নাটমন্দিরের পাশেই শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ জীউর মন্দির। শ্রীপাদ ভাগবতানন্দ গোস্বামী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তগ্রামের কুলীনগ্রামে বসংবংশে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার খ্যাতি আছে। গুণরাজ খাঁর পুত্র সত্যরাজ খাঁ (প্রকৃত নাম লক্ষ্মীকান্ত বসু এবং তাঁর পুত্র রামানন্দ বসু) শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। এখানে ওঁদের নামে শ্রীপাট আছে। হুসেন শাহের রাজত্বকালে সপ্তগ্রামের 'অধিকারী' বা রাজার পুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী চৈতন্য দাস চৈতন্যদেবের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন এবং কঠোর বৈরাগ্যসাধন ও অতুলনীয় ভক্তির প্রভাবে উত্তরকালে বৈষ্ণব জগতের চিরসম্মানিত ষট

গোস্বামীর অন্যতমরূপে পরিচিত হন। সপ্তগ্রামে তাঁর শ্রীপাট আজও বিদ্যমান। তিনি প্রতিদিন একুশ ঘন্টা হরিনাম সংকীর্তনে বিভোর থাকতেন এবং মাঝে মাঝেই সপ্তগ্রামে বৈষ্ণবদেব সমাগম হতো ও কীর্তন গান হতো। শ্রী মদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাছ থেকে শুনে ঝামটপুর নিবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৈষ্ণব সমাজের অমূল্য গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন।

প্রভু নিত্যানন্দ গঙ্গার উভয় তীরে অর্থাৎ হুগলিতেও হরিনাম সংকীর্তন করে কৃষ্ণপ্রেম প্রচারের কাজ করতেন। তিনি সস্ত্রীক মাঝে মাঝে সপ্তগ্রামে বাস করতেন। উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন নিত্যানন্দের বিবাহের প্রধান উদ্যোক্তা। নিত্যানন্দ যে গ্রামে ছিলেন, হুগলির সেই গ্রামের নাম নিত্যানন্দপুর। সেখানে তাঁর শিষ্য শ্রীধর একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিত্যানন্দের অনেক নামগানকীর্তন রচনা করেন বলে শোনা যায়। সাধু সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ-এর নাম আমরা সবাই জানি। তাঁর পূর্বাশ্রম ছিল ডুমুরদহে। আগের নাম ছিল প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৩৪৬ সালে সংসার ত্যাগ করেন এবং তাঁরই উৎসাহে হরিনাম সংকীর্তন নিয়ে জয়গুরু সম্প্রদায় হিন্দুধর্মের প্রচার করে। কীর্তনপরায়ণ এই মহাসাধক ডুমুরদহে 'রামাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৌনকালে নামপ্রচারের আদেশ পান। প্রভু নিত্যানন্দের প্রপৌত্র রামকানাই গোস্বামী জীরাট গ্রামে শ্রীশ্রী গোপীনাথ জীউর-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। চৈতন্যদেবের আরেকজন পার্ষদ শ্রীশ্রী কৃষ্ণানন্দপুরী হরিপালের দ্বীপা গ্রামে হরিনাম বিতরণ করেন এবং মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে হরিসভা নির্মাণ করেন। অভিরাম গোস্বামীর কৃপায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদরজ খানাকুল কৃষ্ণনগরে পড়েছিল। তিনি এখানে শ্রীশ্রী গোপীনাথ জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং নানা স্থানে বিষ্ণুমন্দির স্থাপনা করে নামগানের মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। পাণ্ডুগ্রামে সাধক আউলচাঁদ গোস্বামীর তিরোধান উপলক্ষ্যে বারোদিন যাবৎ পূজা ও মহোৎসব হয়। এই মহোৎসব মানেই কীর্তন উৎসব। একদিন বা একাধিক দিন ধরে অষ্টপ্রহর চলে এই কীর্তন সম্মেলন। দেশ দেশান্তর থেকে কীর্তনীয়া ও তাঁর সম্প্রদায় দীর্ঘ সময় ধরে কথা ও গান সহযোগে কীর্তন গান করেন। সঙ্গে থাকে ঢালাও ভোগ ও প্রসাদ খাওয়ার ব্যবস্থা। সাধারণত ধনী বৈষ্ণবদের বাড়ীতে এবং হরিসভায় বাৎসরিক সম্মেলনে এই কীর্তন উৎসব হয়। এখনো হয়। মাইকযুগের আগে থেকেই এই কীর্তন গানের চর্চা চলে আসছে। এই কয়েকমাস আগেও লাউড স্পীকার সহযোগে প্রতিবেশীদের বেশি করে দিন রাত কীর্তন শোনাবার ব্যবস্থা থাকতো। আজকাল পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদসহ মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালতের বিশেষ অধ্যাদেশে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের পরিণামে নামকীর্তনের আকাশে বাতাসে ঘনঘটা কমেছে এবং অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে বড় একটা শুনতে হয় না। তবে এটা একটা সাংগঠনিক ব্যাপার। মহোৎসব ও কীর্তন নামগান - এর লাগাতার হরিভক্তি প্রদায়িনী সভাগুলো এককালে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হাতিয়ার ছিল। কাজও হয়েছিল খুব। এখন আর তেমন হয় না। স্রোত থেকে অনেক কিছু সরে এসেছে। এবারে হুগলির কীর্তনাঞ্চল-এর একটা খন্ড তালিকা দেওয়া যাক — গুড়াপের শ্রীশ্রী নন্দলাল জীউর মন্দিরসহ রাসমঞ্চ দোলমঞ্চ, নাটমন্দির, হরিটের শ্রীশ্রীরাধা গোপীনাথ মদনমোহন জীউর মন্দির। খণ্ড ভগবানাচার্যের পুত্র রঘুনাথ আচার্য প্রমুখ দলবদ্ধভাবে এই স্থান থেকে খেতুড় গ্রামে নরোত্তম দাস ঠাকুরের বিরাট মহোৎসবে যোগদান করেন। (আগেই বলেছি মহোৎসব মানেই মহাসংকীর্তনের মহা আসর।) সেখানে রঘুনাথ আচার্য নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে মহোৎসবে যান। প্রতিবৎসর বৈশাখী কৃষ্ণা পঞ্চমী থেকে তিন দিন হরিট গ্রামে মহোৎসব উপলক্ষ্যে বৈষ্ণব সমাবেশ হয়, লীলাকীর্তন ও প্রসাদভক্ষণ হয়। এই গ্রামের গোস্বামী বংশ ভগবানের নাম সংকীর্তন এবং গীতবাদ্যাদির জন্য বিখ্যাত ছিল। এই মহোৎসবকে অনেকে বারোয়ারী বলেন। ধনিয়াখালির বসুয়া এবং আলা গ্রামে রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দিরে রথযাত্রার সাতদিন বারোয়ারী চলে এবং পালাক্রমে

যাত্রাকীর্তন প্রভৃতির অনুষ্ঠানে খুব জাঁকজমক হয়। আলাগ্রামে দোলমঞ্চ আছে। হুগলি জেলার বহু দেবালয়ে দোলমঞ্চ রাসমঞ্চ, মগরা গ্রামের আনন্দ কানন এবং দাশরথি ভবন, জীরাটের গোপীনাথ জীউর মন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপ, গুপ্তিপাড়ার শ্রী কৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির, ডুমুরদহে রাধারমণ জীউর মন্দির, পাণ্ডুয়া থানার পোঁটরা গ্রামের সচ্চিদানন্দের আশ্রম, আদিসপ্তগ্রামের পাট বাড়ি, পোলবা থানার মাকালপুর গ্রামের হরিসভা, বলাগড় থানার সোমড়া গ্রাম-এর রাধাগোবিন্দের মন্দির, গুপ্তিপাড়ার মঠ বা বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির, চন্দননগরে নন্দদুলালের মন্দির, শ্রীপুরে গোবিন্দ জীউর মন্দির, সুখাড়িয়ার রাধাকৃষ্ণ মন্দির, হরিপালের শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জীউ মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দির ও রাসমঞ্চ, জেজুরের হরিসভা, গৌরহাটির হরিসভাকে কেন্দ্র করে মেলা ও কীর্তন, আরামবাগের সোয়ালুক গ্রামের শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দির; মহাপ্রভুর সপ্তদশ শ্রীপাটের অন্যতম বাখরপুরের রজনী পণ্ডিতের শ্রীপাট, গুড়বাড়ির শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ জীউর মন্দির ও দোলমঞ্চ। দশঘরা শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির - এখানে বিপিনকৃষ্ণ রায় স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে কবি কীর্তনের ব্যবস্থা করতেন। এঁদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় জীউর মন্দিরের প্রশস্ত নাটমন্দিরে আলাদাভাবে কীর্তন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। তারকেশ্বরের লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণের মন্দিরে দোলোৎসব হয়, এখানে হরিনাম প্রদায়িনী সভা ১৩৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন কীর্তন হয়। বন্দীপুরে শ্রীশ্রীগোপীজনবল্লভ জীউ মন্দিরে জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা ও অন্যান্য উৎসবে কীর্তন হয়। শ্রীরামপুরের চাতরায় গৌরাঙ্গ মন্দির, বটতলার হরিসভা, দ্বারকানাথের মন্দির, মাহেশ জগন্নাথ মন্দির ছাড়াও জি টি রোডের ওপরে রাধাকৃষ্ণের মন্দির, চৌধুরীপাড়ার মদনমোহন-এর প্রাচীন মন্দির, চাতরায় গৌরাঙ্গ মঠ সহ অসংখ্য হরিমন্দিরে কীর্তন হয়। আরামবাগ মহকুমার পাতুল গ্রামের হরিসভা শতাধিক বছরের পুরাতন। প্রতিবছর এখানে চার দিন ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন হয়। আটপুরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপে, রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে এবং অসংখ্য হরিকীর্তন প্রদায়িনী প্রতিষ্ঠানে দৈনিক, সাময়িক অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা আছে। কয়েকটি মাত্র নাম সংগ্রহ করে উপস্থাপন করা গেল। তন্ত্রসাধনার সঙ্গে বৈষ্ণবসাধনার মিলমিশের সহাবস্থানে কোনো কোনো স্থানে মিশ্র কীর্তনের অনুষ্ঠান হয়। যেমন শাক্ত শৈব এবং বৈষ্ণব গানের সংমিশ্রণ যেমন গুপ্তিপাড়ার শৈব মঠে, সত্যানন্দের শ্রীপাটে, জীরাটের মাধবাচার্যের নাট এবং যশড়ার জগদীশের পাটে। ইদানীং এইসব ধর্মসভায় শ্যামাসঙ্গীত ও কীর্তনের সহাবস্থান দেখা যায়।

এই কীর্তন প্রসঙ্গে মনে পড়ল হরির লুটের কথা। ছোট বেলায় আমাদের বাড়ির মতো বঙ্গ দেশের বৈষ্ণব প্রভাবিত অনেক বাড়িতেই তুলসীতলার উঠোনে বা ঠাকুরঘরে কীর্তনের আসরের শেষে (অনেক বাড়িতেই করতাল, কাঁসর ঘন্টা আর খোল থাকতো) হরির লুটের বাতাসা ছুঁড়ে দেওয়া হতো - যে যত পারো লুটে পুটে নাও - আমরা সেই বাতাসা কাড়াকাড়ি করে সংগ্রহের লোভে কীর্তনের আসরে বসে থাকতাম। কয়েকটা গান এখনো মনে আছে —

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

•••

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে॥ — ইত্যাদি গান

এতবার বহুশ্রুত, যে সুরটা মর্মে গেঁথে স্থায়ীস্মৃতি হয়ে আছে, এখনো যে কোনো সময়ে গেয়ে দিতে পারি। শ্রীরামপুরের ক্ষেত্রসার মেলা বাড়ির নাট মন্দিরে লক্ষ্মী সাহার পৃষ্ঠপোষকতায়

কয়েকবৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত ধর্মসভার অঙ্গ হিসেবে গানের আসরের শেষে এক ধামা বাতাসা প্রসাদ বিতরণ হতে দেখেছি। আমি স্বয়ং গায়ক এবং কখনো দর্শকরূপে সেখানে বহুবার উপস্থিত থেকে সেই স্মৃতিমেদুরতায় আক্রান্ত হওয়ার কথাটা স্মরণ না করে পারলাম না। সে সব দিন কেটে গেছে। আজকাল দীর্ঘ পদকীর্তনের দিন চলে যাচ্ছে। খণ্ডগীতির আকারে ছোট ছোট কীর্তন গান -এর রেকর্ড ক্যাসেট প্রকাশিত হচ্ছে — যেমন আমরা ছোট বেলায় দেখেছি হরিমতী দেবী, উত্তরা দেবী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, রাধারাণী দেবী প্রমুখের ছোট ছোট কীর্তন গান। আর একটি কীর্তন স্থানের উল্লেখ করা উচিত। শ্রাদ্ধবাসর এবং শবযাত্রার সময় হুগলী সহ বঙ্গদেশের প্রায় সব হিন্দুগৃহেই শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তন গান করে একরকমের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হতে দেখছি। এই প্রসঙ্গে রিষড়া অঞ্চলের এক কীর্তনীয়া মোহনচন্দ্র দাস-এর কথা বলি। শেওড়াফুলির এক ডাক্তারবাবুর বাবার শ্রাদ্ধবাসরে তিনি সদলে কীর্তন গান করছিলেন। খুব সুরেলা সাধা গলা। সব সুরসপ্তক পরিষ্কার ভাবে ছুঁতে পারছেন। গানপাগল মানুষ আমি উৎকর্ণ হলাম। গান শেষে আলাপ করে নাম ধাম জানতে পারলাম। সঙ্গে একজন গায়িকা ছিলেন। বয়স্কা। অসাধারণ ব্যতিক্রমী কীর্তন গান করছিলেন। নাম বললেন মহামায়া বন্দ্যোপাধ্যায়। কত গুণী শিল্পী শুধু মাত্র যোগাযোগের অভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে পারেন না। পরে উনি কলকাতার এক অনতি পরিচিত ক্যাসেট কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করে গান শোনান। তাঁরা তাঁর কয়েকটি গান নিয়ে একটি ক্যাসেট প্রকাশ করেছিলেন।

এবারে কয়েকজন হুগলির বিখ্যাত কীর্তনীয়ার কথা বলা যাক। ধনিয়াখালির গুড়বাড়ি ইউনিয়নের চোপা গ্রামে শ্রীমন্ত ঘোষ গায়ক ও পদকীর্তন-রচয়িতা হিসাবে বিখ্যাত হন। তাঁর রচিত একটি পালার নাম 'নন্দ বিদায়'। প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া ব্রজেন সেন পাণ্ডুয়া থানার ছোট সারসা গ্রামের সেন বংশের সন্তান। জেজুরের কংগ্রেস নেতা প্রয়াত অতুল্য ঘোষ বাল্যকাল থেকে যাত্রা থিয়েটার এবং কীর্তন গান করতেন। জাঙ্গীপাড়া - কৃষ্ণনগর ভক্ত কবি মহাজন গোবিন্দদাস -এর জন্মস্থান। তিনি নিজে পদাবলী রচনা করে কীর্তন গান পরিবেশন করতেন। পদকর্তা ও গায়ক হিসেবে তাঁর সুনাম হয়েছিল। খানাকুলের কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাপ্রভুর প্রেম ও নাম গান প্রচারকীর্তন করতেন। ইন্দুভূষণ বসু ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কীর্তনীয়া নবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছ থেকে কীর্তন শিক্ষা করেছিলেন। তিনি বহু প্রার্থনা সঙ্গীত ও পদাবলীর আখর রচনা করেন। খ্যাতনামা কীর্তন শিল্পী রথীন ঘোষ কর্ডলাইনের পোড়াবাজারের বাসিন্দা। তিনি পরবর্তী কালে কলকাতায় গিয়ে বিখ্যাত হন। তিনি ছায়াছবির সঙ্গীত পরিচালক, বেতার শিল্পী, সুরকার, কীর্তন কলানিধি উপাধি প্রাপ্ত। কোন্নগর নিবাসী নবাই চৈতন্য মিত্র প্রখ্যাত কীর্তনবিদ এবং সাধক ছিলেন। বহুবার তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে কীর্তন গান শুনিয়ে তৃপ্তি দান করেছেন এবং তাঁর কৃপা লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন বলে বর্ণিত আছে। রিষড়ার হরিভক্তি প্রদায়িনী সমিতি নামক একটি প্রাচীন বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠান জানি — এই সংস্থার নিজস্ব বাসগৃহ ও মন্দির ইদানীং করা হয়েছে। এখানে নিয়মিত কীর্তন গানের অনুষ্ঠান হতে দেখি।

••• ••• •••

এখানে হুগলি জেলার সঙ্গীত চর্চার ইতিহাস-এর প্রথম পর্ব সমাপ্ত। বাকি ইতিহাস তৈরীর প্রস্তুতিপর্ব শেষ। স্থানাভাবে এখানে দেওয়া গেল না। এরপর একে একে নানা পর্যায়ে আসবে শাক্তপদাবলীসহ শ্যামাসঙ্গীত, চণ্ডীমণ্ডপ সংস্কৃতি, লোকসঙ্গীত, অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ করে রামায়ণী গান, উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, কর্মসঙ্গীত, কথকতা, ব্রতকথা, কবিগান, ছড়ার গান, পাঁচালী পীরের গান, সুফীর গান, ফকিরী গান, চড়ক ও গাজন গান, পটুয়ার গান, পুতুল নাচের গান,

মেলা ও উৎসবের গান, গির্জা অধ্যুষিত এলাকায় খ্রিস্ট সঙ্গীত, রামমোহন ও ব্রহ্মসঙ্গীত, বাঈজীর গান ও সঙ্গীত পৃষ্টপোষক, রামকৃষ্ণের গান, যাত্রা নাটকের গান, পঞ্চ কবির গান, চন্দননগরে রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গীত বিদ্যালয়, সঙ্গীত গ্রন্থ, সঙ্গীত পত্রিকা, সঙ্গীত সম্মেলন — ইত্যাদি ইত্যাদি। মহাভারত শেষ হতে অনেক পৃষ্ঠা লাগবে। ক্রমশ প্রকাশ্য।

🕮 সহায়ক প্রসঙ্গ আকর সূত্র

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য — ১) বাংলার লোক সংস্কৃতি ২) লোকসঙ্গীত রত্নাকর চার খণ্ড

সুধীর কুমার মিত্র — হুগলীর জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ, দুই খণ্ড

বুদ্ধদেব রায় — বাঙলা গানের স্বরূপ

অসিত দত্ত — শ্রীচৈতন্যদেব ও উত্তরকাল : শ্রীরামপুর সমাচার

বিনয় ঘোষ — পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

কালিদাস রায় — পদাবলী সাহিত্য

অসিত দত্ত — লোকসঙ্গীতের উৎস সন্ধান

রামকৃষ্ণ সরকার — কোন্নগরের ইতিহাস

অনেক গ্রন্থ দিয়ে সহায়তা করেছেন দুইজন গ্রন্থাগারিক অশোক রায় এবং আনন্দময়ী দাসগুপ্ত।

সংযোজন : বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁশবেড়িয়ার সংগীত-কথা

হুগলি জেলার সংগীত চর্চায় বাঁশবেড়িয়ার অবদান অনেকখানি। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়-এর শ্বশুরবাড়ি এই বংশবাটিতে রাজবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় সংগীতের আসর বসত এককালে। পরে পাঁচের দশকে প্রধানত হেমন্ত ঘোষ ও সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উৎসাহে বাঁশবেড়িয়া সংগীত প্রতিযোগিতা কমিটির পরিচালনায় বাৎসরিক ধ্রুপদী সংগীতের আসর বসত। সহযোগিতায় আরও ছিলেন কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (পাখোয়াজ), ইন্দুভূষণ দাস (তবলা), জ্যোতি বসুরায়, রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সংগীতানুরাগী ব্যক্তি। নিয়মিত বহু গায়ক গায়িকার সঙ্গে তবলা সংগত করতেন ও তানপুরা বাজাতেন। প্রধানত তাঁর ও হেমন্ত ঘোষ-এর আগ্রহাতিশয্যে বাঁশবেড়িয়ায় পাঁচ ও ছয়ের দশকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সংগীত প্রতিযোগিতা ও সংগীতানুষ্ঠানের আসর। অনুষ্ঠানটি হতো অধুনালুপ্ত শ্রীকৃষ্ণ টকীজ প্রেক্ষাগৃহে।

১৯৬১ সালের সংগীত প্রতিযোগিতার একটি প্রচারপত্র নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত হ'ল।

বাঁশবেড়িয়া সংগীত প্রতিযোগিতা কমিটির

পরিচালনায়

সঙ্গীতানুষ্ঠান

তারিখ : ১২ মার্চ (রবিবার) ১৯৬১ (সারারাত্রিব্যাপী)

স্থান : শ্রীকৃষ্ণ টকীজ (বাঁশবেড়িয়া)

অংশগ্রহণ করেছেন —

কণ্ঠসংগীতে : সঙ্গীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল (ধ্রুপদ), সংগীত রত্নাকর ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, সংগীত রত্নাকর রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সবিতা রক্ষিত বুলবুল চট্টোপাধ্যায়, কণা ভদ্র, গৌরী চৌধুরী।

যন্ত্রসংগীতে : ওস্তাদ কেরামাতউল্লা খান (তবলা), মহম্মদ সাগিরুদ্দিন খান (সারেঙ্গী), রাজীবলোচন দে (পাখোয়াজ), গোকুলচন্দ্র সুর (তবলা), কণা ভদ্র (সেতার), মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সরোদ)।

নৃত্যে : বাণী দাস।

সম্পাদক

সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উক্ত অনুষ্ঠানটিতে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর গোন্দলপাড়ার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়। সুধীরবাবুর দিনলিপি থেকে আরো জানা যায় যে, ৬০ সালে একটি অনুষ্ঠানে সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়কে হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলে আনার জন্য ভাড়া লেগেছিল ৭৫ পয়সা। ব্যান্ডেল থেকে বাঁশবেড়িয়া রিকস্‌া ভাড়া লেগেছিল ১ টাকা ৫০ পয়সা। চা ও সিগারেটে খরচ হয়েছিল ৩২ পয়সা। এই রকম সব কৌতূহলপ্রদ তথ্য সেখানে সন্নিবেশিত আছে।

পঙ্কজ মল্লিককে মাত্র ২০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল একটি অনুষ্ঠানের জন্য রাহা খরচ বাবদ। পঙ্কজবাবু লিখেছিলেন, 'তাহাতেই হইয়া যাইবে।' আজকের এই চরম ও চূড়ান্ত পেশাদারিত্বের যুগে যা অকল্পনীয়। তখন গান বাজনায় ডাকসাইটে শিল্পী ছিল, কিন্তু টাকা ছিল না। এখন শিল্পী সেরকম নেই; কিন্তু প্রচুর টাকা আছে।

ছয়ের দশকের প্রথমে 'বাঁশবেড়িয়া সংগীত বিতান' সৃষ্টি হয়েছিল। এতে যুক্ত ছিলেন ভোলানাথ দাস, বলাই পাল (এসরাজ), হরিদাস ভট্টাচার্য, সন্তোষ কুমার চন্দ্র (বেহালা), ইন্দুভূষণ দাশ, হেমন্ত ঘোষ, বৈদ্যনাথ শেঠ (বেহালা), কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, দুখিরাম নন্দন প্রমুখ। হালিশহর সংগীত প্রতিযোগিতা থেকে নিয়মাবলী এনে, তা অনুসরণে এই প্রতিযোগিতার সূচী তৈরী হয়েছিল — এ তথ্য জানালেন বেহালাশিল্পী সন্তোষ কুমার চন্দ্র। তিনি আরও জানালেন, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ও একসময় এই সংগঠনে যুক্ত ছিলেন, পরে তিনি 'দেশগৌরব সংগীত বিতান' নামে অন্য একটি সংগীত ও নৃত্যের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। গীটার-শিল্পী অশোক মুখোপাধ্যায় জানালেন, 'বাঁশবেড়িয়া সংগীত বিতান'-এর অনুষ্ঠানে পণ্ডিত যশরাজ, পণ্ডিত কিষেণ মহারাজ, মালবিকা কানন, জগন্ময় মিত্র, অখিলবন্ধু ঘোষ, নানকু মহারাজ, দবীর খাঁ, অপরেশ লাহিড়ী, বাঁশরী লাহিড়ী, সাগিরুদ্দিন খান, আমিনুদ্দিন খান ডাগর, জন গোমেজ, বেঞ্জামিন গোমেজ, পঙ্কজ সরকার প্রমুখ এসেছিলেন। সন্তোষচন্দ্রও এই নামগুলি সমর্থন করেছেন। তিনি ও অশোক মুখোপাধ্যায় দুজনেই ধুতি-বাংলা ফুলশার্ট পরিহিত অবস্থায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-এর অংশগ্রহণের কথা জানিয়েছেন।

দুর্ভাগ্যবশত ১৯৬২ সালেই এই সংঘবিন্যাস ভেঙে যায়। উৎসাহীর অভাব তো বটেই, সেইসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ টকীজ নিয়ে গোলমাল হওয়াও এর জন্য দায়ী। এখানে শ্রীকৃষ্ণ টকীজ-এর অদ্ভুত নির্মাণ বৈচিত্রের কথা (কলকাতার মিনার্ভা ও স্টার-এর মতো) বলা আবশ্যক। দোতলার পুরোটাই ব্যালকনির মতো থাকায় সিনেমা হল অপেক্ষা নাটমঞ্চ হিসেবেই সেটিকে মানাত বেশি।

আজ সেই প্রেক্ষাগৃহও নেই, বাঁশবেড়িয়ার সাংগীতিক ঐতিহ্যও বিলুপ্তপ্রায়। যদিও ইন্দুভূষণ দাস-এর পুত্র স্বপন দাস ১৯৭০ থেকে একক প্রচেষ্টায় 'বাঁশবেড়িয়া সংগীত বিতান'টিকে ক্ষুদ্র চেহারায় হলেও টিকিয়ে রেখেছেন।



হুগলি : চলচ্চিত্র চর্চা

অজয় মিশ্র

পৃথিবীর ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের বয়স হল ৭৫। ভারতে এর বয়স ৫৫। ফিল্ম সোসাইটির সংখ্যা ১১৫ থেকে ১২০টি। সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজারের কাছাকাছি। সারা দেশের সোসাইটি গুলিকে নিয়ে তৈরী হয়েছে ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়া। এরা নিয়মিত ভালো ভালো বিদেশী ছবি নিয়ে এসে সদস্য ক্লাবগুলিকে দিয়ে থাকেন প্রদর্শনের জন্য। আবার কখনো নিজেরাই উৎসবের আয়োজন করেন। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কি বছরই অ-প্রতিযোগিতামূলক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সংস্কৃতিসম্পন্ন জেলা হিসেবে হুগলিরও অবদান আছে এই চলচ্চিত্র আন্দোলনে। এই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে সামগ্রিকভাবে পশ্চিবঙ্গের চলচ্চিত্র আন্দোলন নিয়ে দু-চারকথা বলা যেতে পারে।

পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল ফিল্ম্ সোসাইটি আন্দোলনের। কী উদ্দেশ্যে ফিলম্ সোসাইটি আন্দোলন শুরু হয়েছিল সে প্রসঙ্গে আজও মূল্যায়ন হয় নি। এ ব্যাপারে সদস্যদের ধারণাও খুব পরিষ্কার নয়। এবং পরে যখন আন্দোলন বিভিন্ন জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ল, তখনও সেই ব্যাপ্তি কতটা পরিমাণগত আর কতটা গুণগত তার পরীক্ষা আজও হয়নি। সমীক্ষা হয়নি সদস্যদের মনোভাব ও চিন্তাধারার, যে কেন তারা ফিল্ম সোসাইটির সদস্য হন। মুল উদ্দেশ্য যদিও ছিল সার্থক ও শিল্পবোধ সম্পন্ন দর্শক তৈরী করা, সেটাও যে হয়নি তা তো দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। ঋত্বিকঘটকের নাম তরুণ প্রজন্ম জানেই না, তাদের হৃদয়দেবতা এখন ঋত্বিক রোশন।

ফিল্ম সোসাইটির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এ কথাটাই মনে হয়, সদস্যদের নিয়মিত ছবি দেখানোর বাইরে তাঁর অন্য কোন সদর্থক ভূমিকা ছিল না। যদিও ছবি সংগ্রহ বা পছন্দ করার ব্যাপারে ফিল্ম ক্লাবগুলো বর্তমানে বিশেষ স্বাধীনতা পায় না। প্রধানত ভারত সরকারের মাধ্যমে বা বিভিন্ন দূতাবাসের সাহায্যে বিদেশী ছবি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংস্থার কাছে আসে। সেখান থেকে বিভিন্ন ফিল্ম ক্লাব ছবি নিয়ে নিজের নিজের সদস্যদের দেখায়। এই হলো প্রধান কাজ। কিন্তু কোনো ফিল্ম ক্লাব যদি মনে করে বিশেষ একটি দেশের বিশেষ একটি ছবি সে তার সদস্যদের দেখাবে, তা সম্ভব নয়। বিভিন্ন আইনকানুনের বাধা। এর পরের কাজ পত্রিকা প্রকাশ। মোটামুটি প্রায় প্রত্যেক ক্লাবেরই নিজস্ব মুখপত্র আছে। কিন্তু অধিকাংশই অনিয়মিত। পত্রিকাগুলিতে প্রধানত বিভিন্ন ছবির সমালোচনা, চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনা, পরিচালকদের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক কাজের পরিচিতি প্রকাশিত হয়। এছাড়াও অবশ্য কিছু কিছু সংগঠন সেমিনার, সিম্পোসিয়াম-এর আয়োজনও করে থাকে। একমাত্র ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি ছোট ছোট ছবি তৈরী করেছে নিজেদের সদস্যদের দেখানোর

জন্য। আর নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি নিয়মিত চিত্রনাট্য রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে।

এই নিরিখেই দেখতে হবে হুগলির চলচ্চিত্র আন্দোলনকে। মূলত 'নো কাঁচি'র আবর্তে এই আন্দোলন প্রায়শই খানিকটা দিশাহারা হলেও, জেলার চলচ্চিত্র মনস্ক সিরিয়াস কিছু মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টায় চলচ্চিত্র চর্চার প্রথম সূত্রপাত হুগলির চুঁচুড়ায়। বর্তমান সাংসদ রূপচাঁদ পালের সঙ্গে সমমনস্ক কয়েকজন তরুণ গড়ে তুলেছিলেন প্রথম ফিল্ম্ সোসাইটি। ছবি দেখানো হত হুগলি গার্লস কলেজ অডিটোরিয়ামে। যথেষ্ট সংখ্যক উৎসাহী কর্মীর অভাবে সাধ্য থাকলেও প্রত্যাশাপূরণ হয় নি। কয়েকটি শো'এর পরই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এই উদ্যোগ।

১৯৭৩ সালে পাশের শহর চন্দননগরে প্রতিষ্ঠিত হয় চন্দননগর সিনে সেন্টার। সুমঙ্গল বসু ও শেখর ঘোষ-এর উৎসাহে চন্দননগরের কিছু তরুণ বুদ্ধিজীবী নিয়মিত চলচ্চিত্র দেখানোর বন্দোবস্ত করেন জ্যোতি প্রেক্ষাগৃহে। এ ছাড়াও নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে ১৬ মি.মি ছবির প্রদর্শনও হতো। এদের সদস্য সংখ্যা কম বেশি ৩৫০ জনের মধ্যেই ঘোরাফেরা করত। সদস্য চাঁদা প্রথমদিকে ছিল ১০ টাকা কোয়ার্টার। পরে তা ক্রমে ক্রমে বেড়েছে। বছরে অন্তত ৪০টি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি এরা দেখিয়েছেন। সংস্থার মুখপত্রের নাম 'চিত্রণ'। যার শুরু ইঙ্গমার বার্গম্যান সংখ্যা হিসেবে। সংগঠনের প্রধান যে সমস্যা ছিল, তা হ'ল অডিটোরিয়ামের। চন্দননগরের মত পুরোনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমণ্ডিত শহরে তখন কোন অডিটোরিয়াম ছিল না। ফলত জ্যোতির মত সিনেমা হলে নানা অসুবিধের মধ্যেই এরা ছবি দেখিয়েছেন। মাঝে মাঝেই সিনে সেন্টারের উদ্যোগে সেমিনার আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যদিও উৎসাহী শ্রোতার অভাবে সেগুলিও ফলপ্রসূ হয় নি। যে যে বিদেশী ছবি দেখানো হতো, তার সংক্ষিপ্তসার ছবি প্রদর্শনের আগে দর্শকদের মধ্যে বিতরিত করার বন্দোবস্ত থাকত। প্রচুর উল্লেখযোগ্য ভালো ছবি এই সংস্থা তার সভ্যদের দেখিয়েছে। বিশ্ব চলচ্চিত্রের নামী পরিচালকদের মধ্যে অনেকের উল্লেখযোগ্য ছবিই প্রদর্শিত হয়েছে সিনে সেন্টারে। সেসব ছবির প্রিন্টও ছিল উৎকৃষ্ট। প্রদর্শিত ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন, ভিভরে সা ভি, মুরিয়েল, গোল্ডরাশ, নাইফ ইন দি ওয়াটার, ইদিপাস রেকস্, দ্য সেভেনথ্ সীল, ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ, দ্য ভার্জিন স্প্রিং, দ্য সাইলেনস্, লামোর ফ্যু ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীরামপুরে ৭০ -এর দশকের শেষ দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সিনে স্টাডি গ্রুপ, শ্রীরামপুর। এদেরও উল্লেখযোগ্য ছবির তালিকায় পৃথিবীর নামী চলচ্চিত্রকারদের ছবি। এরাও নিয়মিত ছবি দেখিয়ে গেছেন, সেমিনার আয়োজন করেছেন। চলচ্চিত্র চর্চার একটা আবহ তৈরির চেষ্টাতেও এরা নিয়ত সচেষ্ট ছিলেন আগাগোড়াই। ছবি দেখানোর আগে এরা সবসময়ই মুদ্রিত বুলেটিন প্রকাশ করতেন। তাতে সেদিনকার প্রদর্শিত ছবিটি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া থাকত। বেশির ভাগ শো হত শঙ্কর সিনেমায় এবং টাউন হল-এ এবং মাঝে মাঝে উদয়ন প্রেক্ষাগৃহেও।

শ্রীরামপুরের পাশেই শেওড়াফুলি সিনে সেন্টারও জেলার চলচ্চিত্র আন্দোলনে একটি অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছে। চন্দননগর ও শ্রীরামপুরের যে যে কাজ, এরাও তারই অনুসরণ করে গেছে বরাবর। এছাড়াও নিয়মিত সেমিনারের আয়োজনও হত। যদিও শ্রোতা সংখ্যা স্বল্প, তবুও উদ্যোগটি প্রশংসনীয়। একবার মনে আছে হামবার্তো সোলাসের 'সিসিলিয়া' ছবিটি প্রদর্শনের আগে এরা সমালোচক, প্রাবন্ধিক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়কে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই ধরনের প্রচেষ্টা খুব বেশি পরিমাণে অবশ্য করতে পারেন নি। হলে জেলার চলচ্চিত্রান্দোলনে এই স্থবিরতা আসত না।

এরা নিয়মিত একটি বুলেটিন প্রকাশ করতেন 'চিত্রলেখা' নামে। এতে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত নানা খবর ছাড়াও সভ্যদের কাছে আবেদন থাকত ভালো ছবি দেখার জন্য, ভালো ছবিকে উৎসাহিত করার জন্য।

এদের 'চিত্রলেখা' থেকে সেমিনার সংক্রান্ত একটি সংবাদ উদ্ধৃত করছি —

Last Sunday (25.3.84) we arranged a seminar on 'Bergman, and his films.' Sri Parthapratim Bandopadhyay was the speaker. He spokes about Bergman, and analysis his use of women and childrens in his films.

Homely atmosphere helps details discussion with the members and guest speaker, Mr. Gautam Ray, Mr. Ajit Maitra, Mr. Tapan Modak were questions in the seminar.

... ...

Special show organised by society on 22.4.84 at 9-30 am at Udayan Cinema of HIRAK RAJAR DESHE. Members should attend this show with special entry card of Rs. 3/- Only.

এদের প্রদর্শিত বুনুএল ফিল্মোৎসবের স্মৃতি এখনও সজীব, টাটকা।

উত্তরপাড়ায়ও একটি সিনে ক্লাব দীর্ঘদিন যাবৎ সক্রিয় ছিল। এখনও আছে কিনা জানা নেই। সঠিক তথ্যের অপ্রাপ্তিই এক্ষেত্রে কারণ।

সবশেষে জেলার উত্তরাঞ্চল মগরায় গঠিত হয়েছিল মগরা সিনে ক্লাব। কয়েকজন অত্যুৎসাহী ব্যাঙ্ক কর্মী ও ব্যবসায়ীর চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল '৮৭ সালে মগরা ক্লাবটি। প্রথম দিকে এরা নিয়মিত সকালে ছবি দেখিয়ে গেছেন। পরে কেন, কি কারণে উৎসাহে ভাঁটা দেখা দিল, সেটা গবেষণার বিষয়। সংস্থা থেকে একবছর পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। পৃষ্ঠপোষণাতেও ঘাটতি ছিল না। তবু এই ক্লাবটি কেন যে দীর্ঘজীবী হ'ল না, তার অন্যতম কারণ বোধ হয় কর্মী ও সদস্যসংখ্যার অভাব।

এসব থেকে ভিন্নতর এক উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল বাঁশবেড়িয়া সিনে স্টাডি গ্রুপ। জেলার অন্যান্য সংগঠনের মত ছবি দেখানো এর উদ্দেশ্য ছিল না। অন্য ক্লাবে ভালো ছবি দেখে এসে তা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা ও চর্চাই ছিল স্টাডি গ্রুপের অভিষ্ট।

বর্তমান প্রাবন্ধিকের সঙ্গে জুটে গিয়েছিল চলচ্চিত্রমনস্ক কিছু উৎসাহী যুবক। যারা চলচ্চিত্রকে সমাজ পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার হিসেবেই দেখেছিলেন। প্রথম থেকেই চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বই ও পত্রপত্রিকার এক অনবদ্য পাঠাগার গড়ে তোলা হয়েছিল। সেইসব মুদ্রিত অক্ষর ও সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল-বার্গম্যান -গোদারের ছবি নিয়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বসত আলোচনার আসর। এদের প্রকাশিত প্রথম ইস্তাহারটি পড়লেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হবে,

> *সিনে স্টাডি গ্রুপ একটি চলচ্চিত্র সম্পর্কিত পঠন - পাঠন সংস্থা। স্টাডি গ্রুপ মনে করে, A Film is like a match,you can make a big fire.*
>
> *স্টাডি গ্রুপ দৃঢ়ভাবেই মনে করে, Cinema is a Language.*
>
> *স্টাডি গ্রুপ অভ্রান্তভাবেই বিশ্বাস করে, Camera is a theoretical rifle. — গোদারের একথা অভ্রান্তভাবেই সত্য।*
>
> *সিনে স্টাডি গ্রুপ মনে করে সিনেমা একই সঙ্গে আর্ট এবং ইন্ডাস্ট্রি। আর সেইজন্যই শিল্পের গভীরতা এবং এর সঙ্গে যুক্ত বাণিজ্যচিন্তা - এই দুইকে একসঙ্গে ও আলাদাভাবে বোঝা দরকার।*
>
> *স্টাডি গ্রুপ চলচ্চিত্রকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পমাধ্যম মনে করে।*

মূলত পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়েই স্টাডি গ্রুপ যাত্রা শুরু করেছিল। পঠন-পাঠনের নির্যাস তর্ক-বিতর্ক গুলিকে লিপিবদ্ধ চেহারায় দেখার এক দুর্মর বাসনায় জন্ম নিয়েছিল 'চিত্রধ্বনি'। জেলার প্রথম নন-সিনেক্লাব ফিল্ম ম্যাগাজিন। প্রথম সংখ্যা থেকেই অন্যরকম চিন্তা-চেতনার একটা ছাপ এর সর্বাঙ্গে। বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনাই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। বিষয়গতভাবে একটি শিল্পকর্ম যতই কেননা বৈপ্লবিক ভাবধারা সূচিত করুক, আঙ্গিকগতভাবে তা যদি সমৃদ্ধ না হয়, তাকে এরা গুরুত্ব দেয় নি। সিনেমার রূপগত বিশ্লেষণের প্রয়াস এদের সংগঠনের সকলের লেখাতেই কমবেশি প্রতিফলিত। ক্যামেরা দৃষ্টিকোণ, আলো, শিল্প নির্দেশনা, রং, সম্পাদনা, ডিটেলস্ নিয়ে 'চিত্রধ্বনি' পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তা শুধু জেলা কেন, কলকাতার অনেক শিল্পরসিককেই বিস্মিত করেছে। একাদিক্রমে দশ বছর নানা চেহারায়, নানা মাপে এর প্রকাশ ঘটেছিল, 'চিত্রধ্বনি'র পথের পাঁচালী, ঘরে বাইরে, সত্যজিৎ ও পরমা সংখ্যা এখনও স্মৃতিমেদুর এক অভিজ্ঞতা।

পরিবর্তনশীল দুনিয়ার অন্যান্য অনেক পরিবর্তনের মত একদিন 'চিত্রধ্বনি'ও বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু এর একটা প্রভাব নিঃসন্দেহে এলাকায় পড়েছে। চলচ্চিত্রমনস্কতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সেসময় জেলার ফিল্ম ক্লাব গুলির মতই সিনে স্টাডি গ্রুপও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। এরই ফলশ্রুতিতে সুপ্রিয়া ভট্টাচার্বের উদ্যোগে চার্লি চ্যাপলিন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছিল ২৮ মে ১৯৮৯ সালে বাঁশবেড়িয়া সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে।

বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের মধ্যে সংগঠনগতভাবে ব্যান্ডেল থার্মাল পাওয়ার রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজন করেছিল ঋত্বিক চলচ্চিত্র উৎসবের। সময়টা জুন, ১৯৭৮। নাগরিক, অযান্ত্রিক, বাড়ী থেকে পালিয়ে, যুক্তি তক্কো আর গপ্পো প্রদর্শিত হয়েছিল সেই উৎসবে।

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগম ও চন্দননগর পৌরনিগমের যৌথ উদ্যোগে সুস্থ চলচ্চিত্রমনস্কতার প্রসার কল্পে ২৭ জানুয়ারি, ১৯৯১ চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে মাসাধিককাল ব্যাপী 'সত্যজিৎ চলচ্চিত্র উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার, মহানগর, হীরক রাজার দেশে, ঘরে বাইরে, গণশত্রু প্রদর্শিত হয়েছিল। দুটি অনুষ্ঠানই এলাকার সংস্কৃতিমনস্ক মানুষদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। দুঃখের বিষয়, এরকম উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে আর হয় নি। আজ ঘরে বসেই বোতাম টিপে ছবি দেখার সর্ববিধ আয়োজন। সিনেমা হল-এ যাবার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। ভালো ছবিও সেই ইডিয়ট বকসে কালেভদ্রে। ফলত রুচি ও মননের সার্বিক অধঃপতন সম্পন্ন হয়েছে। এই সময় বা দুঃসময়ে বড়ো বেশি প্রয়োজন ছিল ফিল্ম ক্লাবের উদ্যোগের। যে আন্দোলন আজ অবসিত, ক্ষয়িষ্ণু, সেখানে নবীন প্রজন্ম আবার কবে দেশলাই কাঠি জ্বালাবে, সেই অপেক্ষায় থাকা ছাড়া এ মুহূর্তে কোন আশ্বাসবাণী নেই।

হুগলি : লোকসংস্কৃতি

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার ইতিহাসে হুগলি জেলার একটি বিশেষ স্থান আছে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে একদা বনজঙ্গল কেটে অনেক গ্রাম গড়ে উঠেছিল। গ্রাম থেকে গড়ে উঠেছিল নগর। নগর থেকে শহর। হুগলি জেলার অনেক গ্রাম ও নগর গড়ে উঠেছিল ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করে। লোকমুখে শোনা যায়, হুগলির বিভিন্ন স্থানের গৌরবের কথা। সপ্তগ্রাম, মহানাদ, পাণ্ডুয়া, সিঙ্গুর, হরিপাল, রাজবলহাট, গড়মান্দারণ প্রভৃতি জায়গায় আবিষ্কৃত হয়েছে ঐতিহাসিক নিদর্শন। আমাদের আলোচ্য বিষয় ইতিহাস নয়। এই নিবন্ধ হুগলি জেলার লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির উপাদান সম্পর্কিত বিষয়।

উক্ত মূল কাঠামোটি মনে রেখে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

ষোড়শ শতাব্দীতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে উল্লেখ আছে :

> 'এই সব শহরে যত সৈদাগর বৈসে।
> কত ডিংগা লয়্যা তারা বাণিজ্যায় আইসে।।
> সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়।
> ঘরে বসে সুখমোক্ষ নানা ধন পায়।।'

সেকালে সপ্তগ্রাম বন্দর থেকে কার্পাসবস্ত্র বিভিন্ন স্থানে চালান যেত। হুগলি জেলার সপ্তগ্রামে ছিল বন্দর। বলাগড় ছিল নৌশিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্র।

বিভিন্ন সময়ে হুগলি জেলায় বেশ কয়েকটি যাত্রাদল গড়ে উঠেছিল। যাত্রা-র ইতিহাস প্রসঙ্গে নানা রকম মতবাদ প্রচলিত আছে।

অধ্যাপক নিরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন : 'যাত্রা'-র প্রাচীনত্বে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে যাত্রার উল্লেখ আছে। ভবভূতি তাঁহার মালতীমাধবে যাত্রা শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। বৈদিক স্তোত্রের গীতধ্বনি এবং তাহার প্রকাশের মধ্যে যাত্রার বীজ নিহিত ছিল, এমন অনুমানও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে শ্রী চৈতন্য পূর্ববর্তীকালে "যাত্রা" শব্দটির অভিনয়ার্থক প্রয়োগ কিন্তু পাওয়া যায় না। চর্যাপদের মধ্যে "বুদ্ধ-নাটক" শব্দটি পাওয়া যায়।

> নাচন্তি বজর গাঅন্তি দেবী।
> বুদ্ধ-নাটক বিসমা হোই।।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে বড়ুচণ্ডীদাস "নাট" শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন।

> ষোল শত গোপী গেলা যমুনার ঘাট।

তা দেখি খাঁ কাহাঞি পাতিল নাটে।।
খনে করতাল খনে বাজএ মৃদঙ্গ।
তা দেখি রাধিকার সখীগণে রঙ্গ।।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস কৃষ্ণযাত্রার উল্লেখ করিয়াছেন।

কৃষ্ণ-যাত্রা অহোরাত্র কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
ইহার উদ্দেশোনাহি জানে কোনো জন।।

শ্রীচৈতন্যের অভিনয়-বাসর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যরসিকের নিকট পরম পবিত্র আনন্দ-তীর্থ। এই অভিনয়ের সংবাদে যাত্রার কলাবিধি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা না পাওয়া গেলেও নৃত্য এবং সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে অস্বীকার করা যায় না। যাত্রায় গদ্যের ছাঁদে (ছন্দে?) কথা বলা আবশ্যিক রীতি রূপে গণ্য হইয়া থাকে। পাঁচালীর সম্পূর্ণ পরিচয় নৃত্য-গীতের মধ্যেই আবদ্ধ। নূতন পদ্ধতির পাঁচালীতে লোকরঞ্জক ছড়ায় গদ্যের ছাঁদে বাক্য প্রয়োগের ধারাটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইতে লাগিল। ছন্দকে অতিক্রম করিয়া হয়ত নয়, কিন্তু ছন্দের মধ্যেই গদ্যের ভাব বা প্রকাশ নিতান্ত অপ্রকাশ থাকে নাই। দাশরথির পাঁচালীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়। এই কারণে পাঁচালী হইতে যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ মনে করা যায়।......'

'যাত্রা' প্রসঙ্গে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন, '.....অভিনয় জনসাধারণের মধ্যে যাত্রার আকারে প্রদর্শিত হইত। 'যাত্রা' এই নামটি দিয়াই বেশ বোঝা যায় — যাত্রা ধর্মসম্বন্ধীয় উৎসবের অঙ্গ ছিল। "যাত্রা" বলিলে কোন দেব-দেবীর উৎসব বোঝায়। জনসাধারণের মধ্যে আজও রামায়ণ-মহাভারতের দেব-দেবী বা নায়ক-নায়িকার আখ্যায়িকা হইতে অভিনয়ের আখ্যান বস্তু (Plot) সংগৃহীত হইয়া থাকে।......'

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন : 'হুগলি জেলার কৃষ্ণনগর জাঙ্গীপাড়া নিবাসী গোবিন্দ অধিকারী পরমানন্দের শিষ্য। ইনি জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন। জন্ম ১২০৫। মৃত্যু ১২৭৭।

ইনি যাত্রা, কীর্তন ও কথকতায় বিশেষ নাম করিয়া ছিলেন। প্রথমে গোলক দাস অধিকারীর নিকট কীর্তন শিক্ষা করেন, কীর্তনেরও একটা দল খোলেন। পূর্ববঙ্গে জগদীশ গাঙ্গুলীর যাত্রার দল ছিল। নিজেই তিনি পালা রচনা করিতেন। গোবিন্দ বাল্যকালে ইঁহার দলে কিছুদিন গান করেন। তারপর বদনের দলে গান করিতেন। শেষে 'কালিয়দমন' যাত্রার দল গঠন করেন। গোবিন্দ নিজে দূতী সাজিতেন। নিজে অনেক গান রচনা করেন। ইঁহার দূতীগিরি দেখিবার জন্য, ইঁহার গান ও ঘটকালী শুনিবার জন্য বহু দূর দেশ হইতে লোকে আসিত। ইঁহার "শুকশারীর পালা", 'চূড়ানূপুরের দ্বন্দ্ব' তখনকার আমলে বিশেষ দ্রষ্টব্যের মধ্যে ছিল।'

সেকালের যাত্রাদলের মদন মাস্টার প্রসঙ্গে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন :

'চন্দননগরে মদন মাস্টারের সখের দল ছিল, পরে পেশাদারী হয়। যাত্রার পালা ছিল — দক্ষযজ্ঞ, মদনভস্ম, ধ্রুবচরিত্র। বালকদের গান ছিল কীর্তনাঙ্গ।

মদনমাস্টার যাত্রার দলে জুড়ীর গানের প্রবর্তক। জুড়ীর সুর ছিল কবি গান - ভাঙ্গা। মদনের সময় ছোকরারাই গায়িত। যার গান সেই গায়িত। রাগরাগিনী গায়িবার জন্য ছিল জুড়ী। বিখ্যাত মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁহার দলে ঢোল বাজাইতেন। পরে নিজে দল করেন। মদনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নবীন দল পরিচালনা করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী নিজেই দল চালান — দলের নাম হয় বৌমাস্টারের দল। কালী ও কৃষ্ণ নামে দুই ভাই ঐ দল পরিচালনা করিত।'

হুগলি জেলার বিভিন্ন স্থানের যাত্রাদলের কথা উল্লেখ করেছেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। তাঁর লেখার কিছু অংশ হলো এই :

'ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ — নলদময়ন্তী, কলঙ্কভঞ্জন ও চণ্ডীযাত্রা গায়িতেন।.........'

'খানকুল কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ছিলেন ঈশ্বর চক্রবর্তী। হুগলি-গোপীনাথপুরের কৃত্তিবাস মণ্ডলের গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ পালা মন্দ ছিল না।'

যাত্রাগানের গোড়ার কথা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, একেবারে আদি থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যাত্রার একটি সুসংবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া কঠিন।

মদন মাস্টারের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। মদন মাস্টারের 'দক্ষযজ্ঞ' পালার একটি গানের কিছু অংশ হলো এই :

'তাই ভাবি গো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে,
কেমন করে যজ্ঞে যাই বলো না।
তোমরা সবে সমাদর পাবে,
আমি গেলে পিতা কথাও কবে না।।'

এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা দরকার লোকে যাত্রাগান শুনতে যায়, থিয়েটার যায় দেখতে। যাত্রা হলো - শ্রাব্যকাব্য, থিয়েটার হলো দৃশ্যকাব্য।

বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হুগলি জেলার দান অপরিসীম। এদেশের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় এই জেলায়। বাংলার নবযুগের মনীষী রাজা রামমোহন রায়। একাধারে পণ্ডিত, ধর্মপ্রচারক, সমাজ-সংস্কারক, দেশপ্রেমিক ও সাংবাদিক। সর্বধর্ম সমন্বয়ের সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংস এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহন ও রামকৃষ্ণকে নিয়ে হুগলি-র একটি গ্রামীণ ছড়ায় বলা হয়েছে :

'এক পাগলে রক্ষা নেই,
    দুই পাগলের খেলা।
জড় হইলো পাগলেরা,
    ধন্য হইলো যে জেলা।।
এক পাগলে পাগ বাঁধে,
    অন্দুড়-গা অন্য জনার।
ধন্য বাঙলা ধন্য মোরা,
    ছড়া কাটি বন্দনার।।'

লৌকিক আচার লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত। লোকবিশ্বাস ও সংস্কার লোকসংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। লৌকিক আচার ও লৌকিক অনুষ্ঠান চোখে পড়ে লোকজীবনে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো জন্ম, বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় অনুশীলন ও যুগান্তর দলের যথেষ্ট প্রভাব ছিল হুগলি জেলায়। এ-কথা ভূপতি মজুমদার-এর মুখে শুনেছিলাম। ভূপতি মজুমদার আরও বলেছিলেন, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর উদ্যোগে হুগলি জেলায় বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ব্যায়াম-এর আখড়া গড়ে উঠেছিল। সেই সব আখড়ায় হতো লাঠি খেলা।

সেদিন অনেকে লাঠি খেলার সময় একটি ছড়া কাটতেন। তা' হলো এই :

বন বন বন লাঠি ঘোরে,
টিকটিকি মরে লাঠির জোরে।
আড়কাটি লাল পাতা,
মাথা ফেটে পড়ে থাক।'

এই ছড়ায় বিদেশী সরকারের পুলিশ এবং গুপ্তচরের বিরুদ্ধে মারপিট করার ইংগিত পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, মধ্য কলকাতায় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা 'হাডুডু' খেলার সময় একটি বিদেশী সরকার বিরোধী ছড়া কাটতেন। ওই সব ছড়াকে স্বদেশী মন্ত্র বলা যেতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিকে বলা হতো, ভারতবাসীর মুক্তির মন্ত্র। সেদিন অনেকে মনে করতেন, ওই সব মন্ত্র পড়া লাঠির সাহায্যে বিদেশী সরকারের পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করা যাবে। মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এবং জাদু শক্তির প্রতি তাঁদের বিশ্বাস ছিল।

হুগলি জেলায় বিভিন্ন সময় লোকজীবনে নতুন ভাবধারার প্রভাব পড়েছে। নবজাগৃতির উৎস রূপে গৌরবের অধিকারী হয়েছিল হুগলি জেলা। এক দিকে শিক্ষা-সংস্কৃতি, নতুন ধরণের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ভালোমন্দ কত কিছু এসে মিলিত হয়েছিল এখানে। আবার হুগলির সেই পুরাতন গ্রাম, গ্রাম্য সমাজ ও লোক সংস্কৃতি হারিয়ে যায় নি। লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির উপাদান যেমন, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, ছড়া প্রবাদ, হেঁয়ালী, খনার বচন, গীতিকা, ধাঁধা প্রভৃতি মৌখিক ধারা আজও বেঁচে আছে। এই মৌখিক ধারাতে অনেকে লিখিত ধারার সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন : শিব মঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাহিনীকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে লিখিত সাহিত্য।

হুগলি জেলায় বেশ কিছু প্রবাদ প্রচলিত। যেমন : ১. ধান ভানতে শিবের গীত' । ২. পারের কড়ি মারতে নেই' — ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, হুগলি জেলায় বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠী বাস করে। তাদের সামগ্রিক জীবনযাত্রায় আচার ব্যবহারে, উৎসবে, আনন্দপ্রকাশে এবং নানা কার্যক্রমের প্রণালী ও রীতির সঙ্গে সংস্কৃতি জড়িত। জনসাধারণের জীবনযাত্রায়, সঙ্গীত ও নৃত্যে, শিল্প-সাহিত্যে, লোকনাট্যে সব কিছুর সঙ্গে সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। জনসাধারণের সংস্কৃতি — লোক সংস্কৃতি। সঙের গান, সঙের পথনাটক জনসাধারণের লোক সংস্কৃতির আর একটি স্রোত অবিচ্ছেদ গতিতে প্রবহমান। এক সময় হুগলি জেলায় বিভিন্ন স্থান থেকে সঙ বের হতো। শ্রীরামপুরের বটতলার সঙ ছিল বিখ্যাত। মুখ্যত চিত্ত বিনোদনের জন্যই সঙের সৃষ্টি হয়েছিল। সেকালে সঙের পথনাটক, ছড়া, গান যেমন সকলকে প্রচুর আনন্দ দিত ঠিক তেমনি সমাজের অনাচার ও দুর্নীতির ওপর কষাঘাত করে দায়িত্বশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। সমাজচেতনামূলক গান ও ছড়াগুলি একদিক দিয়ে নৈতিক শিক্ষার মূল্যবান উপাদান বলে স্বীকৃত হয়েছিল। একদা চন্দননগরে জন্মাষ্টমীর দিন সঙ বের হতো। এই উৎসবের নাম ছিল- 'বাদাই'।

হুগলি জেলায় লোকজীবনে অনেক বিধিব্যবস্থা পালন করতে দেখা যায়। যা তাঁরা পূর্বপুরুষের কাছ থেকে দেখেশুনে অনেকে লাভ করেন। ওই সব হলো লোকসংস্কৃতির সম্পদ। অনেক বাড়িতে মেয়েরা নকশী কাঁথা, মাটি, পাথর, কাঠের ছাঁচে তৈরি মিষ্টি, গুড়-পাটালি, নারকেল দিয়ে তৈরি মিষ্টি করেন। মাটির পুতুল তৈরি করার রেওয়াজ এবং পূজাপার্বণে ঘরে মেয়েরা আলপনা দিয়ে থাকেন। অনেক বাড়িতে বিয়ের পিঁড়ি ও কুলায় চিত্র আঁকা দেওয়ালে বসুধারা-র কথা আমরা শুনেছি।

বিবাহের সময় ছাদনাতলায় বাংলার নাপিত ছড়া কাটে। নাপিতের ছড়াকাটা বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ অঙ্গ। বাংলার বহু নাপিত মুখে মুখে পুরুষ পরম্পরায় বিবাহে ছড়া কেটে থাকে। নাপিতের ছড়াগুলিকে ঐন্দ্রজালিক (ম্যাজিকাল) ছড়া বলা যেতে পারে। হুগলি জেলার চাঁপ্তা গ্রামের নাপিতের একটি ছড়ার কিছু অংশ :

'শুভ দৃষ্টি মধ্যে এখন বিবাহ বন্ধন,
মহাদেবের বিবাহ অপূর্ব কথন।

বরণডালা নিয়ে মেনকা ছাওনাতলায় গেল,
সোনার বরণ গৌরীর আমার কপালে এই ছিল।'

হুগলি জেলায় বিভিন্ন স্থানে শিব-দুর্গার বিবাহ কাহিনী নাপিতের ছড়ায় বেশি শোনা যায়।

অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেকালের বিখ্যাত যাত্রাদলের পালাকার কৈলাসচন্দ্র বারুই-এর নাম। তাঁর বাড়ি ছিল রিষড়ায়। তিনি বিদ্যাসুন্দর পালা রচনা করেছিলেন। তা'ছাড়া তাঁর ছিল একটি পেশাদারী যাত্রাগানের দল। কৈলাস বারুই রচিত বিদ্যাসুন্দর যাত্রা পালার একটি গান :

বাছা, দাও দেখি হার, লয়ে যাই তার,
কি পাই উপহার, বিদ্যার কাছে।
হয়তো পাব হার, নইলে উপহার,
অস্থি চর্মসার, ললাটে আছে।।
করি ছেলেখেলা,
দায়ে ঠেকিলো,
বুঝি ওষুধ গেলা হবে তার কাছে।' (মালিনীর উক্তি)

কবিয়াল ভৈরব হালদার-এর বাড়ি ছিল সিঙ্গুরে। কবিয়াল ভোলা ময়রার বাড়ি ছিল গুপ্তিপাড়ায়।

একসময় ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম (বর্তমান বাংলাদেশ), কাছাড় ও ত্রিপুরাতে পল্লীকবিদের ভাট বলা হতো। তাঁদের গান — ভাটের গান নামে পরিচিত ছিল।

সেকালে হুগলি জেলায় অনেক ভাট বা ভট্ট কবি বাস করতেন। তারকেশ্বরের মোহান্তর অনাচারের ঘটনা নিয়ে হুগলি জেলার ভাট এবং হেটো কবিরা ছড়া, গান এবং পথনাটক রচনা করেছিলেন। এই সবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হুগলি জেলার লোকসংস্কৃতির উপাদান।

🕮 তথ্যসংকেত

১. নিরঞ্জন চক্রবর্তী - ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী ও বাংলা সাহিত্য।
২. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ - অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড।
৩. মনীন্দ্রনাথ আশ - কবিয়াল কৈলাস বারুই ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা।
৪. হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত।
৫. হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - পশ্চিমবঙ্গের লোকজীবনে লোকসংস্কৃতি।
৬. হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে।
৭. হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - হেটোবই হেটোছড়া।
৮. হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - পথনাটকের কথা।
৯. হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - হেটোছড়ায় সমাজচিত্র, প্রকাশিত হয়েছিল :
Papers in Comparative Literature Seminars and workshops 1987-92, Volume 3. Edited by Prof. Amiya Dev. (Comparative Literature), Jadavpur University, Calcutta, 1992.

হুগলি : সাহিত্যগৌরব

অরুণ মুখোপাধ্যায়

বিষয়টা এত বিস্তৃত, এত দীর্ঘ ও সময়ের মারপ্যাঁচে আবদ্ধ যে, ভূমিকার অবতারণা না করে মূল বিষয়ে প্রবেশ করাই সবচেয়ে ভালো ও নিরাপদ। তাই এই লেখার শুরু থেকেই নামধাম ও সালতারিখের কন্টকিত বিন্যাস, আমার সামান্য সামর্থ্য ও পরিশ্রম অনুযায়ী। যদিও চাইনি, তথ্য কন্টকিত করতে, তবু তা হয়ে গেছে বিষয়ের খাতিরে। এটুকুই বলা যেতে পারে এই লেখার প্রস্তাবনা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী, দশকের পর দশক পার হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। হুগলি জেলার সাহিত্য গৌরবকে বিভিন্ন শতাব্দী অনুযায়ী ধরবার চেষ্টা করেছি মাত্র। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক — সাহিত্যের এই শাখাগুলি ঘিরেই আলোচিত হবে এই প্রবন্ধ। তবে ইতিহাসের খাতিরে হয়ত পেছিয়ে যেতে হবে, আবার হয়ত অনেকখানি এগিয়ে যেতে হবে। ফলে সাহিত্য পদবাচ্য নয়, এমন অনেক নির্মাণের, যুগের চাহিদা অনুযায়ী, বিষয়ের চাহিদা অনুযায়ী লেখাও হয়ত কিছু ক্ষেত্রে আলোচিত হবে। অন্য জেলার মানুষ, হলেও হুগলির সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত, সম্পৃক্ত এমন মানুষের কথা আসাও বিচিত্র নয়। আবার অনেকের কথাই হয়ত বাদ দিতে হয়েছে, স্বল্প পরিসরের কারণে। তবে প্রতি ক্ষেত্রেই চেষ্টা করেছি প্রতিনিধি স্থানীয় মুখ্য উল্লেখযোগ্য সাহিত্য ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরতে। গৌণকে বাদ দিতেই হয়েছে। নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমার অক্ষমতা, আমার ত্রুটিই কারণ। আর যে নামগুলি স্বতস্ফূর্তভাবে এসেছে, তার জন্য দায়ী মহাকাল এবং ইতিহাস।

এবার মূল প্রসঙ্গে একেবারে প্রবেশ করা যাক।

এক

ভুরশুটে দশম শতাব্দীতে শ্রীধর আচার্য নামে এক ব্যক্তি অধ্যাত্মসাধনা ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বৈশেষিক মতের আস্তিক্য ব্যাখ্যা দেন। 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থ রচয়িতা শ্রীধর ও আর্যাছন্দে রচিত 'ত্রিশতিকা'-র লেখক শ্রীধর এক ব্যক্তি কিনা, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 'শ্রীধর পদ্ধতি' নামে জাতকখন্ডের গ্রন্থও পাওয়া যায়। এটিও হুগলির শ্রীধরের নামেই প্রচলিত আছে। বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তির আগে, সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশের যুগে, শ্রীধর হুগলির লেখক হিসেবে আমাদের প্রথম সাহিত্যিক গৌরবপ্রাপ্তির আনন্দ দিয়েছেন। সপ্তগ্রাম কৃষ্ণপুরের কায়স্থ জমিদারের একমাত্র সন্তান রঘুনাথ দাস (১৪৯৫/৯৬ - ১৫৮২) অল্পবয়সে ঘরসংসার, ঐশ্বর্য, সুখ ত্যাগ করে পুরীতে চৈতন্যদেবের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামী রঘুনাথ দাস মহাপ্রভুর তিরোধানের পর বৃন্দাবনে এসে বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠ করেন

এবং সংস্কৃতে 'স্তবমালা', 'মুক্তাচরিত্র', 'দানকেলিচিন্তামণি' ইত্যাদি কাব্য রচনা করেন। 'উপদেশামৃত', 'মনঃশিক্ষা', 'শ্রীচৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ', 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি', চৈতন্যাষ্টক', তাঁর রচনা। স্বরূপ দামোদর কৃত চৈতন্যজীবনীমূলক কড়চারও বৃত্তিকার ছিলেন তিনি। বৃন্দাবনে তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য কীর্তি রাধাকুন্ড ও শ্যাম কুন্ড উদ্ধার। মূলত রাঢ় অঞ্চলের কাব্য হলেও রাধানগরের সহদেব চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট নাম। তাঁর 'অনিলপুরাণ'-এর সঠিক রচনাকাল পাওয়া যায় না। তবে মনে করা হয়, ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে অনিলপুরাণ রচিত হয়েছিল। এতে প্রাচীন জ্ঞানবিশ্বাস, কৃষক - শিব সংস্কৃতি ইত্যাদির মিশ্রণ ঘটার জন্য এর ধর্মতত্ত্ব একটু রহস্যময় হয়ে উঠেছে। কবি ধর্মঠাকুরের কথা লিখলেও শান্তভাব ছাড়তে পারেন নি। প্রসিদ্ধ 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' এই কাব্যেও পাওয়া যায় এবং এই নিরঞ্জনের কথায় হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিস্মৃত ইতিহাসকেই ফুটিয়ে তুলেছে। সহদেবের অনিলপুরাণে মীননাথ - গোরক্ষনাথের কাহিনী আছে। লাউসেনের কাহিনী নেই। তাঁর রচনায় তারকেশ্বর বন্দনার উল্লেখ আছে। আত্মকাহিনী অংশে কবি লিখছেন — " দ্বিজ সহদেব গান অনাদিভাবনা / রাধানগর বাড়ী যায় বালিগড় পরগণা / গান দ্বিজ সহদেব শঙ্কর ভাবনা/ নিবাসী নন্দনবাটি বালিগড়ি পরগণা।"

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগে, যখন সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, স্মৃতিপুরাণ, ন্যায়দর্শন, ব্যাকরণ - অভিধান এই দেশে বিশেষভাবে অনুশীলিত হত, যখন বৈষ্ণবকাব্য, মঙ্গলকাব্য খুব জনপ্রিয় ছিল, দেবদেবীই যখন সাহিত্যের চরিত্র তখন হুগলির শ্রীধর আচার্য, রঘুনাথ দাস, সহদেব চক্রবর্তী যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্যসৃষ্টি করে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন, এতো হুগলিবাসীর পরম গৌরব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সাহিত্যের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, তখন বিকৃতরুচির ধনী নাগরিকদের রসতৃষ্ণা মেটাবার জন্য একধরনের নাগরিক লোকগীতি, অভিনয় ও কাব্যকলার অনুশীলন করা হত। কবিগান, টপ্পা, যাত্রা, পাঁচালী গেয়ে যারা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল, তাদের বলা হত কবিওয়ালা। হুগলি জেলা বিশিষ্ট কবিওয়ালাদেরও জন্ম দিয়েছে। রাসু, নৃসিংহ রায়, নিত্যানন্দ বৈরাগী, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী, নীলমণি পাটনী, গুরুচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, নিধুবাবু, রঘুনাথ দাস, রসিককৃষ্ণ রায়, বলাই বৈষ্ণব, কালী মির্জা কথক ও গায়ক হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিওয়ালা পর্যায়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। এঁদের শিক্ষাদীক্ষা ছিল না, জমিদার মুৎসুদ্দিদের স্থূল রুচি মেটাবার জন্য এঁরা আসরে দাঁড়িয়ে রুচিহীন, শ্লীলতাহীন, ভদ্রতাহীন গান পরিবেশন করতেন বা বলা যেতে পারে গান ফেরি করতেন। কিন্তু তাঁদের গানেও জীবনের ও যুগের জটিল যন্ত্রণার ছবি পাওয়া যায়।

দুই

উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা কবিয়াল হেলম্যান অ্যান্টনি, জাতিতে পর্তুগীজ, ব্যবসার প্রয়োজনে চন্দননগরের গৌরহাটি অঞ্চলে বাস করতেন। অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী নামে পরিচিত এই কবিওয়ালার রচিত বিখ্যাত গান " আমি ভজন সাধন জানিনে মা, জেতেতে ফিরিঙ্গী/ যদি দয়া করে কৃপা কর, হে শিবে মাতঙ্গী।" এক বিধবা বাঙালি ব্রাহ্মণকন্যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। জাতপাত মানতেন না। তাই লিখতে পেরেছিলেন, "খ্রীস্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই/শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই।" অ্যান্টনি অন্য কবিওয়ালা ঠাকুর সিংহের ব্যঙ্গের জবাবে বলে ওঠেন — " এই বাংলায় বাঙালীর বেশে আনন্দে আছি/হয়ে ঠাকুরে সিংয়ের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি।" ১২৪৩ বঙ্গাব্দে বা ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। চন্দননগরের নীলমণি পাটনী, একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা। নিত্যানন্দ বৈরাগী (১৭৫১ - ১৮২১) প্রথম জীবনে গান গেয়ে জীবিকানির্বাহ

করতেন। পরে কবির দল গঠন করে অর্থ ও যশলাভ করেন। তাঁর দলের নাম ছিল 'নিতে বৈরাগীর দল'। দাঁড়াকবি'র প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা রঘুনাথ দাসের (আনু. ১৭২৫ - ১৭৯০) মূল নিবাস ছিল গুপ্তিপাড়া। তিনি বিখ্যাত দুই কবিয়াল রাসু - নৃসিংহের শিক্ষক গুরু। নৃসিংহ রায়ের (১৭৩৮ - ১৮০৯) জন্ম চন্দননগরের গোন্দলপাড়ায়। তিনি এবং তাঁর অগ্রজ রাসু রায় দুজনে একটি কবির দল গঠন করে ১১৫৭ বঙ্গাব্দে কলকাতায় আসেন। প্রধানত বিরহ, সখী সংবাদ এবং ভক্তিভাবপূর্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি প্রধান গানেই তাঁদের আধিপত্য ছিল। পিয়াসপাড়া, হুগলির বলাই বৈষ্ণব (? — ১২০১ বঙ্গাব্দ) ছিলেন খ্যাতনামা কবিয়াল। গুপ্তিপাড়ার কালী মির্জা (আনু. ১৭৫০ - ১৮২০) ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের সংগীত গুরু ও বর্ধমান মহারাজের সভাগায়ক। তাঁর প্রকৃত নাম কালিদাস চট্টোপাধ্যায়। যৌবনে বারাণসীতে সংগীত ও বেদান্ত শিক্ষালাভের পর লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের কাছে সংগীত শিক্ষালাভের পর সেখানেই উর্দু ও ফারসী শেখেন। পরে গোপীমোহন ঠাকুরের আশ্রয়ে ও আনুকূল্যে কাশীবাসী হন। বেশভূষা, চালচলন ও ফারসী ভাষায় দক্ষতার জন্য 'মীর্জা' নামে খ্যাত হন। 'গীতলহরী' গ্রন্থে তাঁর রচিত দুশোটি গান আছে। এ ছাড়া 'বাঙ্গালীর গান' ও 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম' গ্রন্থেও তাঁর কিছু কিছু গান সংকলিত হয়েছে। রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর (১৭৪১ - ১৮৩৯) জন্ম হুগলির চাঁপ্তায় মামারবাড়িতে। বাংলাদেশে টপ্পাগানের প্রবর্তক হিসেব তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এদেশে তিনিই প্রথম ইংরাজী অভিজ্ঞ কবিয়াল ও প্রথম স্বাদেশিক সংগীতের রচয়িতা। "নানান দেশের নানান ভাষা / বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা" তাঁর লেখা বিখ্যাত গান। তাঁর রচিত টপ্পাতেই আধুনিক বাংলাকাব্যের আত্মকেন্দ্রিক লৌকিক সুর প্রথম ধ্বনিত হয়। 'গীতরত্ন' সংকলনে তাঁর রচিত ৯৬টি গান, 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম' গ্রন্থে তাঁর রচিত ১৫০টি গান এবং দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' গ্রন্থে তাঁর রচিত ৪৫০টি গান সংকলিত আছে। উনবিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা কথকের বাস ছিল চন্দননগরে। তাঁর নাম গুরুচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রসিদ্ধ দাশু রায়ের পর যিনি শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকার হিসেবে পরিচিত, তিনি শ্রীরামপুর বড়ার রসিকচন্দ্র রায় (১২২৭ব - ১৩০০ব.)। কবিয়াল, যাত্রাওয়ালা, কীর্তনওয়ালা, তর্জাওয়ালা, বাউল ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের জন্য তিনি বহু সরস সুন্দর সংগীত রচনা করেছেন। 'হরিভক্তিচন্দ্রিকা', 'কৃষ্ণপ্রেমাঙ্কুর', 'বর্ধমানচন্দ্রোদয়', 'পদাঙ্কদূত', 'শ্যামাসঙ্গীত', ২ খন্ডের 'পদসূত্র' ইত্যাদি তাঁর রচিত গ্রন্থ। বিদ্যাসাগরের যত্নে তাঁর কোনো কোনো কাব্যগ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক উপযোগী করে তোলা হয়েছিল। বাঁশবেড়িয়ার শ্রীধর কথক (১৮১৬ - ?) যৌবনে পাঁচালী ও কবিগান গাইতেন। সুকথক হিসেবে খ্যাত হলেও তাঁর রচিত ভাবময় ও রসময় টপ্পা এবং কৃষ্ণ ও শ্যামা বিষয়ক সংগীতও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলা, হিন্দী, আরবী, ফারসী ভাষায় বহু টপ্পা গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ১৬৯টি সংগৃহীত গানের মধ্যে বেশির ভাগটাই প্রেমবিষয়ক। তাঁর নামে বহু পদাবলীও পাওয়া যায়। তাঁর রচিত বহু গান নিধুবাবুর টপ্পা নামেও বাজারে প্রচলিত আছে। 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে', 'নয়নের দোষ কেন', 'তোমার তুলনা প্রাণ এ মহীমন্ডলে', 'আমার মনোবেদনা কভু জানাওনা তায়/শুনিলে আমার দুঃখ সে পাছে বেদনা পায়।" ইত্যাদি গানগুলি নিধুবাবুর বা শ্রীধর কথক, যাঁরই হোক না কেন, সে বিতর্ক চলুক, কিন্তু হুগলির তো বটে । গুপ্তিপাড়ার ভোলা ময়রা একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। বিদ্যাসাগর বলেছেন, "বাংলাদেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতোম প্যাঁচার ন্যায় লেখক এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব বড়ই আবশ্যক।" রাসু, নৃসিংহ এবং নিত্যানন্দ বৈরাগী সম্পর্কে সামান্য তথ্য দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। সুশীলকুমার দে তাঁর, 'হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গলি লিটারেচার ইন্ দ্য নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি' গ্রন্থে লিখছেন — "Rasu was born in 1734 (1141 B.S.) and Nrishinha in 1738 (1144 B.S.) at Gondalpada ...... They were greatly patronised by Indranarayan Chaudhuri, Dewan of

French Government; and Chandannagar soon became a centre of Kabi – song through their influence .... Nitai was born at Chandannagar about 1751 (1158 B.S.) in the house of one Kunjadas Baishnab, and was brought up in Baishnabism."

শুধু চন্দননগর নয়, সমগ্র হুগলি জেলাই কবিগান, কথকতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, একথা বলা মোটেই বাড়াবাড়ি কিছু নয়।

চন্দননগরের মদন মাস্টার ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাত্রাসাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য যাত্রাপালা রচনা করতেন। ফরাসডাঙ্গায় তাঁর নিজস্ব দল ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর 'বউ মাস্টারের দল' নামে তাঁর দলটি চলত। জিরাট - বলাগড়ের ব্রজমোহন রায় যাত্রাপালা রচনা করে খ্যাত হয়েছিলেন। উভয়েই যাত্রা পালার সংস্কার সাধন করেছিলেন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে।

তিন

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার নামে একজন মানুষ নদীয়াধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে রাজা একবার তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হলে তিনি বর্ধমানরাজ চিত্রসেনের আশ্রয়ে যান এবং তাঁরই আদেশে গদ্যেপদ্যে 'চিত্রচম্পূ' রচনা করেন। এই গ্রন্থে বর্গীর হাঙ্গামার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। চিত্রসেনের মৃত্যুর পর তিনি আবার কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা অলংকৃত করেন এবং কিছুকাল পরে নদীয়া ত্যাগ করে কলকাতায় রাজা নবকৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকতে শুরু করেন। গুপ্তিপাড়ার এই বাসিন্দা 'চন্দ্রাভিষেক' নামে একটি নাটকও রচনা করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস যে এগার জন পণ্ডিতের সাহায্যে 'বিবাদার্ণবসেতু' নামে বৃহৎ ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহ রচনা করান, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই গ্রন্থটি ব্রিটিশ আমলে হিন্দু আইনের আদিগ্রন্থ এবং দীর্ঘকাল সুপ্রীমকোর্টের একমাত্র আইনগ্রন্থ ছিল। হুগলির (বর্তমানে হাওড়ার) পেঁড়ো গ্রামে জন্মেছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় (১৭২২ - ১৭৬০। অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা এই কবি 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'অন্নদামঙ্গল' লিখেই প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে ফারসী ভাষা শেখা এবং চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপের সুবাদে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ভারতচন্দ্রকে কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি নিযুক্ত করে। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক ও বিদগ্ধ কবি। যিনি ভাষার লালিত্যে, নৈপুণ্যে, প্রসাদগুণে ও চরিত্রচিত্রণের দক্ষতায় বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের আধুনিকতা এনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাই লিখতে পেরেছিলেন — " রাজসভার কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় চুঁচুড়ায় বহুদিন বাস করেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ বাকসার সিংহ পরিবারের সন্তান। পাণিশেওলার অধিবাসী প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসেরও আগে উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেন। হরিপালের আদি-অধিবাসী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ হুগলির গৌরব। রাধানাথ শিকদার, যিনি প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে যুগ্মভাবে মহিলাদের জন্য 'মাসিক পত্রিকা' সম্পাদনা করতেন, তাঁর জীবনের শেষ দশা কেটেছে চন্দননগরের গোন্দলপাড়া মরান রোড নামক স্থানে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু। ডিরোজিয়ানদের অন্যতম রামগোপাল ঘোষ হুগলির বাগাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০) 'শিশুপালন' নামে একটি ও 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান' নামে আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গুড়াপের প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র - শরৎ মধ্যবর্তী পর্যায়ে স্নিগ্ধমধুর করুণরসসিক্ত হাস্যোজ্জ্বল গল্পকাহিনী লিখে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন।

'নবীনসন্ন্যাসী', 'রত্নদ্বীপ' তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। হুগলির প্রসিদ্ধ কবি 'ভোরের পাখি' শারদামঙ্গল খ্যাত বিহারীলাল চক্রবর্তী তো রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু। আশ্চর্য্য এই, যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য - উন্মেষও হুগলির চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে। এখানে বসেই তিনি 'সন্ধ্যাসংগীত' লিখেছিলেন, 'বৌঠাকুরাণীর হাট' -এর খসড়া করেছিলেন এবং 'বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ গ্রন্থের অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর স্বীকারোক্তি — "মোরান সাহেবের বিখ্যাত হর্ম্যে আমাকে কিছু দীর্ঘকাল যাপন করতে হয়েছিল। বস্তুত এই গঙ্গাতীরে এই নগরের এক প্রান্তেই আমার কবিজীবনের উদ্বোধন। সেটা ছিল আমার জীবনের সত্য ও সহজ উদ্বোধন।" বঙ্কিমচন্দ্র চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে থাকার সময় 'রজনী', 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা করেন। কিছু প্রবন্ধ লেখেন। আর লেখেন 'আনন্দমঠ' উপন্যাস। কোন্নগরের অতুলকৃষ্ণ মিত্র 'নন্দবিদায়' নামক একটি দৃশ্যকাব্য লিখে নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, ইন্দিরা দেবী, চাতরার ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও হুগলি জেলার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত। অনুরূপা দেবীর 'মা', ধূর্জটি প্রসাদের 'অন্তঃশীলা', বিভূতিভূষণের 'নীলাঙ্গুরীয়', বাংলাসাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। শেষোক্ত জন তো হাস্যরসধারার বিশিষ্ট লেখক। বলাগড়ের মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্রযুগেই বিশিষ্ট কবি সমালোচক - প্রাবন্ধিকের সম্মান পেয়েছিলেন, বলাগড়েই যতীন্দ্র মোহন বাগচী রবীন্দ্র সমসাময়িক যুগে নানা কাব্যগ্রন্থ সৃষ্টি করে পাঠকমনে নতুন রসের সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। কোন্নগরের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীরামপুরের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ মিত্র, চুঁচুড়ার সঙ্গে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, জেজুরের সঙ্গে অতুল্য ঘোষের নাম জড়িত। রবীন্দ্রনাথের সচিব অমিয় চক্রবর্তী, কল্লোলের প্রেমেন্দ্র মিত্র সাহিত্যিক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। হরপ্রসাদ মিত্র বিশিষ্ট কবি - সমালোচক। নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায় 'থানা থেকে আসছি', 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে' ইত্যাদি লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অতুল্য ঘোষ রাজনীতিবিদ ও সংগঠক হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁর 'পত্রালী', 'কষ্টকল্পিত', 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা', 'নৈরাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে গান্ধীবাদ' নামক কয়েকটি গ্রন্থ আছে। তাঁর মাতামহ চুঁচুড়ার অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' নামে দুটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। 'কবি হেমচন্দ্র', 'মহাপূজা', 'সনাতনী', 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ', 'রূপক ও রহস্য' ইত্যাদি গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাঁর পিতা রায়বাহাদুর গঙ্গাচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৮৮) 'গদাধর' ভণিতায় অনেককে পাঁচালী লিখে দিতেন। 'ঋতুবর্ণন' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থও আছে। হুগলির (বর্তমান মেদিনীপুর) বীরসিংহ গ্রামে জন্মেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কাজী নজরুল ইসলাম দীর্ঘদিন হুগলি জেলে বন্দী ছিলেন। ব্যাপারটি আদৌ গৌরবের নয়, কিন্তু, বিদ্রোহী কবির বন্দীদশার লেখায়, বন্দীজীবনের কথায় পরোক্ষভাবেও হুগলির মাটির স্পর্শ রয়ে গেছে। বহু বিখ্যাত গান ও কবিতার রচনাস্থল হুগলি।

ত্রিবেণীর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৬৯৪-১৮০৭) দেশীয় বিচার পদ্ধতি ও আইনের উপর 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব' গ্রন্থ সংকলন করেন। হিন্দু দেওয়ানি বিচারব্যবস্থা এই গ্রন্থটিকে নির্ভর করেই চলত।

চার

চন্দননগরের অরুণচন্দ্র দত্ত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'স্ট্যান্ডার্ড রিয়ারার', 'নবসঙ্ঘ', 'প্রবর্তক', পত্রিকা বিভিন্ন সময়ে সম্পাদনা করেছেন। ধর্মমূলক কিছু বই তিনি লিখেছিলেন। ফুরফুরার আবুবকর সিদ্দিক মওলানা ইসলাম প্রচার, মুসলিম সমাজ থেকে অনাচার, কুসংস্কার দূরীকরণ ও ইসলামবিরোধী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কলম ধরেছিলেন। চুঁচুড়ার সৈয়দ আমীর আলী, 'এ ক্রিটিক্যাল এগজামিনেশন অব

দি লাইফ অ্যান্ড টিচিংস অব মহম্মদ', 'দি স্পিরিট অব ইসলাম', 'শর্ট হিস্ট্রি অব দি স্যারাসেনস', 'মহমেডান ল', হিস্ট্রি অব মহামেডান সিভিলাইজেশান ইন্ ইন্ডিয়া' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। গুপ্তিপাড়ার ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজী, বাংলা ও ফরসীতে বহু নিবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'ZORIAN'। হুগলির উমেশচন্দ্র বটব্যাল 'সাংখ্যদর্শন' ও 'বেদপ্রকাশিকা' নামে দুটি গ্রন্থ লেখেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'- এর নাম তাঁরই প্রস্তাবানুসারে গৃহীত হয়। বড়জাতপুরের এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১) গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত এই লেখক 'মাসুকের দরবার', 'প্রেমের মুসাফির', 'ভারতবর্ষ', 'জীবনের শিল্প', 'খেয়ালের ফেরদৌস', 'ভবিষ্যতের বাঙালী' প্রবন্ধ ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক। "সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে" — তাঁর রচনার বিখ্যাত উক্তিনির্যাস। 'সিক্স ইয়ার্স ইন বার্মা' নামে একটি গ্রন্থ লিখে হুগলির ভাস্তাড়ার কামাখ্যাচরণ গুপ্ত এবং মহাভারতের মূল সংস্কৃত থেকে ইংরাজীতে আক্ষরিক গদ্যানুবাদ করে, চরকসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ করে জনাইয়ের কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর পিতা চন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান সংকলনে সহযোগী ছিলেন। 'মুখার্জী ম্যাগাজিন' পত্রিকার নিয়মিত লেখক চন্দননগরের কৃষ্ণমোহন মল্লিক দুখন্ডে 'ব্রিফ হিস্ট্রি অব বেঙ্গল কমার্স' নামে তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ লিখেছিলেন। গুপ্তিপাড়ার কৃষ্ণানন্দ স্বামী, মূল নাম কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, 'গীতার্থসন্দীপনী' ও 'ভক্তি ও ভক্ত' নামে ধর্মপুস্তক রচনা করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদি বাস ছিল জিরাট বলাগড়ে। তিনি 'মাতৃশিক্ষা ও চিকিৎসা প্রকরণ' নামে একটি বই লেখেন ও বাল্মীকি রামায়ণের ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করেন। চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায় (১৮৭০-১৯৪৫) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। তিনি ইংরাজী, বাংলা ও ফরাসি ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন ও তিনটি ভাষাতেই প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'কালনিদ্রা', 'কমলাকান্তের পত্র', 'শরৎ সমালোচনা - শেষ প্রশ্ন' ইত্যাদি তাঁর রচিত গ্রন্থ। বোড়াইচন্ডীতলা, চন্দননগরের মতিলাল রায় (১৮৮৩-১৯৫৯) শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য, প্রবর্তক পত্রিকা ও সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রচিত 'স্বদেশী যুগের স্মৃতি', 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। জেজুরের সুধীরকুমার মিত্র 'হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' 'হুগলি জেলার দেবদেউল' ইত্যাদি আকরগ্রন্থ লিখেছেন। চন্দননগরের বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নির্বাসিতের আত্মকথা' ও বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রক্তবিপ্লবের এক অধ্যায়' গ্রন্থ লিখেছেন যাতে বিপ্লবের কথা অত্যন্ত জীবন্ত। হুগলির শিখিরার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৫ - ১৯৬৬) মুদ্রা, মূর্তি, ধর্মতত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজীতে তিনি বিষয়কেন্দ্রিক অনেকগুলি বই লিখলেও বাংলায় লেখা 'পঞ্চোপাসনা' গ্রন্থটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছিল। বালোড়ের তারকনাথ বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে তেষট্টিটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। 'বিরজা', 'গিরিজা', 'মহামায়া', 'রাণা প্রতাপসিংহ' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'হিন্দু বিধবাসংক্রান্ত আইন' লিখেছিলেন কোন্নগরের ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র। চুঁচুড়ার রায়বাহাদুর দয়ালচন্দ্র সোম, ধাত্রীবিদ্যার বিশিষ্ট অধ্যাপক, 'ম্যানুয়াল অব মেডিসিন ফর মিডওয়াইভস' ও 'ডরস-ই-জারাহি' গ্রন্থ রচনা করেন। দীননাথ ধর (১৮৪০-?) মেঘনাদবধকাব্যের অনুকরণে 'কংসবিনাশকাব্য', আনন্দভট্ট রচিত সংস্কৃত 'বল্লালচরিতে'র বঙ্গানুবাদ এবং 'প্রসূতিবিয়োগে তস্য সূত', 'ত্রিশূল', ঊষাচরিত', 'সুবর্ণবণিক কুলোদ্ধারক ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। হাস্যরসাত্মক সংগীত ও সাধন সংগীত রচনায়ও তিনি দক্ষ ছিলেন। ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, ফারসী ভাষায় সুদক্ষ আঁটপুরের দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৫-১৯১৪) 'আমার জীবনচরিত' নামে একটি ধারাবাহিক লিখেছিলেন মাসিক জন্মভূমি পত্রিকায়। যা পরে 'সিপাহী বিদ্রোহে বাঙালী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়। গ্রন্থটিতে আমরা সেই সময়ের কথা জানতে পারি।

গীতিকবিতার যখন খুব রমরমা, তখন অক্ষয়কুমার বড়াল (আদি নিবাস ফরাসডাঙা) এবং দেবেন্দ্র

'নবীনসন্ন্যাসী', 'রত্নদ্বীপ' তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। হুগলির প্রসিদ্ধ কবি 'ভোরের পাখি' শারদামঙ্গল খ্যাত বিহারীলাল চক্রবর্তী তো রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু। আশ্চর্য্য এই, যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য - উন্মেষও হুগলির চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে। এখানে বসেই তিনি 'সন্ধ্যাসংগীত' লিখেছিলেন, 'বৌঠাকুরাণীর হাট' -এর খসড়া করেছিলেন এবং 'বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ গ্রন্থের অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর স্বীকারোক্তি — "মোরান সাহেবের বিখ্যাত হর্ম্যে আমাকে কিছু দীর্ঘকাল যাপন করতে হয়েছিল। বস্তুত এই গঙ্গাতীরে এই নগরের এক প্রান্তেই আমার কবিজীবনের উদ্বোধন। সেটা ছিল আমার জীবনের সত্য ও সহজ উদ্বোধন।" বঙ্কিমচন্দ্র চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে থাকার সময় 'রজনী', 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা করেন। কিছু প্রবন্ধ লেখেন। আর লেখেন 'আনন্দমঠ' উপন্যাস। কোন্নগরের অতুলকৃষ্ণ মিত্র 'নন্দবিদায়' নামক একটি দৃশ্যকাব্য লিখে নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, ইন্দিরা দেবী, চাতরার ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও হুগলি জেলার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত। অনুরূপা দেবীর 'মা', ধূর্জটি প্রসাদের 'অন্তঃশীলা', বিভূতিভূষণের 'নীলাঙ্গুরীয়', বাংলাসাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। শেষোক্ত জন তো হাস্যরসধারার বিশিষ্ট লেখক। বলাগড়ের মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্রযুগেই বিশিষ্ট কবি সমালোচক - প্রাবন্ধিকের সম্মান পেয়েছিলেন, বলাগড়েই যতীন্দ্র মোহন বাগচী রবীন্দ্র সমসাময়িক যুগে নানা কাব্যগ্রন্থ সৃষ্টি করে পাঠকমনে নতুন রসের সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। কোন্নগরের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীরামপুরের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ মিত্র, চুঁচুড়ার সঙ্গে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, জেজুরের সঙ্গে অতুল্য ঘোষের নাম জড়িত। রবীন্দ্রনাথের সচিব অমিয় চক্রবর্তী, কল্লোলের প্রেমেন্দ্র মিত্র সাহিত্যিক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। হরপ্রসাদ মিত্র বিশিষ্ট কবি - সমালোচক। নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায় 'থানা থেকে আসছি', 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে' ইত্যাদি লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অতুল্য ঘোষ রাজনীতিবিদ ও সংগঠক হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁর 'পত্রালী', 'কষ্টকল্পিত', 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা', 'নৈরাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে গান্ধীবাদ' নামক কয়েকটি গ্রন্থ আছে। তাঁর মাতামহ চুঁচুড়ার অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' নামে দুটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। 'কবি হেমচন্দ্র', 'মহাপূজা', 'সনাতনী', 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ', 'রূপক ও রহস্য' ইত্যাদি গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাঁর পিতা রায়বাহাদুর গঙ্গাচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৮৮) 'গদাধর' ভণিতায় অনেককে পাঁচালী লিখে দিতেন। 'ঋতুবর্ণন' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থও আছে। হুগলির (বর্তমান মেদিনীপুর) বীরসিংহ গ্রামে জন্মেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কাজী নজরুল ইসলাম দীর্ঘদিন হুগলি জেলে বন্দী ছিলেন। ব্যাপারটি আদৌ গৌরবের নয়, কিন্তু, বিদ্রোহী কবির বন্দীদশার লেখায়, বন্দীজীবনের কথায় পরোক্ষভাবেও হুগলির মাটির স্পর্শ রয়ে গেছে। বহু বিখ্যাত গান ও কবিতার রচনাস্থল হুগলি।

ত্রিবেণীর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৬৯৪-১৮০৭) দেশীয় বিচার পদ্ধতি ও আইনের উপর 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব' গ্রন্থ সংকলন করেন। হিন্দু দেওয়ানি বিচারব্যবস্থা এই গ্রন্থটিকে নির্ভর করেই চলত।

চার

চন্দননগরের অরুণচন্দ্র দত্ত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'স্ট্যান্ডার্ড রিয়ারার', 'নবসঙ্ঘ', 'প্রবর্তক', পত্রিকা বিভিন্ন সময়ে সম্পাদনা করেছেন। ধর্মমূলক কিছু বই তিনি লিখেছিলেন। ফুরফুরার আবুবকর সিদ্দিক মওলানা ইসলাম প্রচার, মুসলিম সমাজ থেকে অনাচার, কুসংস্কার দূরীকরণ ও ইসলামবিরোধী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কলম ধরেছিলেন। চুঁচুড়ার সৈয়দ আমীর আলী, 'এ ক্রিটিক্যাল এগজামিনেশন অব

দি লাইফ অ্যান্ড টিচিংস অব মহম্মদ', 'দি স্পিরিট অব ইসলাম', 'শর্ট হিস্ট্রি অব দি স্যারাসেনস', 'মহমেডান ল', হিস্ট্রি অব মহামেডান সিভিলাইজেশান ইন্ ইন্ডিয়া' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। গুপ্তিপাড়ার ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজী, বাংলা ও ফারসীতে বহু নিবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'ZORIAN'। হুগলির উমেশচন্দ্র বটব্যাল 'সাংখ্যদর্শন' ও 'বেদপ্রকাশিকা' নামে দুটি গ্রন্থ লেখেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'- এর নাম তাঁরই প্রস্তাবানুসারে গৃহীত হয়। বড়জাতপুরের এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১) গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত এই লেখক 'মাসুকের দরবার', 'প্রেমের মুসাফির', 'ভারতবর্ষ', 'জীবনের শিল্প', 'খেয়ালের ফেরদৌস', 'ভবিষ্যতের বাঙালী' প্রবন্ধ ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক। "সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে" — তাঁর রচনার বিখ্যাত উক্তিনির্যাস। 'সিক্স ইয়ার্স ইন বার্মা' নামে একটি গ্রন্থ লিখে হুগলির ভাডামোড়ার কামাখ্যাচরণ গুপ্ত এবং মহাভারতের মূল সংস্কৃত থেকে ইংরাজীতে আক্ষরিক গদ্যানুবাদ করে, চরকসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ করে জনাইয়ের কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর পিতা চন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান সংকলনে সহযোগী ছিলেন। 'মুখার্জী ম্যাগাজিন' পত্রিকার নিয়মিত লেখক চন্দননগরের কৃষ্ণমোহন মল্লিক দুখন্ডে 'ব্রিফ হিস্ট্রি অব বেঙ্গল কমার্স' নামে তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ লিখেছিলেন। গুপ্তিপাড়ার কৃষ্ণানন্দ স্বামী, মূল নাম কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, 'গীতার্থসন্দীপনী' ও 'ভক্তি ও ভক্ত' নামে ধর্মপুস্তক রচনা করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদি বাস ছিল জিরাট বলাগড়ে। তিনি 'মাতৃশিক্ষা ও চিকিৎসা প্রকরণ' নামে একটি বই লেখেন ও বাল্মীকি রামায়ণের ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করেন। চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায় (১৮৭০-১৯৪৫) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। তিনি ইংরাজী, বাংলা ও ফরাসি ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন ও তিনটি ভাষাতেই প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'কালনিদ্রা', 'কমলাকান্তের পত্র', 'শরৎ সমালোচনা - শেষ প্রশ্ন' ইত্যাদি তাঁর রচিত গ্রন্থ। বোড়াইচন্ডীতলা, চন্দননগরের মতিলাল রায় (১৮৮৩-১৯৫৯) শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য, প্রবর্তক পত্রিকা ও সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রচিত 'স্বদেশী যুগের স্মৃতি', 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। জেজুরের সুধীরকুমার মিত্র 'হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' 'হুগলি জেলার দেবদেউল' ইত্যাদি আকরগ্রন্থ লিখেছেন। চন্দননগরের বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নির্বাসিতের আত্মকথা' ও বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রক্তবিপ্লবের এক অধ্যায়' গ্রন্থ লিখেছেন যাতে বিপ্লবের কথা অত্যন্ত জীবন্ত। হুগলির শিখিরার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৫ - ১৯৬৬) মুদ্রা, মূর্তি, ধর্মতত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজীতে তিনি বিষয়কেন্দ্রিক অনেকগুলি বই লিখলেও বাংলায় লেখা 'পঞ্চোপাসনা' গ্রন্থটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছিল। বালোড়ের তারকনাথ বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে তেষট্টিটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। 'বিরজা', 'গিরিজা', 'মহামায়া', 'রাণা প্রতাপসিংহ' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'হিন্দু বিধবাসংক্রান্ত আইন' লিখেছিলেন কোন্নগরের ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র। চুঁচুড়ার রায়বাহাদুর দয়ালচন্দ্র সোম, ধাত্রীবিদ্যার বিশিষ্ট অধ্যাপক, 'ম্যানুয়াল অব মেডিসিন ফর মিডওয়াইভস' ও 'ডরস-ই-জারাহি' গ্রন্থ রচনা করেন। দীননাথ ধর (১৮৪০-?) মেঘনাদবধকাব্যের অনুকরণে 'কংসবিনাশকাব্য', আনন্দভট্ট রচিত সংস্কৃত 'বল্লালচরিতে'র বঙ্গানুবাদ এবং 'প্রসূতিবিয়োগে তস্য সুত', 'ত্রিশুল', উষাচরিত', 'সুবর্ণবণিক কুলোদ্ধারক ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। হাস্যরসাত্মক সংগীত ও সাধন সংগীত রচনায়ও তিনি দক্ষ ছিলেন। ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, ফারসী ভাষায় সুদক্ষ আঁটপুরের দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৫-১৯১৪) 'আমার জীবনচরিত' নামে একটি ধারাবাহিক লিখেছিলেন মাসিক জন্মভূমি পত্রিকায়। যা পরে 'সিপাহী বিদ্রোহে বাঙালী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়। গ্রন্থটিতে আমরা সেই সময়ের কথা জানতে পারি।

গীতিকবিতার যখন খুব রমরমা, তখন অক্ষয়কুমার বড়াল (আদি নিবাস ফরাসডাঙা) এবং দেবেন্দ্র

নাথ সেন (আদি নিবাস বলাগড়) বিহারীলাল পরবর্তী বাংলা গীতিকবিতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। অক্ষয়কুমার রচিত কাব্য 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ' ও 'এষা'। দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'উর্মিলাকাব্য', 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা', 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' মধুসুদন প্রভাবিত হলেও পরবর্তী সময়ের 'নির্ঝরিনী', 'অশোকগুচ্ছ', 'অপূর্বনৈবেদ্য', 'গোলাপগুচ্ছ' রবীন্দ্রনাথের যুগেও বাঙালী পাঠককে আলোড়িত করেছিল।

গুপ্তিপাড়ার ধরণীধর সেন ছিলেন একজন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী। 'এক্সক্যাভেসন ইন ময়ুরভঞ্জ', 'স্টাডিজ ইন প্রি - হিস্ট্রি' গ্রন্থ দুটি রচনার নেপথ্যে তাঁর সহযোগিতা ছিল। 'ইন্ডিয়ান অ্যানথ্রোপলজি' গ্রন্থটি তিনি সম্পাদনা করেন। বাংলাতেও তিনি নানা প্রবন্ধ লিখেছেন। চন্দননগরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ধর্মদাস বসু 'ধর্মজীবন', 'স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব' নামক বই লিখেছিলেন। বাঁশবেড়িয়ার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', 'ধর্ম জিজ্ঞাসা', থিয়োডর পার্কারের জীবনী', 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা', 'অনন্তের উপাসনা' গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু (আদি নিবাস মাহেশ) বাইশ খন্ডের বিশ্বকোষ ও 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' সংকলন করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় পুরাতত্ত্বে অসাধারণ পান্ডিত্যহেতু 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্নব' উপাধি দ্বারা তিনি ভূষিত হন। তিনি দেশীয় ও বিদেশীয় নাটকও অনুবাদ করেছেন। চুঁচুড়ার নগেন্দ্রনাথ সোম (১৮৭০-১৯৪০) মধুসূদনের জীবনী 'মধুস্মৃতি' লিখে দারুণ খ্যাতি অর্জন করেন। ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস, কবিতাও তিনি লিখেছিলেন। পোলগ্রামের নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য 'নববোধন'. 'কথাকুঞ্জ', 'কুলপুরোহিত', 'অভিমান' উপন্যাস লেখেন ও জৈন পন্ডিত হেমচন্দ্রের 'অভিধান চিন্তামণি' বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করেন। 'চুঁচুড়া বার্তাবহ', 'বঙ্গ দর্পণ', 'শিল্প ও সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক চুঁচুড়ার নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় 'বালগঙ্গাধর তিলক', 'স্মরণা' ও 'গায়ত্রী' নামে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। চুঁচুড়ারই নীলরত্ন হালদার বহুভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও সুকবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। 'কবিতা রত্নাকর', 'জ্যোতিষ', 'পরমায়ু প্রকাশ', 'অদৃষ্ট প্রকাশ', 'বহুদর্শন,' 'দম্পতিশিক্ষা', 'সর্বমোদতরঙ্গিনী', 'শ্রীশ্রী মহাদেবস্তোত্রম', 'শ্রুতিগীতরত্ন', 'পার্ব্বতীগীতরত্ন' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি তাঁর রচিত। প্রথম গ্রন্থটি পাদ্রী মার্শম্যান ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন। তিনি বহু সংগীত রচনাও করেছিলেন। হোরাগ্রামের পঞ্চানন নিয়োগী 'আয়ুর্বেদ ও নব্যরসায়ন', 'তুফান', 'বৈজ্ঞানিক জীবনী', 'আয়রন এ্যান্ড এ্যানসেন্ট ইন্ডিয়া' বিজ্ঞান গ্রন্থগুলির জনক। ভদ্রকালীর পূর্ণচন্দ্র দে 'প্রশ্নোত্তর মনিরত্নমালা', 'উদ্ভট শ্লোকমালা', 'উদ্ভটসমুদ্র', 'স্তবসমুদ্র', 'মোহমুদগর', 'মোহঠাকুর' ইত্যাদি বহু সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা সংগ্রহ ও অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেন। শিশুদের ইংরাজী শেখার সুবিধার্থে প্যারীচরণ সরকার 'ফার্স্ট বুক অব্ রিডিং' ও 'সেকেন্ড বুক অব্ রিডিং' লিখে অত্যন্ত জনপ্রিয় হন। প্যারীচরণের আদিনিবাস হুগলির গুড়াগ্রাম। উত্তরপাড়ার পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় 'শব্দসিন্ধু' অভিধান সংকলন করে এবং 'ক্রিয়াযোগসার' গ্রন্থ রচনা করে খ্যাত হয়েছেন। বাঁশবেড়িয়ার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ধর্মসংক্রান্ত কয়েকটি বই লেখেন ইংরাজীতে।

হুগলির জাহানাবাদের যদুনাথ সর্বাধিকারী (১৮০৫-১৮৭০) ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করে 'তীর্থভ্রমণ' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তা বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুদ্রিত ভ্রমণকাহিনী। তিনি 'সংগীতলহরী' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন। চন্দননগরের বসন্তলাল মিত্র বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী হলেও সংগীতশাস্ত্রের লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের অনুসন্ধান ও উদ্ধারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। মাদ্রাজ থেকে 'সঙ্গীত পারিজাত' ও কাশ্মীর থেকে 'রত্নাকর' নামে দুটি সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করে দুই ব্যক্তির সাহায্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। 'গন্ধর্বসংহিতা' নামে সংগীত বিষয়ক একটি গ্রন্থের প্রথম খন্ডও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। বাঘাডার স্বামী বোধানন্দ (মূলনাম হরিপদ চট্টোপাধ্যায়), স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য, 'লেকচারস অন বেদান্ত ফিলজফি' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

হরিপালের ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮) খ্যাতনামা দার্শনিক ও আচার্য। ইংরাজীতে তিনি বহু

গ্রন্থ রচনা করেছেন। উত্তরপাড়া বালির ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯২৫) 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা', 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' 'বাংলা সাময়িক পত্র' নামক গবেষণা গ্রন্থ লিখে জীবিতকালেই কিংবদন্তী হয়ে যান। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাময়িক পত্রিকার থেকে আহৃত তথ্য সমাবেশে বঙ্গসংস্কৃতি, সমাজ ও সাহিত্যে নবজাগরণের ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস রচনার ভিত্তি তিনি গড়ে তুলেছেন।

প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করে যে বাঙালী চিকিৎসার ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন, সেই মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০-১৮৫৬) চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু বই বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। বৈদ্যবাটী ছিল তাঁর আবাসস্থল। 'জন্মভূমি' পত্রিকার সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি 'অক্ষয় দত্তের জীবনচরিত', 'আর্যনারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতা' গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর নিবাস ছিল রাধানগর। মলয়পুরের মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ 'শ্রী শ্রী হরিভক্তিবিলাসঃ, 'শব্দাম্বুধি', 'বেণীসংহার', 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'নূতন অভিধান', 'অপূর্বোপাখ্যান', 'অমরার্থদীধিতি', 'অন্নদামঙ্গল', পাঁচ খন্ডের 'আরবীয় উপাখ্যান টিপ্পনী', 'হিতোপদেশ' বাংলায় অনুবাদ করেন। সাতগাছিয়ার যদুনাথ সার্বভৌম 'আত্মতত্ত্ববিবেকবিবৃতি' নামে টিপ্পনী ও চিন্তামণি গ্রন্থের টিপ্পনী লিখে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। সেনহাটির বিশ্বনাথ পাণি (১৭৮৫-১৮৫৪/৫৫) কলাবতী পদ্ধতিতে খেয়াল, ধ্রুপদ ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের গান লেখেন। বহু পদাবলী সংকলন করেন। 'বৃন্দাবন প্রত্যুপায়', 'প্রেমসম্পুট', 'ভক্তরত্নমালা', 'কন্দর্পকৌমুদী' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দিগড়ার (আদি নিবাস) যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ভাষাচর্চা ও জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। 'এনসেন্ট ইন্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার, 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, সরোজিনী পদক পান। যোগেশচন্দ্র রায় (১৮৫৯-১৯৫৬) 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ', 'বাংলা ভাষা', 'চন্ডীদাস চরিত' রচনা ও 'বাঙ্গালী শব্দকোষ' সম্পাদনাকর্মেও জড়িত ছিলেন। চন্দননগরের রাখালদাস মজুমদার 'শ্রীরামচরিত' নামে একটি বই লেখেন। বাঘাডার যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'কনেবৌ' নামে একটি গার্হস্থ্য উপন্যাস লিখেছিলেন। জেজুরের রাধানাথ মিত্র 'গোরাচাঁদ', 'ঘরের ছবি', 'লালকুঠি', 'প্রণয় প্রসঙ্গ', 'জোড়া ডিটেকটিভ', ইত্যাদি কাব্য, উপন্যাস, গল্প ও রহস্যকাহিনী লিখতেন। ইলছোবার অধিবাসী ছিলেন রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪)'। 'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব,' 'বাঙ্গলার ইতিহাস', 'অনুকূল হত্যার ইতিহাস' ইত্যাদি তাঁর রচিত অসাধারণ গ্রন্থ। অনুবাদ ব্যাখ্যা ও আখ্যায়িকাও তিনি রচনা করেছেন। কৈকালার চন্দ্রনাথ বসু 'শকুন্তলাতত্ত্ব', 'সাবিত্রীতত্ত্ব', 'ত্রিধারা', 'হিন্দুত্ব' ইত্যাদি গ্রন্থ লিখেছেন। হিন্দু ধর্মকর্ম, সভ্যতা সংস্কৃতি, সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধ তিনি লিখতেন। চন্দননগরের শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারী (আসল নাম উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) 'জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ', 'জীবের সাধ্য ও সাধনা', 'চন্ডীদাসের জন্মস্থান', 'মানুষ ও গ্রামের প্রাচীনত্ব ও পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার', 'আমাদের জাতীয় ইতিহাসের দিগ্‌দর্শন' ইত্যাদি গ্রন্থ লিখেছিলেন। ইংরাজীতে বাঙালী ব্রাহ্মণ ও বেদ বিষয়ে লেখা তাঁর গ্রন্থগুলিও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ,' 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ,' 'কবিতীর্থের পাঁচালী', 'সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ', 'রবিতীর্থ', রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে' গ্রন্থগুলির লেখক শচীন্দ্রনাথ অধিকারী (১৮৯৭-১৯৭৯) রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। এই গ্রন্থগুলি রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে সাহায্য করে। শচীন্দ্রনাথ চন্দননগরে বাস করতেন। তাঁর জামাই সাহিত্যিক সম্রাট সেন (মূল নাম বেচু প্রামাণিক) গোবর্ধন সাধুখাঁ, ঝরা বকুল, শ্রীমন্ত সওদাগর নামেও পরিচিত ছিলেন। সম্রাট সেন (১৯৩৩-১৯৯৩) 'অগ্নিটে সপ্তগ্রাম', 'সায়াহ্নে সপ্তদুর্গা', 'মহানগর বাদশানগর', 'যমুনাবতী সরস্বতী' ইত্যাদি উপন্যাস লিখেছেন। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত 'যন্ত্রকোষ' সম্পাদনা করেছেন। তিনি বাস করতেন ভদ্রেশ্বরের

তেলিনীপাড়ায়। হরাদিত্য নিবাসী শশধর দত্ত 'ঘি ও আগুন', 'স্বর্গাদপি গরীয়সী', 'আগুন ও মেয়ে', 'শ্রীকান্তের শেষপর্ব', শেষ উত্তর' ইত্যাদি গ্রন্থ লিখে এবং কোন্নগরের শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় 'রামের রাজ্যাভিষেক' বই লিখে সাহিত্যিক পরিচিতি পান। কোন্নগরের শিশিরকুমার মিত্র অরবিন্দ, শ্রীমা ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্পর্কে ইংরাজীতে গ্রন্থ লিখেছেন। বন্দিপুরের সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপুরের সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত পত্রপত্রিকায় লিখে আলোড়ন ফেলেছিলেন। বিজ্ঞান, প্রকৃতি, উদ্ভিদ বিষয়ক নানা প্রবন্ধ লিখতেন নাগবোলের সহায়রাম বসু। আইনী বই লিখে ও বিদ্যাপতির পদাবলীর সটিক সংস্করণ প্রকাশ করে সেহালার সারদাচরণ মিত্র কায়স্থ কারিকা সংকলন করতেও কুণ্ঠিত হন নি। ভূমি বিদ্যা, পরিবহণ ও ভ্রমণব্যবস্থার উপযোগী গ্রন্থ লিখতেন ইংরাজীতে চন্দননগরের সুবোধচন্দ্র বসু। নানা দেশীবিদেশী গল্পকে ছোটদের মত করে পরিবেশন করার অনায়াস দক্ষতা ছিল চন্দননগরের সুলতা করের। তেলিনীপাড়ার ডা. সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় পেশায় চিকিৎসক হলেও অন্ধতা নিবারণ বিষয়ে নানা পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ - নিবন্ধ লিখতেন। সানিহাটির হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গ ভাষার লেখক (১ম)', 'সঙ্গীত তরঙ্গ', 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী' গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। তেলিনীপাড়ার কপিল ভট্টাচার্য 'পশ্চিমবঙ্গের নদনদী ও পরিকল্পনা', 'স্বাধীন ভারতে নদনদী ও পরিকল্পনা' লিখে দেশজুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি গল্প, নাটক লিখতেন। অনুবাদও করতেন। শ্রীরামপুরের গোপীনাথ ভট্টাচার্য 'স্টাডিজ ইন অ্যানালিটিক্যাল ফিলজফি' নামে দর্শনের ওপর বই লিখেছিলেন ও ভারতীয় দর্শনের সটিক সংস্করণ প্রকাশ করেন।

গোপীনাথপুর নিবাসী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত কাব্য, অনুবাদ কাব্য, ছোটদের গ্রন্থ, প্রবন্ধ লিখে নাম করেছিলেন। ভদ্রেশ্বরের রবীন সুর (১৯৩৪-১৯৮৮) 'অন্তর্গত নদী', 'রাবণের সিঁড়ি', 'বারো নম্বর বাড়ি', 'গোধূলি বারান্দার কুশীলব' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। গরলগাছার শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্বান, যুক্তিবাদী লেখক - গবেষক ছিলেন। ইংরাজীতে রচিত তাঁর লেখাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বেঙ্গলি স্পোকেন অ্যান্ড রিটন'। প্রস্তরবিদ্যা সংক্রান্ত বই লিখে খ্যাতি পেয়েছিলেন হুগলির সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়। খ্যাতনামা ভূবিদ্ শ্রী চট্টোপাধ্যায় 'পেট্রোগ্রাফি অব দি ইনজেনিয়াস অ্যান্ড মেটামরফিক রকস অব ইন্ডিয়া' ও 'দি ওয়ার্ল্ড' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। কলাছড়ার সুকুমার মিত্র দুই খন্ডে কার্ল মার্কসের জীবনী, '১৮৫৭ ও বাংলাদেশ', 'কৃষ্ণ আফ্রিকার জাগরণ', 'অগ্নিগর্ভ দক্ষিণ আফ্রিকা' ইত্যাদি গ্রন্থ লিখে নাম করেছিলেন। মান্দড়ার সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় গণনাট্য আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে 'কেরানী', 'সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্ত', 'স্পার্টাকাস' ইত্যাদি নাটক লেখেন ও শেকস্পীয়ার অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শুধু গল্প - কবিতা - উপন্যাস - নাটকই নয়, হুগলি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা বিষয়ের, নানা পেশার মানুষ গ্রন্থ লিখেছেন। ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞান (ভূ, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, উদ্ভিদ, মৃত্তিকা, চিকিৎসা ইত্যাদি) কোনো বিষয়ই বাদ নেই। এটা তো হুগলির পক্ষে পরম গৌরবের ব্যাপার। নয় কি ?

পাঁচ

বলাগড়ের সুখাড়িয়া গ্রামের গৃহবধূ কৃষ্ণকামিনী মিত্র মুস্তৌফী ওরফে দাসী রচিত 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্যই বাঙালী মহিলা রচিত সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের দাবিদার। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্যে তিনি পয়ার, ত্রিপদী, পয়ার মিশ্র ত্রিপদী, একাবলী, দীর্ঘ ললিত ছন্দ যেমন ব্যবহার করেছেন, নাট্যসংলাপও ব্যবহার করেছেন। "ধনেতে কখন নাহি হয় সুখোদয়/ সন্তোষ সুখের হেতু জানিবে নিশ্চয়।" তাঁর রচনার উদাহরণ। গুপ্তিপাড়ার ফুলকুমারী গুপ্ত (১৮৬৯ - ১৯৩১) 'সৃষ্টিরহস্য' নামে

একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যা বাঙালী মহিলা রচিত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি 'অবসর' নামে একটি কাব্যও লিখেছিলেন। পালাড়া, ভদ্রেশ্বরের নগেন্দ্রবালা মুস্তৌফী (১৮৮৭ - ১৯০৬) 'মর্মগাথা', 'প্রেমগাথা', 'অমিয়গাথা', 'বজ্রগাথা', 'নারীধর্ম', 'ধবলেশ্বর', ইত্যাদি গ্রন্থ লিখেছিলেন। 'অমিয়গাথা' গ্রন্থের জন্য তিনি 'সরস্বতী' উপাধি পান। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কন্যা ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভ্রাতৃবধূ হরিপালের সরযূবালা দাশ (১৮৮৯ - ১৯৪৯) 'বসন্তপ্রয়াণ', 'দেবোত্তর', 'ত্রিবেণীসঙ্গম', 'অন্নপূর্ণা', 'বিশ্বনাথ' ইত্যাদি গ্রন্থ লিখেছিলেন। বেগমপুরের আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯ - ১৯৯৫) সত্যবতী ট্রিলজি লিখেই ('প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা,' 'বকুলকথা') জ্ঞানপীঠ, সাহিত্য অকাদেমি ও নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। সমগ্র নারী সমাজের আশাআকাঙ্খা, দুঃখবেদনার কথা তিনি অত্যন্ত সহজভাব সহজসুরে লিখে গেছেন। ১৭৬ টি উপন্যাস, ৩০টি ছোটগল্প, সংকলন ও বিভিন্ন বই তিনি লিখেছেন গৃহবধূ ও মাতার ভূমিকা পালন করে সম্পূর্ণ অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই সাহিত্যিকের বহু কাহিনী চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।

ছয়

সাহিত্যিক সাফল্য, জনপ্রিয়তার কথা বলতেই মনে পড়ে দেবানন্দপুরের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮) 'মন্দির' গল্প লিখে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। 'মন্দির' কুন্তলীন গল্প পুরস্কার পায়। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ যখন মধ্যগগনে, শরৎচন্দ্র তখন পূর্ণচন্দ্রের মহিমায় বিরাজমান। ভবঘুরে, বাউন্ডুলে শরৎচন্দ্রের লেখাই ছিল একমাত্র পেশা। 'বড়দিদি', 'বিপ্রদাস', 'বিরাজ বৌ', চারখন্ডের 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দত্তা', 'পথের দাবী' তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য কালজয়ী গ্রন্থ। সমাজের তথাকথিত চরিত্রনীতি, সতীত্ব, সংযমের বাঁধাগৎকে, আদর্শকে টান মেরে ফেলে দিয়ে এই সমাজে অনাচার অবিচারে পিষ্ট মানবমানবীর মর্মন্তুদ কাহিনী লিখে সমাজের শিষ্ট ও শিক্ষিত মানুষের কাছে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র মৃত্যুর প্রায় ষাট বছর পরেও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে।

কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিলেন চন্দননগরের হরিহর শেঠ (১৮৭৮-১৯৭২)। কুন্তলীন পুরস্কারের নবম বর্ষে (১৩১১ বঙ্গাব্দে) হরিহর শেঠ 'অমৃত গরল' গল্পের জন্য অষ্টম পুরস্কার পেয়েছিলেন। আর সপ্তম বর্ষের (১৩০৯ বঙ্গাব্দ) প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক যুবক 'মন্দির' গল্পের জন্য। ইনি আসলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। হরিহর শেঠ বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় কথায় ও চিত্রে', 'পুরাতনী', 'সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয়,' 'রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর', 'মুক্তিসাধনায় চন্দননগর' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনার জন্য। তিনি গল্প, উপন্যাসও লিখেছেন। দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯১০-১৯৭৮), যিনি প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্ন্যাস নিয়ে উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরে 'কালিকানন্দ অবধূত' নাম নেন, লেখক হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', 'বশীকরণ', 'কলিতীর্থ কালীঘাট' ইত্যাদি গ্রন্থ রচয়িতা অবধূত চুঁচুড়া, হুগলিতে 'রুদ্রচন্ডী' মঠ তৈরী করেছিলেন। সেখানে বহুদিন ভৈরবী স্ত্রী নিয়ে বসবাস করতেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বলতেন "রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক - তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রতিভাশালী সেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের (১৮৬১-১৯০৭) জন্মস্থান হুগলির খন্যান। 'সন্ধ্যা' দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব 'বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি', 'ব্রহ্মামৃত', 'সমাজতত্ত্ব', 'আমার ভারত উদ্ধার', 'পাল-পার্বণ' ইত্যাদি গ্রন্থ লিখেছিলেন। গ্রন্থাগার জগতের প্রবাদপুরুষ মুনীন্দ্র দেব রায় (১৮৭৪-১৯৪৫) বাঁশবেড়িয়ার গড়বাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'গ্রন্থাগার',

'দেশবিদেশের গ্রন্থাগার', 'বাঁশবেড়িয়া পরিচয়', 'হুগলী কাহিনী' ইত্যাদি অতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সাত

বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান অনস্বীকার্য। শ্রীরামপুর মিশন শুধু বাইবেল অনুবাদই করায় নি, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানের মত গুরুগম্ভীর পুস্তক ছাপতেও দ্বিধাবোধ করে নি। পুরাতন বাংলা সাহিত্যকে ছাপার অক্ষরে প্রচার করে শ্রীরামপুর মিশন বাংলা সাহিত্যের অশেষ উপকার করেছে। জোশুয়া মার্শম্যানের সম্পাদনায় 'সমাচার দর্পণ' (সাপ্তাহিক ও 'দিগদর্শন' (মাসিক) বাংলা সাহিত্য পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশস্থল শ্রীরামপুর।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে মিশনারিদের সহজে বাংলা শেখানোর জন্য উইলিয়াম কেরী যে কজন পণ্ডিত ও মুন্সীর সাহায্য নেন, চুঁচুড়ার রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) তাঁদের একজন। রামরাম এক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। তাঁকে নিয়ে অনেক গল্পকাহিনী। কেরী ও টমাসকে খ্রিস্টান হবার আশা দিয়ে, এমনকি কবিতায় 'খ্রিস্টস্তব' লিখেও তিনি কোনোদিন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেননি। 'গসপেল মেসেঞ্জার' বাংলা অনুবাদে 'হরকরা', খ্রীষ্টসংগীত অনুবাদ, খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' নামে খ্রিস্টচরিত, 'জ্ঞানোদয়' কাব্যগ্রন্থ রচনা করলেও তিনি যে কারণের জন্য স্মরণীয়, তা হল 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং 'লিপিমালা' নামে দুটি গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাঙালীর লেখা প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ। বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ইতিহাসে রামরাম বসু চিরস্মরণীয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের মহিমা হ্রাস পেল তখনই, যখন বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন রাধানগরের রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। তিনি আধুনিক ভারতের জনক, আন্তর্জাতিক আদর্শের প্রবক্তা ও বাংলা গদ্যের ধারক বাহক। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে অনুবাদ, আলোচনা, বিতর্ক ও মীমাংসার বাহন হিসেবে গড়ে তুললেন। যুক্তি - চিন্তা - মনন সহযোগে বাংলা গদ্যকে তিনি আধুনিক চিন্তাশীল মনের উপযোগী করে গড়ে তুললেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যেই নিহিত আছে — "কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা, কী সমাজ, কী ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই।" শ্রীরামপুর বড়ার গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রথম বাঙালী সাংবাদিক। বাংলায় প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র 'বাঙ্গলা গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। তাঁর সম্পাদিত 'অন্নদামঙ্গল' প্রথম সচিত্র বাংলা পুস্তক হিসেবে প্রকাশিত হয়। ইংরাজী বাংলা অভিধান, 'দায়ভাগ', 'দ্রব্যগুণ' ও 'চিকিৎসার্ণব' তাঁর রচিত গ্রন্থ।

বাংলা নাটকের প্রথম পর্বে যাঁরা নাটক লিখেছিলেন, হুগলির হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭- ১৮৮৪) তাঁদের অন্যতম। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য নাটকের সঙ্গে প্রাচ্য নাট্যকলার মিলন ঘটান। তাঁর রচিত প্রথম নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (মার্চেন্ট অফ ভেনিস অবলম্বনে), তৃতীয় নাটক 'চারুমুখচিত্তহরা' (রোমিও এ্যান্ড জুলিয়েট অবলম্বনে) শেক্সপীয়ারকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে। তাঁর দ্বিতীয় ও শেষ নাটক যথাক্রমে 'কৌরববিয়োগ' (মহাভারত অবলম্বনে) ও 'রজতগিরিনন্দিনী' (ব্রহ্মদেশের উপাখ্যান অবলম্বনে) তেও অনুবাদের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। গদ্যপদ্যের আশ্রয়ে, বিদেশী ভাবকে দেশীয় ভাষার ভাবের সঙ্গে ঐক্যস্থাপন করে রচিত তাঁর নাটকগুলি অভিনীত হয়েছিল কি না জানা যায় না। তবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে হরচন্দ্র ঘোষ এক অবিস্মরণীয় নাম।

বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগের বিশিষ্ট কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হুগলির রাজবলহাটের গুলিটায়। হেমচন্দ্রের (১৮৩৮ - ১৯০৩) প্রধান পরিচয় তিনি একজন যশস্বী দেশপ্রেমিক কবি। 'চিন্তাতরঙ্গিনী', 'বীরবাহু' কাব্য, 'ছায়াময়ী' (দান্তের ডিভাইনা কমেদিয়া অবলম্বনে), 'আশাকানন', 'দশমহাবিদ্যা', 'কবিতাবলী', 'নলিনীবসন্ত' (শেক্সপীয়ারের টেম্পেস্ট অবলম্বনে) ও 'রোমিও জুলিয়েত' রচনা করলেও দুখন্ডের 'বৃত্রসংহার কাব্য' ই তাঁকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখে দিয়েছে। এই

কাব্যে তিনি পুরাণের কাহিনীর সাহায্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম জাতীয় কবি, যিনি সমগ্র স্বাধীন ভারতের এক সংহতিপূর্ণ চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। মধুসূদন অনুসারী হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার'ই 'মেঘনাদবধকাব্যে'র পর দ্বিতীয় মহাকাব্যের গৌরব লাভ করতে পেরেছে। হেমচন্দ্রের অনুজ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭) 'যোগেশ' নামে একটি আখ্যানকাব্য রচনা করেছিলেন। করুণরসের এই কাব্য আখ্যান ও গীতিময়তার আশ্রয়ে গড়ে উঠেছিল। 'চিত্তমুকুর', 'বাসন্তী', 'চিন্তা' নামক কাব্য ও 'সুধাময়ী' নামে একটি উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন।

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় / দাসত্ব শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?" লিখেছিলেন বাকুলিয়া হুগলির রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)। 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী', 'কাঞ্চীকাবেরী' তাঁর রচিত কয়েকটি আখ্যানকাব্য। অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কাব্যকবিতার ধাঁচে, স্বদেশপ্রেম ও ইতিহাসকে অবলম্বন করে তিনি যে কটি বীররসের আখ্যানকাব্য লিখেছিলেন, তার কাব্যমূল্য যাই হোক তাতে মাইকেলের আগমনীই সূচিত হয়েছিল। তাঁর রচিত 'কলিকাতা কল্পলতা' গ্রন্থই সম্ভবত বাংলাভাষায় প্রথম কলকাতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, ওড়িয়া কাব্যসাহিত্যে যথেষ্ট দক্ষতা থাকা রঙ্গলাল ঈশ্বর গুপ্ত ও মধুসূদনের মাঝখানে জলবিভাজিকার মত দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিই ইংরাজী প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পথপ্রদর্শক এবং বাংলা সাহিত্যের পালা বদলের ইতিহাসের সংযোগসেতু।

আট

এবার লাটাইয়ে সুতো গোটানো শেষ। আমরা এই প্রবন্ধের শেষ অঙ্কে দাঁড়িয়ে আছি। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পট ও দিক পরিবর্তনে হুগলি জেলার এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মধ্যযুগে, আধুনিক যুগে, কবিতা, কবিতার নানা বাঁক পরিবর্তনে, বাংলা গদ্য, বাংলা নাটকের আদিপর্বে, মহাকাব্যের যুগে এমন কি গীতিকবিতার যুগেও হুগলির সাহিত্যিক মনীষীবৃন্দের অবদান বিশাল। দেশসেবায় জাতীয়তার মন্ত্রে, বিপ্লবে, অধ্যাত্মচেতনায়, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞানেও হুগলির সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বেরা যথেষ্টই সামনের সারিতে। শতাব্দী ও দশক পেরিয়ে হুগলির সাহিত্য মনীষা অন্বেষণের আজ এখানেই ইতি। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আগামীর জন্য তোলা থাক।

গ্রন্থঋণ

১) সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান (প্রথম ও দ্বিতীয়)
২) হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ — সুধীর কুমার মিত্র
৩) সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয় — হরিহর শেঠ
৪) বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস — ড. সুকুমার সেন
৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৬) বাংলা নাটকের ইতিহাস — ড. অজিত কুমার ঘোষ
৭) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ — শিবনাথ শাস্ত্রী
৮) কুন্তলীন গল্পশতক — বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত

পত্রিকাঋণ

প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বঙ্গবাসী, আনন্দবাজার পত্রিকা, গোধূলিমন, ঊর্মি, সমীপন, সাহিত্য-সেতু

ব্যক্তিঋণ

১) মিলা চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক, চন্দননগর পুস্তকাগার
২) পীযূষ কান্তি সিনহা, গ্রন্থাগারিক, বাঁশবেড়িয়া গ্রন্থাগার

হুগলি : বাংলা সাময়িকীর সূতিকাগার

জগবন্ধু কুণ্ডু

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হুগলি জেলার সাহিত্য সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে মুখ্য এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র হ'ল বাংলা সাময়িক পত্রের আবির্ভাব ও শ্রীবৃদ্ধির আনুপূর্বিক আলোচনা। যদিও বিদেশাগত মিশনারিদের আন্তান্তিক প্রচেষ্টায় এর গোড়াপত্তন, শিক্ষিত বাঙালী সমাজ কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাকে মাতৃভাষাজ্ঞানে এর উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হন। সেই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে যার অঙ্কুর নির্গত হল সংবাদপত্ররূপে, পরবর্তীকালে তাই-ই সাময়িকপত্রে রূপ পরিগ্রহ করল। আর এই অগ্রগতির ইতিহাস যেমনই বিস্ময়কর তেমনই দ্রুতগামী পটপরিবর্তনের ধ্রুব নির্দেশক। বাঙালীর কাব্যমণ্ডিত পরিবেশে গদ্যের যুক্তিবাদীমন সহজেই আপন স্থান করে নিল; বিদ্রোহে নয়, বঙ্গভাষাভাষীর নিশ্চিত আগ্রহজনিত চেতনার পুষ্টি সাধনে। এই সম্মিলনের ফলে বাঙালীর ভাষায় স্নিগ্ধতার সঙ্গে বীর্য, সরসতার সঙ্গে ঋজুতাও এল এবং একথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি বলা হয় যে বাংলাভাষাকে এই নূতন পথে নিয়ে যেতে সাময়িক পত্রের অবদান গৌণ তো নয়ই বরং ভগীরথের সুমহান কৃত্যের সমতুল।

আবার ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় জানা যায় সাময়িক পত্রের প্রথম প্রকাশের পিছনে তাগিদ ছিল সংবাদ সংগ্রহের ও সংবাদ পরিবেশনের। একেই সম্ভবত যুগসন্ধিক্ষণ আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হবে না। তৎকালীন বাঙালী সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের মানুষ তার অভ্যস্ত জড়তা, কূপমণ্ডুকতা ও পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি পেয়ে মনন-চিন্তনের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা, তীক্ষ্ণতা ও গতি অর্জনে প্রয়াসী হয়ে উঠতে চাইছে অন্যদিকে বাংলার পুরাতন গ্রাম সমাজ ক্লাইভ-মীরজাফরের আমল থেকে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে প্রায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ তখন পৈত্রিক ভিটেমাটি ছেড়ে নূতন নাগরিক সমাজ গড়বার উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে অর্থাৎ নাগরিক বাংলার মানস - জীবনে এক বিশেষ ধরণের ব্যক্তিত্বের উদ্ভব ঘটতে চলেছে যার অভিঘাত অদূর ভবিষ্যতে হয়ে ওঠে সুদূর প্রসারী। একদিকে দেশের নাগরিকস্তরে উচ্চশ্রেণীর ও আভিজাত্যবোধের গোড়াপত্তন, অন্যদিকে আধুনিক বিত্তকেন্দ্রিক সমাজে একধরণের অনুভূমিক গতিবৃদ্ধির দরুণ মানুষ আঘাত প্রাপ্ত এমন কি দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সমাজ হয়ে উঠেছে ঘটনাবহুল, জড়ত্ব, আলস্য স্তিমিত হতে চলেছে, জীবনধারা হয়ে উঠছে নিত্য পরিবর্তনশীল ও রোমাঞ্চকর। এই পরিবর্তনের হাওয়ার খবর রাখতেই প্রবর্তিত হল সাময়িক পত্র বা সংবাদপত্রের — আর এখানেই হুগলির অবদান হয়ে রইল চির ভাস্বর। অন্য অর্থে বলা যায় সাময়িক পত্র বা সংবাদপত্রের আদর্শ সূতিকাগার আমাদের প্রিয় এই হুগলি জেলা। বাংলার অনেক মনস্বীতার চারণভূমি হুগলি জেলা সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দের বিখ্যাত উক্তি — "সমগ্রভারতের হৃদয়ভূমি বঙ্গদেশ ... বাংলার হৃদয় স্পন্দিত হয় হুগলী জেলায়" বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক মন্তব্য : "আধুনিক বাংলাদেশের

জন্ম হয় সেদিন যেদিন মুদ্রণযন্ত্র আবির্ভূত হল হুগলীর শ্রীরামপুরে ও কলকাতায়। আর বাঙালির নবজন্ম ও দ্বিজত্ব লাভ হল সেদিন যেদিন সাময়িক পত্র প্রকাশিত হল, প্রথমে ইংরেজিতে, পরে বাংলাতে।"

(রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য)

'বাংলা সাময়িক পত্র' গ্রন্থের সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন : "বাংলা সাহিত্যের প্রসারের সহিত বাংলা সাময়িক-পত্রের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; ১২২৫ সালে (ইং ১৮১৮) প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।"

সাধারণভাবে যদি বিগত একশত তিরাশি - চুরাশি বৎসরের সাময়িক পত্রের ইতিহাস আলোচনা করা যায় তবে একটি সুষম ক্রমবিন্যাস লক্ষিত হয়। যে যে বিষয় পর পর সাময়িকপত্রের মধ্য দিয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে তার একটি ক্রম নিম্নে বর্ণিত স্তরের অনুরূপ :

ক. সংবাদ, খ. জ্ঞানচর্চা, গ. ধর্ম ও শাস্ত্রচর্চা, ঘ. শিক্ষা, ঙ. সমালোচনা, চ. কবিতা, ছ. সৃজনশীল সাহিত্য, জ. কবিতা শিল্প ও সঙ্গীত বা বিনোদন বিষয়ে একক পত্রিকা।

১৮১৮ সাল থেকে প্রথম পর্বের সংবাদ ও সংবাদ সাময়িকীতে মূলত দেশীয়শাসন ব্যবস্থা, যুদ্ধ বিবরণ, ব্রিটিশ শাসকদের নানা মনোরঞ্জন প্রজাপালনোপযোগী কাহিনী, শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি তথ্যে প্রবন্ধাদি ও সাহিত্য - আলোচনার সূত্রপাত হল। তৃতীয় পর্যায়ে বিগত বিংশ শতাব্দীতে এসে মূলত সাহিত্যচর্চার আঙ্গিক প্রস্তুতির পর সাময়িক পত্রের আদর্শ কেন্দ্রীভূত হয়।

জ্ঞানচর্চার মধ্যে দেখা গেছে বিজ্ঞান, কৃষি বিষয়ক আলোচনা, দূরবীক্ষণিকা, মনতত্ত্ব (মনস্তত্ত্ব নয়), সারসংগ্রহ, চিকিৎসাবিদ্যা, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি; ধর্ম আলোচনায় প্রথম দিকে খ্রিস্টিয়, মধ্যপর্বে ব্রাহ্ম ও পরবর্তীকালে হিন্দু রক্ষণশীলতা সাময়িক পত্রের প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে। এ ছাড়া বিবিধ বিষয়ার্থক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়, কবিতা-যুদ্ধও একটি বিশেষ স্থান লাভ করে; আবার পঞ্চাবলী, পক্ষির বিবরণ - এই সকল পত্রিকার মধ্যে তৎকালীন জনমানসের বিভিন্ন রুচি ও মানসিক উৎকর্ষের নিদর্শনও মেলে।

যাক্ সে সব কথা। এখন মূল প্রসঙ্গে আসা যাক্।

শহর কলকাতার জন্মের অনেক আগে থেকেই হুগলি জেলা ছিল বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও হুগলি জেলার নামটি প্রথম উঠে আসে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হ্যালহেড ইংরাজী ভাষায় 'A Grammar of the Bengal Language' নামে যে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন তাতে মুদ্রিত বাংলা হরফের নিদর্শন প্রথম বাংলা মুদ্রিত সামগ্রী বলে চিহ্নিত। এটি ছাপা হয়েছিল হুগলি থেকে। যে পঞ্চানন কর্মকার প্রথম ছেনি কেটে বাংলা হরফ নির্মাণ করেছিলেন তিনিও হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়ার লোক। আবার প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্সী রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত' ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে ছাপা হয়।

বর্তমান আলোচ্য বিষয় যেহেতু হুগলি জেলার পত্র-পত্রিকা, সুতরাং পূর্বেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই রচনার সীমিত পরিসরের মধ্যে জেলার পত্র-পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত রচনা সম্ভব নয়। এখানে জেলার পত্র-পত্রিকার একটি রূপরেখা, চরিত্র এবং ব্যাপ্তির কথাই মাত্র তুলে ধরা হল। ইতিমধ্যে জেলা থেকে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা দু'হাজার ছাড়িয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই অনেক পত্র-পত্রিকার নাম অনুল্লেখের তালিকায় থেকে যাবে, অর্থাৎ তালিকাটিকে কোনমতেই সম্পূর্ণ বলা যাবে না।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি ব্যাপটিস্ট মিশনারি উইলিয়াম কেরীর প্রচেষ্টায় 'শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট

মিশন' প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সেখানে স্থাপন হ'ল 'ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস'। তারপর থেকেই মুদ্রণজগতে এল বিপ্লব এবং হুগলি জেলায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ঢেউ। এই মিশন প্রেস থেকেই প্রথম বাংলা সাময়িক মাসিক পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন' আত্মপ্রকাশ করে মিশনারিগণের উদ্যোগে এবং জন ক্লার্ক মার্শম্যান -এর নেতৃত্বে। দামি বিদেশী কাগজে দেশীয় অক্ষরে ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির মূল্য ছিল আট আনা। শিক্ষিতের হার অত্যন্ত কম থাকায় পত্রিকাটি বেশি দিন চলে নি। মাত্র ২৬টি সংখ্যা প্রকাশ পাবার পর ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বাঙালীর মনে সেদিন যে দীপশিখাটি জ্বলে উঠেছিল তা আজও অনির্বাণ।

এতদিন জানা ছিল যে, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ২৩শে মে বাংলার ১২২৫ সালের ১০ জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ'-ই বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত মুদ্রিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। কিন্তু পরে জানা গেছে প্রথম বাংলা সংবাদ পত্রটি প্রকাশিত হয় 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের কয়েকদিন আগে ১৫ই মে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ১৪৫ নম্বর চোরাবাগান স্ট্রিট থেকে রাজা রামমোহন রায়ের ভাই হরচন্দ্র রায় ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'বেঙ্গল গেজেট' বাঙালী মালিকানায় প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। অবশ্য দু'জনই ছিলেন হুগলি জেলার সন্তান। যদিও এর আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র তিনমাস। 'বেঙ্গল গেজেট'র কোন সংখ্যাই পাওয়া যায় না।

'সমাচার দর্পণ' ছিল চার পৃষ্ঠার কাগজ। মূল্য ছিল ছয় আনা। প্রথম তিন মাস বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে থেকে শ্রীরামপুর মিশনারিরা গভর্নমেন্টের অর্থানুকূল্যে 'আখবার ঈ-শ্রীরামপুর' নামে সমাচার দর্পণের ফার্সী সংস্করণও প্রকাশ করতে লাগলেন। ১৮২৯-এর ১২ জুলাই থেকে সমাচার দর্পণের ইংরাজী সংস্করণও প্রকাশিত হতে থাকল। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাপ্তাহিকের পরিবর্তে সপ্তাহে দু'বার - বুধ ও শনি প্রকাশিত হতে থাকল। নানা কারণে ১৮৩৪ -এর ৮ নভেম্বর থেকে আবার সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। মার্শম্যান সম্পাদিত 'সমাচার দর্পণ' -এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর। ইতিমধ্যে মার্শম্যান 'Friend of India' এবং 'গভর্নমেন্ট গেজেট' নামে আরো দু'খানি পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। এই 'Friend of India' থেকেই আমরা সে যুগের বহু পত্র-পত্রিকার উত্থান পতনের খবরাখবর পেয়ে যাই।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'সমাচার দর্পণ' শ্রীরামপুর মিশনারিদের কাছ থেকে হাতবদল হয়ে চলে যায় — 'জ্ঞান দীপিকা' সম্পাদক ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। তখন এটি প্রকাশিত হতে থাকে বাংলা-ইংরাজী দ্বিভাষিক রূপে। ১৮৪৩ -এর জানুয়ারির পর মনে হয় এর আর কোন সংখ্যা প্রকাশ হয় নি; কারণ সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় নি।

এরপর পুনরায় শ্রীরামপুর মিশনের তত্ত্বাবধানে ১৮৫১-র ৩রা মে থেকে তৃতীয় পর্যায়ে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ পেতে থাকে। পরে ১৮৫৩ -তে এটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

'দিগ্‌দর্শন' এবং 'সমাচার দর্পণ' বন্ধ হয়ে গেলেও এই দুটি পত্রিকা উনিশ শতককে আলোকিত, উজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত করে যায়। এরই আলোকে শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, চন্দননগর, উত্তরপাড়া এমন কি হুগলির প্রত্যন্ত গ্রামীণ জীবনেও সাড়া পড়ে যায়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হতে থাকে নানা ধরণের পত্র-পত্রিকা। উনবিংশ এবং বিংশ শতকে এরই ঢেউ আছড়ে পড়ল প্রায় সমগ্র বঙ্গে। শয়ে শয়ে নানা পত্র-পত্রিকায় ভরে গেল বাংলাদেশ। হাজারে হাজারে বাঙালী বুদ্ধিজীবী লেখকের আবির্ভাব ঘটল। জ্ঞানত বা অজ্ঞানতই হোক মিশনারিরা আমাদের এই প্রাণের প্রদীপকে জ্বালিয়ে বাংলার নবজাগরণের ঋত্বিক হয়ে রইলেন। নিঃসন্দেহে এর নেপথ্য নায়ক উইলিয়ম কেরী।

এবার দেখা যাক্ উনিশ শতকে পর পর কেমনভাবে কোথা থেকে কি ধরণের পত্র-পত্রিকা ছড়িয়ে

পড়ল সারা হুগলি জেলায় এবং হুগলি হয়ে উঠল জ্ঞান ভাণ্ডারের সোনার খনি। দিগ্‌দর্শন এবং সমাচার দর্পণ এর পর দেখা যাচ্ছে ১৮১৯ -এ শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট অক্সিলিয়ারী মিশনারি সোসাইটি থেকে প্রকাশ পেল মাসিক 'গস্‌পেল ম্যাগাজিন'। ১৮২২ -এ বের হ'ল মাসিক 'খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধি'। ১৮৪০ এ মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশ পেল 'গভর্নমেন্ট গেজেট' নামে এক সাপ্তাহিক এবং জে. রবিনসনের সম্পাদনায় মাসিক 'মঙ্গলোপাখ্যান পত্র' প্রকাশ পায় ১৮৪৩-এ। ১৮৫০ থেকে দেখা গেল শুধু শ্রীরামপুর নয়, তার আশপাশ থেকেও নানা পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে।

১৮৫০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত হুগলি জেলা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার তালিকা নিম্নে দেওয়া হ'ল এইভাবে — প্রথমে পত্রিকার নাম ও প্রকাশকাল পরে প্রকাশস্থান ও সম্পাদকের নাম।

১৮৫০		
ধর্মমর্ম প্রকাশিকা (মাসিক)	কোন্নগর	গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সত্যপ্রদীপ (সাপ্তাহিক)	শ্রীরামপুর	মেরিডিথ টৌসেন্ড
১৮৫২		
জ্ঞানারুণোদয় (মাসিক)	শ্রীরামপুর	কালিদাস মৈত্র ও যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়
সংবাদ শশধর (সাপ্তাহিক)	শ্রীরামপুর	কালিদাস মৈত্র
বিদ্যারত্ন (মাসিক)	শ্রীরামপুর	তারাপদ শিকদার
১৮৫৬		
উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা (পাক্ষিক)	উত্তরপাড়া	বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
১৮৫৭		
বিজ্ঞানমিহিরোদয় (মাসিক)	শ্রীরামপুর	নারায়ণ চট্টোরাজ গুণনিধি
১৮৫৮		
সুরোধিনী (পাক্ষিক)	চুঁচুড়া	রামচন্দ্র দীক্ষিত
১৮৬৩		
আয়ুর্বেদ পত্রিকা (সাপ্তাহিক)	বংশবাটি	দ্বারকানাথ দাস
১৮৬৪		
শিক্ষা দর্পণ ও সংবাদসার (মাসিক)	হুগলি	ভূদেব মুখোপাধ্যায়
১৮৬৮		
পল্লীগ্রাম বার্তাবহ (পাক্ষিক)	বৈদ্যবাটী	
উত্তরপাড়া মাসিক পত্রিকা (মাসিক)	উত্তরপাড়া	রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়
১৮৬৯		
হিন্দু হিতাকাঙ্খিনী (মাসিক)	জিরাট	(হিন্দু হিতৈষিণী সভার মুখপত্র)
১৮৭১		
চিকিৎসা দর্শন (মাসিক)	চুঁচুড়া	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
চুঁচুড়া প্রকাশিকা (মাসিক)	চুঁচুড়া	

১৮৭৩		
সর্ব্বার্থ সংগ্রহ (মাসিক)	শ্রীরামপুর	অতুলনাথ তর্কবাগীশ ও কালীবর বেদান্তবাগীশ
সাধারণী (সাপ্তাহিক)	চুঁচুড়া	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
ভারত দর্পণ ও পুলিশ বার্তাবহ (পাক্ষিক)	চুঁচুড়া	
সমাজ দর্পণ (পাক্ষিক)	চন্দননগর	
চন্দননগর পত্রিকা (মাসিক)	চন্দননগর	
নবসঙ্ঘ (পাক্ষিক)	চন্দননগর	মতিলাল রায়
১৮৭৪		
আজীবন নেহার (মাসিক)	চুঁচুড়া	মীর মশারফ হোসেন
সাহিত্য কুসুম (মাসিক)	হুগলি	বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়
কুমুদিনী (মাসিক)	চুঁচুড়া	হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ (মাসিক)	চুঁচুড়া	সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বরদাকান্ত মিত্র।
১৮৭৫		
বিবিধ বার্ত্তা প্রকাশিকা (পাক্ষিক)	চাতরা	অভিলাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৮৭৬		
চুম্বক নজীর (মাসিক)	শ্রীরামপুর	
পঞ্চানন্দ (মাসিক)	চুঁচুড়া	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৮০		
লে পেতি বেঙ্গলী (সাপ্তাহিক)	চন্দননগর	চার্লস দুমেন
১৮৮১		
বেঙ্গল মিসলেনি (মাসিক)	বুড়োশিবতলা	জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৮৮২		
প্রজাবন্ধু (সাপ্তাহিক)	গোন্দলপাড়া	তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গবন্ধু (মাসিক)	শ্রীরামপুর	রামচন্দ্র রায়
মুকুল মাল (মাসিক)	চন্দননগর	কেদারনাথ ঘোষাল
১৮৮৩		
দৈনিক বার্ত্তা (দৈনিক)	হুগলি	গিরীন্দ্র লাল চৌধুরী
১৮৮৪		
বয়স্য (মাসিক)	চুঁচুড়া	বিপিনবিহারী দত্ত
১৮৮৫		
দি রিভার (সাপ্তাহিক)	চন্দননগর	বিহারীলাল সাহা

১৮৮৬		
ধূমকেতু (সাপ্তাহিক)	চন্দননগর	শিবকৃষ্ণ মিত্র
১৮৮৭		
অ্যামেচার ওয়ার্কশপ (সাপ্তাহিক)	চন্দননগর	এ. টি. সেন
১৮৮৮		
ভারত সঞ্জীবন (মাসিক)	হুগলি	ভূপতিনাথ দাস
১৮৮৯		
সবিতা (মাসিক)	উত্তরপাড়া	যোগীন্দ্রনারায়ণ সিংহ
রুচি (মাসিক)	শ্রীরামপুর	অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়
শিশুবান্ধব (মাসিক)	শ্রীরামপুর	জি. এইচ. রুজ
ত্রাণোদয় (খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক পাক্ষিক)	শ্রীরামপুর	অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়
১৮৯১		
হিতসাধিনী (মাসিক)	চন্দননগর	নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বঙ্গপ্রভা (মাসিক)	চন্দননগর	বিপিনবিহারী কোলে
১৮৯২		
বিবিধ বার্তা প্রকাশিকা (পাক্ষিক)	শ্রীরামপুর	অভিলাষ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চন্দননগর প্রকাশ (সাপ্তাহিক)	চন্দননগর	নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৮৯৩		
পূর্ণিমা (মাসিক)	বাঁশবেড়িয়া (হুগলিতে মুদ্রিত)	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
চুঁচুড়া বার্তাবহ (সাপ্তাহিক)	চুঁচুড়া	দীননাথ মুখোপাধ্যায়
পুরোহিত (মাসিক)	হুগলি	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
১৮৯৪		
বাসনা (মাসিক)	চুঁচুড়া	চুঁচুড়া বাসনা সমিতি প্রকাশিত
জ্যোৎস্না হার (মাসিক)	চুঁচুড়া	সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়
দর্শন (সাপ্তাহিক)		
১৮৯৬		
স্নেহময়ী (মাসিক)	শ্রীরামপুর	উইলিয়ম কেরী
সনাতন ধর্মকথা (মাসিক)	চুঁচুড়া	দুর্গাদাস রায়
১৮৯৭		
হরিভক্ত বঙ্গিনী (মাসিক)	বালী, হুগলি	প্রসন্ন কুমার শাস্ত্রী
সনাতন ধর্মকথা (মাসিক)	চুঁচুড়া	দুর্গাদাস রায়
১৮৯৮		
শিক্ষা (মাসিক)	হোয়েরা	বনমালী চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানী (মাসিক)	চুঁচুড়া	প্রসাদদাস গঙ্গোপাধ্যায়
প্রতিমা (মাসিক)	হুগলি	রামচরণ বসু

১৯০০
বঙ্গীয় রহস্য পত্রিকা (মাসিক)　　　　বদনগঞ্জ　　　　হেমগিরি চন্দ্র (প্রকাশক)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত দুটি পত্রিকার ব্যাপক প্রচার লক্ষ্য করা যায়। একটি চুঁচুড়ার 'বার্ত্তাবহ' আরেকটি বাঁশবেড়িয়ার 'পূর্ণিমা'। দুটি পত্রিকাই ১৩০০ বঙ্গাব্দ থেকে যাত্রাশুরু। প্রথমটি চুঁচুড়ার দীননাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর ভ্রাতারা পরপর সম্পাদনা করেন। শেষ সম্পাদক ছিলেন বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়। পত্রিকাটি শতবর্ষের দোরগোড়ায় এসে আর্থিক কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকায় সাহিত্য, সংবাদ, নিলাম, ইস্তেহার ও অন্যান্য অনেক সংবাদ থাকত। এর পৃষ্ঠায় জেলার অনেক লুপ্তপ্রায় ইতিহাস গ্রথিত আছে। 'পূর্ণিমা' সাহিত্য পত্রিকাটি হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এবং কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হতে থাকে প্রতি পূর্ণিমায়। ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর পর এটির সম্পাদনার দায়িত্ব নেন কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়। এখানে জেলা এবং জেলার বাইরের প্রায় সব লেখকরাই লিখেছেন। এই পত্রিকাটি ১৮ বছর ধরে চলে। এখানেই প্রথম শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত'র কিছুটা প্রকাশিত হয়।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'শ্রীরামপুর' নামে পাক্ষিক (পরে সাপ্তাহিক) সাহিত্য পত্রিকায় শ্রীরামপুরের বহু প্রাচীন ইতিহাস প্রকাশ পায়। এটি প্রথম সম্পাদনা করেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার পরে বসন্ত কুমার বসু। পরিচালকগণের মধ্যে ছিলেন ফনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ১৯২০তে 'শ্রীরামপুর ও আরামবাগ সম্মিলনী' নামে একটি সাহিত্য সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়ে ৫ বছর চলে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ১৫ আগস্ট অতুল্য ঘোষ 'পত্র' নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। সম্পাদক ছিলেন শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় 'নির্মোক' নামে আরও একটি সাপ্তাহিক দেখা যায়। চুঁচুড়ার নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্পণ' (সাপ্তাহিক) এবং 'শিল্প ও সাহিত্য' (মাসিক) যথাক্রমে ১৩১২ এবং ১৩১৬ থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ -এ প্রকাশ পায় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'মিতা' এবং ১৩৪০ -এ ব্রজবল্লভ রায় ও সুবোধ রায় -এর সম্পাদনায় চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত হয় 'সমাচার'।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলি হ'ল —

চন্দননগর থেকে : ১৯০১ ডা. গগনচাঁদ নন্দীর 'স্বাস্থ্য সখা', ১৯০৮ সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'মাতৃভূমি', ১৯১৫ থেকে 'প্রবর্তক';এর পর পর সম্পাদকগণ হলেন - মনীন্দ্রনাথ নায়েক, মতিলাল রায়, অরুণচন্দ্র দত্ত ও রাধারমণ চৌধুরী, ১৯২০তে সাপ্তাহিক 'নবরত্ন' — সম্পাদনায় অরুণচন্দ্র দত্ত। তারপর ১৯২১ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে — 'তরুণ ভারত', 'স্বাস্থ্য সেবক', 'পঞ্চপ্রদীপ', 'দর্পণ', 'প্রজাশক্তি', 'সাজি', 'স্বাধীনতা', 'চন্দননগর' ও 'সমাচার' প্রভৃতি। **উত্তরপাড়া - ভদ্রকালী থেকে** : ১৯৩০-এ 'তরুণ', ১৯৩৬ - এ 'আমাদের কথা', ১৯৪১ -এ অগ্রদূত — সবগুলির পরমায়ু ছিল এক থেকে দেড় বছর। এ ছাড়া বৈদ্যবাটীর 'কেয়া' (১৩৪৭)।

আর একটি পত্রিকার কথা না বললে ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যাবে, সেটি হ'ল খন্যানের স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নির্ভীক নেতা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সান্ধ্য' নামে দৈনিক সংবাদপত্র। বলা বাহুল্য জনমানসে স্বাদেশিকতা প্রচারই ছিল এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য।

স্বাধীনতা লাভের পর আমরা জীবনের প্রায় সকল বিষয়ে হয়ে গেলাম কলকাতার মুখাপেক্ষী। খুব অল্প দিনের মধ্যেই অবশ্য আমাদের অনেকেরই সম্বিত ফিরে আসে। আবার নতুন করে স্বভূমিতে প্রস্ফুটিত হবার প্রচেষ্টাও শুরু হয়ে যায়। আবার জেলার সর্বত্র পত্র-পত্রিকার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

স্বাধীনোত্তর কালে সম্পাদকদের মানসিকতা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যেতে দেখা গেল। একদল শপথ নিলেন — নতুন ভাবে দেশ গড়তে হবে, দেশীয় সাহিত্য সংস্কৃতির বনিয়াদ শক্ত করে তৈরি করতে হবে। সেই মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে তাকিয়ে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে লাগলেন। আর একদল সম্পাদক সচেষ্ট হলেন - নিজেকে এবং নিজ গোষ্ঠীভুক্ত কবি-লেখকদের প্রচারের আলোকে এনে কিভাবে রাতারাতি নাম করা যায় তার বাতাবরণ তৈরিতে। এর সঙ্গে অবশ্য যুক্ত হ'ল নতুন নতুন চিন্তাভাবনা। নতুন আঙ্গিকে জনমানসে সাহিত্যকে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা। সে দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর ৫০ -এর দশক থেকে ৮০ -র দশক পর্যন্ত নানা ভাঙচুরের মধ্যে সাহিত্য যেমন এগিয়েছে, তেমনি বিভিন্ন ধরণের পত্র-পত্রিকায় দেশ ভরে গেছে। আমাদের জেলাও কোনভাবে পিছিয়ে থাকে নি। কিন্তু অনেক পত্রিকা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মলাভ করে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবার পর পত্রিকাও বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য হুগলি জেলায় ৩৫/৪০ বৎসর সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে এমন পত্রিকাও কয়েকটি রয়েছে তাদের কথায় শেষে আসছি।

স্বাধীনতার পর জেলার কোন কোন পত্রিকা কি ভূমিকা পালন করেছে বা পালন করে চলেছে তার পর্যালোচনা পরবর্তী প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। এক সময় 'শীর্ষবিন্দু' পত্রিকাটি শ্রীরামপুরের সাহিত্য সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করত। একে আবর্তন করে যাঁরা লেখালেখি শুরু করেন তারা এখন অনেকেই প্রতিষ্ঠিত। মৃদুল দাশগুপ্ত এক সময় প্রকাশ করেন 'বাইসন'। আমরা পেয়েছি 'ছোটদের কাগজ', 'বন্ধু', 'যুবস্বপ্ন', 'পল্লব', 'দৃষ্টি', রামকিশোর ভট্টাচার্যের 'ত্রিবেণী', 'মউল', কৃষ্ণচন্দ্র ভড়ের 'শিশুপ্রিয়', 'ঐকতান', 'সারথী', 'অভিজ্ঞান', 'রক্তিমা' প্রভৃতি। 'অভিনব অগ্রণী' হাওড়া জেলার পত্রিকা হলেও সম্পাদকীয় দপ্তর শ্রীরামপুরে।

শেওড়াফুলি থেকে : 'কেয়া', 'ক্যাক্টাস', 'সংবর্ত'। **উত্তরপাড়ার** : 'চিকন', 'লেখা', 'লিটল ম্যাগাজিন', 'মহুয়া', 'চেতনা'। **হিন্দমোটরের** : 'অনির্বাণ', 'কবি', 'প্রগতি', 'সহবাস', 'দুরুণ'। **কোন্নগর থেকে** : 'দর্পণ', 'গদ্যপদ্য', 'উন্মেষ', 'কৃষ্ণনীপ', 'বন্দনা'। **বৈদ্যবাটীর** : 'সেই-সন্দীপন', 'শাব্দিক', 'শতরূপা'। **ভদ্রেশ্বরের** : 'শব্দস্রোত', 'শব্দবর্ণ', 'সৈকত'। **চন্দননগরের** : 'গোধূলিমন', 'লেখনী', 'ভুবন', 'কুঁড়ি', 'ঝর্ণা' 'দূর্বা', 'স্বতন্ত্র জোয়ার', 'দ্বন্দশুক', 'সেবা', 'নব জাগরণী', 'সংসপ্তক', 'অনিকেত', 'দাহপত্র' প্রভৃতি। **হুগলি - চুঁচুড়ার** : 'কোরক', 'সায়ক', 'সংকেত', 'সংকেতে অনুভূতির সেতু', 'কুঁড়ি কোড়ক', 'ভ্রমণবার্তা', 'মন কলম' প্রভৃতি।

১৯৫৩তে সুনীল বসুর ত্রৈমাসিক 'নতুন পাথেয়' -তে অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ' কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবার পরই পত্রিকাটির গুরুত্ব প্রাপ্তি ঘটে। **ব্যান্ডেলের** : 'মন মধুকর', **সাহাগঞ্জের** : 'চিন্তাভাবনা', **দেবানন্দপুরের** : 'পাণ্ডুলিপি', **খন্যানের** : 'মেঠো দর্শন'। **বাঁশবেড়িয়া পৌরাঞ্চলের** : 'সাহিত্য-সেতু', 'দেহলী', 'ঐশ্বর্য', 'গ্রন্থিক', 'চিত্রধ্বনি', 'সোপান', 'দিবাকর', 'নব জাগরণ' 'ধূমকেতু', 'অর্ণব', 'ঝংকার', 'পাড়ি', 'কোয়েল', 'আজকের সাহিত্য', 'সাবর্ণ'। **সিঙ্গুরের** : 'দ্রাঘিমা - ৮০', 'দীপ্তি', 'সবুজ সংকেত'। **নালিকুলের** : 'উন্মেষ', 'প্রতীতি'। **হরিপালের** : 'উর্মি', 'যুগসন্ধানী', 'প্রয়াস'। **বলরামবাটির** : 'কালের যাত্রার ধ্বনি', 'যুব অভিযান'। **বেলমুড়ির** : 'প্রাতিস্বিক'। **ধনিয়াখালির** : 'অঙ্গীকার', 'লিপিকা', 'তাঁতঘর'। **শিয়াখালার** : 'পথের দাবি'। **আরামবাগ মহকুমার** : 'আলিঙ্গন', 'রাণীরঞ্জন', 'দিশারী', 'সোনালী রোদ', 'রূপসী ধরিত্রী', 'বাংলার মুখ' ইত্যাদি।

এই হল স্বাধীনতা উত্তর কালের উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা। এরমধ্যে যুক্ত হয় নি সংবাদপত্র প্রকাশনার তালিকা। তারাও অবশ্য পুজো বা অন্য বিশেষ পর্ব উপলক্ষ্যে দু'একটি সাহিত্য সংখ্যাও প্রকাশ করে থাকে।

উপরোক্ত তালিকা থেকে জানা যায়, হুগলি জেলায় শহর ও প্রত্যন্ত গ্রামেও সাহিত্য পত্রিকা জন্মাবার পরিবেশ কতটা অনুকূল। কিন্তু সঠিকভাবে লালন-পালন ও সম্যক পুষ্টি সাধন করে বাঁচিয়ে রাখার মানসিকতা নেই পরিচালক বর্গের। অথবা বলা যায় দীর্ঘকাল পত্রিকা চালানোর সক্ষমতা ও রসদের যোগান ক্রমাগত ক্ষীয়মান। তাই উপরোক্ত অনেক পত্রিকাকে আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু তাঁরা যে কাজ করে গেছেন তা একত্রিত করতে পারলে হুগলি জেলার সমৃদ্ধ অথচ অজানা অনেক ইতিহাসই পুনরাবিষ্কারের সম্ভাবনা বিদ্যমান।

সত্তর দশক থেকে হুগলির পত্র-পত্রিকা গুলির আঙ্গিক, অবয়ব এবং বিষয় বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রভূত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কেউ শুধু সাহিত্য নিয়ে, কেউ ভ্রমণ, কেউ বা কেবল চাষবাস, পোলট্রি, বিজ্ঞান, খেলা, সিনেমা, বিনোদন, শিশু সাহিত্য, শুধু কবিতা, শুধু গল্প নিয়ে সংখ্যা। আর এখন একটি উচ্চমানের মানসিকতাপুষ্ট উদ্যোগপর্ব দেখা গেল — বিষয় ভিত্তিক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের। এটির প্রথম পথ প্রদর্শক বাঁশবেড়িয়ার 'সাহিত্য-সেতু'। তাদের 'কলকাতা সংখ্যা'র অভূতপূর্ব সাফল্য পশ্চিমবঙ্গের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এবার হুগলি জেলায় সাম্প্রতিককালে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা সুদীর্ঘ কাল নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে জেলার সাহিত্য সংস্কৃতির উর্বর ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে চলেছে এবং সাহিত্যের উন্নয়নী বাতাবরণ তৈরিতে সক্ষম হয়েছে তাদের কথায় আসা যাক।

প্রথমেই আসি শ্রীরামপুরের 'ঐকতান' পত্রিকার কথায়। অমিয় গোস্বামীর সম্পাদনায় দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চলছে। অনেক তরুণদের প্রথম লেখা এখানেই প্রকাশিত হয়। শুধু সাহিত্যের জন্য সাহিত্য করে চলেছে চন্দননগরের 'গোধূলিমন'-এর সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাটি চলছে ৪৪ বছর ধরে। পত্রিকাটি আগে ছিল মাসিক এখন ত্রৈমাসিক। দেশের নানা স্থান থেকে নতুন নতুন প্রতিভাকে তুলে এনে সম্পাদক তাঁদের সুযোগ দিয়ে চলেছেন। এখানে এমন কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ - নিবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে যার জন্য জেলার সাহিত্যপ্রেমীরা গর্ববোধ করতে পারেন। এরা কয়েকটি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করেছেন। অশোক চট্টোপাধ্যায় মাঝে মাঝে সাহিত্য বাসর করে সাহিত্যকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে চলেছেন নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে। বছরে একবার হলেও চন্দননগরের 'গল্পমেলা' সংকলন প্রকাশ পেয়ে থাকে। এর সম্পাদক গল্পকার গৌর বৈরাগী। প্রতিমাসে এখনও গল্প মেলার আসর নিয়মিত বসিয়ে থাকেন জেলায় বাংলাগল্পের পরিমণ্ডল গড়ার জন্য। এবং বছরে একবার বার্ষিক গল্পমেলায় গল্প লেখকদের পুরস্কৃত করে সম্মান জ্ঞাপন করেন। 'সেই-সন্দীপন' সম্পাদক বৈদ্যবাটীর কাশীনাথ ঘোষও গোধূলিমন এর মতই কাজ করে চলেছেন আজ ৩৪ বছরের উপর। এঁরা প্রতি বছর ১৫ আগস্ট এক সাহিত্য সভা আহ্বান করে বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও সম্পাদকদের সম্মানিত করে থাকেন। হরিপালের কবি ও কথাকার দীপালি দে সরকার একক প্রচেষ্টায় প্রায় ২৮ বছর ধরে প্রকাশ করে আসছেন 'উর্মি' নামে এক সাহিত্য ত্রৈমাসিক। এঁরা কয়েকটি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করেছেন। চন্দননগরের 'দাহপত্র' - জেলার একটি স্মার্ট পত্রিকা। যদিও খুব বেশি দিনের নয় তবে লেখার মান এবং সম্পাদনা বেশ উচ্চমানের। 'নীল সুষমা' গত দু'বছর যাবৎ শ্রীরামপুরের লিটল ম্যাগাজিন মেলা করে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে জেলায়। পাণ্ডুয়ার 'চিরাগ' পত্রিকাটি ক্রমশ অগ্রগতির পথে। 'অভিজ্ঞান' শুধু ছোটদের পত্রিকা। কিন্তু এর পরিচালকমণ্ডলী বহু সমাজসেবা এবং সংস্কৃতিমূলক কাজ করে চলেছেন; এই পত্রিকার প্রধান নায়ক শ্রীরামপুরের ডা. অসিত দত্ত। 'সাংস্কৃতিক সমধান' একটি সংগীত ও সংস্কৃতি মূলক পত্রিকা। এইটি সরকারী নিবন্ধ অনুসারে শ্রীরামপুরের পত্রিকা হলেও সব কাজ কর্ম চলে ও প্রকাশ হয় উ: ২৪ পরগনা জেলা থেকে। এই পত্রিকার ভবিষৎ সম্বন্ধেও আমরা

আশাবাদী। এ জেলার পত্রিকা না হয়েও আমাদের জেলায় বসে নিয়মিত তাঁর সম্পাদকীয় দপ্তরে নানা সাহিত্য পাঠের আসরের মাধ্যমে এখানকার মাটিকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন — তিনি হলেন দিলীপ কুমার বাগ 'অভিনব অগ্রণী'র সুযোগ্য সম্পাদক। এ ছাড়া আরো কিছু পত্রিকা এই মুহূর্তে তরতাজা হয়ে নানা আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়ে চলেছে। তারা নতুন পথের দিশারী হয়ে উঠতে পারে। তবে সে সম্পর্কে এখনই কোন মন্তব্যের সময় আসে নি।

সবশেষে এই বিশিষ্ট সাহিত্য সংস্কৃতি বিবরক সংকলনটি সম্পাদনার নেপথ্যে যে পত্রিকা বিগত ৩৬ বছর একাদিক্রমে উন্নত মানের সাহিত্য পত্র নিয়মিত পনের দিন অন্তর প্রকাশ করে চলেছে সেই 'সাহিত্য-সেতু' সম্পর্কে কিছু না বললে জেলার সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃত হবে, তাই 'সাহিত্য-সেতু' সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ করতে চাই — আগামী প্রজন্মের দিকে লক্ষ্য রেখেই। অনেকেরই জানা বাঁশবেড়িয়ার 'সাহিত্য-সেতু' পত্রিকাটি ৩৬ বছর একাদিক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে। আগে ছিল ত্রৈমাসিক, পরে মাসিক, এখন পাক্ষিক। এই পত্রিকা কেবল মাত্র সম্পাদক নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা নয়। এর একটি যৌথ পরিচালকমণ্ডলী আছে। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা বর্তমান এই নিবন্ধ লেখক হলেও প্রথম দিকে সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল অন্যের হাতে। ১৯৮৮ থেকে তাকেই অতিরিক্ত এই গুরু দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে। এই পত্রিকাই এখন জেলার অনেক পত্রিকার পথ প্রদর্শক ও প্রেরণাদাতা। এর ব্যাপ্তি, বৃদ্ধি ও প্রচার এখন জেলা প্রদেশ ছাড়িয়ে সমগ্র ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের বঙ্গ ভাষাভাষী সংস্কৃতি মনস্কদের মধ্যে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। এখন যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের চল দেখা যাচ্ছে সারা পশ্চিমবঙ্গে তার প্রথম পথপ্রদর্শক এই 'সাহিত্য-সেতু'। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৩০০ পৃষ্ঠার সচিত্র 'কলকাতা সংখ্যা' প্রকাশ করে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। তারপর থেকে প্রায় ৫০টির মত বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছে। কেবলমাত্র নিয়মিত সংখ্যা প্রকাশ নয়, জেলার সাহিত্যের এক সুন্দর বাতাবরণ তৈরিতেও এর পরিচালকমণ্ডলী সর্বদা সচেষ্ট। বছরে একবার সারাদিনব্যাপী কবিমেলা ও কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মেলামেশার আসর বসানো আর একটি উল্লেখনীয় মহৎ কাজ। 'সাহিত্য-সেতু পুরস্কার' তো এখন একটি সর্বভারতীয় স্তরের আকর্ষণীয় পুরস্কারের রূপ নিয়েছে।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতার আদলও আমূল পালটে যাচ্ছে। মুদ্রণশিল্পের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্সের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব আর অস্বীকার করা যাবে না। হুগলি জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্র পত্রিকার সংখ্যা বিপুল। কিন্তু পত্রিকার মান, রুচি ও পরিবেশনার শ্রীমণ্ডিত রূপের প্রকাশ এখনও অধরা রয়ে গেছে। উচ্চ মানের পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব এখন আর সম্পাদক বা সম্পাদকমণ্ডলীর একচেটিয়া নয়; প্রকৃত মনন ও চিন্তাশীল পাঠকের সংখ্যাও যে বেড়ে চলছে একথাটি মনে রাখলেই পত্রিকার লেখক-কবি-সমালোচক তথা আধুনিক বুদ্ধিজীবীর দায়িত্বও অপরিসীম সে কথাও মনে রাখা উচিত। আসলে বাংলা ভাষার নবনির্মাণ বা আধুনিকীকরণ স্থিতধী লেখক-পাঠক ও সম্পাদকের ভাবনা ও যৌথ কর্মপরায়ণতার ফসল। আধুনিক প্রজন্মের পাঠকের কাছে সাময়িক পত্রিকা বা লিটল ম্যাগাজিনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো এবং পাঠে আগ্রহী - মনস্ক করে তোলার উপর নির্ভর করছে এর উজ্জ্বল বর্ণময় ভবিষ্যৎ।

হুগলি : প্রাসঙ্গিক পুস্তক তালিকা

পীযূষ কান্তি সিন্‌হা

ইতিহাসে হুগলি জেলা বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির অঙ্গনে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল স্বাধীনতার বহু পূর্বেই। স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রামে হুগলি জেলার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও এই জেলা ধন্য বাংলার নবজাগরণের বহু মনীষীর জন্ম ও কর্মস্থান হিসাবে। এই রকম এক জেলা সম্পর্কিত বই-এর সংখ্যা কম হবার কথা নয়। যেসব বই এই তালিকা ভুক্ত হয়েছে, তাতে হুগলি জেলা সম্পর্কে কিছু না কিছু তথ্য আছে। এই তালিকা তৈরীর সময় কয়েকটি বিষয় বাধ্য হয়ে বাদ দিতে হয়েছে। যেমন জেলা থেকে প্রকাশিত বা জেলার বিষয় নিয়ে লেখা গল্প উপন্যাস, জেলার কবিদের লেখা কাব্যগ্রন্থ এবং জেলার মনীষীদের নিয়ে লেখা অন্য জেলার লেখকদের লেখা পুস্তক। মূলত এই তালিকা তাঁদেরই বেশী প্রয়োজন হবে যাঁরা হুগলি জেলা সম্পর্কে বা এই জেলার কোন বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করতে বা তথ্য সম্পর্কে আগ্রহী। আমি যেহেতু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত সেজন্য একটা বিষয় জানাতে হবে, সেটা হ'ল — যে-পদ্ধতিতে বই-এর তালিকা করা হয়েছে তা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানসম্মত নয়। তবে নির্দিষ্ট বই সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানার থাকলে বা কোন বই বাদ পড়লে সম্পাদকের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার এই কাজকে বাস্তবায়িত করেছে শ্রদ্ধেয় অনিলকুমার দত্ত'র পরামর্শ ও মৃণালকান্তি দত্ত'র সহযোগিতা।

বই		লেখক
১)	অগ্নিযুগের কথা (১৩৫৮)	সতীশ পাকড়াশী
২)	অবজেক্টস অফ অ্যান্টিকোয়ারিয়ান ইন্টারেস্ট ইন বেঙ্গল	-------
৩)	অবজারভেশন অন্ ল' অ্যান্ড কনস্টিটিউশন্ অফ ইন্ডিয়া	-------
৪)	অন দি ব্যাঙ্ক অফ ভাগীরথী	লঙ, জে, এ (১৮৮৭)
৫)	অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব হায়ার এডুকেশন	বসন্ত সামন্ত, সম্পা. (১৯৯১)
৬)	আইন-ই-আকবরী	ব্লোচম্যান, ই

৭)	অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল	হান্টার ডাব্লু ডাব্লু (১৮৯৮)
৮)	আর্লি হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া	স্মিথ. ভি (১৯০৮)
৯)	আউট লাইন হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল	মার্শম্যান
১০)	আরামবাগের ইতিকথা	চুনীলাল বসু (১৯৫৭)
১১)	আমাদের গৌরব	যতীন শীল (১৯৭৭)
১২)	আর্লি ইন্ডিয়ান ইমপ্রিন্টস	ডিহেলে ক্যাথরীন স্মিথ (১৯৬২)
১৩)	আনন্দমঠ ও জাতীয়তাবাদ	জীবন মুখোপাধ্যায় (১৯৮২)
১৪)	আনন্দরাজ পিল্লাই'স ডায়েরী	আনন্দরাজ পিল্লাই
১৫)	আদর্শ চরিত কিম্বা কেরী, ওয়ার্ড	মহেন্দ্ররাজ চৌধুরী (১৯৮০)
১৬)	আউটলাইন অফ্ হিস্ট্রি	ওয়ালস এইচ. জি.
১৭)	আর্লি রেকর্ড অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া	হুইলার
১৮)	আর্লি অ্যানালাস অফ্ দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল, ভলুম ২	উইলসন ডাব্লু (১৮৯৫)
১৯)	আজকের বাজার ভাও	দুর্গাদাস ধর
২০)	আর্লি বেঙ্গলী প্রিন্টিস অন পেপার	এস সি গুহ (১৯৪৫)
২১)	আর্লি ট্রাভেলস্ ইন ইন্ডিয়া	রালফ ফিচ
২২)	আওয়ার ইন্ডিয়ান এম্পায়ার	ম্যাকফেরিয়ান
২৩)	অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ দি ট্রেড ইন হুগলি	....
২৪)	অ্যানালিসিস অফ দি বেঙ্গল ফিনান্স	....
২৫)	আকবরী-ই-কুহাবৎ	মহম্মদ খান নবাব
২৬)	আর্কাইভ পর্তুগীজ স্টেট	চুনহা রিভোরাম
২৭)	আকবর	ভন্ নোহা (১৮৯০)
২৮)	ইন্ডিয়ান ক্যাম্বিয়নস	কেইন ডাব্লু এস
২৯)	ইন্ডিয়া ভেরা	ললিত দে
৩০)	ইন্ডিয়ান শিপিং	অশোক মেহতা (১৯৪৩)
৩১)	ইউরোপিয়ান এজেন্সী হাউস ইন বেঙ্গল	এস বি সিং
৩২)	ইতিহাসের শ্রীরামপুর	শর্মিষ্ঠা ঘোষ
৩৩)	ইকোস ফ্রম ক্যালকাটা	বুসস্টেইড (১৮৯৭)
৩৪)	ইকনমিক কন্ডিশান অফ্ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া	....
৩৫)	ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়েরী	.... (১৯১১)

৩৬)	ইনিশিয়াল কয়েনেজ অফ ইন্ডিয়া	....
৩৭)	ইনস্ক্রিপসন ইন বেঙ্গল	এন মজুমদার
৩৮)	ইন্ডিয়া	মার্শম্যান (১৮৭০)
৩৯)	ইনস্ক্রিপসন অফ বেঙ্গল, ভলুম ৪	সামসুদ্দিন আহমেদ
৪০)	ইতিহাসের আলোকে ব্যান্ডেল কনভেন্ট ও চার্চ	বসন্ত কুমার সামন্ত (১৯৯৭)
৪১)	ইতিহাসে বাঁশবেড়িয়া	বিজয়চন্দ্র কর্মকার (১৩৯৬ ব.)
৪২)	ইউনিয়ন ক্যাটালগ অফ্ বেঙ্গল বুক্স অ্যান্ড পিরিয়ডিক্যাল	অনিল দত্ত ও নির্মল চৌধুরী (১৯৮৬)
৪৩)	ইন্ডিয়া	ন্যাশনাল লাইব্রেরি
৪৪)	ইমপিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া	অক্সফোর্ড (১৯০৮)
৪৫)	ইমপিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া	ট্রাবনার লন্ডন (১৯০৯)
৪৬)	ইন্ডিয়ান ক্যামিয়নস	কেইন ডাব্লু এস
৪৭)	ইন্ডিয়া ভেরা	ললিত দে
৪৮)	উইলিয়ম কেরী অ্যান্ড হিজ অ্যাসোসি-য়েট ইন দি অ্যাওকেনিং অফ বেঙ্গল	সুনীল চট্টোপাধ্যায় (১৯৭৪)
৪৯)	উইলিয়ম কেরী	কেরী, এস পিয়ার্স (১৯৩৪)
৫০)	উইলিয়ম কেরী	সজনী কান্ত দাস (১৩৬৩ ব.)
৫১)	উইলিয়ম কেরী ও সাহিত্য সাধনা	শক্তিব্রত ঘোষ (১৯৯০)
৫২)	উত্তরপাড়া বিবরণ	অবনী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০)
৫৩)	উত্তরপাড়া : কিছু জানা কিছু অজানা	সুকুমার সাহা (১৯৯২)
৫৪)	উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি প্রসঙ্গে	ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় (১৯৬৪)
৫৫)	এ নিউ অ্যাকাউন্ট অফ দি ইস্ট ইন্ডিয়া	হ্যামিলটন, ক্যাপ্টেন (১৭৪৪)
৫৬)	এ শর্ট অ্যাকাউন্ট অফ রাজ	এ. সি. মুখার্জী
৫৭)	এ লেটার ফ্রম হেস্টিংস টু মীর সুলাইমানু খাঁ	....
৫৮)	এ লাইফ অফ হাজী মহম্মদ মহসীন	ইবন-ই-আলাম
৫৯)	এসেস অন্ দি রিলিজিয়ন	উইলসন, ডাব্লু (১৮৭২)
৬০)	অ্যান অ্যাডভ্যান্স হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া	মজুমদার - দত্ত
৬১)	এল এশিয়া পোর্তুগীজ	পেরিয়া, ভি

৬২)	এ স্কেচ অফ দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দি হুগলি	টয়েনবি (১৮৮৮)
৬৩)	একাউন্ট অফ দি ডিস্ট্রিক্ট হুগলি	টয়েনবি (১৮৯০)
৬৪)	এটলাস	ভ্যান ডেন ব্রুকস
৬৫)	এ ভিউ অফ্ দি ইংল্যান্ড গভর্নমেন্ট ইন বেঙ্গল	ভার্সালে
৬৬)	এ বেঙ্গল জমিনদার	নীলমণি মুখার্জী (১৯৭৫)
৬৭)	এ নিউ হিস্ট্রি অফ্ দি ইস্ট ইন্ডিস	আর জে ডটসলে (১৭৫৭)
৬৮)	এ ম্যানুস্ক্রিপ্ট ইন দি ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্ট আর্কাইভস	....
৬৯)	এ ভয়েজ ফ্রম ইংল্যান্ড টু ইন্ডিয়া	ইভস এডওয়ার্ড (১৭৭৩)
৭০)	এ জিয়োগ্রাফিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ্ কানট্রিস রাউন্ড দি বে অফ বেঙ্গল	বাওরে টি (১৯০৫)
৭১)	অ্যানালস অফ্ দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী	ব্রুশ
৭২)	এ শর্ট অ্যাকাউন্ট অফ্ শুভ্রমনি রাজা	এস সি মুখার্জী
৭৩)	এক্সপেরিয়েন্স অফ ফর্মার ফেমিন	গেডেস
৭৪)	এ গ্রামার অফ্ বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ	হ্যালহেড এন. বি
৭৫)	এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া অ্যাজ ডেসক্রাইব বাই মেগাস্থিনিস	ম্যাকবিনডিল জে.ভি
৭৬)	এ নিউ অ্যাকাউন্ট অফ দি ইস্ট ইন্ডিস	হ্যামিলটন
৭৭)	এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ চন্দননগর কলেজ	সীতেশ চন্দ্র বসু (১৯৫৫)
৭৮)	এ রিপোর্ট অন দি এপিডেমিক অফ্ প্লেগ ইন হুগলী - চিনসুরা মিউনিসিপ্যালিটি	ক্রফোর্ড ডি.জি (১৯০৫)
৭৯)	এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ হুগলি ডিস্ট্রিক্ট	ক্রফোর্ড (১৯০২)
৮০)	এ ব্রিফ ভিউ হিস্টরিক্যাল, স্ট্যাটিসটিক্যাল অফ্ দি ফ্রেঞ্চ ইন ইন্ডিয়া	লাউরি ডাব্লু (১৮৪৭)
৮১)	এশিয়াটিক অবজারভার	....
৮২)	এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল	হান্টার ডাব্লু ডাব্লু (১৮৭৬)
৮৩)	ওল্ডম্যাপস্ অফ গ্যাস্টালডি	গ্যাস্টালডি
৮৪)	ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার : হুগলি	অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৭২)

৮৫)	ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পৌরব্যবস্থার ক্রমবিকাশ	মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯১)
৮৬)	কালেকসন অব পেপারস রিলেটিং টু দি হুগলি ইমামবাড়া	.... (১৯১৪)
৮৭)	কবিমানসী : জীবনভাষা	জগদীশ ভট্টাচার্য (১৩৬১ ব.)
৮৮)	কাজী নজরুল	প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
৮৯)	ক্যাপ্টেন জেমস স্টিওয়ার্ড : ফেলিক্স কেরী	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৫৮ ব.)
৯০)	কানাইলাল	মতিলাল রায় (১৩৩০ ব.)
৯১)	কৃতীজন (১,২)	মনীন্দ্রনাথ কুন্ডু (১৯৮৪)
৯২)	কোন্নগরের ইতিহাস	রামকৃষ্ণ সরকার (১৩৮৭ ব.)
৯৩)	কালেকসন অফ ট্রিটিস, এনগেজমেন্ট	আইলচিসন (Ailchison)
৯৪)	কোলোক্কাস ডে ট্রেডাডেসকো	
৯৫)	কন্সারটেস ডে পেজেস্	বিকার জে. এফ. সি
৯৬)	কন্ট্রিবিউশন টু দি জিয়োগ্রাফি অ্যান্ড হিস্ট্রি অব বেঙ্গল	ব্লোচ্ম্যান
৯৭)	কেমব্রিজ শর্টার হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া	ডডওয়েল এইচ
৯৮)	কয়েনস্ অ্যান্ড ক্রোনোলজি অফ দি আর্লি ইন্ডিপেন্ডেনডেন্ট সুলতান অব বেঙ্গল	এন কে ভট্টশালী
৯৯)	কলেজবাড়ীর ইতিকথা	গিরিজা চরণ ঘোষ (১৯৪২)
১০০)	ক্যাটালগ অফ আরবিক অ্যান্ড পার্সিয়ান ইনস্ক্রিপশান ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম	চিন্ময় দত্ত
১০১)	কানাইলাল - মতিলাল রায় ও মৃত্যুঞ্জয় কানাই	সুধীর কুমার মিত্র
১০২)	কলকাতা : তিন শতক	কৃষ্ণ ধর (১৯৯৪)
১০৩)	ক্যালকাটা পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট	ব্লক হাইডেন, কে
১০৪)	কলিকাতায় সঙ্গীত চর্চা	উৎপলা গোস্বামী (১৯৯০)
১০৫)	গুড ওল্ড ডে'জ অফ্ জন কোম্পানী	কেরী. ডাব্লু. এইচ
১০৬)	গাইড টু বেঙ্গল	মার্শাল মেজর জি. টি.
১০৭)	গ্লিম্পসেস অফ্ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি	নেহরু জে. এন
১০৮)	গৌড়ের ইতিহাস	রজতকান্ত চক্রবর্তী
১০৯)	গ্রন্থাগারবিদ্যার ক্রমবিকাশ	বি এন ব্যানার্জী (১৯৬৫)

১১০)	গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি	প্রভাত ঘোষ (১৯৯০)
১১১)	চন্দননগরের আদি পর্ব	ইন্দ্রাণী রায়
১১২)	চন্দননগর পুস্তকাগারের জীবন কথা	.... (১৯৫৩)
১১৩)	চন্দননগরে বিশ্বকবি	মৃণাল ঘোষ (১৯৬০)
১১৪)	ছাপাখানার ইতিকথা	ফজিল রাবি (১৯৭৭)
১১৫)	ছোটদের হুগলি	বিভূদাণ রায় (১৯৪০)
১১৬)	জয়কৃষ্ণ চরিত	অম্বিকা গুপ্ত (১৩০৮)
১১৭)	জনাইয়ের ইতিহাস	....
১১৮)	জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	বসন্ত কুমার সামন্ত (১৯৮৩)
১১৯)	জয়কৃষ্ণ মুখার্জী : অ্যান অ্যাপ্রিসিয়েশন	শিব মুখার্জী (১৯১২)
১২০)	ট্রাভেলস্ অফ্ এ হিন্দু	....
১২১)	টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে অফ দি রিভার হুগলী ফ্রম ব্যান্ডেল টু গার্ডেনরীচ	চার্লস জোসেফ
১২২)	ডাফ হাই স্কুল	পি. এন. নাগ (১৯৩৬)
১২৩)	ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ড বুক : হুগলি	.... (১৯৭১)
১২৪)	ডিসিসিভ ব্যাটলস্ অফ ইন্ডিয়া টলেমি	ম্যালসন. জি.
১২৫)	টেপোগ্রাফিক্যাল স্কেচ্	রেনী (Rainey)
১২৬)	তিন শতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজচিত্র	কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী (১৩৮২)
১২৭)	থ্রি ফ্রেঞ্চ ম্যান ইন বেঙ্গল	হিল. এস. সি (১৮৮৮)
১২৮)	দেবগণের মর্ত্তে আগমন	দুর্গাচরণ রায়
১২৯)	দুশো বছরের মুদ্রণ	চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৭৮)
১৩০)	তারকেশ্বরের নাটকের কথা	সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩১)	তীর্থ মহিমা	নিমাই শীল
১৩২)	৩০০ বছরের যাত্রা শিল্পের ইতিহাস	গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ (১৯৯৫)
১৩৩)	দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন	চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮১)
১৩৪)	দানে কোম্পানী ইন করমন্ডল	রায়চৌধুরী
১৩৫)	দি রুটস অফ বেঙ্গলি কালচার	সমীরণ রায়
১৩৬)	দি আর্লি পাবলিকেশন অফ শ্রীরামপুর মিশনারিজ	গ্রীয়ারসন জি. এ.

১৩৭)	দি সিজ (Seige) অফ্ বেঙ্গল	কোরোয়ালহো এস. এ
১৩৮)	দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল	সেন এস. এন (১৯৬১)
১৩৯)	দি পোর্ত্তগীজ ইন বেঙ্গল	সেন এস. এন (১৯৬৩)
১৪০)	দি ভয়েজ টু দি ইস্ট ইন্ডিস	ভ্যান নিউয়িসচেটিন
১৪১)	দি মিনিটস অফ্ কনসালটেশন অফ ফোর্ট উইলিয়ম	....
১৪২)	দি আর্লি হিস্ট্রি অ্যান্ড গ্রোথ অফ ক্যালকাটা	....
১৪৩)	দি ফ্রেঞ্চ ইন ইন্ডিয়া	এস. পি. সেন
১৪৪)	দি ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ্ বাঁশবেড়িয়া রাজ	বাওয়ার এ. জি. (১৮৮৬)
১৪৫)	দি ক্লাইমেট, মেটেরিয়াল অ্যান্ড ইকোনমিক ইনফ্লুয়েন্স অফ ফরেস্ট	নিসবেট
১৪৬)	দি রাইজ অফ্ দি ফ্রেঞ্চ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া	মেলসন জি (১৯২৮)
১৪৭)	দি অ্যাডমিনিস্ট্রেসন অফ্ দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোঃ	কীন এইচ. জি
১৪৮)	দি স্টোরি অফ শ্রীরামপুর অ্যান্ড ইটস্ কলেজ	হাওয়েলস জি
১৪৯)	দি ডাচ্ ইন বেঙ্গল অ্যান্ড বিহার	কালীকিংকর দত্ত
১৫০)	দি জিওগ্রাফিক্যাল ডিক্শনারী অফ এনসিয়েন্ট অ্যান্ড মেডিভিয়াল ইন্ডিয়া	এন. দে
১৫১)	দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীস ইন ইন্ডিয়া	ফস্টার ডাব্লু
১৫২)	দি বাঁশবেড়িয়া রাজ	শম্ভু চন্দ্র দে (১৯১৭)
১৫৩)	দি ইমপেরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া	হান্টার ডাব্লু, ডাব্লু (১৮৮১)
১৫৪)	দি ডাইরি অফ উইলিয়ম হেজেস্ ডিউরিং হিজ এজেন্সী ইন বেঙ্গল	হেজেস উইলিয়ম (১৮৮৭)
১৫৫)	দি প্যারিস অফ বেঙ্গল	হাইন্ড রেভারেন্ড (১৮৮৯)
১৫৬)	দি প্ল্যান অফ দি সিকোয়েন্স	স্টুয়ার্ড ডাব্লু
১৫৭)	দি লাইফ অ্যান্ড টাইমস অফ্ কেরী	মার্শম্যান জন ক্লার্ক (১৮৫৯)
১৫৮)	দি ট্রাভেলস অফ হিন্দু ইনভেরিয়াস পার্টস অব বেঙ্গল	ভোলানাথ চন্দ্র (১৮৬৯)
১৫৯)	দি রেলওয়েজ অফ ইন্ডিয়া	ডেভিডসন ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড (১৮৬৮)
১৬০)	দি পোর্তগীজ ইন ইন্ডিয়া,. বিয়িং এ হিস্ট্রি	ডানভারস এফ. (১৮৯৪)

অফ রাইজ অ্যান্ড ডেক্লাইন অফ্ দেয়ার ইস্টার্ণ এম্পায়ার

১৬১)	দি ব্যান্ডেল চার্চ অ্যান্ড হুগলি	ক্যারভালহো এস. এ (১৯৭২)
১৬২)	দি সিজ অফ্ হুগলি	ক্যারভালহো এস. এ (১৯৯১)
১৬৩)	দি হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া	ইলিয়ট এইচ. এম (১৯৫৫)
১৬৪)	দি কেরী এগজিবিশন অফ আর্লি প্রিন্টিং	.... (১৯৫৫)
১৬৫)	ন্যারেটিভস অফ দি ট্রানজিশন ইন বেঙ্গল	ভ্যান্সিটার্ট ভি
১৬৬)	ন্যাচারাল হিস্ট্রি	প্লিনী
১৬৭)	নদীয়া কাহিনী	কুমুদ রায়
১৬৮)	পূর্ব রেলের পথে পথে	আশিস সরকার
১৬৯)	পশ্চিমবঙ্গের কালী ও কালীক্ষেত্র	দীপ্তিময় রায় (১৩৯৩)
১৭০)	পুরাতনী	হরিহর শেঠ (১৩৩৫)
১৭১)	পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি	রামরঞ্জন দাস (১৯৮০)
১৭২)	প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ	কুনাল সিংহ (১৯৭২)
১৭৩)	পর্যটকের দৃষ্টিতে এই বাংলা	গোপাল বসাক (১৩৯০)
১৭৪)	পশ্চিমবঙ্গ : ভ্রমণ ও দর্শন	ভূপতি দাস (১৩৮৫)
১৭৫)	পট পরিবর্তন	অভিরন দাস
১৭৬)	পাণ্ডুয়ার ইতিহাস	প্রভাস পাল (১৩৮৭)
১৭৭)	পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা	অশোক মিত্র (১৯৬৮)
১৭৮)	প্রভু উদ্ধারণ	যতীন শীল
১৭৯)	পলাশীর পর বক্সার	তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৩৪৭)
১৮০)	পলাশীর যুদ্ধ	তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৩৭৩)
১৮১)	প্রাগৈতিহাস বাংলা	পরেশ দাশগুপ্ত
১৮২)	পৌরাণিকা	অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৩)	প্যারাকিয়াল অ্যানালস অফ বেঙ্গল	হাইড. কে. বি.
১৮১)	পাবলিকেশনস অফ দি শ্রীরামপুর মিশনারিজ : এ কনট্রিবিউশন	গ্রিয়ার্সন (১৯০১)
১৮২)	প্রিন্টিং প্রেস ইন ইন্ডিয়া	প্রিয়লকার
১৮৩)	পোর্তুগীজ ইন ইন্ডিয়া	ডানবীর

১৮৪)	পোর্তুগীজ ডিসকভারীজ	....
১৮৫)	পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া	এম রায়চৌধুরী
১৮৬)	পেপারস্ রিলেটিং টু হুগলি ইমামবাড়া	....
১৮৭)	পশ্চিম বাংলার তীর্থ	প্রলয় সেন (১৩৮৬)
১৮৮)	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি	বিনয় ঘোষ (১৯৭৮)
১৮৯)	ফাইনাল ফ্রেঞ্চ স্ট্রাগল ইন ইন্ডিয়া	মেল্শন (১৯০৮)
১৯০)	ফা-হিয়েন	ম্যাকরিনড্ল
১৯১)	ফিফ্থ রিপোর্ট	ফারমিনডার
১৯২)	ফাদার দ্যতিয়েনের গদ্য পরম্পরা	ফাদার দ্যতিয়েন (১৯৮৪)
১৯৩)	ব্রিটিশ ব্যাপটিস্ট মিশনারিজ ইন ইন্ডিয়া	পটস্ ই ড্যানিয়েল (১৯৬৭)
১৯৪)	বেঙ্গলী লিটারেচর ইন দি নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরী	সুশীল দে
১৯৫)	বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার : হুগলি	ওম্যালী (১৯১২)
১৯৬)	ব্যান্ডেল অ্যান্ড ইটস চার্চ	রড্রীগস্. এম. ভি
১৯৭)	বেঙ্গল মাস রেকর্ড অফ বোর্ড রেভিনিউ	....
১৯৮)	বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-৫৭	হিল
১৯৯)	ব্রীফ হিস্ট্রি অব হুগলী ডিস্ট্রিক্ট	ক্রফোর্ড (১৮০৯)
২০০)	বেঙ্গল আন্ডার লেফ্টন্যান্ট গভর্নরস	বাকল্যান্ড
২০১)	বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট	....
২০২)	ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিজম অ্যান্ড বেঙ্গলী রেনেশাস	ক্রস্ট ডি.
২০৩)	বেঙ্গল টাইপ অ্যান্ড দেয়ার ফাউন্ট	ডেহল
২০৪)	বেঙ্গল ইন দি রাইম অফ আওরঙ্গজেব	অঞ্জলি চ্যাটার্জী (১৯৬৮)
২০৫)	বাঁশবেড়িয়া পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট	মুনীন্দ্রদেব রায়
২০৬)	বংশবাটি পরিচয়	মুনীন্দ্রদেব রায় (১৯৩৮)
২০৭)	বাংলার মৃৎশিল্প অলংকরণ	শম্ভুনাথ মিত্র (১৩৮৮)
২০৮)	বিদ্যাসাগর : প্রসঙ্গ হুগলি জেলা	বসন্ত কুমার সামন্ত (১৯৯৩)
২০৯)	বাংলার খেতাবী রাজ-রাজড়া	বিমল দত্ত (১৯৯২)
২১০)	বিপ্লব তীর্থ চন্দননগর	বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৪)
২১১)	বাংলার তীর্থ	ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য (১৩৬২)
২১২)	বাঁশবেড়িয়া বা বংশবাটি	মুনীন্দ্রদেব রায় (১৩৩১)

২১৩)	বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী যুগ	মহম্মদ সিদ্দিক খান (১৯৬২)
২১৪)	বাংলার নবজাগরণে উইলিয়ম কেরী ও তাঁর পরিজন	সুনীল চট্টোপাধ্যায়
২১৫)	বাঙ্গালীর গান	দুর্গাদাস লাহিড়ী
২১৬)	বঙ্গভূমিকা	সুকুমার সেন
২১৭)	বাংলার পারিবারিক ইতিহাস	শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী (১৯৩৪)
২১৮)	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	সজনীকান্ত দাস
২১৯)	বাংলার বেগম	ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৫)
২২০)	বাংলার সাধনা	কালীমোহন সেন
২২১)	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব	রামগতি ন্যায়রত্ন
২২২)	বাংলার ইতিহাস	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
২২৩)	বিশ্বকোষ	নগেন্দ্রনাথ বসু
২২৪)	বড় সাধ বড় সেবা : মহাত্মা উইলিয়ম কেরী	সুনীল চট্টোপাধ্যায়
২২৫)	বাংলা ছাপার হরফ	চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৭৭)
২২৬)	বাংলা মুদ্রণের দু'শ বছর	অতুল সুর (১৩৮৫)
২২৭)	বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস	বরুণ মুখোপাধ্যায়
২২৮)	বাদশানামা	আব্দুল হামিদ (১৯৮৫)
২২৯)	বংশপরিচয় (১ - ২০ খন্ড)	জ্ঞানেন্দ্র নাথ কুমার (১৯২৮)
২৩০)	বর্ধমান ফিভার.......	জি. সি. রায় (১৮৭৬)
২৩১)	ব্যান্ডেল গীর্জার ইতিহাস	নীহার রঞ্জন চাকী (১৯৭৫)
২৩২)	ভয়েজ ইন দি ইন্ডিয়ান ওসান অ্যান্ড টু দি বেঙ্গল	গ্রান্ড প্রি
২৩৩)	ভয়েজ টু দি ইস্ট ইন্ডিজ	গ্রীস (১৭৯৮)
২৩৪)	ভয়েজ ফ্রম ইংল্যান্ড টু ইন্ডিয়া	ইভস্ (Ives)
২৩৫)	ভারতবর্ষের ইতিহাস	সেন ও রায়চৌধুরী
২৩৬)	ভারতীয় সমাজ পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস	ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত
২৩৭)	ভারত পথিক রামমোহন ও রাধানগর	কল্যাণ ব্রহ্মচারী (১৯৯৩)
২৩৮)	ভ্রমণ সঙ্গী	গীতা দত্ত ও মৃণাল দত্ত (সম্পাদিত)

২৩৯)	ভ্রমণ সঙ্গী : উইক এন্ড ট্যুর	গীতা দত্ত ও মৃণাল দত্ত
২৪০)	ভিলেজ ডাইরেক্টরী অফ দি প্রেসিডেন্সী অব বেঙ্গল : হুগলি	জেমস. এইচ. ই. এম (১৮৮৪)
২৪১)	ভারতের তীর্থপথ নির্দেশ	ভূপতি রঞ্জন দাস (১৯৭৯)
২৪২)	ভারতের মুক্তিযজ্ঞে বিপ্লবী অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় (১৩৯২)
২৪৩)	ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের ইতিবৃত্ত	শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৪)
২৪৪)	ভয়েজ টু দি ইস্ট ইন্ডিজ	স্যাভরসিনার্স জে. এম (১৭৯৮)
২৪৪)	ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বাংলা	কৃষ্ণ ধর
২৪৫)	মহামনীষী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন	অলোক কুমার চক্রবর্তী (১৩৯৪)
২৪৬)	মেময়ারস টু ভ্যান ডেন ব্র্যাকস ম্যাপ	ভ্যালেনটিন
২৪৭)	মিলিটারী ট্র্যানসাকসন ইন হিন্দুস্থান	ক্রুম
২৪৮)	মেমোয়ার অফ উইলিয়ম কেরী	কেরী ইউসটেস (১৮৩৬)
২৪৯)	মিশনারিজ অ্যান্ড এডুকেশন ইন বেঙ্গল	লেয়ার্ড এম. এ (১৯৭২)
২৫০)	মুসলিম তীর্থ ফুরফুরা শরীফ্	মাসুদ-উর রহমান
২৫১)	মুমতা খাবুল - নুবাগ	খালিফ খাঁ
২৫২)	মুক্তির সন্ধানে ভারত	যোগেশ চন্দ্র বাগল
২৫৩)	মুদ্রণ চর্চা	দীপংকর সেন (১৯৯৩)
২৫৪)	মোহন্তের এই কাজ	যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ
২৫৫)	মোহন্তর যেমন কর্ম তেমন ফল	ঐ
২৫৭)	মৃত্যুঞ্জয়ী কানাইলাল	পূর্ণচন্দ্র দে (১৯৬২)
২৫৮)	মুসলিম তীর্থ পাণ্ডুয়া	মাসুদ-উর-রহমান (১৯৮৬)
২৫৯)	মাহেশ মঙ্গল বা মাহেশ পরিচয়	শ্রাদ্ধানন্দ দেবশর্মা (১৩৫৪)
২৬০)	মুক্তি সাধনায় চন্দননগর	হরিহর শেঠ (১৩৫৭)
২৬১)	রবিজীবনী (২য় খন্ড)	প্রশান্ত কুমার পাল (১৩৯১)
২৬২)	রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর	হরিহর শেঠ (১৯৪৫)
২৬৩)	রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর অঞ্চল	শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৬)
২৬৪)	রাইজ অ্যান্ড প্রোগ্রেস অফ দি ব্রিটিশ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া	আবের (Auber)

২৬৫)	রিপোর্ট টু দি সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া ... অন পোর্তুগীজ রেকর্ডস্	দ্যানবীর
২৬৬)	রাইজ অ্যান্ড প্রোগ্রেজ অফ বেঙ্গল আর্মি	ক্যা এ. ব্রুম
২৬৭)	রুইন অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড	মেজর বোস
২৬৮)	রুটস অফ বেঙ্গল কালচার	সমীরণ রায় (১৯৬৩)
২৬৯)	রূপকথায় হুগলি	কার্তিকচন্দ্র শাসমল (১৩৭৬)
২৭০)	লিস্ট অব ইনস্ক্রিপসন অন টুমবস অফ মনুমেন্টস ইন বেঙ্গল.....	উইলসন, সি.আর (১৮৯৬)
২৭১)	লিস্ট অব এনসিয়েন্ট মনুমেন্টস ইন বেঙ্গল	স্টুয়ার্ড সি
২৭২)	লাইফ অফ জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন	উমাচরণ ভট্টাচার্য
২৭৩)	লেটার অন দি সীজ অব হুগলি	কোত্রাল জোশ
২৭৪)	শ্রীরামপুর : ভারতবন্ধু উইলিয়ম কেরী	অমৃতলাল সরকার (১৯৩৬)
২৭৫)	শহর শ্রীরামপুরের ইতিকথা	ভৈরব হালদার (১৯৬৫)
২৭৬)	শ্রীঅরবিন্দ ও হুগলি জেলা	রথীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২৭৭)	শ্রীধাম কামারপুকুর	স্বামী তেজসানন্দ (১৯৫৮)
২৭৮)	শহীদ কানাইলাল : নতুন তথ্যের আলোকে	বসন্ত কুমার সামন্ত (১৯৯০)
২৭৯)	শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস	বসন্ত বসু (১৩২৪)
২৮০)	শ্রীরামপুরের আশেপাশে গৌরাঙ্গযুগের ইতিহাস	পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়
২৮১)	শ্রীরামপুর অ্যান্ড ইটস স্টোরি	Holtzsch (১৩৮৯)
২৮২)	সপ্তগ্রামের ইতিকথা	নিতাই ঘোষ (১৯৯৫)
২৮৩)	শ্রীচৈতন্যভাগবৎ	বৃন্দাবন দাস
২৮৪)	সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয়	হরিহর শেঠ (১৩৭০)
২৮৫)	সংবাদপত্রে সেকালের কথা	ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৫৬)
২৮৬)	সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়	অলোক রায়
২৮৭)	সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ	বিনয় ঘোষ (১৯৬৪)
২৮৮)	সুহ্মভূমি বন্দরমালা	মহাদেব ঘোষ (১৯৯৫)
২৮৯)	স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলি জেলা	তুষার চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৩)
২৯০)	সেকালের একাল	রাজনারায়ণ বসু
২৯১)	সুবর্ণ বণিক	নিমাই শীল

২৯২)	সুবর্ণ বণিক কথা ও কীর্ত্তি	নরেন্দ্রনাথ লাহা
২৯৩)	স্টাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ্ বেঙ্গল	হান্টার ডাব্লু ডাব্লু
২৯৪)	সার্ভে অফ হুগলি	যোশেফ ডি.
২৯৫)	স্কেচ অফ দি হিস্ট্রি অব হিন্দুস্তান	কীন এইচ. জি.
২৯৬)	সিলেকশন ফ্রম আনপাবলিশড রেকর্ডস অফ গভর্নমেন্ট ফর দি ইয়ার ১৭৪৮-৬৭	লঙ জে. এ
২৯৭)	সাভ হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড এথিক্যাল অ্যাসপেক্ট	ওল্ডহ্যাম ডাব্লু. বি.
২৯৮)	সিলেকশন ফ্রম ক্যালকাটা গেজেট	সেলটন - কার
২৯৯)	সত্যাগ্রহস ইন বেঙ্গল	বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (১৯৪৬)
৩০০)	সেন্সাস ১৯৬১ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক : হুগলি	বি. রায়
৩০১)	সোস্যাল প্রোফাইল অফ তারকেশ্বর	প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী (১৯৮৪)
৩০২)	হুগলি বা দক্ষিণ রাঢ়	অম্বিকাচরণ গুপ্ত (১৩২১)
৩০৩)	হুগলি জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস	অশোক চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৩)
৩০৪)	হিস্ট্রি অফ দি পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল উইথ ম্যাপস অ্যান্ড ইলাসট্রেশন	ক্যাম্পোস জে. জে. এ
৩০৫)	হিস্ট্রি অব দি ব্যান্ডেল কনভেন্ট অ্যান্ড চার্চ....	ক্যাম্পোস জে. জে. এ
৩০৬)	হুগলি মেডিক্যাল গেজেটিয়ার	ক্রফোর্ড ডি. ডি. (১৯০৩)
৩০৭)	হুগলি জেলার পুরাকীর্ত্তি	দেবলা মিত্র
৩০৮)	হিস্টোরিকাল স্কেচ	প্যারাপুল্লি জোন্স
৩০৯)	হিতকরী সভা স্ত্রী শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ	বসন্ত কুমার সামন্ত (১৯৯০)
৩১০)	হুগলি ও হাওড়ার ইতিহাস (১ম খন্ড)	বিধুভূষণ ভট্টাচার্য (১৩৩৫)
৩১১)	হুগলি ও হাওড়ার ইতিহাস (২য় খন্ড)	বিধুভূষণ ভট্টাচার্য
৩১২)	হুগলি ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্স্ (১৯২১ - ২২ থেকে ১৯৩০-৩১)	বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯৩৩)
৩১৩)	হটার্স সুবার্বন্স ক্যালকাটানসিস : এ ক্যাটালগ	ভয়েট জে. ও.
৩১৪)	হুগলি কলেজ রেজিস্ট্রার ১৮৩৬ - ১৯৩৬	.... (১৯৩৬)
৩১৫)	হুগলি পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট	শম্ভু চন্দ্র দে (১৯০৬)

৩১৬)	হুগলির গৌরব কাহিনী	সলিল মিত্র (১৯৭৯)
৩১৭)	হুগলি জেলার ইতিহাস	সুধীর কুমার মিত্র (১৩৫৫)
৩১৮)	হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ	সুধীর কুমার মিত্র (১৩৭০)
৩১৯)	হুগলি জেলার দেবদেউল	সুধীর কুমার মিত্র (১৯৯১)
৩২০)	হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল আর্মি	ক্যাপ্টেন. এ. ব্রুম
৩২১)	হিস্ট্রি অফ ব্যান্ডেল	ক্যাম্পোস জে (১৯০৫)
৩২২)	হিস্ট্রি অফ দি পোর্তুগীজ ইন বেঙ্গল	ক্যাম্পোস জে (১৯০৯)
৩২৩)	হিসটোরিয়া দে	....
৩২৪)	হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল	ঢাকা ইউনিভার্সিটি
৩২৫)	হিন্দু ম্যানার, কাস্টম অ্যান্ড সেরিমনিস	ডুবাইস এ.
৩২৬)	হিস্ট্রি টোলড বাই ইটস হিস্টোরিয়ান	ইলিয়ট এইচ (১৮৯০)
৩২৭)	হিসটোরিক্যাল মনুমেন্টস অব বেঙ্গল	....
৩২৮)	হিস্ট্রি অফ চি চার্চ ইন বেঙ্গল	....
৩২৯)	হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল	আর সি মজুমদার
৩৩০)	হিস্ট্রি অফ ফ্রেঞ্চ ইন ইন্ডিয়া	ম্যালসন জি.
৩৩১)	হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, বিহার, ওড়িশা আন্ডার ব্রিটিশ রুল	ওম্যালি
৩৩২)	হুগলি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার	ওম্যালি
৩৩৩)	হিসটোরিক্যাল ফ্র্যাগমেন্টস অব দি মুঘল এমপায়ার	অরাম
৩৩৪)	হিস্ট্রি অফ হিন্দুস্তান	অরাম
৩৩৫)	হিন্দু আইকোনোগ্রাফি	রাও
৩৩৬)	হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল	স্টুয়ার্ড সি.
৩৩৭)	হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ভলুম ২	উইলসন ডাব্লু
৩৩৮)	হিস্ট্রি অফ হুগলি কলেজ	জ্যাকেরিয়া
৩৩৯)	হুগলি ওয়াজ দক্ষিণ রাঢ়	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
৩৪০)	হিকি সাহেবের কলকাতা	বরুণ সেন
৩৪১)	হুগলি জেলার ভূমি ব্যবস্থা	আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৯৯৭)

হুগলি : প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ তালিকা

সন্দীপ দত্ত

[হুগলি জেলা সম্পর্কিত পত্রপত্রিকা বিশেষত সাম্প্রতিক লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বিষয়বিন্যাস ক'রে একটি পঞ্জি করা হলো। স্বভাবতই এই পঞ্জিটি অসম্পূর্ণ। উৎসাহী পাঠকের কাজে লাগলে বাধিত হব।]

১. হুগলি জেলা

১) হুগলি জেলা / পরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐতিহাসিক চিত্র ৭ বর্ষ ৯ সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯১১।

২) হুগলি জেলা সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ / নিখিলনাথ রায় : ঐতিহাসিক চিত্র ৭ বর্ষ ১১-১২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯১২।

৩) হুগলি জেলা ও বঙ্কিমচন্দ্র / অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় : সাহিত্য-সেতু ৩০ বর্ষ ৬ সংখ্যা ১ জুলাই ১৯৯৬।

৪) হুগলি কাহিনী / ইন্দিরা দাশ : ঐকতান ৪ খণ্ড অক্টোবর ১৯৯১।

৫) হুগলি : পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা / বিদ্যুৎ সাহা : উর্মি ২৪ বর্ষ অক্টোবর ১৯৯৪।

৬) আধুনিকতা ও হুগলি জেলা / মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

৭) অতীতের হুগলি / দীপালি দে সরকার : ঐ, ঐ, ঐ।

৮) হুগলি / অশোক কুমার কুণ্ডু : 'গণকণ্ঠ' বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৩।

৯) একটি শহরের জন্মকথা / গোরাচাঁদ আঢ্য : বন্দেমাতরম শতবার্ষিকী ১৯৭৬।

১০) হুগলি-চুঁচুড়া শহরের প্রাকৃতিক পরিচিতি / তুষার সিংহ : ঐ

১১) ইতিহাসের এক ফালি আলো / মুরারী সিংহ : ঐ, ঐ।

২. পুরসভা

১) পৌরপতি ও উপপৌরপতিদের তালিকা / সাহিত্য-সেতু ২৪ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯০।

২) প্রসঙ্গ : হুগলি জেলার পৌরসভা / অমিয় নন্দী : সাহিত্য-সেতু ২৪ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯০।

৩) পৌরসভা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য (প্রশ্ন) / ঐ, ঐ, ঐ।

৪) উত্তরপাড়া-কোতরং পৌরসভা / মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

৫) কোন্নগর পৌরসভা / শিশির দে : ঐ, ঐ, ঐ।

৬) রিষড়া পৌরসভা / মিঠু মুখোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

৭) শ্রীরামপুর পৌরসভা / কৃষ্ণচন্দ্র ভড় : ঐ, ঐ, ঐ।

৮) বৈদ্যবাটী পৌরসভা / তারক ভড় : ঐ, ঐ, ঐ।

৯) চাঁপদানী পৌরসভা / দেবাশিস মুখোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

১০) ভদ্রেশ্বর পৌরসভা / মধুময় পাল : ঐ, ঐ, ঐ।

১১) হুগলি-চুঁচুড়া পৌরসভা / অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

১২) বাঁশবেড়িয়া পৌরসভা / অশোক গঙ্গোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

১৩) তারকেশ্বর পৌরসভা / দীনবন্ধু হাজরা : ঐ, ঐ, ঐ।

১৪) আরামবাগ পৌরসভা / জগবন্ধু কুণ্ডু : ঐ, ঐ, ঐ।

১৫) চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন / পরেশ সিংহ : ঐ, ঐ, ঐ।

১৬) উত্তরপাড়া পৌরসভার ইতিকথা / মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় : উ. জ. সা. পা. ১২৫ বর্ষপূতি স্মরণিকা, ১৯৮৪।

১৭) উত্তরপাড়া-কোতরং পৌরসভার বিবরণ / শান্তিপ্রিয় দাশগুপ্ত : ঐ, ঐ।

১৮) বাঁশবেড়িয়া পৌরসভা / অশোক গঙ্গোপাধ্যায় : গ্রন্থিক বাঁশবেড়িয়া সংখ্যা, ১৯৮৬।

৩. মন্দির, মসজিদ, গির্জা

১) আঞ্চলিক মন্দির স্থাপত্য : হুগলির মন্দির / প্রণব রায় : শাল্মলী ১, জানুয়ারি ১৯৯৫।

২) একগুচ্ছ দেব সৌধ / সুধীর কুমার মিত্র : বন্দনা ১৯৮৬।

৩) একদিনের মধুর ভ্রমণ / পীযূষকান্তি সিনহা : সাহিত্য-সেতু, ২২ বর্ষ ৯সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৮।

৪) কোন্নগরের দ্বাদশ শিবমন্দির / দেবাশিস বসু : সমন্বয়ে ১ সংখ্যা জানুয়ারি ১৯৮৬।

৫) চণ্ডীতলার চণ্ডীমন্দির / স্বরাজ : বৈদগ্ধ বৈশাখ ১৩ বর্ষ ২ সংখ্যা, আগস্ট-অক্টোবর ১৯৯২।

৬) গুপ্তিপাড়ার জোড়বাংলা ও তার নির্মাণকাল / নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য : সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা, ৩ বর্ষ ৪ সংখ্যা ১৮৭৬।

৭) দুই কৃষ্টির সহাবস্থান গাজীর দরগা / সলিল ভট্টাচার্য : সাহিত্য-সেতু ২২ বর্ষ, ৯সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৮।

৮) বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির / শীতল দাস : প্রত্যয় ৭ বর্ষ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪।

৯) বংশবাটি রাজা নৃসিংহদেব রায় ও হংসেশ্বরী মন্দির / সমীরণ সৌরভ : মনতর্পণ, ৫ বর্ষ ২ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯।

১০) বংশবাটির হংসেশ্বরী / সমীর ভট্টাচার্য : প্রয়াস ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৯।

১১) ব্যান্ডেল চার্চ এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক / সমীরণ সৌরভ : মণতর্পণ ৪ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৯।

১২) বাঁশবেড়িয়ার মন্দির ভাস্কর্য / দীপকরঞ্জন দাস : সাহিত্য-সেতু ২২ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৮।

১৩) ব্যান্ডেল চার্চ : নির্মম সময়ের মধুরতম স্মারক / শুভাশিস দত্ত : সাহিত্য-সেতু ২২ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৮।

১৪) বিমূর্ত ধর্মমতের বাস্তব রূপায়ণ ও হংসেশ্বরী মন্দির /সন্তোষ রায় ও কুনালদেব রায় : ঐ, ঐ।

১৫) মল্লিকপুর ডাকাতে কালী মন্দির : সবুজ সংকেত / ১ বর্ষ ২ সংখ্যা ১৯৭৭।

১৬) মন্দির মসজিদ মাজার / অসিত দত্ত : ঐকতান ৪ খন্ড ৪ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯১।

১৭) মন্দির ঐতিহ্যে ও সংস্কৃতিতে হরিপাল / তপন কুমার নাথ : উর্মি ১৯ বর্ষ ১৯৮৯।

১৮) উত্তরপাড়া - ভদ্রকালী কোতরং / শ্যামল চট্টোপাধ্যায় : উ. জা. সা. পা. ১২৫ বর্ষপূর্তি ...., ১৯৮৪।

১৯) ষণ্ডেশ্বর দেবাঙ্গনে হুগলী-চুঁচুড়া / অমর পাল : বন্দেমাতরম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (২য় খন্ড), ১৯৭৬।

২০) গাজীর দরগা / নিলয় বড়ুয়া : গ্রন্থিক ত্রিবেণী সংখ্যা।

২১) লোকায়ত মন্দিরকলায় বাঁশবেড়িয়ার দেবদেউল / নিলয় সরকার : গ্রন্থিক বাঁশবেড়িয়া সংখ্যা ১৯৮৬।

২২) হংসেশ্বরী / প্রদীপ বসু / ঐ, ঐ, ঐ।

২৩) হংসেশ্বরী মন্দির / জগবন্ধু কুণ্ডু : তিথিডোর ৬ বর্ষ সংখ্যা ১৯৮৭।

২৪) রামনগরের মন্দির / তারাপদ সাঁতরা : সমন্বয়ে ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৮৬।

২৫) সপ্তগ্রাম বংশবাটি ও হংসেশ্বরী মন্দির - বাংলার এক ঐতিহ্য / অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় : মনতর্পণ ৬/৪ এপ্রিল ১৯৯৩।

২৬) হুগলি জেলার এক মন্দির স্থপতি : জীবন ও সাধনা / তারাপদ সাঁতরা : সমন্বয়ে ২ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৬।

২৭) হুগলির মন্দির / সুধীর কুমার মিত্র : সমন্বয়ে ১ সংখ্যা জানুয়ারি ১৯৮৬।

২৮) হুগলির ইমামবাড়া / অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় : সাহিত্য-সেতু / ২২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৮।

৪. পূজা-পার্বণ, দেব দেবী

১) এক গ্রামীণ দুর্গাপূজা ও অলৌকিক ঘটনা / বিশ্বনাথ সরকার : পুণ্যতীর্থ, কামারপুকুর, অক্টোবর ১৯৯১।

২) দেবী উত্তর বাহিনী / শ্রীমন্ত কুমার মালিক : সবুজ সংকেত, ২ বর্ষ, ১ সংখ্যা, জুলাই ১৯৭৮।

৩) বাঁশবেড়িয়া অর্থনীতির আলোকে কার্তিক উৎসব / অশোক গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্য-সেতু, ৩১ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৭।

৪) কেওটা - সাহাগঞ্জ বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক উৎসবে দেব-দেবী / জগবন্ধু কুণ্ডু, বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

৫) চুঁচুড়ার কার্তিক পূজা যেমন দেখে আসছি / অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় : সাহিত্য-সেতু ১৭ বর্ষ, ৭-৮ সংখ্যা, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮৩।

৬) কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল বাঁশবেড়িয়া এবং কার্তিক পূজা উৎসব / পিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী : সাহিত্য-সেতু ১৭ বর্ষ, ৭-৮ সংখ্যা, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮৩।

৭) চন্দননগরের ঐতিহ্যপূর্ণ উৎসব / জগবন্ধু কুণ্ডু : ঐ, ঐ, ঐ।

৮) একটি প্রাচীন দুর্গাপূজা (হরিপাল) / রামকৃষ্ণ সাঁতরা : রাখীবার্তা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩।

৯) চন্দননগরে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা ও তার প্রভাব / সমীরণ সৌরভ : মনতর্পণ ৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮৮।

১০) জগদ্ধাত্রী পূজায় চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বর / অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৩ বর্ষ, ১০-১১ সংখ্যা, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯১।

১১) চন্দননগরের বাইরে / সম্রাট সেন : ঐ, ঐ, ঐ।

১২) পূজা পার্বণ শোভাযাত্রায় হুগলি-চুঁচুড়া / গোবিন্দ চন্দ্র পাল : বন্দেমাতরম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (২য় খণ্ড) ১৯৭৬।

১৩) চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপূজা / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : লেখনী, ৭ বর্ষ ২ সংখ্যা ১৯৭০।

১৪) সাংবাদিকের দৃষ্টিতে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপূজা উৎসব / অতুল মুখোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

১৫) বেণীমাধব এবং ত্রিবেণীর শিব / রতন কৃষ্ণ বসু : গ্রন্থিক ত্রিবেণী সংখ্যা।

১৬) ত্রিবেণী কালীতলার ডাকাতে কালী / বাসুদেব দাস : ঐ, ঐ, ঐ।

১৭) জগদ্ধাত্রী / শক্তিসাধন সিংহ : গ্রন্থিক, উৎসব সংখ্যা, ১৯৮৪।

১৮) কার্তিক / নিলয় বড়ুয়া : ঐ, ঐ, ঐ।

১৯) ফুরফুরা শরীফ / সৌহার্দ্য ভ্রাতৃত্বের মিলনভূমি / ধনঞ্জয় পাল : ঐ, ঐ, ঐ।

২০) বাঁশবেড়িয়ার উৎসব / পিনাকী ঠাকুর : গ্রন্থিক বাঁশবেড়িয়া সংখ্যা, ১৯৮৬।

২১) ওঁমা অধ্যাত্ম সাধনায় চন্দননগর / অরুণচন্দ্র দত্ত : স্মারকগ্রন্থ, চন্দননগর সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৯৭৫।

২২) জগদ্ধাত্রী পূজা / চন্দননগর / অমল হালদার : ঐ, ঐ, ঐ।

২৩) মা এলো চন্দননগরে / শিবপ্রসাদ ঘোষ : গোধূলিমন ৩৫ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৩।

২৪) স্মৃতিকথা ইতিকথা / ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা : গোধূলিমন, ৩৭ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৫।

২৫) জগদ্ধাত্রী পূজার ইতিবৃত্ত / হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য : গোধূলিমন, ৩৬ বর্ষ, ২ সংখ্যা নভেম্বর, ১৯৯৪।

২৫) জগদ্ধাত্রী পূজা সম্পর্কে কিছু তথ্য / বসন্তকুমার সামন্ত : ঐ, ঐ, ঐ।

২৬) স্বপ্নদৃষ্ট আবির্ভাব / বিজয় দাস : ঐ, ঐ, ঐ।

২৭) মনে পড়ে / শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

২৮) আলোর শহর / অরুণ মুখোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

২৯) চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজার ধারা ও তার ঐতিহ্যবাহী গতিপথ / বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

৩০) চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজার একাল-সেকাল / বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৪০ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৮।

৩১) বাংলার ইতিহাসে জগদ্ধাত্রী / কলিদাস হাজরা : ঐ, ঐ, ঐ।

৩২) পুণ্যতীর্থ চন্দননগর / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

৩৩) দুই বিজয়া / প্রমোদ বসু : গোধূলিমন, ৩৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯২।

৩৪) চন্দননগরের হারানো দিন ও জগদ্ধাত্রী পূজা / সম্রাট সেন : গোধূলিমন, ৩৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯২।

৩৫) এবার পুজোয় ঠাকুর দেখা / দিনকর দত্ত, অরুণ মুখোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

৩৬) কার্তিক মূর্তি বৈচিত্র্য : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা / অজয় মিশ্র : সাহিত্য-সেতু, ১২ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, এপ্রিল-নভেম্বর ১৯৮৮।

৩৮) বাঁশবেড়িয়ার প্রাচীন লোক উৎসব : কার্তিক পূজা / জগবন্ধু কুণ্ডু : ঐ, ঐ, ঐ।

৩৯) কার্তিক আমাদের ঘরের ছেলে / জগদীশ চন্দ্র মোদক : ঐ, ঐ, ঐ।

৪০) বাঁশবেড়িয়ার অর্থনীতির আলোকে কার্তিক উৎসব / অশোক গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্য-সেতু, ১২ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, এপ্রিল-নভেম্বর ১৯৮৮।

৪২) বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পুজো / আধুনিকতা ও যুবউৎসব : অমিত কুণ্ডু ঃ ঐ, ঐ, ঐ।

৪৩) ত্রিবেণীর উৎসব / ধনঞ্জয় পাল : গ্রন্থিক, ত্রিবেণী সংখ্যা।

৪৪) হুগলির মেলা / চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় : গ্রন্থিক, উৎসব সংখ্যা ১৯৮৪।

৪৫) হুগলি জেলার অন্যতম উৎসব : রথ / এম. এ. হেলা : ঐ, ঐ, ঐ।

৪৬) ইতিহাস ও কিম্বদন্তীর আলোকে মাহেশের রথযাত্রা / সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী : তিথিডোর, ২ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ১৯৮৩।

৫. মেলা

১) ধনেখালির প্রাচীন মেলা / মোহাম্মদ আলী বুলবুল : অঙ্গীকার, ৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৬।

২) পাণ্ডুয়ার মেলা : সকল ধর্মের মানুষের মিলন মেলা / যদুপতি মল্লিক : সাহিত্য-সেতু, ২৫ বর্ষ, ১৬-১৭ সংখ্যা, ১ ও ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯১।

৩) বাঁশবেড়িয়া ও গ্রন্থমেলা / অজয় মিশ্র : সাহিত্য-সেতু, ২৪ বর্ষ, ১০-১২ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭।

৬. জনপদ

১) আঁটপুর / নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : সমন্বয়, ৫ ডিসেম্বর ১৯৮৭।

২) অতীত গোন্দলপাড়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৮ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৬।

৩) গৌরবের ভূমিকায় হুগলি দু'শ বছর / কালিদাস হাজরা : সন্দীপন, ২৫ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩।

৪) চাঁপদানীর ইতিহাস (ধারাবাহিক) / কালিদাস হাজরা : সেই-সন্দীপন, ২ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, মার্চ-মে ১৯৯৮ থেকে।

৫) ফরাসডাঙ্গা প্রসঙ্গে / সুধীর কুমার মিত্র : সমন্বয়ে, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭।

৬) বাঁশবেড়িয়ার জীবনস্রোত / অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় : সাহিত্য-সেতু, ২০ বর্ষ, ৬-১২ সংখ্যা, ১৯৮৬।

৭) রাজবল্লভী / শ্রীমন্ত মালিক : সন্দীপন, ১৬ বর্ষ, ১ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩।

৮) মামুদপুর / প্রতিবেদন : মনতর্পণ, ৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০।

৯) পুরনো দিনের কথা (ডানকুনি) : সঞ্চারী, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩।

১০) হুগলীর পাণ্ডুয়া / পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রবাসী, ২ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৯২৫।

১১) বৈদ্যবাটীর সংক্ষিপ্ত কথা / শীতলচন্দ্র বিদ্যাভূষণ : সন্দীপন, ২৬ বর্ষ, ১ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩।

১২) তারকেশ্বরের ইতিকথা / সুখেন্দু বসু : কাশের দেশ, ১বর্ষ, ১ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৮৯।

১৩) পবিত্রপীঠভূমি কামারপুকুর / হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ : পুণ্যতীর্থ, কামারপুকুর, অক্টোবর ১৯৯১।

১৪) হরিপাল / রামকৃষ্ণ সাঁতরা : উর্মি, ১৯ বর্ষ, ১৯৮৯।

১৫) হরিপাল - স্বাধীনতার সংগ্রামে ও সমাজচেতনায় / রামকৃষ্ণ সাঁতরা : উর্মি, ১৯ বর্ষ, ১৯৮৯।

১৬) উত্তরপাড়ার আদিকথা / ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় : উ. জ. সা. পা., ১২৫ বর্ষ পূর্তি স্মরণিকা, ১৯৮৪।

১৭) উত্তরপাড়া / সেকাল থেকে একাল : রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

১৮) চন্দননগরের পাঁচালী / প্রভাত কুমার দে : লেখনী, ৮ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ১৯৭১।

১৯) চন্দননগর / বলাই কৃষ্ণ গোল : ঐ, ঐ, ঐ।

২০) দ্বারের জাঙ্গাল / প্রভাত কুমার দে : লেখনী, ৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ১৯৭০।

২১) ত্রিবেণী - অতীত থেকে বর্তমান / অসিত মণ্ডল : গ্রন্থিক, ত্রিবেণী সংখ্যা।

২২) ইতিহাসের দর্পণে বাঁশবেড়িয়া / নিলয় বড়ুয়া : গ্রন্থিক, বাঁশবেড়িয়া সংখ্যা ১৯৮৬।

২৩) সপ্তগ্রামের একটি গ্রাম / খামারপাড়া : শৈলেন কুণ্ডু / ঐ, ঐ, ঐ।

২৪) ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার / বরুণ মুখোপাধায় : বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা, ১৯৯০।

২৫) সংস্কৃতি ও সাধনা / ক্ষিতিমোহন সেন : বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার হীরক জয়ন্তী উৎসব স্মারকগ্রন্থ, ১৯৫১।

২৬) চন্দননগরের পুণ্যকথা / সুধীর কুমার মিত্র : স্মরণিকা, বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ৪০ তম বার্ষিক অধিবেশন, ১৯৭৭।

২৭) দেবানন্দপুর / ? : স্মারকগ্রন্থ ৯৭ তম শরৎচন্দ্র জন্মোৎসব, ১৯৭২।

২৮) সপ্তগ্রাম / ? : ঐ, ঐ, ঐ।

২৯) কৃষ্ণপুর / ? : ঐ, ঐ, ঐ।

৩০) পুণ্যক্ষেত্র ত্রিবেণী সঙ্গম / নিতাই ঘোষ : স্মারক গ্রন্থ, প্রাক্ প্লাটিনাম জয়ন্তী, ত্রিবেণী সাধারণ পাঠাগার, ১৯৯২।

৩১) জেলার কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান / কিরণ শংকর আদিত্য : স্মরণিকা, বীণাপাণি স্মৃতি পাঠাগার, ১৯৮৯।

৩২) রিষড়ার আদিপর্ব ও নামকরণ প্রসঙ্গ / মণীন্দ্রনাথ আশ : কৌশিকী ৭ বর্ষ, ৫-১১ সংখ্যা, ১৯৮০।

৩৩) চন্দননগর সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি / চন্দননগর যুব সংঘ হীরক জয়ন্তী স্মারক, ১৯৯৫।

৩৪) চন্দননগর সম্পর্কিত / শংকর শেঠ : ঐ, ঐ, ঐ।

৭. হল, সভা, গ্রন্থাগার, ক্লাব, প্রতিষ্ঠান

১) কোন্নগর হরিদাস মিউজিক্যাল এসোসিয়েশন / বিষ্ণু দত্ত : সমন্বয়ে, ৩৬ অক্টোবর ১৯৯৬।

২) গোন্দলপাড়া সম্মেলন টাউন লাইব্রেরী / একাল ও সেকাল / অরুন্ধতী সেনগুপ্ত : গোধূলিমন ৩৯ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৯৭।

৩) চন্দননগর যুব সংঘ / অরুণ মুখোপাধ্যায় : ঐ, ৩৭ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৫।

৪) চন্দননগর পুস্তকাগার / অরুন্ধতী সেনগুপ্ত : ঐ, ৩৭ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৫।

৫) চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ : তর্পণ , ১বর্ষ, ১২ সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৮৫।

৬) চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবন প্রসঙ্গে / শীতল দাস : গোধূলিমন, ২৪ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, মার্চ ১৯৮২।

৭) নৃসিংহ দাস বসু মেমোরিয়াল হল (কোন্নগর টাউন হল) প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস / বিষ্ণু দত্ত : সমন্বয়ে, ৩৭ জানুয়ারি ১৯৯৭।

৮) হুগলি কৃষ্টি পরিষদ প্রসঙ্গে / গোবিন্দ চন্দ্র পাল : তর্পণ ১ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৫।

৯) হুগলি জেলা সাধারণ গ্রন্থাগার ভাবনা / দিলীপ কুমার দে : উর্মি, ২৪ বর্ষ, অক্টোবর ১৯৯৪।

১০) ইতিহাসের আলোয় চন্দননগর যুব-সংঘ / স্বপন কুমার : চন্দননগর যুব সংঘ হীরক জয়ন্তী স্মারক পত্র ১৯৯৫।

১১) উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার — একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ / শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় : উ. জ. সা. পা. ১২৫ বর্ষপূর্তি স্মরণিকা, ১৯৮৪।

১২) উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরির ইতিবৃত্ত / রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : উ. জ. সা. পা. ১২৫ বর্ষপূর্তি স্মরণিকা, ১৯৮৪।

১৩) উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরি (অধিগ্রহণ পর্ব) / হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় : উ. জ. সা. পা. ১২৫ বর্ষপূর্তি স্মরণিকা, ১৯৮৪।

১৪) উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরি (উন্নয়ন আন্দোলন ও বর্তমান অধ্যায়) / নির্মল চন্দ্র চৌধুরী : উ. জ. সা. পা. ১২৫ বর্ষপূর্তি স্মরণিকা, ১৯৮৪।

১৫) কবি মধুসূদন ও উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি / সংকলিত : উ. জ. সা. পা. ১২৫ বর্ষপূর্তি স্মরণিকা, ১৯৮৪।

১৬) গ্রন্থাগারে শ্রী অরবিন্দ / অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় : উ. জ. সা. পা. ১২৫ বর্ষপূর্তি স্মরণিকা, ১৯৮৪।

১৭) উত্তরপাড়া হিতকরী সভা / ড. বসন্ত কুমার সামন্ত : ঐ, ঐ, ঐ।

১৮) চল্লিশ বছর পূর্বের বিস্মৃতপ্রায় এক কাহিনী / প্রমীলচন্দ্র বসু : হুগলি জেলা গ্রন্থাগর পরিষদ সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ ১৯৭৭।

১৯) হুগলির গ্রন্থাগার / সুধীর কুমার মিত্র : ঐ, ঐ।

২০) গ্রন্থাগার স্থাপনে ও আন্দোলনে হুগলি জেলার চার পথিকৃৎ / রতন কুমার দাস : ঐ, ঐ।

২১) হুগলি জেলা গ্রন্থাগার সমিতির ইতিবৃত্ত / ফনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : ঐ, ঐ।

২২) হুগলি - চুঁচুড়া গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে / হীরেন্দ্র কৃষ্ণ মল্লিক : বন্দেমাতরম শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ (২য় খন্ড), ১৯৭৬।

২৩) চন্দননগর পুস্তকাগার : স্মৃতিচারণ / ফটিকলাল দাস : লেখনী, ১৩ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ১৯৭৩।

২৪) বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার / মিঠু মুখোপাধ্যায় : গ্রন্থিক, বাঁশবেড়িয়া সংখ্যা, ১৯৮৩।

২৫) কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি / নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় : তিথিডোর ২ বর্ষ ৪ সংখ্যা ১৯৮৩।

২৬) হুগলি জেলা গ্রন্থাগার আন্দোলন / নির্মল চন্দ্র চৌধুরী / হুগলি সংবাদ, ২২ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ১৯৯৭।

২৭) হুগলি জেলার শতায়ু সাধারণ গ্রন্থাগার / শ্যামল কুমার সিংহ : ঐ, ঐ, ঐ।

২৮) হুগলি জেলার গ্রন্থাগার সমীক্ষা / অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা, ১৯৯০।

২৯) একটি দলিল ও জ্ঞানমন্দির কথা / বসন্ত কুমার সামন্ত : ঐ, ঐ, ঐ।

৩০) বাঁশবেড়িয়া গ্রন্থাগার আন্দোলন ও আমরা / অনিল কুমার দত্ত : ঐ, ঐ, ঐ।

৩১) উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার / শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

৩২) শতবর্ষ পরিক্রমা / বিজয়চন্দ্র কর্মকার : ঐ, ঐ, ঐ।

৩৩) ৭০এর আলোকে ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি / ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মারক গ্রন্থ, ত্রিবেণী সাধারণ পাঠাগার প্রাক্ প্লাটিনাম জয়ন্তী, ১৯৯২।

৩৪) এক নজরে হুগলি জেলার সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগার-এর তালিকা / ? : স্মরণিকা, বীণাপাণি স্মৃতি পাঠাগার, ১৯৯৮।

৮. শিক্ষা - সাক্ষরতা

১) অতীতের পাতা থেকে সাক্ষরতা আন্দোলন / কমল চট্টোপাধ্যায় : সাহিত্য-সেতু, ২৮ বর্ষ, ১২-১৩ সংখ্যা, ১ ও ১৫ অক্টোবর, ১৯৯৪।

২) আমার পরিবারের কেউ নিরক্ষর নয় / করুণা নাথ : ঐ, ঐ, ঐ।

৩) প্রসংগ বিদ্যালয় শিক্ষা ও হুগলি জেলা / তপন দাশগুপ্ত : ঐ, ঐ, ঐ।

৪) মধ্যশিক্ষার চালচিত্র, হুগলি জেলা সম্পর্কে / অজিত বাগ : ঐ, ঐ, ঐ।

৫) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, হুগলি জেলার অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু কথা / দুলাল ভৌমিক : সাহিত্যসেতু, ২৮ বর্ষ, ১২-১৩ সংখ্যা, ১ ও ১৫ অক্টোবর, ১৯৯৪।

৬) সাক্ষরোত্তর কর্মসূচী, গ্রন্থাগার এবং হুগলি জেলা / অশোক গঙ্গোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

৭) গুপ্তিপাড়ার প্রথম মহিলা শিক্ষিকা : প্রতিশ্রুতি, ১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৫।

৮) চন্দননগরের ঐতিহ্য - বিজ্ঞানে / মনীন্দ্রনাথ কুণ্ডু : মনতর্পণ, ৭ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮৯।

৯) চন্দননগর কলেজের ইতিহাস (ধারাবাহিক) / বসন্তকুমার সামন্ত : গোধূলিমন, ৩৫ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৩ থেকে মে ১৯৯৫ পর্যন্ত।

১০) বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয় : তর্পণ, ১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, মার্চ ১৯৮৫।

১১) হুগলি বিদ্যামন্দির / স্বর্ণকুমারী নন্দী : ভ্রমণবার্তা, ২৫ বর্ষ, ২ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৫।

১২) হুগলি জেলার সার্বিক সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য / পি. আর. দাশ : সাহিত্য-সেতু, ২৮ বর্ষ, ১২-১৩ সংখ্যা, ১ ও ১৫ অক্টোবর ১৯৯৪।

১৩) সাক্ষরতায় মহিলারা / বুলবুল সরকার : ঐ, ঐ, ঐ।

১৪) হুঁশিয়ার / শ্যামল কৃষ্ণ ঘোষ : ঐ, ঐ, ঐ।

১৫) সাক্ষরতা আন্দোলনে সংস্কৃতির ভূমিকা / শঙ্কর মুখোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

১৬) সাক্ষরতা : চোখের আলো / দিলীপ সাহা : ঐ, ঐ, ঐ।

১৭) ১৯৭৪ - ৯৪ দুই দশকের সাক্ষরতা চিন্তা / সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

১৮) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ও বংশবাটি / সুভাষ সেন : গ্রন্থিক বাঁশবেড়িয়া সংখ্যা ১৯৮৬।

১৯) ডাফ সাহেবের বিলুপ্ত স্কুল / মিহির নন্দন : ঐ, ঐ, ঐ।

২০) বাঁশবেড়িয়ার বিদ্যালয় একাল সেকাল / কৃষ্ণসাধন নন্দী : ঐ, ঐ, ঐ।

২১) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ও বাঁশবেড়িয়া / বারিদ বরণ ঘোষ : বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা ১৯৯০।

৯. সাহিত্য

১) বাঁশবেড়িয়ার বর্তমান সাহিত্য সংস্কৃতি প্রদক্ষিণ / অমিত কুণ্ডু : সাহিত্য সেতু, ২২ বর্ষ, ১১-২২ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৮৯।

২) নীলদর্পণের পটভূমি কি বাঁশবেড়িয়া / পিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী : কোয়েল, মে ১৯৮৩।

৩) দিগদর্শন প্রথম বাংলা সংবাদপত্র / অমলেন্দ্রনাথ ঘটক : ঐকতান, ২ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, জুলাই ১৯৯০।

৪)	মানুষজন / পত্রিকা ও তার কবি / চাঁপদানী বৈদ্যবাটী শেওড়াফুলি : সন্দীপন, ১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮১।

৫)	সাহিত্য পরিচিতি আকুনি, বাদপুর, মশাট / এ এফ কামরুদ্দীন আহমদ : ঐ, ঐ, ঐ।

৬)	হুগলি চুঁচুড়ার সাহিত্যচর্চা / শীতল দাস : সন্দীপন, ১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮১।

৭)	হিন্দমোটর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাহিত্য চর্চা / সুবল বণিক : ঐ, ঐ, ঐ।

৮)	সাহিত্যচর্চায় সিঙ্গুর / শ্রীমন্ত মালিক : ঐ, ঐ, ঐ।

৯)	জাঙ্গিপাড়ার সাহিত্যচর্চা / গৌতম ভড় : ঐ, ঐ, ঐ।

১০)	বলরামবাটি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল / সতী চট্টোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

১১)	সাম্প্রতিক সাহিত্যচর্চায় শ্রীরামপুরের অত্যুৎসাহী অপ্রধান সাহিত্য সেবীরা / কৃষ্ণচন্দ্র ভড় : সন্দীপন, ১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮১।

১২)	সাম্প্রতিক সাহিত্য চর্চার রূপরেখা (বাঁশবেড়িয়া) / জগবন্ধু কুণ্ডু : ঐ, ঐ, ঐ।

১৩)	ভদ্রেশ্বরের সাহিত্য সাধনা / জয়ন্ত কুমার চক্রবর্তী : ঐ, ঐ, ঐ।

১৪)	চন্দননগরের সাহিত্যচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিকথা / অশোক চট্টোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

১৫)	হুগলি জেলার লেখক লেখিকার নাম ঠিকানা / ঐ, ঐ, ঐ।

১৬)	হুগলি জেলার পত্রপত্রিকার নাম ঠিকানা / ঐ, ঐ, ঐ।

১৭)	সম্পাদকীয় ঐ, ঐ, ঐ।

১৮)	উত্তরাধিকার / সম্রাট সেন : সন্দীপন, ১৩ বর্ষ, / সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮১।

১৯)	বাংলার গর্ব খানাকুলের সাহিত্য / প্রশান্ত মানিক : সোনালী রোদ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

২০)	সাক্ষাৎকার / সোমনাথ মুখোপাধ্যায় : রক্তিমা, ৫ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯০।

২১)	সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যখন চুঁচুড়ায় / শীতল দাস : গোধূলিমন, ২৪ বর্ষ, ১১ - ১২ সংখ্যা, নভেম্বর - ডিসেম্বর ১৯৮২।

২২)	প্রথম মহিলা কবি কৃষ্ণকামিনী / বসন্ত কুমার সামন্ত : গোধূলিমন, ৩৬ বর্ষ, ৯-২ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৪।

২৩)	নজরুল সখা প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় / শীতল দাস : গোধূলিমন, ২৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৮২।

২৪)	ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে ছিন্নপত্রাবলী (চন্দননগরের পত্রপত্রিকা) / অরুণ মুখোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৭ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৫।

২৫)	হুগলি জেলা ও পত্রপত্রিকা / জগবন্ধু কুণ্ডু : সাহিত্যসেতু, ২৪ বর্ষ, ১০-১২ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭।

২৬) বাংলা সাময়িক পত্র সাহিত্যের প্রেক্ষিতে রিষড়া দর্পণ / শিশির দে : রিষড়া সমাচার, ৩ বর্ষ, অক্টোবর ১৯৯৪।

২৭) একনজরে নজরুল : হুগলি জেলা / জগবন্ধু কুণ্ডু : সাহিত্য-সেতু, ৩৩ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ১ জুলাই ৯৯।

২৮) সম্রাট সেন সংখ্যা : ঐকতান, ৬ বর্ষ, ১ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৩।

২৯) সম্রাট সেন সংখ্যা : সন্দীপন, ২৫ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।

৩০) সম্রাট সেন সংখ্যা : গোধূলিমন

৩১) প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা : সন্দীপন, ২২ বর্ষ, ১ সংখা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯।

৩২) প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় একটি জীবন / বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় : মনের ফসল, ১০ বর্ষ, ১৯৯২।

৩৩) সাধক কবি রামনাথ মুখোপাধ্যায় / মনীন্দ্রনাথ আশ : সেই সন্দীপন, ১বর্ষ, ৮ সংখ্যা, অক্টোবর - নভেম্বর ১৯৯৭।

৩৪) উত্তরপাড়া-ভদ্রকালী অঞ্চলের / তারক দাস মিত্র : উ. জ. সা. গ্র. ১২৫ বর্ষ পূর্তি স্মরণিকা, ১৯৮৪।

৩৫) হুগলি - চুঁচুড়ার পত্র - পত্রিকা / চন্দ্রশেখর দেবনাথ : বন্দেমাতরম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (২য় খন্ড), ১৯৭৬।

৩৬) স্বভাব কবি দ্বারকনাথ বসু / মনীন্দ্রনাথ আশ : সন্দীপন, ২৯ বর্ষ, ১ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।

৩৭) চন্দননগরের সাহিত্য : সাহিত্যের চন্দননগর / অরুণ মুখোপাধ্যায় : চন্দননগর যুব সংঘ হীরক জয়ন্তী স্মারকপত্র ৯৫।

১০. সংস্কৃতি

১) গায়ক প্রবর : রামচন্দ্র শীল / বসন্ত কুমার সামন্ত : গোধূলিমন, ৪০ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, মে ১৯৯৮।

২) সুরের ঝর্ণাধারায় বাঁশবেড়িয়ার অতীত ও বর্তমান / অশোক গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্যসেতু ২২ বর্ষ, ১০-১২ সংখ্যা জানু-জুন ১৯৮৯।

৩) তেলিনীপাড়ার শিল্প ও সঙ্গীতচর্চা (ধারাবাহিক) / সম্রাট সেন : গোধূলিমন, ৩৩ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯১ থেকে।

৪) কবিগানে হুগলি জেলা / বসন্তকুমার সামন্ত : গোধূলিমন, ৩৯ বর্ষ, ৯-১০ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৭।

৫) চন্দননগরের কিছু সাম্প্রতিক নাটক / নীলরতন কুণ্ডু : গোধূলিমন ৩০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা মার্চ ১৯৮৮।

৬) নাট্যরসিক পান্নাদা / নটরসিক : সুপ্তভানু, অক্টোবর ১৯৯৫।

৭) রিষড়ার প্রাচীন কয়েকজন লোকশিল্পী / মনীন্দ্রনাথ আশ : রিষড়া সমাচার, ৩ বর্ষ, অক্টোবর ১৯৯৪।

৮) রিষড়ার কয়েকজন প্রাচীন লোকশিল্পী / মনীন্দ্রনাথ আশ : রক্তিমা, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ - মার্চ ১৯৯৯।

৯) নাট্যতীর্থ শহর চন্দননগর / সুচারু দাস : চন্দননগর যুব সংঘ হীরকজয়ন্তী স্মারক ৯৫।

১০) উত্তরপাড়ার নাট্য চর্চা / ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় : উ. জ. সা. পা. বর্ষপূর্তি স্মরণিকা ১২৫, ১৯৮৪।

১১) হুগলি জেলার গান / বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় : হুগলি জেলার গ্রন্থাগার পরিষদ সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, ১৯৭৭।

১২) নাট্যশিল্প চর্চায় হুগলি চুঁচুড়া / অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় : বন্দেমাতরম শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ (২য় খন্ড), ১৯৭৬।

১৩) বাংলার সঙ্গ সংস্কৃতি উজ্জ্বলতম শহর / গোরাচাঁদ আঢ্য : ঐ, ঐ, ঐ।

১৪) চুঁচুড়ার মার্গ সঙ্গীতের অনুশীলন / বিভূতিভূষণ ধর : ঐ, ঐ, ঐ।

১৫) কালের কলসখানি ভেসে যায় / অজয় মিশ্র : গ্রন্থিক, বাঁশবেড়িয়া সংখ্যা, ১৯৮৬।

১৬) মঞ্চ যখন মুখরিত / অজয় মিশ্র : সাহিত্য-সেতু / ২২ বর্ষ, ১০-১২ সংখ্যা ১৯৮৯।

১১. লোকসংস্কৃতি

১) হুগলির তুষু / সলিল মিত্র : উর্মি ২৪ বর্ষ, অক্টোবর ১৯৯৪।

২) হুগলি জেলার ছেলে ভুলানো ছড়া : বঙ্গলক্ষ্মী, ৭ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২।

৩) আধুনিকতার আলোকস্পর্শে একটি প্রাচীন লোক উৎসব / জগবন্ধু কুণ্ডু : সাহিত্য-সেতু, ৩১ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৭।

৪) হুগলি জেলার প্রাণপ্রবাহ লোকউৎসব / জগবন্ধু কুণ্ডু : সাহিত্য-সেতু, ৩২ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯৯।

৫) হুগলির ব্রত পার্বণ / নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ গুহরাজা : গ্রন্থিক, উৎসব সংখ্যা ১৯৮৪।

৬) সংক্রান্তির লোকায়ত পরব 'ঘেঁটু' / নিলয় সরকার : ঐ, ঐ, ঐ।

৭) হুগলির ঝাঁপান উৎসব / বাসুদেব দাস : ঐ, ঐ, ঐ।

৮) গাজন / শ্যামলেন্দু ঘোষ হাজরা : ঐ, ঐ, ঐ।

৯) 'ডোমিংগো দ্য ক্রুজ' ম্রিয়মান 'আওয়ার লেডি অফ্ ভয়েজ' / অমিত সেন : ঐ, ঐ, ঐ।

১০) হুগলি : লোক সংস্কৃতির উপাদান / বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য-সেতু, ৩২ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ২৬ মার্চ, ১৯৯৯।

১১) লোকসংস্কৃতির পুনরুদ্ধার সম্ভব কি? / অজয় মিশ্র : সাহিত্যসেতু, ঐ, ঐ।

১২) হুগলি জেলার প্রচলিত ছড়া প্রবাদ / মনীন্দ্রনাথ আশ : রিষড়া সমাচার, ৮ বর্ষ, ১৯৯৯।

১২. ইতিহাস

১) দুশো বছর স্মরণে হুগলি জেলা ১৭৯৫ - ১৯৯৫ / কালিদাস হাজরা : যোগাযোগ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫।

২) আর্লেয়াঁ দুর্গের পত্তন ও পতন / শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৮ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৬।

৩) চন্দননগরের বয়স কত? তিনশো না তারো বেশী / বাসবী পাল : ঐ, ঐ, ঐ।

৪) ফরাসি চন্দননগরের সাদা কালো মানুষের কথা / বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৭ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৫।

৫) চন্দননগর / কিভাবে জেগে উঠেছিল শহর প্রতিমা / বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৮ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৬।

৬) চুঁচুড়ার কয়েকটি ঐতিহাসিক ভবন / দীপক রঞ্জন দাস : কৌশিকী, ১৫ বর্ষ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮।

৭) রিষড়া রেল স্টেশনের ইতিবৃত্ত / মনীন্দ্রনাথ আশ : কৌশিকী, ৮ বর্ষ, ১১ - ১২ সংখ্যা, মার্চ ৮৩।

৮) রেলপথে বঙ্গদর্শন / কালিদাস মৈত্র (কু.মু) : কৌশিকী ৩ বর্ষ, ১৯৯৭।

৯) ফরাসি চন্দননগরে নির্বাচন পদ্ধতি ছিল খুবই গণতান্ত্রিক : গোধূলিমন, ৩৩ বর্ষ, ৫-৬ সংখ্যা, মে-জুন ১৯৯১।

১০) ফরাসি আমলে গরুটি ও ফ্রেঞ্চ গার্ডেন / শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৭ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৫।

১৩. শিল্প

১) চন্দননগরের বয়ন শিল্প / হরিহর শেঠ : প্রবাসী, ২ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৯২৫।

২) তারকেশ্বরের তাগা শিল্প / কল্পনা : জানুয়ারি ১৯৮৩।

৩) তাঁতশিল্প আলো অন্ধকারে / আশুতোষ দে : উর্মি, ১৯ বর্ষ, ১৯৮৯।

৪) রঞ্জনশিল্পের অন্যতম কেন্দ্র ছিল রিষড়া / মনীন্দ্রনাথ আশ : সমন্বয়ে, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫।

৫) ধনেখালির তাঁতশিল্প / শৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু : অঙ্গীকার, ৪বর্ষ, ৫ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৬।

৬) আমাদের এলাকায় শিল্প সম্ভাবনা ও সমস্যা (ডানকুনি) / মলয় নন্দী : বিকাশ ৭ বর্ষ, অক্টোবর ১৯৯০।

৭) জলভরার ইতিকথা : গোধূলিমন, ৩৭ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৫।

৮) বাংলার ঐতিহ্য তাঁতের শাড়ি / সাগরিকা মুখোপাধ্যায় : রিষড়া সমাচার, ৩ বর্ষ, অক্টোবর ১৯৯৪।

৯) চিত্রশিল্প সাধনায় হুগলি-চুঁচুড়া / স্বপন আঢ্য : বন্দেমাতরম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (২য় খণ্ড) ১৯৭৬।

১০) বাঁশবেড়িয়ার কুটির শিল্প / নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ গুহরাজা : গ্রন্থিক, বাঁশবেড়িয়া সংখ্যা ১৯৮৬।

১৪. বংশ

১) কোন্নগর থেকে কলকাতায় / দেবাশিস বসু : সমন্বয়ে, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭।

২) কোন্নগর এবং অভিশপ্ত মিত্র বংশের এক শাখার ইতিহাস / অমল কুমার মিত্র : সমন্বয়ে, ২৪ মার্চ ১৯৯৩।

১৫. খেলাধূলা

১) একনজরে জেলার খেলাধূলা / শীতল দাস : মনতর্পণ, ৭ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯১।

২) জেলার খেলাধূলা / বাপ্পা সরকার : মনতর্পণ, ১ বর্ষ, ৩ সংখা, মার্চ ১৯৮৫।

৩) জেলার খেলাধূলা / বাপ্পা সরকার : মনতর্পণ, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৮৫।

৪) চুঁচুড়া ময়দানে ফ্লাডলাইটে ক্রিকেট খেলা / শীতল দাস : মনতর্পণ, ২য় বর্ষ, ৩ সংখ্যা, মার্চ ১৯৮৬।

৫) বাংলার দলনেত্রী (ভলিবল) / ঝুমা চক্রবর্তী / শীতল দাস : মনতর্পণ, ৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৮৮।

৬) খেলাধূলার কিছু কথা : মনতর্পণ, ২ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮৬।

৭) ক্রীড়াচঞ্চল হুগলি-চুঁচুড়া / শীতল দাস : বন্দেমাতরম্ শতবার্বিকী স্মারক গ্রন্থ (২য় খণ্ড), ১৯৭৬।

৮) বাঁশবেড়িয়ার খেলাধূলা ও শরীর চর্চা / ধনঞ্জয় পাল : গ্রন্থিক বাঁশবেড়িয়া সংখ্যা, ১৯৮৬।

৯) খেলাধূলায় হরিপাল / পঙ্কজ কুমার দাস : উর্মি, ১৯ বর্ষ, ১৯৮৯।

১০) ক্রীড়াঙ্গনে বাঁশবেড়িয়ার অতীত বর্তমান কিংবা অনাগত / সুবীর কুমার বসু : সাহিত্যসেতু, ২২ বর্ষ, ১০ - ২২ সংখ্যা, জানুয়ারি - মার্চ ১৯৮৯।

১১) চন্দননগরের ক্রীড়া - কৌতুক / হরিহর শেঠ : চন্দননগর যুব সংঘ হীরক স্মারক পত্র ১৯৯৫।

১৬. ব্যক্তিত্ব

১) দ্বারকানাথ বসু, খালিসানির কাব্যরসিক জমিদার / যোগীন্দ্রনাথ বসু : কৌশিকী ১৯৯৮।

২) পরমভাগবত হরিহর শেঠ / সুধীর কুমার মিত্র : গোধূলিমন, ৩৩ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯।

৩) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হরিহর শেঠ / শিবরাম কুণ্ডু : গোধূলিমন, ৩৪ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯২।

৪) ঐতিহাসিক হরিহর শেঠ / শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা।

৫) সমাজসেবী কমলপ্রসাদ ঘোষ / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : অক্টোবর ১৯৯৫।

৬) শতবর্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় : সাহিত্য-সেতু, ২৬ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ১ মে ১৯৯২।

৭) দর্পণে বসন্তবাবু (ডঃ বসন্তকুমার সামন্ত) / শীতল চৌধুরী : গোধূলিমন, ৪১ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, মার্চ - এপ্রিল ১৯৯৯।

৮) অক্ষয়চন্দ্র সরকার / অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় : সাহিত্য-সেতু, ২৭ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৩।

৯) সুধীর কুমার মিত্র : হুগলি চর্চার পুরোধাপুরুষ / পল্লব মিত্র : কৌশিকী, ৪ বর্ষ, ১৯৯৮।

১০) হুগলির ইতিবৃত্তকার সুধীর কুমার মিত্র / রামকৃষ্ণ সাঁতরা : উর্মি, ৪ বর্ষ, অক্টোবর ১৯৯৪।

১১) মানুষ কেশবচন্দ্র নাগ / পল্লব দে সরকার : ঐ, ঐ, ঐ।

১২) উত্তরপাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পরিচয় / অনেকে : উ. জ. সা. পা. ১২৫ বর্ষপূর্তি স্মরণিকা, ১৯৮৪।

১৩) দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন / দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী : হুগলী জেলার গ্রন্থাগার পরিষদ সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, ১৯৭৭।

১৪) হুগলি-চুঁচুড়ায় বঙ্কিম জীবন / অক্ষয় কুমার আঢ্য : বন্দেমাতরম্ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ (২য় খন্ড), ১৯৭৬।

১৫) হুগলি-চুঁচুড়ার ভূদেব মুখোপাধ্যায় / শ্যামল সেন : ঐ, ঐ, ঐ।

১৬) সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সাধনা / অশোক সরকার : ঐ, ঐ, ঐ।

১৭) মহাবিপ্লবী অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ / গোপেশ চন্দ্র মল্লিক : ঐ, ঐ, ঐ।

১৮) আমাদের ভূপতি দা / সিরাজুল হক : ঐ, ঐ, ঐ।

১৯) বহুমুখী প্রতিভাদীপ্ত নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় / বীরেন শিকদার : ঐ, ঐ, ঐ।

২০) আনন্দ আচার্য্য গৌরীশঙ্কর / রাধাকিশোর মল্লিক : ঐ, ঐ, ঐ।

২১) হুগলি জেলে কাজী নজরুল / বিমলকান্ত মুখোপাধ্যায় : বন্দে মাতরম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (২য় খণ্ড), ১৯৭৬।

২২) হাজি মহম্মদ মহসীন / পল্লব মিত্র : ঐ, ঐ, ঐ।

২৩) এক কৃতি শিক্ষক / কেশব চন্দ্র নাগ / মনীন্দ্রনাথ কুণ্ডু : বর্তমান ভারত পূজা সংখ্যা, ১৯৯৩।

২৪) বাঁশবেড়িয়ার অহঙ্কার / জগবন্ধু কুণ্ডু : গ্রন্থিক বাঁশবেড়িয়া সংখ্যা, ১৯৮৬।

২৫) সংগ্রামী শিল্পী সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় / জগবন্ধু কুণ্ডু : মেধা, ৪ বর্ষ, এপ্রিল ১৯৯৮।

২৬) শিল্পী সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মুখোমুখি / সন্ধ্যাশ্রী মুখার্জি : ঐ, ঐ, ঐ।

২৭) রামগোপাল ঘোষ : একটি স্মরণ সমীক্ষা / বারিদবরণ ঘোষ : মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ স্মারক গ্রন্থ, ১৯৯৫।

২৮) রামগোপাল ঘোষ : প্রসঙ্গ হুগলি জেলা দ্বিশতবর্ষ / জগদীশ ঘোষ : ঐ, ঐ, ঐ।

২৯) উনিশ শতকী পুনরুজ্জীবন ও রামগোপাল ঘোষ / বসন্ত কুমার সামন্ত : ঐ, ঐ, ঐ।

৩০) ইয়ং বেঙ্গল ও রামগোপাল ঘোষ / বীরেন্দ্র নাথ দত্ত : ঐ, ঐ, ঐ।

৩১) ডিরোজিও : উনিশ শতকীয় বঙ্গসমাজ ও রামগোপাল ঘোষ / শেখ ইশা হক : মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ স্মারক গ্রন্থ, ১৯৯৫।

৩২) অনন্য রামগোপাল / শিশির মুখোপাধ্যায় : মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ স্মারক গ্রন্থ, ১৯৯৫।

৩৩) রামগোপাল ও তাঁর সমকাল / সলিল ভট্টাচার্য : মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ স্মারক গ্রন্থ, ১৯৯৫।

১৭. স্বাধীনতা সংগ্রামী, আন্দোলন

১) বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : মনতর্পণ, ১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, জুন ১৯৮৫।

২) বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শতবর্ষ স্মরণিকা / অমলকুমার মিত্র : মনতর্পণ, ২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬।

৩) অমর শহীদ গোপীনাথ সাহা / অশোক চট্টোপাধ্যায় : মনতর্পণ, ৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০।

৪) বালক বিপ্লবী ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় / শ্রীএকলব্য : মনতর্পণ, ২ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, মার্চ ১৯৮৬।

৫) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / শ্রীএকলব্য : মনতর্পণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬।

৬) অমর কানাইলাল / শ্রীএকলব্য : মনতর্পণ, ৪ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, জুন ১৯৮৮।

৭) বিপ্লবী মনীন্দ্রনাথ নায়েক / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : মনতর্পণ, ২ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, মে ১৯৮৬।

৮) বিপ্লবী রাসবিহারী বসু / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ২ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, মে ১৯৮৬।

৯) বিপ্লবী তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৪ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯২।

১০) বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৩ বর্ষ, ১০-১১ সংখ্যা, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯১।

১১) বিপ্লবী বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৫ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৩।

১২) বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষ / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৫ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, মে ১৯৯৩।

১৩) বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯২।

১৪) বিপ্লবী মতিলাল রায় / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৪ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ৯২।

১৫) বিপ্লবী মনীন্দ্রনাথ নায়েক / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৫ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, জুলাই ৯৩।

১৬) বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৪ বর্ষ, ৮ সংখ্যা আগস্ট ৯২।

১৭) বিপ্লবী তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৪ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ডিসেম্বর ৯২।

১৮) বিপ্লবী চারুচন্দ্র রায় / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৪ বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি - মার্চ ১৯৯২।

১৯) চন্দননগরের বিপ্লবী নগেন্দ্রনাথ ঘোষ / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৫ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯৩।

২০) চন্দননগরের বিপ্লবী দুর্গাদাস শেঠ / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৫ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।

২১) চন্দননগর ও অগ্নিযুগ / বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : চন্দননগর যুবসংঘ হীরক জয়ন্তী স্মারক পত্র ৯৫।

২২) ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামে উত্তরপাড়ার ভূমিকা / মনোরঞ্জন হাজরা : উ. জ. সা. প্রা ১২ বর্ষ পূর্তি স্মরণিকা, ১৯৮৪।

২৩) রাষ্ট্রিক উত্থান-পতনে হুগলি-চুঁচুড়া / অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় : বন্দেমাতরম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (২য় খণ্ড), ১৯৭৬।

২৪) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে চন্দননগরের অবদান / মনীন্দ্রনাথ নায়েক : লেখনী, ১৩ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ১৯৭৩।

২৫) ত্রিবেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস প্রসঙ্গে / সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় : গ্রন্থিক, ত্রিবেণী সংখ্যা।

২৬) বাঁশবেড়িয়ার রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস / সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় : গ্রন্থিক বাঁশবেড়িয়া সংখ্যা, ১৯৮৬।

১৮. নদী

১) ভাগীরথী গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ পথের সন্ধানে / তপন কুমার দাস : রাঙ্গামাটি, ৫ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৯।

২) ডাইনে বাঁয়ে হুগলি নদী / সুবীর কুমার প্রামাণিক : ঐ, ঐ, ঐ।

৩) নদীরূপা সরস্বতী নদী / নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ গুহরাজা : গ্রন্থিক, ১৯৮০।

১৯. বিবিধ

১) বিংশ শতাব্দীতে রিষড়ার বহুভাষী জনসাধারণ ও কমলাকান্ত / সুবীর মুখোপাধ্যায় : রিষড়া সমাচার, ৩ বর্ষ, অক্টোবর ১৯৯৪।

২) হুগলি জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায় / জগৎপতি সরকার : ঐ, ঐ, ঐ।

৩) বাংলার টেরাকোটা / শম্ভুনাথ মিত্র : পাণ্ডুলিপি, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৪।

৪) প্রান্ত পরিক্রমণ (হরিপালের মানুষ) / কৌশিক রায় : ঊর্মি, ১৯ বর্ষ, ১৯৮৯।

৫) স্মরণীয় অতিথি স্মরণীয় ঐতিহ্য / অমলকুমার মিত্র : গোধূলিমন, ৩৫ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৩।

৬) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উত্তরপাড়া আগমন উপলক্ষে রচিত অভিনন্দন পত্র : আনন্দ, ১৯৯৬।

৭) একটি অতীত কথা (সাধারণী পত্রিকা) / শীতল দাস : সন্দীপন, ২৫ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।

৮) জেলা হুগলি উৎপত্তির পরিচয় ও বিশ্লেষণ / ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : বন্দনা, ৮৬।

৯) হুগলি জেলার হেটো বই / বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় : বন্দনা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪।

১০) রামরাম বসুর একটি পত্র / মনীন্দ্রনাথ আশ : বন্দনা, সেপ্টেম্বর।

১১) রিষড়া স্টেশন ও রেলগাড়ি / মনীন্দ্রনাথ আশ : সমন্বয়ে, ১৬ জানুয়ারি ১৯৯১।

১২) রত্নপ্রসূ হুগলি জেলা / কৃষ্ণধন গঙ্গোপাধ্যায় : মনতর্পণ, ৭ বর্ষ, ১ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯০।

১৩) শতবর্ষ আগে রবীন্দ্রনাথ ও চুঁচুড়ার পরিবেশ পরিজন / অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় : মনতর্পণ, ৩ বর্ষ, ২ ও ৩ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি - মার্চ ১৯৮৩।

১৪) সে যুগে চুঁচুড়ায় লীলাবতী অভিনয়ে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র উপস্থিত ছিলেন / শীতল চৌধুরী : গোধূলিমন, ৩১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮৯।

১৫) চন্দননগরে সুহাসিনী গাঙ্গুলির স্মৃতিফলক / অমল কুমার মিত্র : গোধূলিমন, ৪০ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৮।

১৬) চন্দননগর ঘিরে নামের পসরা / বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৯ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৭।

১৭) রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসংগীত ও চন্দননগর / শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : তিথিডোর, ৬ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৭।

১৮) হরিদাসের বুলবুল ভাজা / সোমেশ চট্টোপাধ্যায় : রিষড়া সমাচার, ৩ বর্ষ, অক্টোবর ১৯৯৪।

১৯) রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর অঞ্চল / শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : গোধূলিমন, ৩৫ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৩ থেকে ৩৬ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪।

২০) ফরাসি আমলে চন্দননগর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় / শিবরাম কুণ্ডু : গোধূলিমন, ২৯ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৭।

২১) রবীন্দ্রনাথ-পারুল দেবী-চন্দননগর / অমল মিত্র : গোধূলিমন, ৩৮ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, নভেম্বর ৯৬।

২২) নাম থেকে / বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ, ঐ, ঐ।

২৩) ফরাসি চর্চায় চন্দননগরের কৃতি মানুষেরা / বাসবী পাল : ঐ, ঐ, ঐ।

২৪) চন্দননগরে বিদ্যাসাগর / বলাই চাঁদ পাল ও আরতি ঘোষ : গোধূলিমন, ৩৯ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৭।

২৫) সংস্কৃতি চর্চায় প্রাচীন চন্দননগর / শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : চন্দননগর যুব সংঘ হীরক জয়ন্তী স্মারক পত্র ৯৫।

২৬) উত্তরপাড়ার চিকিৎসা ব্যবস্থা / ডা. এ. সি. চক্রবর্তী : উ. জ. সা. পা. ১২৫ বর্ষ পূর্তি স্মরণিকা, ১৯৮৪।

২৭) বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত শরৎসাহিত্য / অনিল কুমার দত্ত : হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, ১৯৭৭।

২৮) লিস্ট অফ লাইব্রেরিস ইন হুগলি ডিস্ট্রিক্ট : ঐ, ১৯৭৭।

২৯) চন্দননগরের সামাজিক জীবনে জগদ্ধাত্রী পুজার সার্থকতা / দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় : লেখনী, ৮ বর্ষ, ২ সংখ্যা ১৯৭১।

৩০) চন্দননগরের উদ্বাস্তু সমস্যা / শচীন্দ্র নাথ অধিকারী : ঐ, ঐ, ঐ।

৩১) উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণের বিচার / রাধারমণ দে : বর্তমান ভারত, পুজা সংখ্যা ১৯৯৩।

৩২) ত্রিবেণী ঘাট / বরুণ চক্রবর্তী : গ্রন্থিক, ত্রিবেণী সংখ্যা।

৩৩) ব্যান্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র / প্রশান্ত নন্দী চৌধুরী : গ্রন্থিক, ত্রিবেণী সংখ্যা।

৩৪) ত্রিবেণী টিস্যুস লি: সম্পর্কে কিছু কথা / সুনীলকান্তি সেনগুপ্ত : গ্রন্থিক, ত্রিবেণী সংখ্যা।

৩৫) প্রসঙ্গ রেয়ন / শচীন্দ্রনাথ দাশ : গ্রন্থিক, ত্রিবেণী সংখ্যা।

৩৬) ডানলপ, গ্যাঞ্জেস / শক্তিসাধন সিংহ : গ্রন্থিক, বাঁশবেড়িয়া সংখ্যা ১৯৮৬।

৩৭) শ্রীরামপুরের দে বাড়ী / নিখিল রঞ্জন ঘোষ : তিথিডোর ২ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ১৯৮৩।

৩৮) রবীন্দ্রনাথ ও হুগলি জেলা / হরিহর শেঠ : শ্রদ্ধার্ঘ্য বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার রবীন্দ্রজন্ম শত বার্ষিকী, ১৯৬১।

৩৯) সাহিত্য সংস্কৃতি ও চন্দননগর / নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় : স্মারক গ্রন্থ, চন্দননগর সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন ১৯৭৫।

৪০) জেলায় প্রকাশিত ক্ষুদ্র সংবাদপত্র এবং ক্ষুদ্র সাময়িকপত্র / শ্যামল কুমার সিংহ : স্মরণিকা, বীণাপাণি স্মৃতি পাঠাগার ১৯৯৮।

হুগলি চর্চা : বাংলা সাময়িকপত্রে

অশোক উপাধ্যায়

বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধ পঞ্জিকরণের কাজে হাত দিই এক যুগ আগে — মুর্শিদাবাদ সংক্রান্ত নিবন্ধের তালিকা প্রকাশিত হয় 'গণকণ্ঠ' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৮-তে। নদীয়া সংক্রান্ত এবং উত্তরবঙ্গ সংক্রান্ত তালিকা যথাক্রমে 'কৌশিকী' পত্রিকার ৩য় পর্যায় ১ম বার্ষিক সংখ্যা ১৯৯৫-তে, ও ৪র্থ বার্ষিক সংখ্যা ১৯৯৮-তে মুদ্রিত হয়েছে। হুগলি বিষয়ক নিবন্ধগুলির তালিকা এখানে সংকলিত হল। মূলত কলকাতার গ্রন্থাগারভিত্তিক এই তালিকা কখনওই সম্পূর্ণতার দাবিদার নয়। কোনও তালিকাই কি পূর্ণতা দাবি করতে পারে? বিশেষত সাম্প্রতিক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধগুলি এখানে গ্রহণ করা হয় নি।

তালিকাটি লেখকের নামের বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। পঞ্জির বিন্যাস এই রকম : প্রথমে লেখকের নাম, কালানুক্রমে প্রবন্ধের শিরোনাম, পত্রিকার নাম, পত্রিকার বর্ষ/সংখ্যা (কোথাও বর্ষ/ খণ্ড/সংখ্যা), মাস বছর, সব শেষে পৃষ্ঠাঙ্ক। চিত্র থাকলে 'সচিত্র' এই উল্লেখ রয়েছে। কোথাও সংযোজিত হয়েছে অতিরিক্ত তথ্য।

- **অঘোরনাথ দত্ত**

বঙ্গের ডেনিস্ উপনিবেশ। বিভা। ১/৭, ফাল্গুন ১২৯৪, পৃ ৩০২-৩০৭; ১/৯, বৈশাখ ১২৯৫, পৃ ৩৮১-৩৯০।

বল্লভপুর। প্রতিমা। ১/১, বৈশাখ ১২৯৭, পৃ ২৫-২৯।

পাণ্ডুয়া বা প্রদ্যুম্ননগর। প্রতিমা। ১/৭, কার্তিক ১২৯৭, পৃ ২৫৯-২৬৫।

ত্রিবেণী। জন্মভূমি। ১/৪, চৈত্র ১২৯৭, পৃ ২০৫-২১২।

সপ্তগ্রাম। জন্মভূমি। ১/৭, আষাঢ় ১২৯৮, পৃ ৩৯১-৩৯৮।

বাঙ্গালায় ওলন্দাজ বণিক্। জন্মভূমি। ১/৯, ভাদ্র ১২৯৮, পৃ ৫০১-৫০৯।

- **অজিতকুমার ভট্টাচার্য**

বল্লভপুরের বল্লভজীর কাহিনী। ভারতবর্ষ। ৪২/১/৪, আশ্বিন ১৩৬১, পৃ ৪৫৬-৪৫৭।

- **অজ্ঞাত**

পাণ্ডুয়া-স্তম্ভ। চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান এবং সমীরণ। ৩/৫, ১৩০৩, পৃ ৪২২-৪২৩।

চন্দননগর অধিকার। দাসী। ৬/১০-১১, অক্টোবর-নভেম্বর ১৮৯৭, পৃ ৪৭০-৪৭২।

ভক্তকবি মথুরেশ। ধর্ম্ম প্রচারক। ২১/৪, শ্রাবণ ১৮২০ শক, পৃ ৪১-৪৫; ২১/৫, ভাদ্র ১৮২০, পৃ ৫৮-৬০। গুপ্তিপাড়ার বাসিন্দা।

শ্রীরামপুরের পুরাবৃত্ত। সাহিত্য-সংহিতা। ২/৫, ভাদ্র ১৩০৮, পৃ ২৯৭ - ৩০০।

পণ্ডিত কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত। সাহিত্য-সংহিতা। ৮/১০-১১, মাঘ-ফাল্গুন ১৩১৪, পৃ ৪৩৭-৪৪২।

পাণ্ডুয়া-কাহিনী। ভারতবর্ষ। ১/১, আষাঢ় ১৩২০, পৃ ১০৮-১১২। সচিত্র।

রাজা রামচন্দ্র নন্দী। তাম্বুলি-পত্রিকা। ১/৬, পৌষ ১৩২১, পৃ ১৭৪-১৭৭।

পূর্ণচন্দ্র। গন্ধবণিক্। ৫/৬, আষাঢ় ১৩৩২, পৃ ২৩৭-২৪২; ৫/৭, শ্রাবণ ১৩৩২, পৃ ২৯৮-৩০১।

চুঁচুড়ার পূর্ণচন্দ্র সাহা প্রসঙ্গে। উদ্ভিদবিজ্ঞানী।

চণ্ডীপ্রতিষ্ঠা/দেশপরিচয়ের ধারা। প্রবর্ত্তক ১৪/১, বৈশাখ ১৩৩৬, পৃ ১৮-২৩।

চন্দননগরের বোড়াই চণ্ডী প্রসঙ্গে।

হুগলী জেলার গৌরব : ১ রামবল্লভী সম্প্রদায়। প্রবর্ত্তক। ১৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, পৃ ১১১-১১২।

হুগলী জেলার গৌরব : ২ ধর্ম্মপ্রচারক কৃষ্ণানন্দ। প্রবর্ত্তক। ১৪/৩, আষাঢ় ১৩৩৬, পৃ ২০৮।

হুগলী জেলার পুরাতন প্রসঙ্গ। সমাচার (চুঁচুড়া)। ১/৮, ২১ কার্তিক ১৩৩৮, পৃ ১৪।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'হুগলী জেলার পুরাতন প্রসঙ্গ' (১২ ভাদ্র ১৩৩৮) প্রবন্ধের পরিপূরক তথ্য।

প্রাচীন গৌরব/বঙ্গপরিচয়। উদ্বোধন। ২/১১, ফাল্গুন ১৩৪১, পৃ ১৪২৮-১৪৩৫। সচিত্র

বাঁশবেড়িয়া প্রসঙ্গে।

- **অনাথনাথ নন্দী**

পরলোকগত সমাজ-সেবী বেণীমাধব দাস। মোদক-হিতৈষিণী। ২/৯, আষাঢ় ১৩৩৬, পৃ ২৬৬-২৬৮।

- **অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়**

হুগলী জেলার প্রাচীন ইতিহাস। জাহ্নবী (নব পর্য্যায়)। ৪/১০, বৈশাখ ১৩২২, পৃ ৪২৩-৪২৫।

- **অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার : ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর দোলমঞ্চ। ভারতী। ২৯/১, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২, পৃ ১৬৪-১৬৮।

- **অমরচন্দ্র দত্ত**

হাজি মহম্মদ মহসীন। প্রদীপ। ২/৪, চৈত্র ১৩০৫, পৃ ১৩২-১৩৭। সচিত্র।

- **অমিতাভ ঘোষ**

প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার ও উইলিয়াম কেরীর বাষ্পের ইঞ্জিন। চতুষ্কোণ। ১৭/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, পৃ ১৩৪-১৪২।
গোলোকচন্দ্র কর্মকার প্রসঙ্গে।

- **অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

  দশঘরার মন্দির : একটি আবেদন। দেশ। ৩২/২৬, ৪ বৈশাখ ১৩৭২, ১৭ এপ্রিল ১৯৬৫, পৃ ১০৩৬-১০৪২। সচিত্র।

  হুগলীর মন্দির ভাস্কর্যকলা। দেশ। ৩২/২৭, সাহিত্য সংখ্যা, ২৫ বৈশাখ ১৩৭২, পৃ ৮১, ৮৩, ৮৫, ৮৭।

- **অমিয়লাল মুখোপাধ্যায়**

  হাটের রাজা—সেওড়াফুলি। ভারতবর্ষ। ৪৪/২/৫, বৈশাখ ১৩৬৪, পৃ ৫৭৩-৫৭৪; ৫৭৬। সচিত্র।

- **অমূল্যধন রায়ভট্ট**

  শ্রীমৎ কমলাকর পিপ্‌লাই। শ্রীগৌরাঙ্গসেবক। ১১/৩, বৈশাখ ১৩২৮, পৃ ৮৮-৯৫।

- **অম্বিকাচরণ গুপ্ত**

  ছড়া : হুগলী ভাঙ্গামোড়া হইতে সংগৃহীত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৩/১, ১৩০৩, পৃ ৬১-৬৪।

  তারকেশ্বর তীর্থ। অনুসন্ধান। ১১/১৮, ১৮ কার্তিক ১৩০৪, পৃ ২৮৩-২৮৬; ১১/২২, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৪, পৃ ৩৪৫-৩৪৮; ১১/২৪, ১ পৌষ ১৩০৪, পৃ ৩৮৩-৩৮৪; ১১/২৫, ৮ পৌষ ১৩০৪, পৃ ৩৯৬-৩৯৮।

  ভাঙ্গামোড়ার শ্রীশ্রী ̍ মদনমোহন জীউ। শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা। ৮/৭, শ্রাবণ ৪১৩ গৌরাব্দ, ১৩০৫, পৃ ২৯৪-৩০০।

  রামদাস আদকের অনাদি-মঙ্গল। অনুসন্ধান। ১৫/১, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮, পৃ ৭-৯; ১৫/২, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮, পৃ ৩৮-৪১, ১৫/১০, ১ শ্রাবণ ১৩০৮, পৃ ১৮৫-১৮৮।

  কবি জয়কৃষ্ণ দাস। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১৪/১, ১৩১৪, পৃ ২৫-৩৪।

  হুগলীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব। বাণী। ৪/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩১৮, পৃ ২৫৫-২৬৪।

  রণজিৎ রায়। প্রজাপতি। ৪/১, বৈশাখ ১৩১৯, পৃ ১৮-২১।

  স্বর্গীয় দিগম্বর বিশ্বাস। প্রজাপতি। ৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯, পৃ ২৫-২৮।

  বায়ড়া। প্রজাপতি। ৫/১০, মাঘ ১৩২০, পৃ ২৯৮-৩০২।
  (মৎপ্রণীত হুগলির ইতিহাস যন্ত্রস্থ তাহা হইতে সংগৃহীত)

  তড়া আঁটপুর। জন্মভূমি। ২২/৯, পৌষ ১৩২১, পৃ ৩১৪-৩১৯।

- **অরুণকুমার রায়**

  জগদ্ধাত্রী পুজা : কৃষ্ণনগর — চন্দননগর। মাসিক বসুমতী। ৪০/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮, পৃ ৩০৩-৩০৮।

- **অশ্বিনীকুমার সেন**

  হাজি মহম্মদ মসিন। ঐতিহাসিক চিত্র। ২/৯-১০, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১২, পৃ ৪৫৯-৪৬৪।

  সিপাহীবিদ্রোহে ভেতো বাঙ্গালী। ঐতিহাসিক চিত্র। ৩/৫-৬, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১৪, পৃ ২১০-২১৪।

'ফাইটিং মুনসেফ' প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে।

কিঙ্কর সেন। সুপ্রভাত। ৪/১২, আষাঢ় ১৩১৮, পৃ ৫৩৯-৫৪০।

জাঁদরেল কালু। ভারতী। ৩৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮, পৃ ৮১৪-৮১৭।

গৌরী সেন। ভারতবর্ষ। ১/৪, আশ্বিন ১৩২০, পৃ ৫৮১-৫৮৩।

সেনহাটী পীতাম্বর লাইব্রেরীর মাসিক অধিবেশনে পঠিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ১৩১৯ সালের ৭ই মাঘের অধিবেশনে পঠিত।

- আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়

বলাগড়-পরিচয়। পঞ্চপুষ্প। ৫/১/১, আষাঢ় ১৩৩৯, পৃ ৭৪-৭৮; ৫/১/৩, ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ ৩২২-৩২৭; ৫/২/৪, চৈত্র ১৩৩৯, পৃ ৪৩৪-৪৩৮; ৫/২/৫-৬, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৫৯৯-৬০০।

আটিসারা/আলোচনা। পঞ্চপুষ্প। ৬/১, আশ্বিন ১৩৪০, পৃ ৭-৮।

শ্রীজগদানন্দ, অনন্ত ও আটিসারা। ভারতবর্ষ। ২১/২/৩, ফাল্গুন ১৩৪০, পৃ ৩৯৬-৩৯৮।

- জনৈক আরামবাগবাসী

আরামবাগ। সমাচার (চুঁচুড়া)। ১/১, ৩০ আষাঢ় ১৩৩৮, পৃ ৪-৫।

- আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেকালের ভদ্রেশ্বর। নবযুগ। ১/২২, ২৬ পৌষ ১৩৩১, পৃ ৬১১-৬১৪।

- ইন্দ্রাণী রায়

চন্দননগরের আদি পর্ব : ১৬৯০ - ১৭৫৭। জিজ্ঞাসা। ২/২, শ্রাবণ-আশ্বিন। ১৩৮৮, পৃ ৭০৯-৭২২।

- উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিরত্ন

হুগলী জেলার পুরাতন প্রসঙ্গ। সমাচার (চুঁচুড়া) ১/৪, ১২ ভাদ্র ১৩৩৮, পৃ ৯-১০; ১/৬, ৯ আশ্বিন ১৩৩৮, পৃ ৬; ১/১১, ১০ পৌষ ১৩৩৮, পৃ ৬; ১/১২, ২৪ পৌষ ১৩৩৮, পৃ ৯; ১/১৩, ৯ মাঘ ১৩৩৮, পৃ ১২; ১/১৬, ২১ ফাল্গুন ১৩৩৮, পৃ ১১-১২; ১/১৭, ৬ চৈত্র ১৩৩৮, পৃ ১০; ১/১৮, ২০ চৈত্র ১৩৩৮, পৃ ৭-৮; ১/১৯, ৩ বৈশাখ ১৩৩৯, পৃ ৭-৮; ১/২০, ১৭ বৈশাখ ১৩৩৯, পৃ ১০; ১/২১, ৩১ বৈশাখ ১৩৩৯, পৃ ১০; ১/২২, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯, পৃ ১২; ১/২৩, ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯, পৃ ৮; ১/২৪, ১১ আষাঢ় ১৩৩৯, পৃ ১০।

হুগলী জেলার ইতিহাস (হুগলী)। মাসিক বসুমতী। ১২/২/৪ মাঘ ১৩৪০, পৃ ৬১০-৬১৭; ১২/২/৬, চৈত্র ১৩৪০, পৃ ৮৯৪-৮৯৬; ১৩/১/৩, আষাঢ় ১৩৪১, পৃ ৪০৪-৪০৭।

হুগলী জেলার ইতিহাস : হুগলীর ইমামবাড়ী ও মহম্মদ মসিন। মাসিক বসুমতী। ১৩/১/৪, শ্রাবণ ১৩৪১, পৃ ৫৮৮-৫৯১।

হুগলী জেলার ইতিহাস। মাসিক বসুমতী। ১৪/১/১, বৈশাখ ১৩৪২, পৃ ৪৬-৪৮।

নবাব খানজা খাঁ, হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট, মডেল বা আদর্শ বিদ্যালয়, হুগলী জেলার বালিকা বিদ্যালয়, হুগলী জেলার স্কুলসমূহ, হুগলী জেলার কলেজ।

হুগলী জেলার ইতিহাস। মাসিক বসুমতী। ১৪/১/৫, ভাদ্র ১৩৪২, পৃ ৮০৪-৮০৫।
হুগলী ও হেস্টিংস, ফ্র্যানসিস ও হেস্টিংস, হুগলী ও ভিখারী দাস।
হুগলী জেলার ইতিহাস। মাসিক বসুমতী। ১৫/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩, পৃ ২৬২-২৬৬। চুঁচুড়া।
হুগলী জেলার ইতিহাস। মাসিক বসুমতী। ১৫/২/৩, পৌষ ১৩৪৩, পৃ ৪৪১-৪৪৩। বৈদ্যবাটী।
হুগলী জেলার ইতিহাস। মাসিক বসুমতী। ১৫/২/৪, মাঘ ১৩৪৩, পৃ ৫৬৩-৫৬৪।
জনাই ও বাক্সা।
হুগলী জেলার ইতিহাস। ১৫/২/৬, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ৯৫৪-৯৫৬।
সেওড়াফুলি, কোতরঙ্গ ও ভদ্রকালী, শিয়াখালা, বলাগড়, দেবানন্দপুর।
হুগলী জেলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড। মাসিক বসুমতী। ১৯/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, পৃ ২০০-২০৪।
ভুরশুটের অতীত কাহিনী।
হুগলী জেলার ইতিহাস। মাসিক বসুমতী। ১৯/২/৪, মাঘ ১৩৪৭, পৃ ৫৮৪-৫৮৭। চন্দননগর।
হুগলী জেলার ইতিহাস। মাসিক বসুমতী। ১৯/২/৬, চৈত্র ১৩৪৭, পৃ ৮৮১-৮৮৪। বাঁশবেড়িয়া।
হুগলী জেলার ইতিহাস। মাসিক বসুমতী। ২১/১/৩, আষাঢ় ১৩৪৯, পৃ ৩২২-৩২৪। রিষড়া।

- **উপেন্দ্রনাথ সাহা**
  বাবা রামানন্দ। ধ্রুব। ১/১, বৈশাখ ১৩১৯, পৃ ১৬-১৮।

- **কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত**
  দিঘির মেলা। ২০/২৬, ১২ বৈশাখ ১৩৬০, পৃ ৭৯৩-৭৯৪। সচিত্র।
  ডিহি বায়ড়া গ্রামে রণজিৎ রায়ের দিঘির ধারে অনুষ্ঠিত মেলা প্রসঙ্গে।
  কুমারগঞ্জের ষষ্ঠীমূর্তি। দেশ। ২০/৩৬, ২০ আষাঢ় ১৩৬০, পৃ ৬৩৪-৬৩৬। সচিত্র।
  বাজুয়ার বিশালাক্ষী মন্দির। দেশ। ২০/৩৮, ২ শ্রাবণ ১৩৬০, পৃ ৭৯৫-৭৯৬। সচিত্র।

- **কালীপদ বিশ্বাস**
  ফরাসী চন্দননগরের ইতিহাস। দেশ ও দশ। আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ ৩১৩-৩১৬।

- **কিশোরীলাল দাস**
  স্বর্গীয় মিহিরলাল দাস। তন্তু ও তন্ত্রী। ৫/৬, আশ্বিন ১৩৩৫, পৃ ১৯১-১৯৩।

- **কৈলাসচন্দ্র সিংহ**
  রামলাল দত্ত। শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়। ১/৮, ভাদ্র ১৩২১, পৃ ২২২ - ২২৩; ১/৯, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২১, পৃ ২৫৩-২৫৪।

- **কৃষ্ণদাস চক্রবর্তী**
  দেবখণ্ড (হুগলী)/ গঞ্জগ্রাম। বর্তমান। ৩/১/৩, ভাদ্র ১৩৫৬, পৃ: ২৪০ - ২৪৩।
  আরামবাগ মহকুমার গ্রাম।

- **কৃষ্ণভাবিনী দেবী**
  কবি আটনি। যমুনা (নবপর্যায়) ৪/৫, ভাদ্র ১৩১৯, পৃ ১৩০-১৩৩।

- **গুরুদাস আদক**

  সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী। সুপ্রভাত। ৫/৫, অগ্রহায়ণ ১৩১৮, পৃ ২১৫-২২১। সচিত্র।

  ত্রিবেণী। যমুনা (নবপর্য্যায়)। ৫/৩, আষাঢ় ১৩২০, পৃ ১১৬-১১৮।

- **গুরুদাস রায়**

  হুগলী জেলায় প্রাচীন নগরী আবিষ্কার (মহানাদের ইতিবৃত্ত)। প্রবর্ত্তক। ১৮/১, বৈশাখ ১৩৪০, পৃ ১৫-২১। সচিত্র।

  মহানাদে প্রাচীন নগরী আবিষ্কার। উদয়ন। ১/৪, শ্রাবণ ১৩৪০, পৃ ৪০৬-৪১১। সচিত্র।

  মহানাদে প্রাচীন নগরী আবিষ্কার। ভারতবর্ষ। ২১/১/৩, ভাদ্র ১৩৪০, পৃ ৩৮১-৩৯০। সচিত্র।

  মহানাদে রাজধানী ও রাজবংশ/আলোচনা। প্রবর্ত্তক। ২০/২/৩, পৌষ ১৩৪২, পৃ ২৮৪-২৮৬।

  মহানাদের গুহ রাজবংশের বংশলতিকা সহ।

- **গোপাল মজুমদার**

  বঙ্গের সর্বাপেক্ষা পুরাতন গীর্জা। মাসিক বসুমতী। ৪৯/১/৬, আশ্বিন ১৩৭৭, পৃ ৯৪৯।

- **গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

  পুরানো কথা — কলিকাতার অদূরে। ভারতবর্ষ। ৭/২/২, মাঘ ১৩২৬, পৃ ১৯৮-২০২। সচিত্র।

  পুরাতন কথা — খাঞ্জা খাঁ। ভারতবর্ষ। ৭/২/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭, পৃ ৭৮৬-৭৮৮।

- **চারুচন্দ্র রায়**

  ফরাসি ভারতে স্বেচ্ছাসৈনিক। ভারতবর্ষ। ৩/২/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃ ৯৯২-৯৯৪। সচিত্র।

  চন্দননগরের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা : দাস ব্যবসায় — একখানি দাসখৎ। প্রবর্ত্তক। ৭/২, ফাল্গুন ১৩২৮, পৃ ৮৯-৯৭। সচিত্র।

  [পুনর্মুদ্রণ : অর্চ্চনা। ১৯/৩, বৈশাখ ১৩২৯, পৃ ১০৫-১১২।]

  ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। প্রবর্ত্তক। ৭/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, পৃ ২৮৫-২৯৬।

  চন্দননগরের যুদ্ধ : উদ্যোগ পর্ব্বাধ্যায়। প্রবর্ত্তক। ৭/৮, ভাদ্র ১৩২৯, পৃ ৪৮৯-৫০৫; ৭/১২, পৌষ ১৩২৯, পৃ ৭৩৭-৭৪৮।

  যোগীন্দ্রনাথ সেন। প্রবর্ত্তক। ৮/৪, বৈশাখ ১৩৩০, পৃ ২৪১-২৪৫।

  চন্দননগরে ফরাসী-বিপ্লব। প্রবর্ত্তক। ৯/৪, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ ২০১-২১৭।

- **চিরঞ্জীব শর্মা**

  রায় বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী বাহাদুর। নব্যভারত। ২২/২, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১, পৃ ৭০-৮৮।

- **জনরঞ্জন রায়**

  চন্দননগর। বর্তমান। ৩/১/৩, ভাদ্র ১৩৫৬, পৃ ১৯৯-২০১।

- **জহরলাল বসু**

  পাঁচালীকার রসিকচন্দ্র রায়। প্রবর্ত্তক। ২৩/২/৪, মাঘ ১৩৪৫, পৃ ৩৯৫-৪০০।

শতবর্ষ পূর্ব্বে মাহেশের রথযাত্রা। প্রবর্ত্তক। ২৪/১/৪, শ্রাবণ ১৩৪৬, পৃ ৩৫৩-৩৫৪।

- জীবনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

  ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম। নন্দিনী (শিবপুর, হাওড়া)। ৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, প ৪১-৪৭।

- জুলফিকার

  সপ্তগ্রাম। মাসিক বসুমতী। ৪৪/১/১, বৈশাখ ১৩৭২, পৃ ১০৭৩-১০৭৯ [১৭-২৩]।

- জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

  জগন্মাতা শ্রীজগদ্ধাত্রী। সংহতি। ২৮/৭, কার্তিক ১৩৬৮, পৃ ৩৮২-৩৮৫।

- জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন

  সপ্তগ্রাম। বিজয়া। ২/১০, আষাঢ় ১৩২১, পৃ ৯৪৫-৯৪৯।

- তপনকুমার রায়চৌধুরী

  সুবা বাংলার পর্তুগীজ বাসিন্দা (১) হুগলী সহর এবং বণিক ও পাদ্রী সম্প্রদায়। ইতিহাস। ১/১, ভাদ্র ১৩৫৭, পৃ ৬১-৬৯।

- তারানাথ রায়

  চন্দননগর বিপ্লব কেন্দ্র। মাসিক বসুমতী। ৩২/২/১, কার্তিক ১৩৬০, পৃ ৫১-৫৪; ৫৬-৫৮।

- তারাপদ চট্টোপাধ্যায়

  রাজা লক্ষ্মীকান্ত। অবসর। ২/৪, পৌষ ১৩১২, পৃ ১২৩-১২৪।

- দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

  গুপ্তিপাড়া-বৃন্দাবনচন্দ্র (আলোচনা)। মাসিক বসুমতী। ১৭/১/৪, শ্রাবণ ১৩৪৫, পৃ ৬৪০-৬৪১।

  জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৪৯/১, ১৩৪৯, পৃ ১-১৪।

  ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। প্রবাসী। ৪৭/১/৩, আষাঢ় ১৩৫৪, পৃ ২৪৩-২৪৭।

  রাঢ়দেশের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ। প্রবাসী। ৪৯/১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, পৃ ১১৩-১১৭।

  "হুগলী জেলার ইতিহাস"। প্রবাসী। ৫২/১/৪, শ্রাবণ ১৩৫৯, পৃ ৫০৩, ৫০৪-৫০৬।

  সুধীর কুমার মিত্রের লেখা 'হুগলী জেলার ইতিহাস'-এর সমালোচনা।

  ভূরশুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ। প্রবাসী। ৫২/১/৫, ভাদ্র ১৩৫৯, প ৫৩৫-৫৩৯।

  রায়বাঘিনী ও কালাপাহাড়। প্রবাসী। ৫৪/২/৩, পৌষ ১৩৬১, পৃ ২৭৭-২৮০।

- দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

  চারুচন্দ্র রায়। প্রবাসী। ৪৫/১/৩, আষাঢ় ১৩৫২, পৃ ১৮৩-১৮৫। সচিত্র।

- দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

  আঁটপুর। প্রবাসী। ৫২/২/৫, ফাল্গুন ১৩৫৯, পৃ ৫৮৮-৫৯২। সচিত্র।

- ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী

  সর্ব্বাধিকারী বংশ। জন্মভূমি। ১৫/৭, মাঘ ১৩১৩, পৃ ২৮৬-২৯১।

- ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী

  দেওয়ান ব্রজনাথ শূর। সদ্‌গোপ পত্রিকা। ২/৬, পৌষ ১৩৩৮, পৃ ১৯৯-২০৯।

- ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার

  'অমূল্য' প্রত্নশালা, রাজবলহাট। প্রবাসী। ৫৪/২/৬, চৈত্র ১৩৬১, পৃ ৬৯৬-৭০০। সচিত্র।

  অমূল্য প্রত্নশালা — রাজবলহাট। প্রবাসী। ৫৬/১/৩, আষাঢ় ১৩৬৩, পৃ ৩৩১-৩৩৬। সচিত্র।

- ধ্রুবচন্দ্র মল্লিক

  ত্রিবেণীর কথা। ভারতবর্ষ। ৩০/১/৬, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯, পৃ ৫৮৭-৫৯০। সচিত্র।

- নগেন্দ্রনাথ বসু

  হুগলীর পুরাতত্ত্ব উদ্ধার সম্বন্ধে বক্তব্য। জাহ্নবী (নবপর্য্যায়)। ২/৪, শারদীয়া সংখ্যা, কার্তিক ১৩১৯, পৃ ৩৫০-৩৫৭।

  পাণ্ডুভূমি-বিহার। প্রবর্ত্তক। ১৪/৬, আশ্বিন ১৩৩৬, পৃ ৪৯৪-৪৯৮।

  পাণ্ডুয়ায় বৌদ্ধ-বিহার। প্রবর্ত্তক। ১৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, পৃ ১৪৪-১৪৫।

  পাণ্ডুভূমি বিহার (প্রত্যুত্তর)। প্রবর্ত্তক। ১৫/৩, আষাঢ় ১৩৩৭, পৃ ২৪৩-২৪৫।

- নটবর দত্ত, পুরাতত্ত্বনিধি

  বিস্মৃত জনপদ — সপ্তগ্রাম। বিশ্ববাণী। ১৭/২, চৈত্র ১৩৬১, পৃ ৬৩-৬৮।

  স্বর্গীয় নটবর দত্ত মহাশয় Calcutta Municipal Gazette-এ শনিবার ৬ই মে ১৯৫০ তারিখের সংখ্যায় Saptagram : A Forgotten City of Bengal নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি নটবর দত্ত মহাশয়ের সেই ইংরাজী প্রবন্ধের বাঙলা ভাষায় স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। — ইতি, সম্পাদক, বিশ্ববাণী।

- ননীগোপাল দাশ

  মহানাদের মন্দির। প্রবর্ত্তক। ২৪/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, পৃ ১৫৩-১৫৬। সচিত্র।

  মহানাদের মন্দির প্রসঙ্গে।

- ননীগোপাল মজুমদার

  কবি বাণেশ্বর। বিজয়া। ৩/২, কার্তিক ১৩২১, পৃ ১৬৭-১৭৭।
  *....ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত

  গুপ্তপল্লীর পণ্ডিত সমাজ। ভারতবর্ষ। ২/২/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ ৯৪৪-৯৪৯।
  * ভবানীপুর-সাহিত্যসমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

- নন্দলাল দে

  প্রাচীন সপ্তগ্রাম। সুবর্ণবণিক্ সমাচার। ১/৪, ফাল্গুন ১৩২৩, পৃ ১১৯-১২২।

হুগলী জেলার ইতিহাস বা পুরাতন রাঢ়। প্রথম অধ্যায়। হুগলী জেলার সাধারণ ইতিহাস। সুবর্ণবণিক্ সমাচার। ৫/৭, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, পৃ ২৪১-২৪৭; ৫/৮, আষাঢ় ১৩২৮, পৃ ২৮১-২৮৭; দ্বিতীয় অধ্যায় হুগলী জেলার পুরাতন স্থান। ৫/৯, শ্রাবণ ১৩২৮, পৃ ৩৩৮-৩৪৫; তৃতীয় অধ্যায় হুগলি জেলার বিখ্যাত ঘটনা। ৫/১০, ভাদ্র ১৩২৮, পৃ ৩৬১-৩৬২।

- **নবকৃষ্ণ ঘোষ**

ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু। ধ্রুব। ১/৪, শ্রাবণ ১৩১৯, পৃ ৭৯-৮২; ১/৫, ভাদ্র ১৩১৯, পৃ ৯৯-১০২। সচিত্র।

- **নরেন্দ্রনাথ বসু**

ধর্ম্মবক্তা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। প্রবর্ত্তক। ৪১/৭, কার্তিক ১৩৬৩, পৃ ২৪৩-২৪৫। সচিত্র।

- **নলিনীকান্ত ঘোষ**

বল্লভপুর। বিশ্বজননী। ২/১, ফাল্গুন ১৩০৮, পৃ ৩-৮।

- **নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত**

শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও তাঁহার শ্রীপাট। প্রতিভা। ২/১০, মাঘ ১৩১৯, পৃ ৫৯৩-৫৯৭। (চুঁচুড়া সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত)

- **নারায়ণচন্দ্র দে**

সাগপ্ত তিলিজাতির বিবরণ। তিলি-বান্ধব (হাওড়া)। ৫/৩, আষাঢ় ১৩২০, পৃ ৪৯-৫৯।

পাণ্ডুয়ায় বৌদ্ধবিহার না হিন্দু মন্দির। প্রবর্ত্তক। ১৪/১২, চৈত্র ১৩৩৬, পৃ ১১১০-১১১২। সচিত্র।

পাণ্ডুয়ায় বৌদ্ধ-বিহার (প্রতিবাদের প্রতিবাদ)। প্রবর্ত্তক। ১৫/৩, আষাঢ় ১৩৩৭, পৃ ২৪১ - ২৪৩।

পল্লীর কথা : ইলছোবা মন্ডলাই/ দেশ পরিচয়ের ধারা। প্রবর্ত্তক। ১৫/৫, ভাদ্র ১৩৩৭, পৃ ৪০৯-৪১৪। সচিত্র।

পল্লীর কথা : জামগ্রাম ও পাণ্ডুয়া। বিচিত্রা। ৫/১/২, ভাদ্র ১৩৩৮, পৃ ২৬৫-২৭২। সচিত্র।

- **নূপুরচন্দ্র নাগ**

আশুতোষের বংশ-পরিচয়। মোদক-হিতৈষিণী। ১/১১, ভাদ্র ১৩৩৫, পৃ ৩৫১-৩৫৫।

আশুতোষ নাগ প্রসঙ্গে।

- **নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য**

গুপ্তিপাড়ার জোড়বাংলা ও তাহার নির্মাণকাল। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৮৩/৩-৪, ১৩৮৩, পৃ ৪৪-৫৪।

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা। ১৪/৪, কার্তিক-পৌষ ১৩৮৩, পৃ ৩২৯-৩৩৮।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৮৬/২-৩, ১৩৮৬, পৃ ২৫-৩৮।

গুপ্তিপাড়ার বাংলা মন্দির সমূহের নির্মাণকাল। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৯০/২, ১৩৯০, পৃ ১৬-২৩।

কালী মির্জা (১৭৫০-১৮২৫)। সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ১৬/২, শ্রাবন-আশ্বিন ১৩৯৭, পৃ ১৮৫-১৮৯।

- এন. রায়

বাঁশবেড়িয়ার কুণ্ডু বাবুদের ইতিবৃত্ত। তিলি-বান্ধব। ৪/৫, ভাদ্র ১৩১৯, পৃ ১০৮-১১৩।

- পঞ্চানন মণ্ডল

দ্বিজ গোলোকচন্দ্রের 'গিরিসংবাদ'। আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৩, পৃ ১৪৫-১৪৬।

- পরমেশপ্রসন্ন রায়

দুর্গেশনন্দিনী-নিকেতন। প্রবাসী। ১৯/১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬, পৃ ১২৯-১৩৬। সচিত্র।

- পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা। ভারতবর্ষ। ৫৩/২/৩, ফাল্গুন ১৩৭২, পৃ ৩০৮ - ৩১২। সচিত্র।

- পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"হুগলী" নামের উৎপত্তি। ভারতবর্ষ। ৫২/২/১, আষাঢ় ১৩৭১, পৃ ৭০-৭২।

ফরাসী চন্দননগরের কামান। প্রবর্ত্তক। ৪৯/৬, আশ্বিন ১৩৭১, পৃ ২৩৩-২৩৪। সচিত্র।

শক্তি সংগ্রামে চন্দননগর। ভারতবর্ষ। ৫২/২/৪, চৈত্র ১৩৭১, পৃ ৪২৬-৪৩০।

ক্লাইভের চন্দননগর অভিযান। প্রবাসী। ৬৬/১/৬, আশ্বিন ১৩৭৩, পৃ ৭১০-৭১২।

হুগলীর পাণ্ডুয়া। প্রবাসী। ৬৭/১/১, বৈশাখ ১৩৭৪, পৃ ৯৭-১০০।

ফরাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। প্রবাসী। ৬৭/১/৪, শ্রাবণ ১৩৭৪, পৃ ৪৭৩-৪৭৬।

চন্দননগরের Institut de Chandernagore প্রসঙ্গে।

- পিনাকীরঞ্জন কর্মকার

গুপ্তিপাড়ার জোড়-বাঙলা মন্দির। বিশ্ববাণী। ১৩/৯, কার্তিক ১৩৫৮, পৃ ৪১৩-৪১৫।

- পুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়

'গঙ্গাতীরে'র প্রতিবাদ। ভারতবর্ষ। ১২/১/৪, আশ্বিন ১৩৩১, পৃ ৬৩১-৬৩২।

সৃজননাথ মিত্র মুস্তৌফীর লেখা 'গঙ্গাতীরে' প্রবন্ধের (ভাদ্র ১৩৩১) প্রতিবাদ। আলোচ্য ডুমুরদহ জমিদার বংশের সম্পত্তি লাভের প্রকৃত ইতিহাস।

- পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর

"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন"। পঞ্চপুষ্প। ২/৬, আশ্বিন ১৩৩৬, পৃ ৭৭৫-৭৭৮।

- প্রকাশচন্দ্র সরকার

তারকেশ্বর। সাহিত্য-সমাজ। ১২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, পৃ ৬৬-৭১; ১২/৪, শ্রাবণ ১৩২৯, পৃ ১৫৭-১৬১।

তারকেশ্বরের ইতিহাস। সাহিত্য-সমাজ। ১২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৯, পৃ ৩৫২-৩৫৫; ১২/৯, পৌষ ১৩২৯, পৃ ৩৯৩-৩৯৪।

- **প্রভাতকুমার দত্ত**

  গুপ্তিপাড়ার মঠ। দেশ। ২৪/২২, ১৬ চৈত্র ১৩৬৩, পৃ ৫৮৯-৫৯১। সচিত্র।

  বাসুদেব মন্দির। দেশ। ২৪/২৭, ২১ বৈশাখ ১৩৬৪, পৃ৪৯-৫৫। সচিত্র। বাঁশবেড়িয়া বাসুদেব মন্দির প্রসঙ্গে।

  পাণ্ডুয়ার মুসলিম আমলের ভগ্নাবশেষ। দেশ। ২৫/১৪, ১৮ মাঘ ১৩৬৪, পৃ ৩৭-৩৯। সচিত্র।

- **প্রভাসচন্দ্র পাল**

  ত্রিবেণীর প্রাচীন ইতিহাস। প্রবর্ত্তক। ২৬/১/৩, আষাঢ় ১৩৪৮, পৃ ৩৩২-৩৩৩।

  রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রবর্ত্তক। ২৭/২/৩, পৌষ ১৩৪৯, পৃ ১৪০।

  ত্রিবেণী। বঙ্গশ্রী। ১১/২/২, মাঘ ১৩৫০, পৃ ২৩৯-২৪১।

  গুপ্ত-পল্লী। বঙ্গশ্রী ১২/১/৬, অগ্রহায়ণ ১৩৫১, পৃ ৩৫৮-৩৫৯।

  গুপ্ত-পল্লী। প্রবর্ত্তক। ২৯/১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩৫১, পৃ ৩৩৮-৩৩৯।

  সূর্য্যমূর্ত্তি। বঙ্গশ্রী। ১২/২/৫, বৈশাখ ১৩৫২, পৃ ৩৪৮।

  পাণ্ডুয়া । প্রবর্ত্তক। ৩১/৩, আষাঢ় ১৩৫৩, পৃ ১৪৫-১৪৬।

  রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস। ভারতবর্ষ। ৩৭/১/২, শ্রাবণ ১৩৫৬, পৃ ১২৫-১২৮। সচিত্র। মহানাদ।

  রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস। ভারতবর্ষ। ৩৭/২/২, মাঘ ১৩৫৬, পৃ ১০৬-১০৯। সচিত্র। দ্বারবাসিনী।

  প্রত্নতত্ত্বে কূর্ম্মাবতার মূর্ত্তি। সংহতি। ২২/১২, চৈত্র ১৩৬২, পৃ ৬০৮-৬০৯।

  সিংহপুর। সংহতি। ২৯/৯, পৌষ ১৩৬৯, পৃ ৪২৫ - ৪২৭।

- **প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**

  মহানাদের গুহ রাজবংশ। ভারতবর্ষ। ২৪/২/৩, ফাল্গুন ১৩৪৩, পৃ ৩৯১-৩৯৩।

  হুগলী জেলার মন্দিরে ইটের কারুকাজ। ভারতবর্ষ। ২৫/১/৪, আশ্বিন ১৩৪৪, পৃ ৬৩৩-৬৩৯। সচিত্র।

  সিংহপুর বা বর্ত্তমান সিঙ্গুর। ভারতবর্ষ। ২৬/১/২, শ্রাবণ ১৩৪৫, পৃ ২৪৮-২৫২। সচিত্র।

- **প্রমথনাথ ঘোষ**

  গোষ্ঠীপতি কিঙ্কর সেন। কায়স্থ-সমাজ। ১০/১২, চৈত্র ১৩৩৬, পৃ ৫৮৩-৫৮৯।

  গোষ্ঠীপতি কিঙ্কর সেন (প্রতিবাদের উত্তর)। কায়স্থ-সমাজ। ১১/৯-১০, পৌষ-মাঘ ১৩৩৭, পৃ ৩৬৪-৩৭৯।

- **প্রমথনাথ সেন**

  শ্রীশ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের কথা। দেশ। ১/১৫, ১৯ ফাল্গুন ১৩৪০, পৃ ৩৮-৪১।

- **প্রমথনাথ সেন দেবভূতি**

  লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন? ভারতবর্ষ। ১৭/২/২, মাঘ ১৩৩৬, পৃ ৩০৬।

- **প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন**

  অন্ধকবি কেনারাম নন্দী। প্রবর্ত্তক। ২১/২/৬, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ৬৪৮-৬৪৯।

- **প্রিয়দর্শন হালদার**

  গড়মান্দারণ। আর্য্যভূমি। ২/৩, আষাঢ় ১৩১৫, পৃ ৪৯-৫২।

কঙ্কর সেন। আর্য্যভূমি। ২/৪, শ্রাবণ ১৩১৫, পৃ ৭৭-৮০।

- **ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী**

ব্যাণ্ডেল সহরের পুরাবৃত্ত। ইতিহাস। ৩/২, অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩৫৯, পৃ ১১৭-১২২।

দো-সতীনা। ৩৪/৭, কার্তিক ১৩১৭, পৃ ৫৫৯ - ৫৬০

- **বজ্রমিত্র [হীরেন মিত্র]**

বাংলার লোকউৎসব ও লোকশিল্প : চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা। যুগান্তর। ২৪/৪০, ২৯ অক্টোবর ১৯৬০, ১২ কার্তিক ১৩৬৭, পৃ ৮, স্ত ২-৪।

- **বটুকৃষ্ণ সিংহ**

আক্না। কায়স্থ-সমাজ। ৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, পৃ ৬২-৬৬; ৬/৮-৯, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৩২, পৃ ৪৫১-৪৫৭।

আক্না নন্দিনীপুর। কায়স্থ-সমাজ। ৮/১, বৈশাখ ১৩৩৪, পৃ ৩২-৪৩।

বাসুকী-কুল-গাথা। কায়স্থ-সমাজ। ১১/৫-৬, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩৭, পৃ ২৬৭-২৭৩।

- **বলরাম রায়**

রাজা ক্রোরী সন্তোষ রায়। বামাবোধিনী পত্রিকা। ৩৫/৩৯৩, আশ্বিন ১৩০৪, পৃ ২২৭-২৩১।

- **বলাইচাঁদ আঢ্য**

চুঁচুড়ার মণ্ডল-বংশ। সুবর্ণবণিক্-সমাচার। ১৭/১১, আশ্বিন ১৩৪০, পৃ ৫১৩-৫১৬।

- **বলাইচাঁদ দত্ত দেবভূতি**

দাতাকর্ণ গৌরী সেন। বৈশ্য-শক্তি। ১/১২, আশ্বিন ১৩৩৬, পৃ ৬০০-৬০২।

- **বামাচরণ চক্রবর্তী**

পাণ্ডুয়ার বিবরণ/সংবাদদাতার পত্র। সোমপ্রকাশ ২১/১৮, ৪ চৈত্র ১২৮৫, পৃ ২৮৭-২৮৮।

- **বিকাশ সরকার**

য়ুরোপ মহাসমরে প্রথম বাঙ্গালী সৈনিকদল। সদ্‌গোপ পত্রিকা। ২/৬, পৌষ ১৩৩৬, পৃ ১৯৬-১৯৯। সচিত্র।

- **বিজয়গোপাল বসু**

ব্যাণ্ডেলের আদিকথা। হিন্দু। ২৫/৪২, ১৩ মাঘ ১৩৫৭, পৃ ৫১৬।

হুগলীর গৌরব—সপ্তগ্রাম। হিন্দু। শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৯, পৃ ১৮-২০।

- **বিপিনবিহারী চক্রবর্তী**

দো-সতীনা। ৩৪/৭, কার্তিক ১৩১৭, পৃ ৫৫৯-৬৬০।

ভগবতীডাঙ্গা। প্রতিভা (ঢাকা)। ২/৫, ভাদ্র ১৩১৯, পৃ ৩০৭।

- **বিপ্রদাস নন্দী**

চন্দননগরের সঙ্গীত-চর্চার কথা। প্রবর্ত্তক। ৪৩/৮, অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, পৃ ২৮৩-২৮৫; ৪৩/৯,

পৌষ ১৩৬৫, পৃ ৩৩৩-৩৩৪; ৪৩/১০, মাঘ ১৩৬৫, পৃ ৩৬৭-৩৬৮।

- **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বৈদ্যবাটী)**

  দিল-আকাশ ও বাগদী রাষ্ট্র। পাঠশালা। ৫/৪, পৌষ ১৩৪৮, পৃ ১৫৫।

  সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ। পাঠশালা। ৫/৮, বৈশাখ ১৩৪৯, পৃ ৩৩১-৩৩৩।

  অপরমান্দারণ বা গড়মান্দারণ। পাঠশালা। ৬/৬, ফাল্গুন ১৩৪৯, পৃ ২৪৩-২৪৪।

  দুইটি মূর্ত্তির পরিচয়। ভারতবর্ষ। ৩০/২/৩, ফাল্গুন ১৩৪৯, পৃ ২৩৭। সচিত্র।

- **বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়**

  চারুচন্দ্র রায়। ভারতবর্ষ। ৪৭/১/২, শ্রাবণ ১৩৬৬, পৃ ১৫০-১৫২।

- **বিশ্বেশ্বর দত্ত**

  প্রতাপপুরের বসুবংশ। কায়স্থ-সমাজ। ১০/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, পৃ ৩৯২-৪১০।

- **বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ**

  মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি। ভারতবর্ষ। ১৭/১/৬, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, পৃ ৯৬৫-৯৬৬।

  প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। ভারতবর্ষ। ২১/১/৫, কার্তিক ১৩৪০, পৃ ৭৬৫-৭৬৮।

- **ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**

  পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। প্রবাসী। ৩০/১/৩, আষাঢ় ১৩৩৭, পৃ ৩৬০-৩৬৫। সচিত্র। ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখায় পঠিত।

- **ভাগবতদাস বরাট**

  গৌরী সেন। ভারতবর্ষ। ৫২/২/৩, ফাল্গুন ১৩৭১, পৃ ৩২৩-৩২৪।

- **ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়**

  সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম। সমীক্ষা (বর্ধমান)। ১ম খণ্ড, আশ্বিন ১৩৭৮, পৃ ৭-১৫।

- **ভোলানাথ দত্ত**

  সপ্তগ্রাম ও মহাত্মা উদ্ধারণ দত্ত / বিবিধ প্রসঙ্গ। ভারতবর্ষ। ৮/২/৫, বৈশাখ ১৩২৮, পৃ ৫৬২-৫৭১। সচিত্র।

- **মতিলাল রায়**

  প্রথম বাঙ্গালী সৈনিকদল। প্রবাসী। ১৭/১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪, পৃ ১৮৩-১৮৫। সচিত্র।

- **মনোজিৎ বসু**

  পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমা : হুগলি। বসুধারা। ২/১/৩, আষাঢ় ১৩৬৫, পৃ ৩৩০-৩৩৬; ২/১/৪, শ্রাবণ ১৩৬৫, পৃ ৪৫৩-৪৫৯। সচিত্র।

- **মনোমোহন নরসুন্দর**

  হুগলীর পল্লীকবি রসিক রায়। প্রবাসী। ৩০/১/৫, ভাদ্র ১৩৩৭, পৃ ৬৩৭-৬৪১।
  ✱ ঊনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্যশাখায় পঠিত

  হুগলী জেলার ছেলেভুলানো ছড়া। বঙ্গলক্ষ্মী। ৭/৪, ফাল্গুন ১৩৩৮, পৃ ২৩৮-২৪১।

- **মানিক ঘোষাল**

  হংসেশ্বরী। মাসিক বসুমতী। ৪৯/১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭, পৃ ২৮৬-২৮৭।

- **মুনীন্দ্রদেব রায়**

  বাঁশবেড়িয়া বা বংশবাটী। ভারতবর্ষ। ১২/১/৫, কার্তিক ১৩৩১, পৃ ৬৫৫-৬৭০। সচিত্র।

  পাণ্ডুয়া। ভারতবর্ষ। ১২/২/২, মাঘ ১৩৩১, পৃ ২৫০-২৬৩। সচিত্র।

  ডাকাতি-দমন। মানসী ও মর্ম্মবাণী। ১৭/১/২, চৈত্র ১৩৩১, পৃ ১৫০-১৫৭; ১৭/১/৩, বৈশাখ ১৩৩২, পৃ ২৬৯-২৭৪; ১৭/১/৪, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, পৃ ৩৪৮-৩৫৫। সচিত্র।

  সপ্তগ্রাম। মাসিক বসুমতী। ৩/২/৬, চৈত্র ১৩৩১, পৃ ৮৩৩-৮৪৩; ৪/১/২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, পৃ ২০৪-২১২; ৪/১/৫, ভাদ্র ১৩৩২, পৃ ৬৭১-৬৮১। সচিত্র।

  ব্যাণ্ডেল। ভারতবর্ষ। ১২/২/৫, বৈশাখ ১৩৩২, পৃ ৬৯১-৭০৭। সচিত্র।

  দক্ষিণ রাঢ়। ভারতী। ৫০/৬, আশ্বিন ১৩৩৩, পৃ ৮৮০-৮৮৪।

  হুগলীর ইতিহাসের এক অধ্যায়। কুরুক্ষেত্র। ১/১, আশ্বিন ১৩৩৫, পৃ ৩৪-৪৪। সচিত্র।
  ✱ হুগলি জেলার প্রথম ঐতিহাসিক সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ

  মহানাদ। কুরুক্ষেত্র। ১/২, কার্তিক ১৩৩৫, পৃ ৮৫-৯৩। সচিত্র।

  হুগলী বরফডাঙ্গার মাঠ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ২২ কল্প ৩ ভাগ ১০৩২ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৬, ১৮৫১ শক, পৃ ১২৪।

  জ্ঞানচর্চ্চায় হুগলী। সমাচার। ১/১২, ২৪ পৌষ ১৩৩৮, পৃ ১১-১২; ১/১৩, ৯ মাঘ ১৩৩৮, পৃ ৮। (বিগত ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুর সাধারণ পাঠাগারের ষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা)

  জ্ঞান-চর্চায় হুগলী। প্রবর্ত্তক। ১৬/১১, ফাল্গুন ১৩৩৮, পৃ ৯৮১-৯৮৭।

  হুগলীর কথা। পঞ্চপুষ্প। ৫/১/৫, কার্তিক ১৩৩৯, পৃ ৬৬৫-৬৭৩; ৫/১/৬, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯, পৃ ৭৯৩-৭৯৯; ৫/২/২, মাঘ ১৩৩৯, পৃ ১৬১-১৬৬; ৫/২/৪, চৈত্র ১৩৩৯, পৃ ৫০২-৫১২; ৫/২/৫-৬ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০, পৃ ৬৬০-৬৬৫।

  বর্ত্তমান হুগলী। প্রবর্ত্তক। ১৯/১, বৈশাখ ১৩৪১, পৃ ৯৫-১০২; ১৯/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, পৃ ২০৬-২১৩; ১৯/৩, আষাঢ় ১৩৪১, পৃ ২৬৬-২৭২।

- **মোজাম্মেল হক**

  পাণ্ডুয়ার মিনার। মাসিক মোহাম্মদী। ১/১০, শ্রাবণ ১৩৩৫, পৃ ৫৮৫-৫৮৭।

- **মোহাম্মদ আন্‌জম্‌**

  শূজা খাঁর মুবারক মঞ্জিল/আলোচনা। প্রবাসী। ৩১/১/৩, আষাঢ় ১৩৩৮, পৃ ৩৩২-৩৩৩।
- **যতীন্দ্রনাথ মিত্র**

  হুগলীর ইতিবৃত্ত। আর্য্যভূমি। ২/১, বৈশাখ ১৩১৫, পৃ ৩-৫।

  লর্ড পদ্মলোচন। অর্ঘ্য। ২/১১, শ্রাবণ ১৩১৯, পৃ ৩৩১- ৩৩৩।

  উত্তরপাড়ার পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে।
- **যতীন্দ্রমোহন রায়**

  হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়। সাহিত্য। ২৬/১১, ফাল্গুন ১৩২৩, পৃ ৭৫৯-৭৬৬।

  অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত 'হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়' গ্রন্থের সমালোচনা।
- **যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার**

  রায়বাঘিনী। মাতৃ-মন্দির। ৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, পৃ ৬০-৬২।
- **যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়**

  ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। প্রবর্ত্তক। ৭/১, মাঘ ১৩২৮, পৃ ৪১-৪৬; ৭/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, পৃ ২৮৫-২৯৬; ৭/৬, আষাঢ় ১৩২৯, পৃ ৩৪৫-৩৫১।
- **যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ**

  মহানাদের কথা/আলোচনা। প্রবর্ত্তক। ২০/২/৫, ফাল্গুন ১৩৪২, পৃ ৫২৯-৫৩০।
- **যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত**

  প্রাচীন সপ্তগ্রাম। প্রবর্ত্তক। ৩০/১/৪, শ্রাবণ ১৩৫২, পৃ ১৪৮-১৫০; ৩০/১/৫, ভাদ্র ১৩৫২, পৃ ১৯৪-১৯৮।
- **যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি**

  আরামবাগ-পরিচয়। প্রবাসী। ৪০/২/৬, চৈত্র ১৩৪৭, পৃ ৭১৯-৭২৫।

  আরামবাগের উদ্ধারকল্পনা। প্রবাসী। ৪১/১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, পৃ ১৭৫-১৮২।

  আরামবাগের দুঃখ। যুগান্তর সাময়িকী। ১৮/১০৫, ১৭ পৌষ ১৩৬১, ২ জানুয়ারী ১৯৫৫, পৃ ৯, স্ত ৪-৬; ১০, ৩-৫, ৬।
- **রমেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ**

  মহানাদ। পঞ্চপুষ্প। ৬/১, আশ্বিন ১৩৪০, পৃ ৫-৭; ৬/২, কার্তিক ১৩৪০, পৃ ১৭৪-১৭৬।
- **রমেশচন্দ্র বসু**

  প্রথম বাঙালী খৃষ্টান। সমালোচনী। ৩/৯, পৌষ ১৩১১, পৃ ২৮৪-২৯০।

  কৃষ্ণচন্দ্র পাল প্রসঙ্গে।
- **রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য**

  বিস্মৃত কবি বাণেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। ভারতবর্ষ। ৫১/১/১, আষাঢ় ১৩৭০, পৃ ৬৮-৭২।
- **রাখালরাজ রায়**

  সিংহল-পাটন/বিবিধ প্রসঙ্গ। ভারতবর্ষ। ৩/২/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃ ৯৬১-৯৬২।

- **রাধারমণ চৌধুরী**

  প্রাচীন পল্লী গুপ্তিপাড়া। প্রবর্ত্তক। ২০/১/৫, ভাদ্র ১৩৪২, পৃ ৫১৫-৫১৯।

- **রামপ্রসাদ মজুমদার**

  চন্দননগরে যাদুঘর। প্রবর্ত্তক। ৫২/৪, শ্রাবণ ১৩৭৪, পৃ ১৩৬।

- **রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়**

  যোদ্ধা প্যারীমোহন। প্রদীপ। ১/১, পৌষ ১৩০৪, পৃ ৩৩-৩৮। সচিত্র।

  প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে।

- **শরৎচন্দ্র ঘোষ**

  *দিগম্বর বিশ্বাস। সদ্‌গোপ পত্রিকা। ২/৩, আশ্বিন ১৩৩৬, পৃ ৭৪-৭৯।

- **শিবচন্দ্র দত্ত**

  আরামবাগ/বাংলার সম্পদ্‌। আর্থিক উন্নতি। ৪/১০, মাঘ ১৩৩৬, পৃ ৭২১-৭২২।

  বাংলার গ্রাম্য-জীবন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ (শ্রীরামপুর হইতে কামারকুণ্ডু)। আর্থিক উন্নতি। ৭/৭, কার্তিক ১৩৩৯, পৃ ৫২৯-৫৩১।

- **শিবপদ সেন**

  ফরাসী বিপ্লব ও চন্দননগর। ইতিহাস। ২/১, ভাদ্র ১৩৫৮, পৃ ৩১-৪৩।

- **শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী**

  হুগলী নামের ইতিহাস। অর্চ্চনা। ১৮/৮, আশ্বিন ১৩২৮, পৃ ৩১০-৩১১।

- **শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ**

  হুগলী। মাসিক বসুমতী। ৪৭/১/৫, ভাদ্র ১৩৭৫, পৃ ৮২২-৮২৫। সচিত্র

- **শ্যামলাল গোস্বামী**

  সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী। অর্ঘ্য। ৪/১, আশ্বিন ১৩২০, পৃ ২৮-৩১।

  * Bengal Past and Present নামক মাসিক পত্রিকার Saptagram and Tribeni নামক প্রবন্ধাবলম্বনে লিখিত।

- **শ্রীতীর্থঙ্কর**

  বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরী মন্দির/মন্দিরে মন্দিরে। অমৃত। ১/২০, ৫ আশ্বিন ১৩৬৮, পৃ ৫৯৭-৫৯৮। সচিত্র।

  তারকেশ্বর/মন্দিরে মন্দিরে। অমৃত। ১/২২, ১৯ আশ্বিন ১৩৬৮, পৃ ৭৫৭-৭৫৮। সচিত্র।

- **শ্রীপতি কবিরত্ন**

  গুপ্তিপাড়ার মঠ। শান্তি-কণা (ঢাকা)। অবতরণিকা, ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭, পৃ ৪১-৪৩; সন্ন্যাস, ২/৩-৪, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৭, পৃ ৯০-৯২; তান্ত্রিক সন্ন্যাস, ২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৭, পৃ ১৬১-১৬৫; মন্দির, ৩/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৮, পৃ ১১১-১১৬।

- **সত্যচরণ নন্দী**

  পরলোকগত শ্রীনাথচন্দ্র দাস। মোদক-হিতৈষিণী। ২/৩, পৌষ ১৩৩৫, পৃ ৮৭-৮৮।

- **সত্যচরণ নাগ**

  মহাত্মা আশুতোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী। মোদক-হিতৈষিণী। ১/১১, ভাদ্র ১৩৩৫, পৃ ৩৪২-৩৪৭। আশুতোষ নাগ প্রসঙ্গে।

- **সন্তোষনাথ শেঠ**

  কর্মবীর ও স্বনাম পুরুষ ধন্য ভুবন চাঁদ কুণ্ডুর জীবনী। তিলি-বান্ধব (হাওড়া)। ৩/৬, আশ্বিন ১৩১৮, পৃ ১২৯-১৩৪।

  স্বর্গীয় কাশীনাথ কুণ্ডুর জীবনী। তিলি-বান্ধব। ৩/১০, মাঘ ১৩১৮, পৃ ২২৪-২২৯।

- **সমীরণ দাশগুপ্ত**

  চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা-উৎসব। অমৃত। ২/২৭, ২৩ কার্তিক ১৩৬৯, ৯ নভেম্বর ১৯৬২, পৃ ১১৮-১২০।

- **সাগরচন্দ্র কুণ্ডু**

  জ্যোতির্ব্বিৎ ফাদার জসেফ মারিয়া জের্‍্যা এবং তাঁহার গ্রহণগণনা। সাহিত্য-সংহিতা। ৫/৪-৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩১১, পৃ ২৬৬-২৭১।

- **সারদাচরণ মিত্র**

  যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী। কায়স্থ-পত্রিকা (নবপর্য্যায়)। ৭/৭, কার্তিক ১৩২৩, পৃ ৪৩০-৪৪২।

- **সিদ্ধেশ্বর রায়**

  সাহাগঞ্জ-কাহিনী। মন্দার-মালা। ৩/১২, শ্রাবণ ১৩২৩, পৃ ৩৬-৪২।

- **সুধীরকুমার মিত্র**

  জেজুরের কাহিনী। উদয়ন। ১/৩, আষাঢ় ১৩৪০, পৃ ৩১১।

  জেজুরের কৃতী ব্যক্তিগণ। কায়স্থ-পত্রিকা। ৩২/৫, ভাদ্র ১৩৪০, পৃ ১৬৯-১৭১।

  ত্রিবেণী। প্রবাসী। ৪৫/২/৩, পৌষ ১৩৫২, পৃ ২৩৮-২৪৩। সচিত্র।

  পাণ্ডুয়ার ইতিকথা। মাসিক বসুমতী। ২৪/২/৩, পৌষ ১৩৫২, পৃ ৩২১-৩২৩। সচিত্র।

  শ্রীরামপুর। প্রবাসী। ৪৫/২/৬, চৈত্র ১৩৫২, পৃ ৫৩৭-৫৪৫। সচিত্র।

  মনীষার শ্রীক্ষেত্র হুগলী জেলা। বঙ্গশ্রী। ১৩/২/৪, চৈত্র ১৩৫২, পৃ ৩৩৬-৩৩৯। সচিত্র।

  হুগলী। প্রবাসী। ৪৬/১/৪, শ্রাবণ ১৩৫৩, পৃ ৩৭৪-৩৮৪। সচিত্র।

  ভূরিশ্রেষ্ঠ। প্রবর্তক। ৩১/৪, শ্রাবণ ১৩৫৩, পৃ ১৯৯-২০১।

  বংশবাটী। বঙ্গশ্রী। ১৪/১/৩, ভাদ্র ১৩৫৩, পৃ ২৪৩-২৫২। সচিত্র।

  রঘুনাথদাস গোস্বামী। ভারতবর্ষ। ৩৪/১/৫, কার্তিক ১৩৫৩, পৃ ৩৯৩-৩৯৮। সচিত্র।

  মাহেশে জগন্নাথদেবের রথ। বঙ্গশ্রী। ১৪/১/৬, অগ্রহায়ণ ১৩৫৩, পৃ ৫৫২ - ৫৫৫। সচিত্র।

- **রাধারমণ চৌধুরী**

  প্রাচীন পল্লী গুপ্তিপাড়া। প্রবর্ত্তক। ২০/১/৫, ভাদ্র ১৩৪২, পৃ ৫১৫-৫১৯।

- **রামপ্রসাদ মজুমদার**

  চন্দননগরে যাদুঘর। প্রবর্ত্তক। ৫২/৪, শ্রাবণ ১৩৭৪, পৃ ১৩৬।

- **রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়**

  যোদ্ধা প্যারীমোহন। প্রদীপ। ১/১, পৌষ ১৩০৪, পৃ ৩৩-৩৮। সচিত্র।

  প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে।

- **শরৎচন্দ্র ঘোষ**

  *দিগম্বর বিশ্বাস। সদ্‌গোপ পত্রিকা। ২/৩, আশ্বিন ১৩৩৬, পৃ ৭৪-৭৯।

- **শিবচন্দ্র দত্ত**

  আরামবাগ/বাংলার সম্পদ্। আর্থিক উন্নতি। ৪/১০, মাঘ ১৩৩৬, পৃ ৭২১-৭২২।

  বাংলার গ্রাম্য-জীবন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ (শ্রীরামপুর হইতে কামারকুণ্ডু)। আর্থিক উন্নতি। ৭/৭, কার্তিক ১৩৩৯, পৃ ৫২৯-৫৩১।

- **শিবপদ সেন**

  ফরাসী বিপ্লব ও চন্দননগর। ইতিহাস। ২/১, ভাদ্র ১৩৫৮, পৃ ৩১-৪৩।

- **শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী**

  হুগলী নামের ইতিহাস। অর্চ্চনা। ১৮/৮, আশ্বিন ১৩২৮, পৃ ৩১০-৩১১।

- **শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ**

  হুগলী। মাসিক বসুমতী। ৪৭/১/৫, ভাদ্র ১৩৭৫, পৃ ৮২২-৮২৫। সচিত্র

- **শ্যামলাল গোস্বামী**

  সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী। অর্ঘ্য। ৪/১, আশ্বিন ১৩২০, পৃ ২৮-৩১।

  ✶ Bengal Past and Present নামক মাসিক পত্রিকার Saptagram and Tribeni নামক প্রবন্ধাবলম্বনে লিখিত।

- **শ্রীতীর্থঙ্কর**

  বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরী মন্দির/মন্দিরে মন্দিরে। অমৃত। ১/২০, ৫ আশ্বিন ১৩৬৮, পৃ ৫৯৭-৫৯৮। সচিত্র।

  তারকেশ্বর/মন্দিরে মন্দিরে। অমৃত। ১/২২, ১৯ আশ্বিন ১৩৬৮, পৃ ৭৫৭-৭৫৮। সচিত্র।

- **শ্রীপতি কবিরত্ন**

  গুপ্তিপাড়ার মঠ। শান্তি-কণা (ঢাকা)। অবতরণিকা, ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭, পৃ ৪১-৪৩; সন্ন্যাস, ২/৩-৪, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৭, পৃ ৯০-৯২; তান্ত্রিক সন্ন্যাস, ২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৭, পৃ ১৬১-১৬৫; মন্দির, ৩/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৮, পৃ ১১১-১১৬।

- **সত্যচরণ নন্দী**

পরলোকগত শ্রীনাথচন্দ্র দাস। মোদক-হিতৈষিণী। ২/৩, পৌষ ১৩৩৫, পৃ ৮৭-৮৮।

- **সত্যচরণ নাগ**

মহাত্মা আশুতোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী। মোদক-হিতৈষিণী। ১/১১, ভাদ্র ১৩৩৫, পৃ ৩৪২-৩৪৭। আশুতোষ নাগ প্রসঙ্গে।

- **সন্তোষনাথ শেঠ**

কর্ম্মবীর ও স্বনাম পুরুষ ধন্য ভুবন চাঁদ কুণ্ডুর জীবনী। তিলি-বান্ধব (হাওড়া)। ৩/৬, আশ্বিন ১৩১৮, পৃ ১২৯-১৩৪।

স্বর্গীয় কাশীনাথ কুণ্ডুর জীবনী। তিলি-বান্ধব। ৩/১০, মাঘ ১৩১৮, পৃ ২২৪-২২৯।

- **সমীরণ দাশগুপ্ত**

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা-উৎসব। অমৃত। ২/২৭, ২৩ কার্তিক ১৩৬৯, ৯ নভেম্বর ১৯৬২, পৃ ১১৮-১২০।

- **সাগরচন্দ্র কুণ্ডু**

জ্যোতির্ব্বিৎ ফাদার জসেফ মারিয়া জেরোঁ এবং তাঁহার গ্রহনগণনা। সাহিত্য-সংহিতা। ৫/৪-৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩১১, পৃ ২৬৬-২৭১।

- **সারদাচরণ মিত্র**

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী। কায়স্থ-পত্রিকা (নবপর্য্যায়)। ৭/৭, কার্তিক ১৩২৩, পৃ ৪৩০-৪৪২।

- **সিদ্ধেশ্বর রায়**

সাহাগঞ্জ-কাহিনী। মন্দার-মালা। ৩/১২, শ্রাবণ ১৩২৩, পৃ ৩৬-৪২।

- **সুধীরকুমার মিত্র**

জেজুরের কাহিনী। উদয়ন। ১/৩, আষাঢ় ১৩৪০, পৃ ৩১১।

জেজুরের কৃতী ব্যক্তিগণ। কায়স্থ-পত্রিকা। ৩২/৫, ভাদ্র ১৩৪০, পৃ ১৬৯-১৭১।

ত্রিবেণী। প্রবাসী। ৪৫/২/৩, পৌষ ১৩৫২, পৃ ২৩৮-২৪৩। সচিত্র।

পাণ্ডুয়ার ইতিকথা। মাসিক বসুমতী। ২৪/২/৩, পৌষ ১৩৫২, পৃ ৩২১-৩২৩। সচিত্র।

শ্রীরামপুর। প্রবাসী। ৪৫/২/৬, চৈত্র ১৩৫২, পৃ ৫৩৭-৫৪৫। সচিত্র।

মনীষার শ্রীক্ষেত্র হুগলী জেলা। বঙ্গশ্রী। ১৩/২/৪, চৈত্র ১৩৫২, পৃ ৩৩৬-৩৩৯। সচিত্র।

হুগলী। প্রবাসী। ৪৬/১/৪, শ্রাবণ ১৩৫৩, পৃ ৩৭৪-৩৮৪। সচিত্র।

ভূরিশ্রেষ্ঠ। প্রবর্ত্তক। ৩১/৪, শ্রাবণ ১৩৫৩, পৃ ১৯৯-২০১।

বংশবাটী। বঙ্গশ্রী। ১৪/১/৩, ভাদ্র ১৩৫৩, পৃ ২৪৩-২৫২। সচিত্র।

রঘুনাথদাস গোস্বামী। ভারতবর্ষ। ৩৪/১/৫, কার্তিক ১৩৫৩, পৃ ৩৯৩-৩৯৮। সচিত্র।

মাহেশে জগন্নাথদেবের রথ। বঙ্গশ্রী। ১৪/১/৬, অগ্রহায়ণ ১৩৫৩, পৃ ৫৫২ - ৫৫৫। সচিত্র।

চণ্ডীতলা। বঙ্গশ্রী। ১৪/২/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪, পৃ ৫২৯-৫৩১। সচিত্র।

চুঁচুড়ার ইতিবৃত্ত। বঙ্গশ্রী। ১৫/১/৬, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪, পৃ ৫৩১-৫৩৬; ১৫/২/১, পৌষ ১৩৫৪, পৃ ৩৫-৪১। সচিত্র।

ভদ্রেশ্বর। বঙ্গশ্রী। ১৫/২/৩, ফাল্গুন ১৩৫৪, পৃ ২১২-২১৫।

গুপ্তিপাড়া। বঙ্গশ্রী। ১৮/২/২, মাঘ ১৩৫৭, পৃ ১৬১-১৬৪। সচিত্র।

গুপ্তিপাড়া। প্রবাসী। ৫৩/২/৬, চৈত্র ১৩৬০, পৃ ৭০১-৭০৫। সচিত্র।

রাজবলহাট। প্রবাসী। ৫৬/২/৫, ফাল্গুন ১৩৬৩, পৃ ৫৭৮-৫৮৩। সচিত্র।

গোস্বামী-মালিপাড়া। প্রবর্ত্তক। ৪৬/৮, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮, পৃ ২৭৯-২৮২।

মাহেশের ইতিবৃত্ত। সংহতি। ৪০/১০, মাঘ ১৩৮০, পৃ ৩৯৫-৩৯৮।

- **সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়**

দরাপ খাঁ গাজী। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ৫/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৪, পৃ ২০১-২০২।

- **সুরেন্দ্রনাথ নন্দী**

জামগ্রামের নন্দী। তিলি-বান্ধব। ৩/১০, মাঘ ১৩১৮, পৃ ২২০-২২৪।

- **সুরেন্দ্রনাথ মিত্র**

হুগলি জেলার কতিপয় প্রাচীন স্থান। অর্ঘ্য। ২/৮, বৈশাখ ১৩১৯, পৃ ২৩০-২৩৬। খলসিনি, ভুরসুট, মাহেশ, সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, সিঙ্গুর।

হুগলী জেলার কবিওয়ালা। অর্ঘ্য। ২/৯, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯, পৃ ২৮০-২৮৫; ৩/২, কার্তিক ১৩১৯, পৃ ৩৩-৩৮।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে হুগলী জেলা। অর্ঘ্য। ২/১১, শ্রাবণ ১৩১৯, পৃ ৩৩৬-৩৪০।

এণ্টনি-প্রসঙ্গ। অর্ঘ্য। ২/১২, ভাদ্র ১৩১৯, পৃ ৩৫৭-৩৬০।

বঙ্গসাহিত্যে হুগলী জেলার প্রভাব। অর্ঘ্য। ৩/৩, অগ্রহায়ণ ১৩১৯, পৃ ৮৯-৯৩।

মুসলমানশাসনে হুগলী। বন্দনা। ১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, পৃ ৭৭-৭৯।

হুগলী জেলার পল্লীকথা : কোন্নগর। অর্ঘ্য। ৩/১১, শ্রাবণ ১৩২০, পৃ ২৯৫-২৯৮।

হুগলী জেলার কবির কথা। যমুনা (নবপর্য্যায়)। ৬/১, বৈশাখ ১৩২১, পৃ ১৬-১৮।

হুগলীর ফৌজদার। অর্চ্চনা। ১২/১১, পৌষ ১৩২২, পৃ ৪১২-৪১৭।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ। ভারতী। ৪৩/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৬, পৃ ৬২৫-৬৩৫। সচিত্র।

- **সুরেন্দ্রনাথ সিংহ**

বৈঁচির দেউল। তাম্বুলি-পত্রিকা। ১/২, ভাদ্র ১৩২১, পৃ ৩৭-৪০।

- **সুরেন্দ্রমোহন বসু**

তারকেশ্বর তীর্থ। সাহিত্য-সংহিতা (হাওড়া)। ২/৮, ফাল্গুন ১৩১৯, পৃ ৩৫৬-৩৫৯।

- **সুরেশচন্দ্র ঘোষ**

  বংশবাটীর হংসেশ্বরী/মাধুকরী। উদ্বোধন। ৩৮/৯, আশ্বিন ১৩৪৩, পৃ ৮৪৯-৮৫২।

  বসুমতী থেকে পুনর্মুদ্রিত।

- **সুরেশচন্দ্র ঘোষাল**

  সপ্তগ্রামে সরস্বতী নদী। মাসিক বসুমতী। ৩৭/২/৬, চৈত্র ১৩৬৫, পৃ ৯২০-৯২৪।

- **সুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী**

  রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান "রাধানগর"। প্রবর্ত্তক। ১৮/১০, মাঘ ১৩৪০, পৃ ৯০২-৯০৬।

- **সৃজননাথ মিত্র মুস্তৌফী**

  গঙ্গাতীরের প্রতিবাদের উত্তরে/বাদ-প্রতিবাদ। ভারতবর্ষ। ১২/২/১, পৌষ ১৩৩১, পৃ ১৩১-১৩২।

  পুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রতিবাদের (আশ্বিন ১৩৩১) প্রত্যুত্তর।

  উলার মুস্তৌফী বংশ। কায়স্থ-পত্রিকা। ২৭/৪, শ্রাবণ ১৩৩৫, পৃ ১৫৯-১৬৩; ২৯/৪, শ্রাবণ ১৩৩৭, পৃ ১৫৫-১৬১।

  যথাক্রমে, শ্রীপুরের শাখা এবং সুখাড়িয়ার শাখা।

- **স্নেহাংশু আচার্য**

  "মধুসূদন দত্ত কি একজন?"/আলোচনা। প্রবাসী। ৫৬/১/৫, ভাদ্র ১৩৬৩, পৃ ৬৩৪।

- **হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়**

  পাণ্ডুয়া। ঐতিহাসিক চিত্র। ৪/১০, মাঘ ১৩১৫, পৃ ৪৭৮-৪৮৬।

  বৈদ্যবাটী "যুবক-সমিতি" গৃহে পঠিত।

- **হরিদাস নন্দী**

  নিত্যধামপ্রাপ্ত সাক্ষিগোপাল বড়াল। শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক। ১৬/২, চৈত্র ১৩৩৪, পৃ ১১১-১১৫।

- **হরিপ্রসন্ন সরকার**

  শ্রীরামপুর। নির্ম্মাল্য। ১/৭, শ্রাবণ ১৩১৭, পৃ ১৮৬-১৮৮।

- **হরিসাধন মুখোপাধ্যায়**

  সেকালের সপ্তগ্রাম [তিন শত বৎসরের পূর্ব্বের কথা]। সাহিত্য। ২৪/১০, মাঘ ১৩২০, পৃ ২৮২-২৮৯।

- **হরিহর শেঠ**

  একখানি পুরাতন দলিল। প্রদীপ। ৭/৫, ভাদ্র ১৩১১, পৃ ১৭১-১৭৬।

  বাহিরের দৃষ্টিতে চন্দননগর। নবযুগ। ২/২১, ১১ পৌষ ১৩২২, পৃ ৭১৯-৭২৫। সচিত্র।

  চন্দননগর ও শিল্প-প্রদর্শনী। প্রবাসী। ১৫/২/৫, ফাল্গুন ১৩২২, পৃ ৪৫৯-৪৬৩। সচিত্র।

দুপ্লের সময়ে চন্দননগর। কল্পতরু। ভারতবর্ষ। ৩/২/৪, চৈত্র ১৩২২, পৃ ৬৭৪-৬৭৮। সচিত্র।
ওয়াটসনের পদপ্রান্তে শৃঙ্খলিত বন্দী চন্দননগর ও কলিকাতা। ভারতবর্ষ। ১০/২/৪, চৈত্র ১৩২৯, পৃ ৫৫৮-৫৬০। সচিত্র।
চন্দননগর-পরিচয় : পুরাতন যুগ। মাসিক বসুমতী। ৩/১/৩, আষাঢ় ১৩৩১, পৃ ৩৪৮-৩৬১; ৩/১/৪, শ্রাবণ ১৩৩১, পৃ ৪৭৪-৪৮৮।
চন্দননগরের সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ-পরিচয়। প্রবাসী। ২৪/১/৬, আশ্বিন ১৩৩১, পৃ ৭৬৪-৭৮৪। সচিত্র।
চন্দননগরের গীত ও বাদ্য। প্রবর্ত্তক। ৯/১০, কার্তিক ১৩৩১, পৃ ৬২১-৬২৭। সচিত্র।
চন্দননগরের বাঙ্গালী সৈনিক। ভারতবর্ষ। ১২/২/১, পৌষ ১৩৩১, পৃ ৬৮-৭৮। সচিত্র।
চন্দননগরের কথক, কবিওয়ালা ও যাত্রা। প্রবাসী। ২৪/২/৪, মাঘ ১৩৩১, পৃ ৫০৬-৫১৬। সচিত্র।
চন্দননগরের সাধক ও সিদ্ধপুরুষ। ভারতবর্ষ। ১২/২/২, মাঘ ১৩৩১, পৃ ২২৫-২৩১। সচিত্র।
চন্দননগরের দেবালয় ও উপাসনাগার। প্রবাসী। ২৪/২/৫, ফাল্গুন ১৩৩১, পৃ ৬১২-৬২১। সচিত্র।
চন্দননগরের আদি পরিচয় ও বঙ্গে ফরাসীদের আদিস্থান নির্ণয়। প্রবাসী। ২৪/২/৬, চৈত্র ১৩৩১, পৃ ৭৭৯-৭৯১। সচিত্র।
চন্দননগরের ক্রীড়া-কৌতুক। ভারতবর্ষ। ১২/২/৪, চৈত্র। ১৩৩১, পৃ ৫৫০-৫৫৬। সচিত্র।
চন্দননগরের পাদ্রী জ্যোতির্ব্বিদ গেরেনের শতবর্ষের গ্রহণ গণনা ও তাঁহার সম্পাদিত প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক। ভারতবর্ষ। ১২/২/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, পৃ ৮৬০-৮৭১।
চন্দননগরের আনন্দ উৎসব। ভারতবর্ষ। ১৩/১/৩, ভাদ্র ১৩৩২, পৃ ৪৭২-৪৮৩। সচিত্র।
চন্দননগরের বয়ন-শিল্প। প্রবাসী। ২৫/২/১, কার্তিক ১৩৩২, পৃ ৬৫-৭৩। সচিত্র
শিল্প বাণিজ্যে বঙ্গে চন্দননগরের স্থান। ভারতবর্ষ। ১৩/১/৫, কার্তিক ১৩৩২, পৃ ৭৩৩-৭৪৭; ১৩/১/৬, অগ্রহায়ণ ১৩৩২, পৃ ৮৯৮-৯০৯। সচিত্র।
ফরাসী কোম্পানীর ভাগীরথী তীরে উপনিবেশ স্থাপন। বঙ্গবাণী। ৫/১/১, ফাল্গুন ১৩৩২, পৃ ৪৮-৬০। সচিত্র।
চন্দননগরের সেবা-ধর্ম প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষ। ১৩/২/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, পৃ ৮৩৫ - ৮৩৯। সচিত্র।
পুরাতনী : গৌরী সেন ও নবাব খাঁ জেহান খাঁ। বঙ্গবাণী। ৫/১/৫, আষাঢ় ১৩৩৩, পৃ ৫৭৩-৫৭৮। সচিত্র।
চুঁচুড়ার ডাচ্-গার্ডেন্। বিচিত্রা। ১/১/৫, কার্তিক ১৩৩৪, পৃ ৭১১-৭১৪। সচিত্র।
পল্লী-ভ্রমণ। মাসিক বসুমতী। ৮/১/৫, ভাদ্র ১৩৩৬, পৃ ৬৩৯-৬৪৯। সচিত্র।
মহানাদ, দ্বারবাসিনী, কুচপালা, শাটীধান, মালিপাড়া ও সেনহাটী।
বিজুড়ের ভাঁড়ার-পোতা। পঞ্চপুষ্প। ৪/১/৪, শ্রাবণ ১৩৩৮, পৃ ৪৯৭-৫০২। সচিত্র।
চন্দননগর — ১৬৭৩ হইতে ১৭৪০। প্রবর্ত্তক। ২৫/২/৫, ফাল্গুন ১৩৪৭, পৃ ৪০৩-৪০৪; ২৫/২/৬, চৈত্র ১৩৪৭, পৃ ৫৩৯-৫৪০; ২৬/১/৩, আষাঢ় ১৩৪৮, পৃ ২৪৬-২৪৭; ২৬/১/৪, শ্রাবণ ১৩৪৮, পৃ ৩০৬-৩০৮।

বাংলা সাহিত্যে চন্দননগরের দান। শারদীয়া বসুমতী। ১৩৫৪, পৃ ৫০-৫৩।

উপনিবেশ চন্দননগরের শেষ অঙ্ক। মাসিক বসুমতী। ৩১/১/৩, আষাঢ় ১৩৫৯, পৃ ৪৭০-৪৭৪।

চন্দননগরের পুরনো কথা। প্রবাসী। ৫৬/২/৬, চৈত্র ১৩৬৩, পৃ ৭৪৯-৭৫০। সচিত্র।

- **হরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র**

  নবাব খান জাহান খাঁ। বাঁশরী। ১/৩, পৌষ ১৩২২, পৃ ৯০-৯৩।

- **হারাধন দত্ত**

  রঞ্জিৎ দীঘির পুরাবৃত্ত। পুণ্য। ৩/৪, পৌষ ১৩০৭, পৃ ১৬-১৬৪।

  (পুনর্মুদ্রণ : রঞ্জীৎ দীঘির পুরাবৃত্ত। সদ্‌গোপ পত্রিকা। ৫/১০-১১, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ পৃ ২৫৬-২৫৮।)

  গড়মান্দারণ ও জাহানাবাদের ইতিবৃত্ত। পুণ্য। ৪/৩-৪, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০, পৃ ১৬৫-১৬৯; ৪/৫, মাঘ ১৩১০, পৃ ২১৫-২২২।

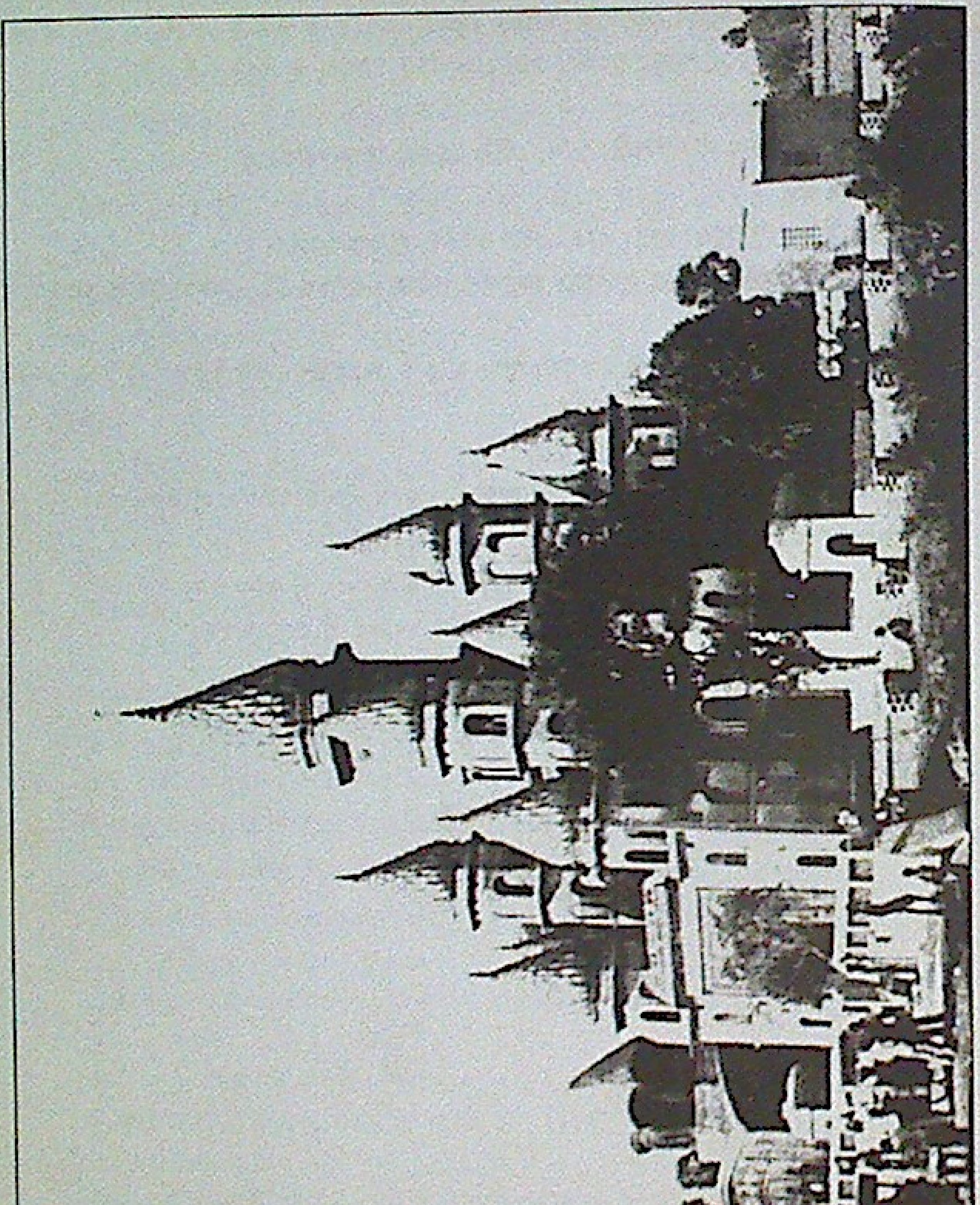
- **হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি**

  গড়মান্দারণ ও জাহানাবাদের ইতিবৃত্ত। জন্মভূমি। ৫/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২, পৃ ৩৩৮-৩৫০।

- **হিরণ্ময়ী দেবী**

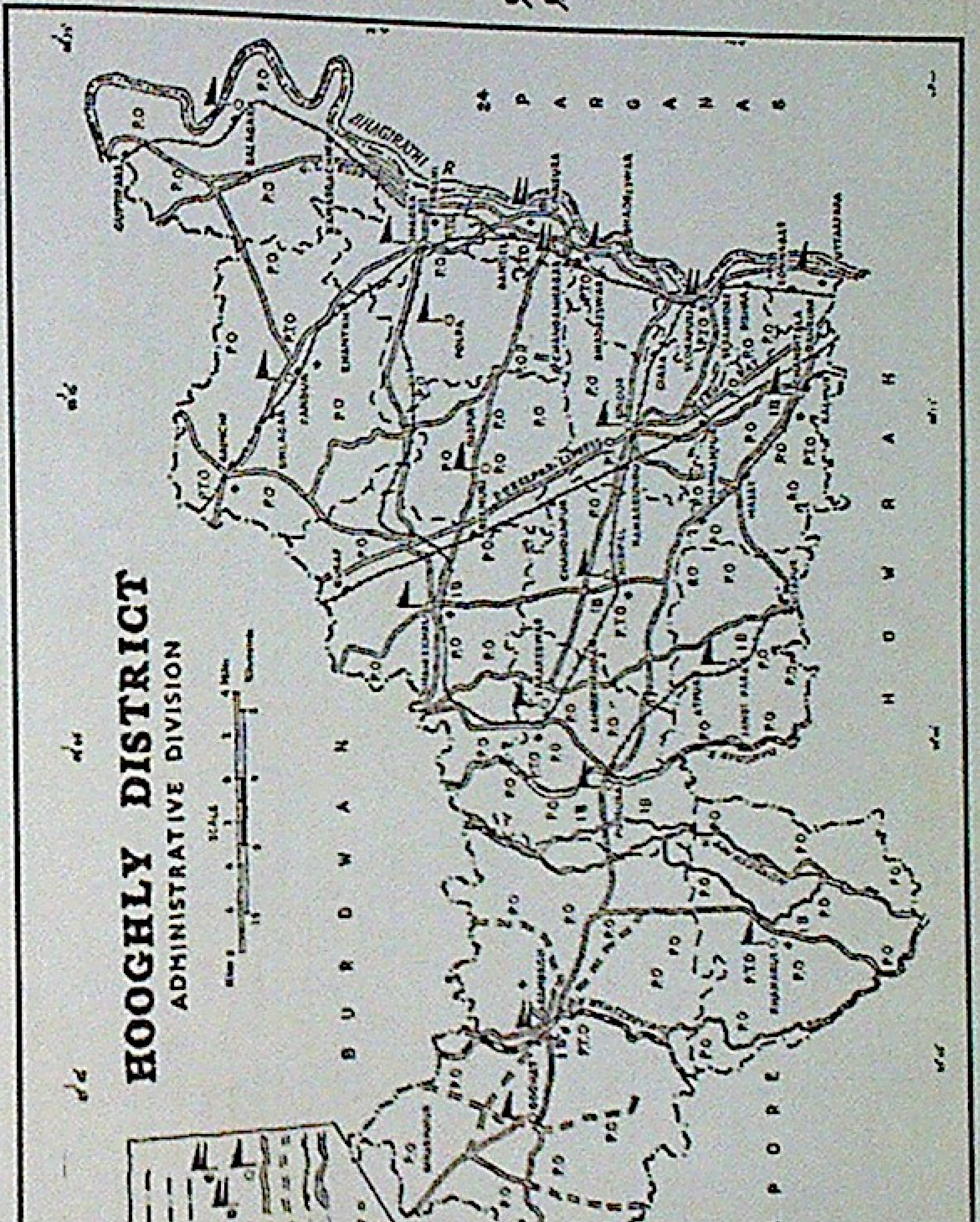
  বান্দেলের গির্জ্জা। ভারতী ও বালক। ১২/৯, পৌষ ১২৯৫, পৃ ৫০০-৫০৫।

  বাঙ্গালায় ওলন্দাজ বণিক্‌। জন্মভূমি। ১/৯, ভাদ্র ১২৯৮, পৃ ৫০১-৫০৯।



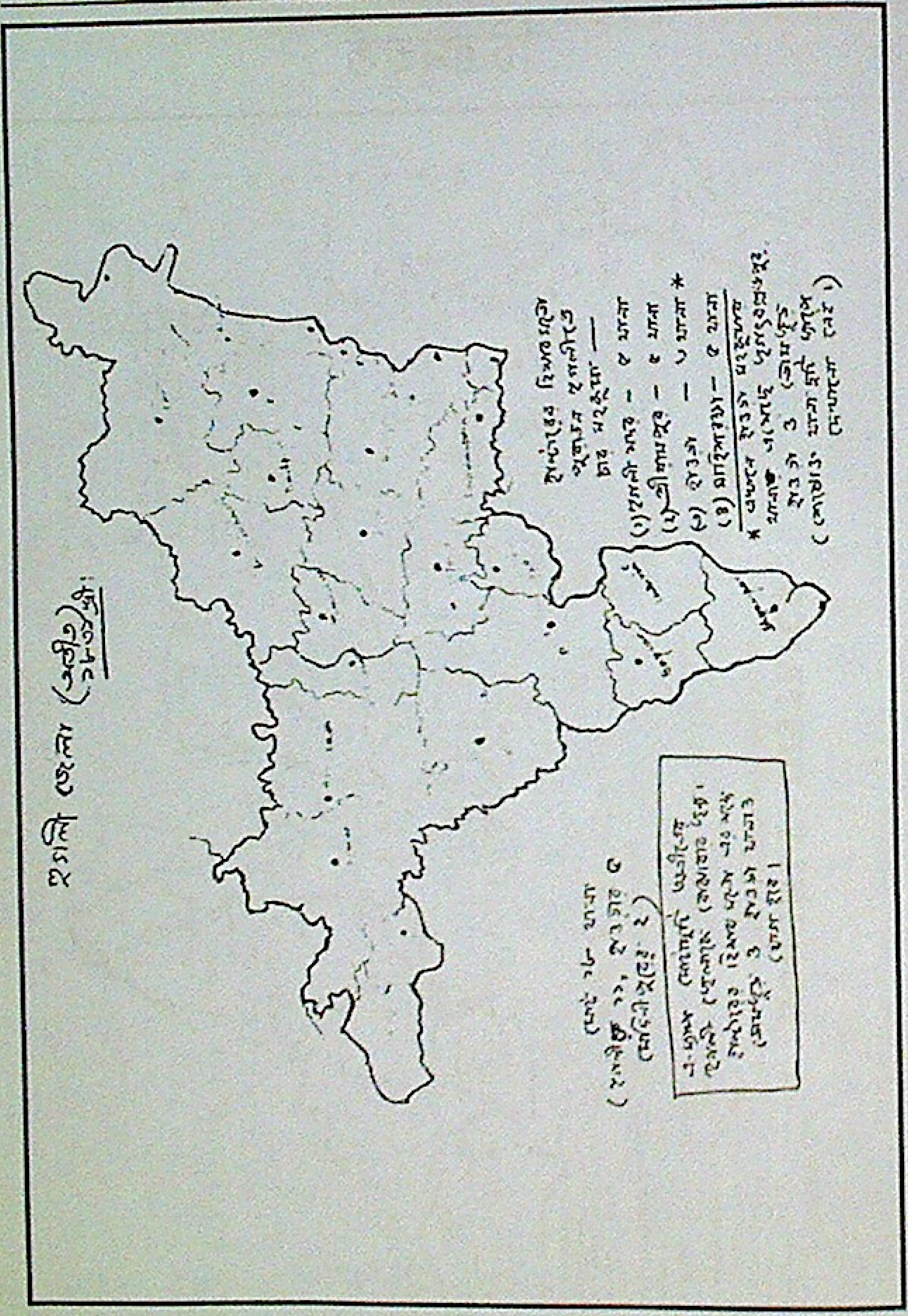
হংসেশ্বরী মন্দির, বাঁশবেড়িয়া

চিত্রমুহূর্ত



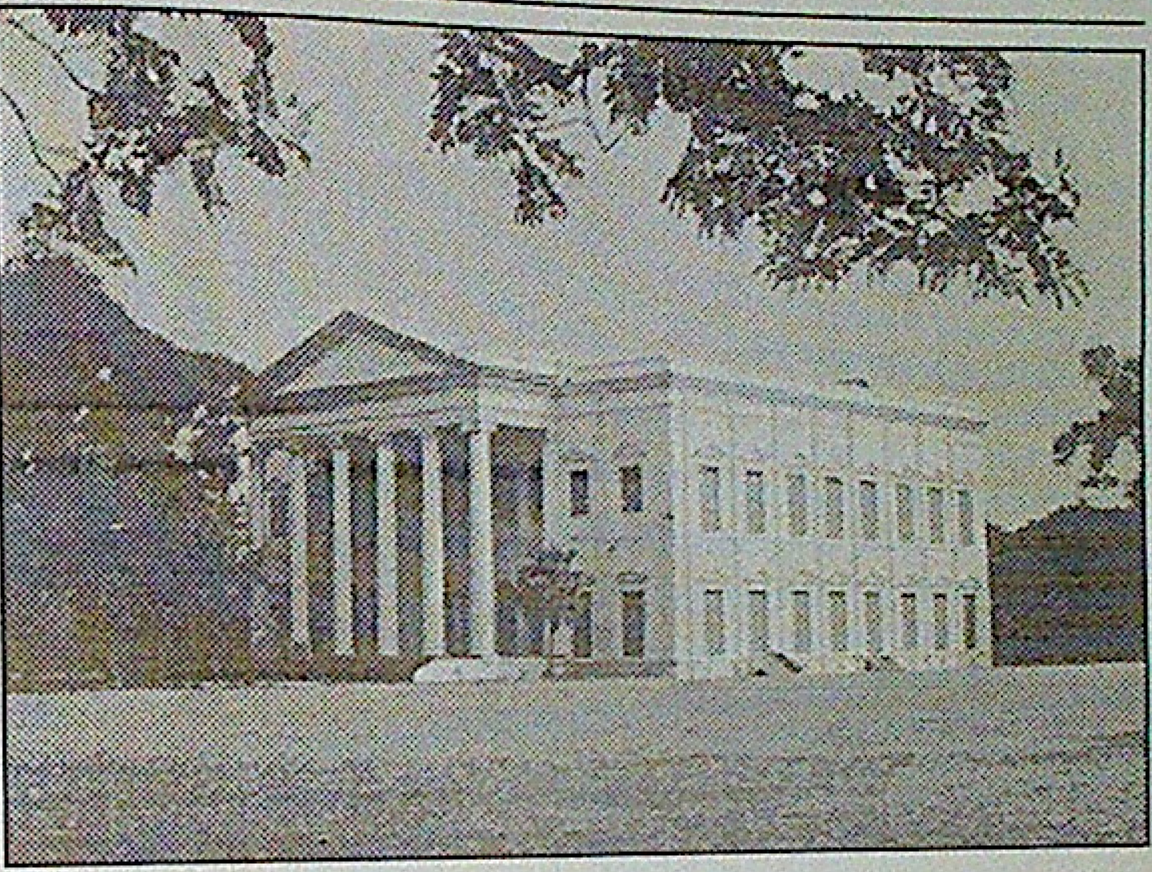
হুগলি : জন্মকথা

১. হুগলি জেলার মানচিত্র



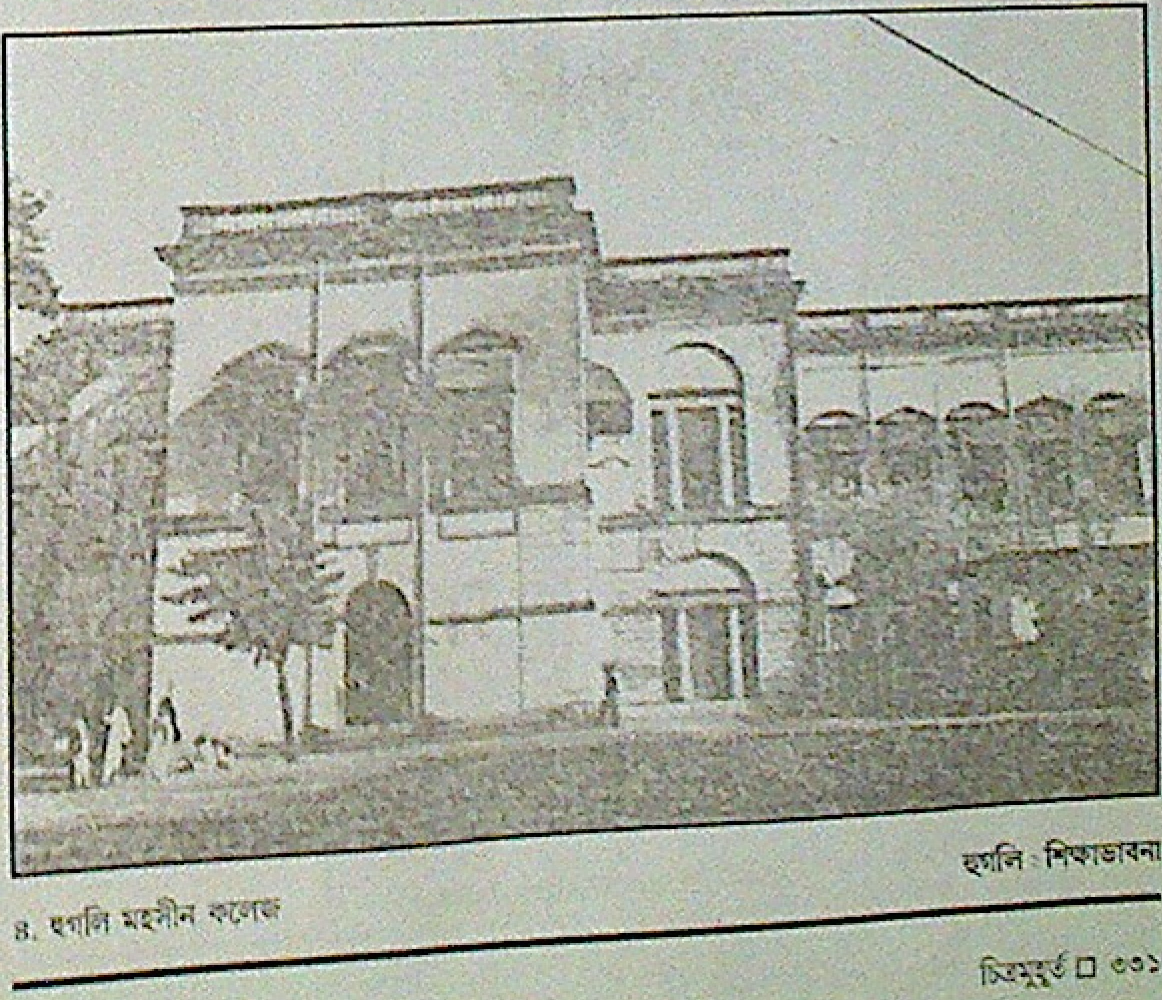
২. হুগলী জেলা ১৮৩১ খ্রি:

হুগলি : জন্মকথা



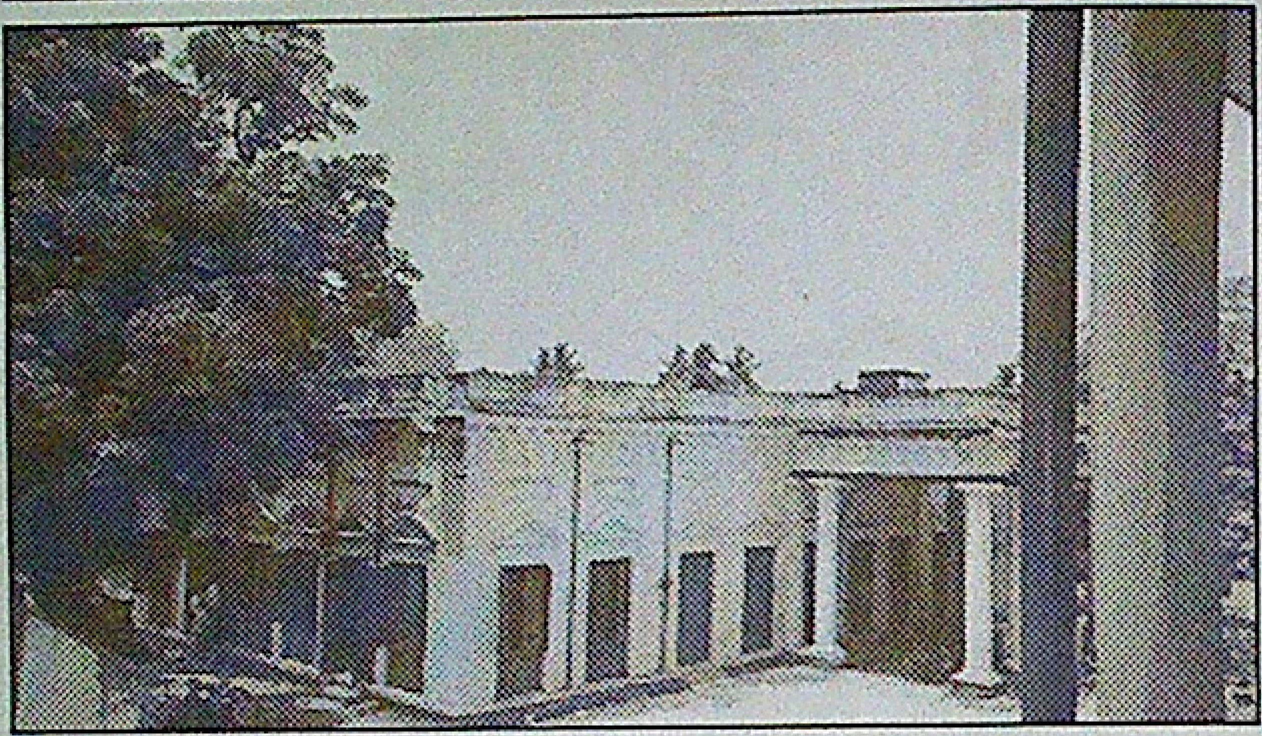
৩. শ্রীরামপুর কলেজ

হুগলি : শিক্ষাভাবনা



হুগলি : শিক্ষাভাবনা

৪. হুগলি মহসীন কলেজ

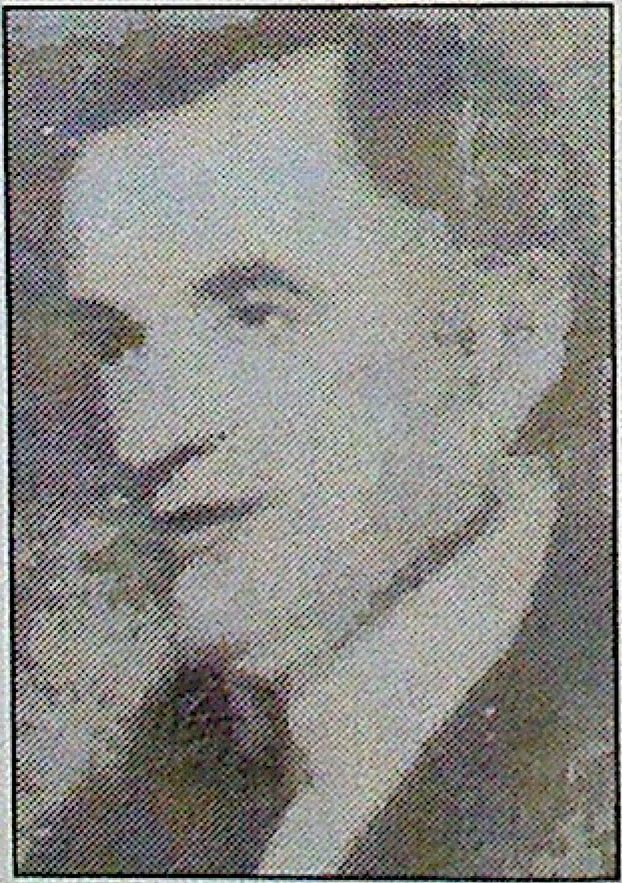


৫. ব্রাহ্ম স্কুল - হুগলি (১৮৩৪)

হুগলি : শিক্ষাভাবনা

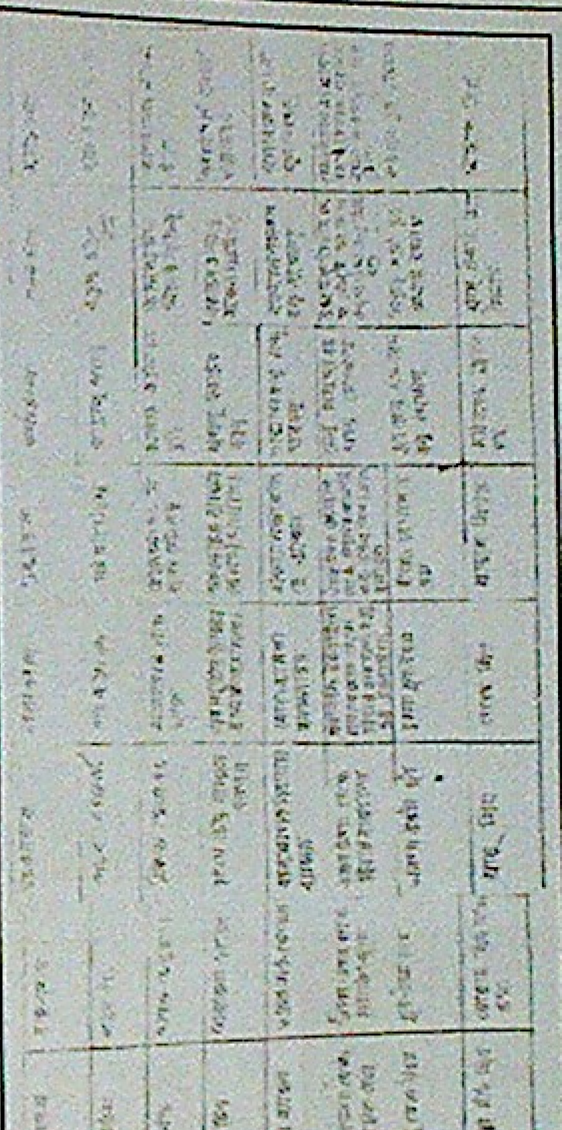


৬. উইলিয়াম কেরী



৭. জোশুয়া মার্শম্যান

হুগলি : খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদান



৮. পলিগ্লট ভোকাবুলারি

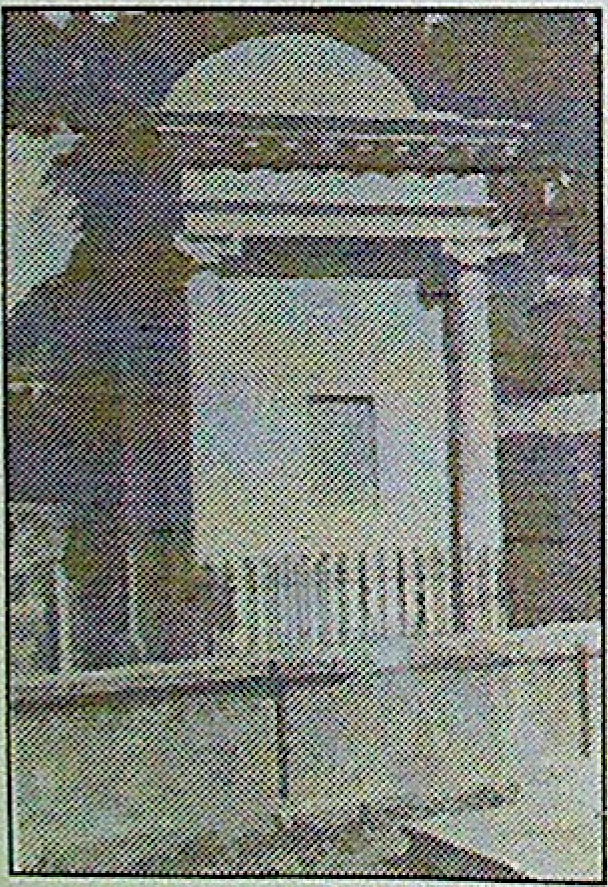
হুগলি : খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদান



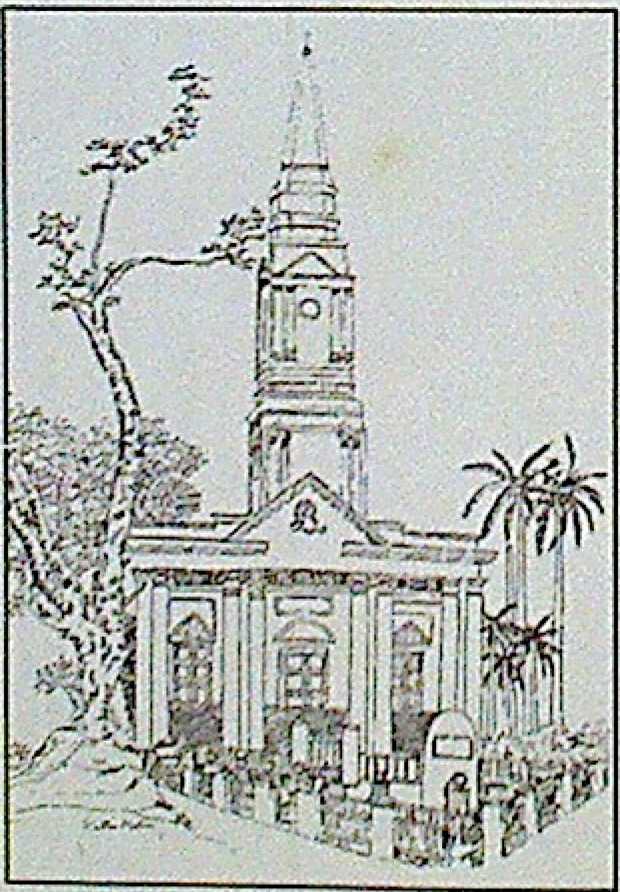
৯. হ্যানা মার্শম্যান



১০. উইলিয়ম ওয়ার্ড

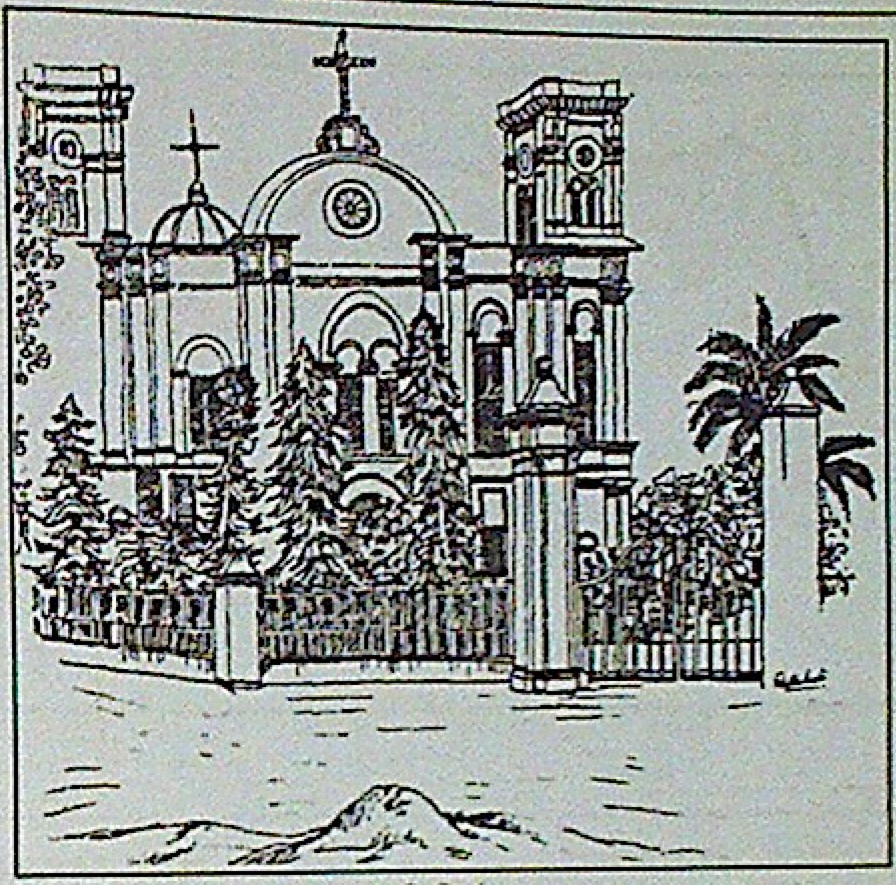


১১ উইলিয়ম কেরীর সমাধিস্থল



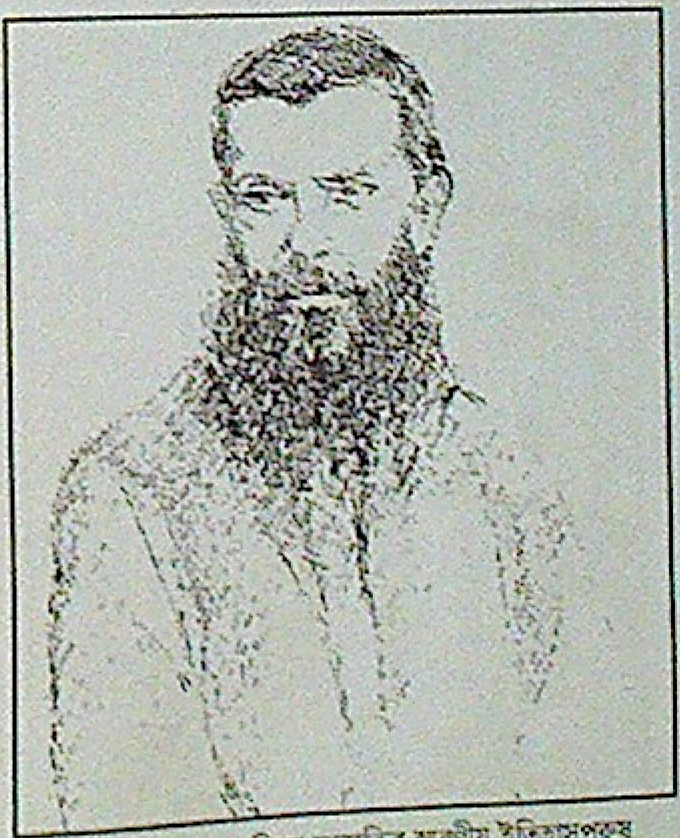
১২. সেন্ট ওলাফ গির্জা, শ্রীরামপুর

হুগলি : খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদান

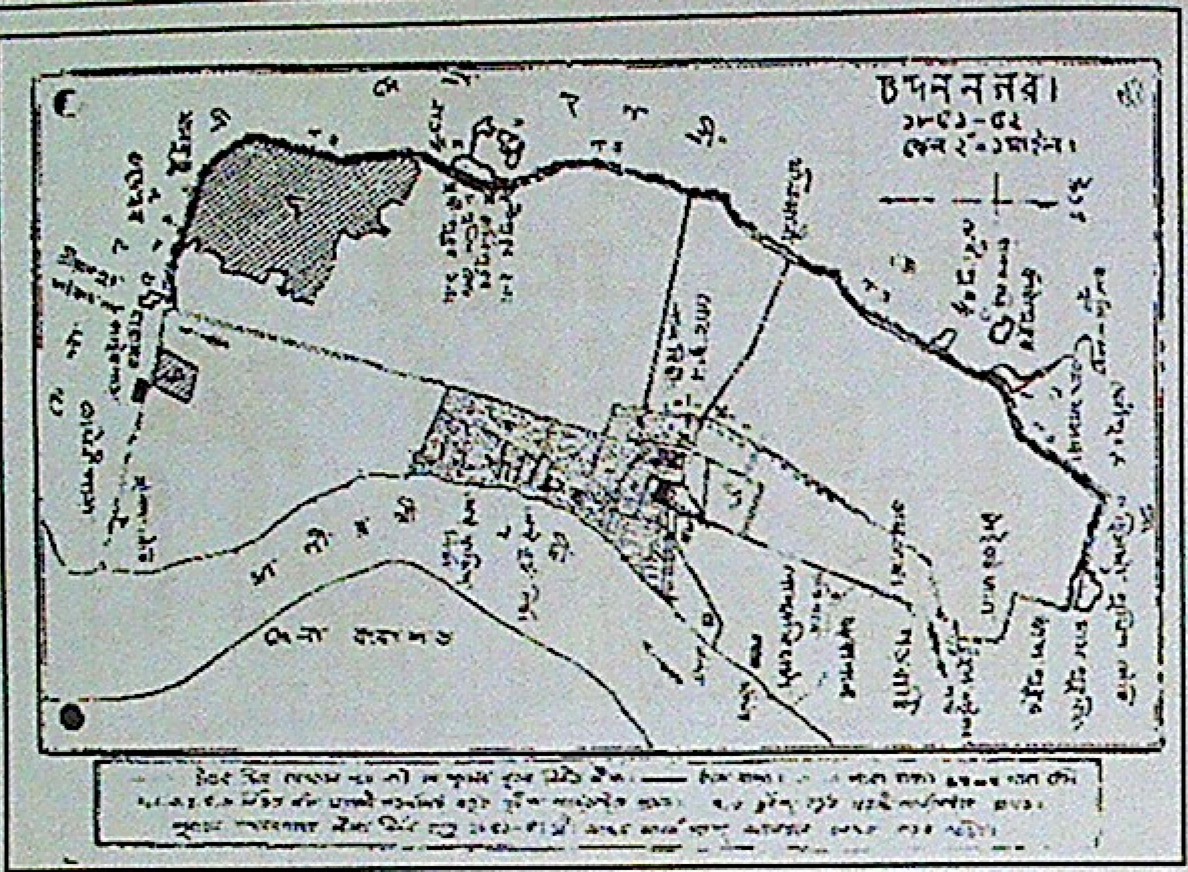


১৩. ফরাসি গির্জা, চন্দননগর

ছবি : ফরাসি সংস্কৃতির প্রভাব

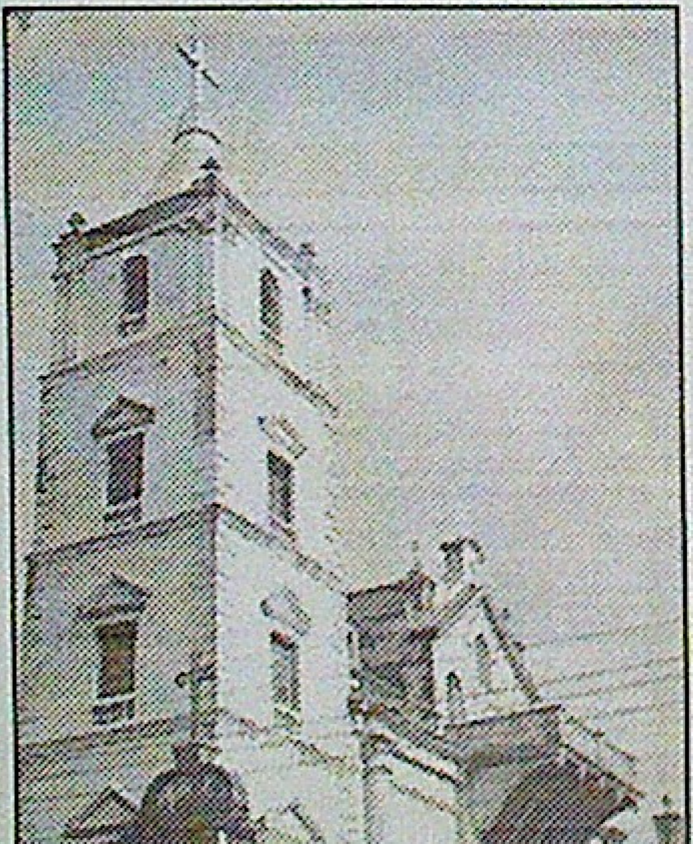


১৪. চন্দননগরের শিক্ষা-সংস্কৃতির স্মরণীয় ইতিহাসপুরুষ
সেন্ট মেরিস ইন্‌স্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা ফাদার ম্যাগলোয়ার বার্থে



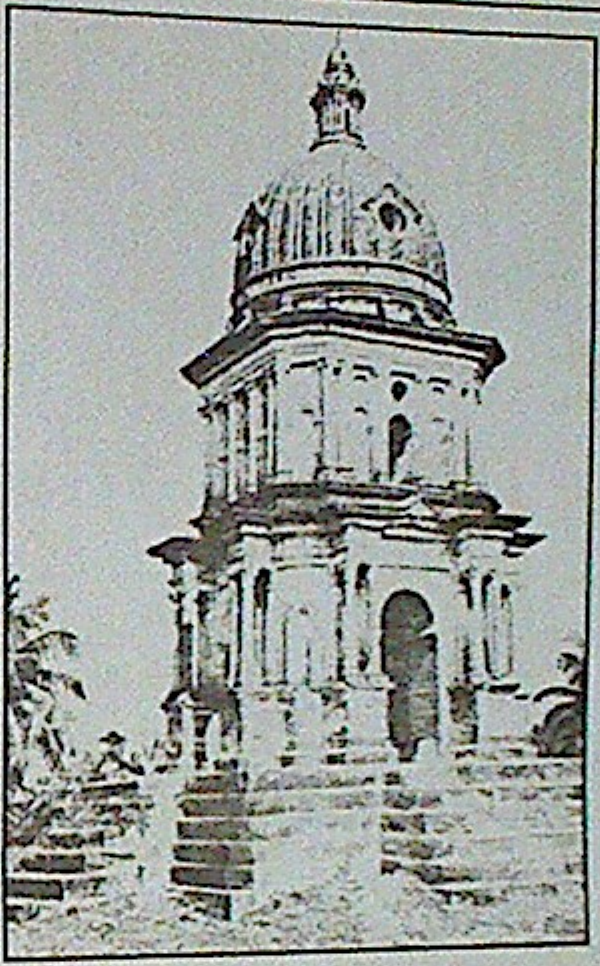
১৫. ব্রিটিশ্ গভর্নমেন্টের সঙ্গে ফরাসিদের
কয়েকখণ্ড জমি অদলবদল সংক্রান্ত নক্সা

হুগলি : ফরাসি সংস্কৃতির প্রভাব



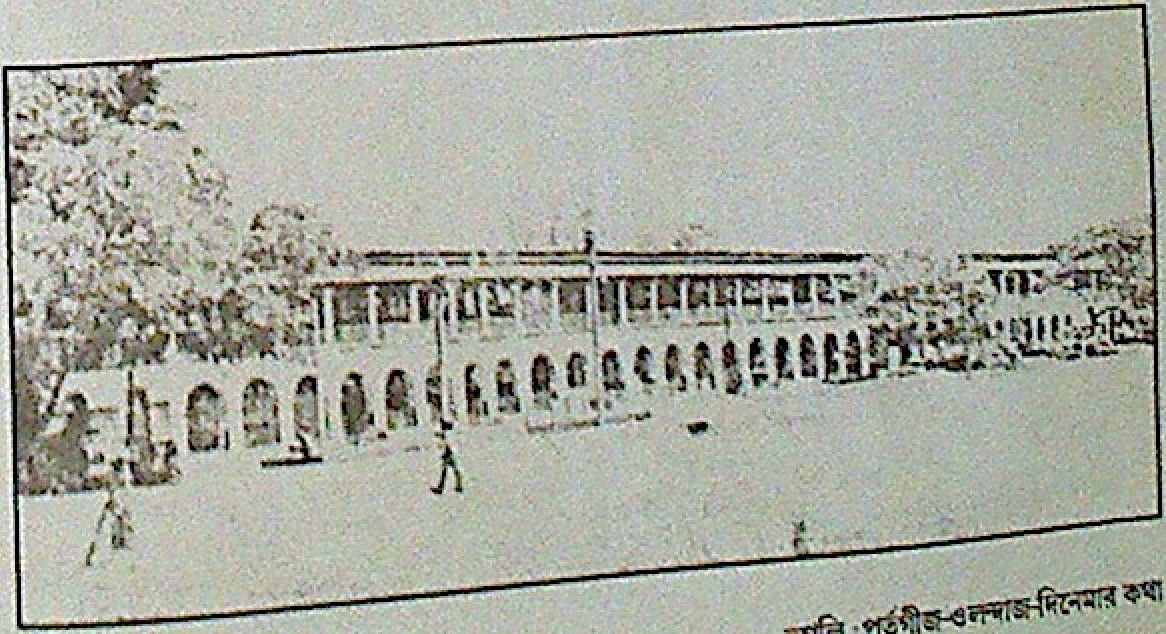
১৬. ব্যান্ডেল চার্চের পশ্চিমাংশ (স্থাপিত ১৫৯৯ খ্রি)

হুগলি : পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-দিনেমার কথা



১৭. সুসানা আন্না মারিয়া সমাধি - চুঁচুড়া

হুগলি : পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-দিনেমার কথা

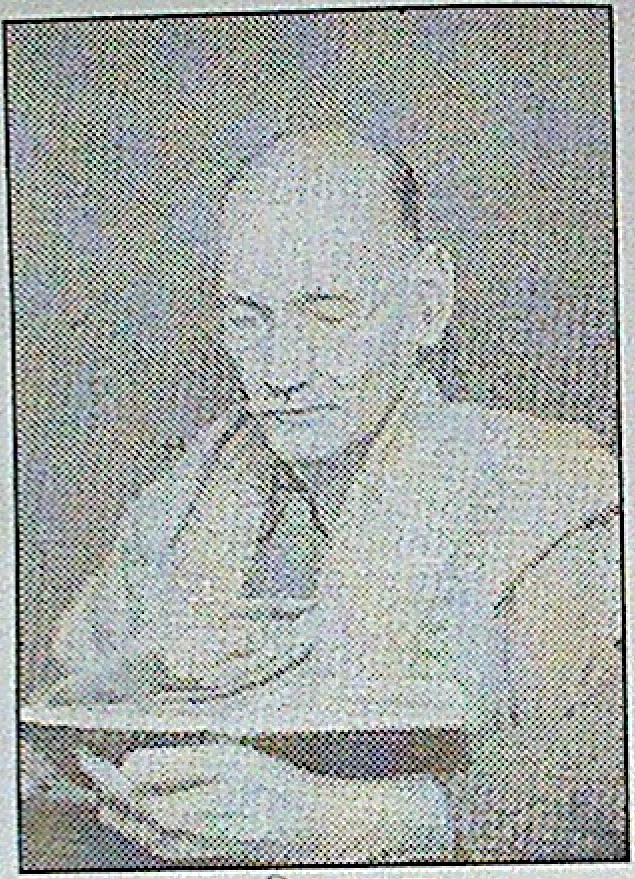


হুগলি : পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-দিনেমার কথা

১৮. হুগলি কালেক্টরেট ভবন



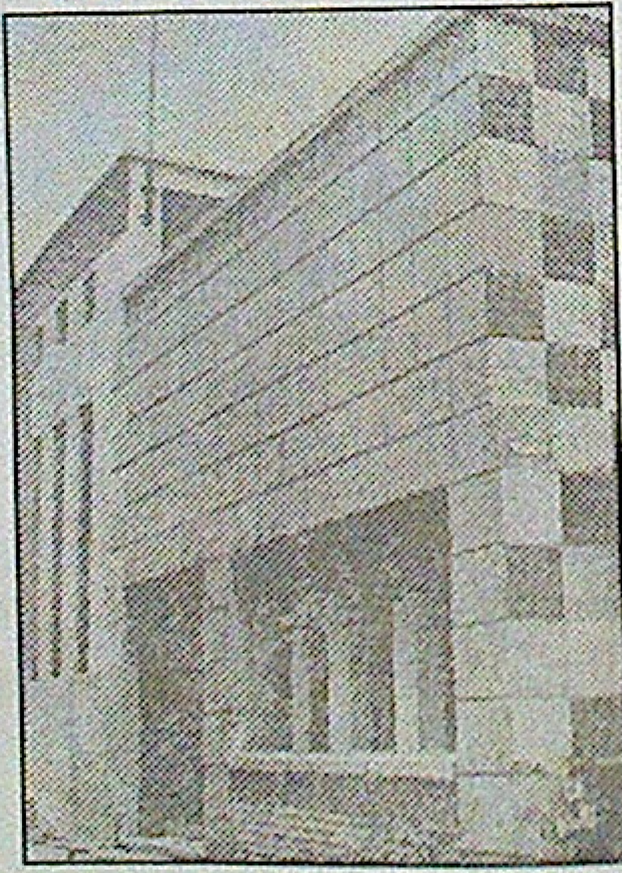
১৯. কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়



২০. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
(বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি)

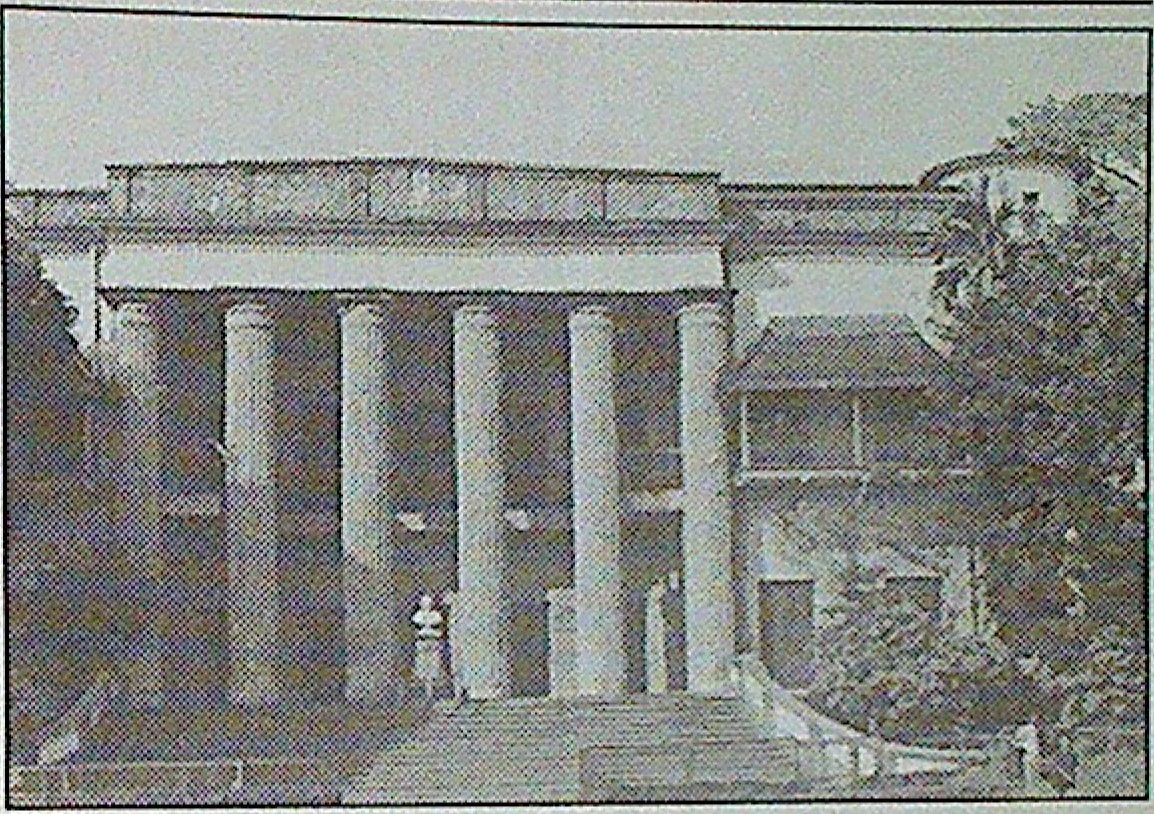


২১. হরিহর শেঠ

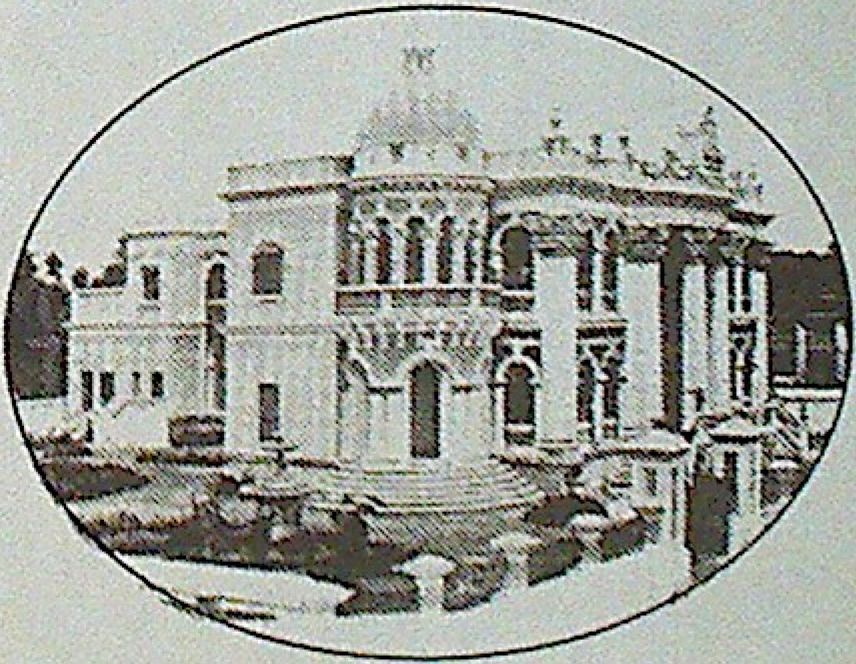


২২. বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি (শহর গ্রন্থাগার)
(১৮৯১)

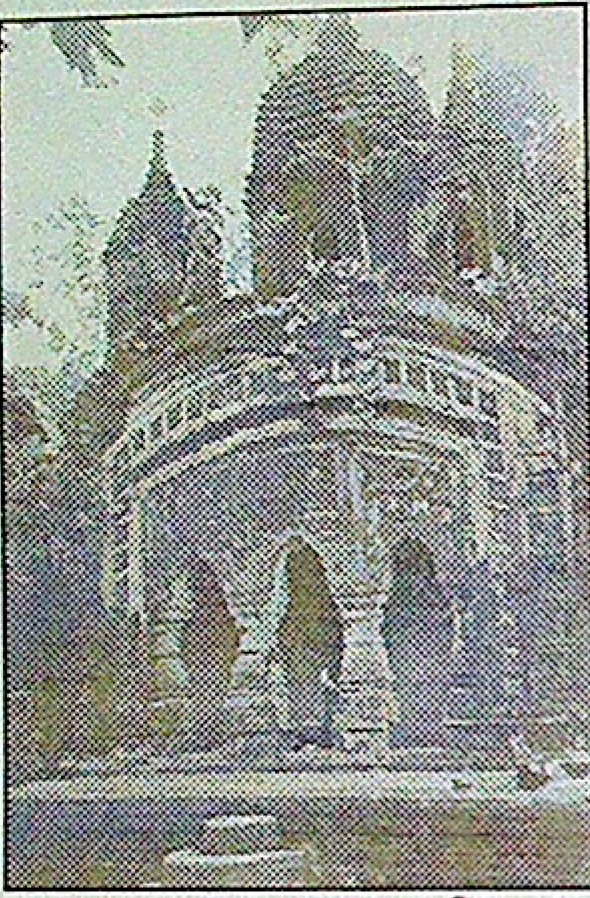
হুগলি : পাঠাগার আন্দোলন



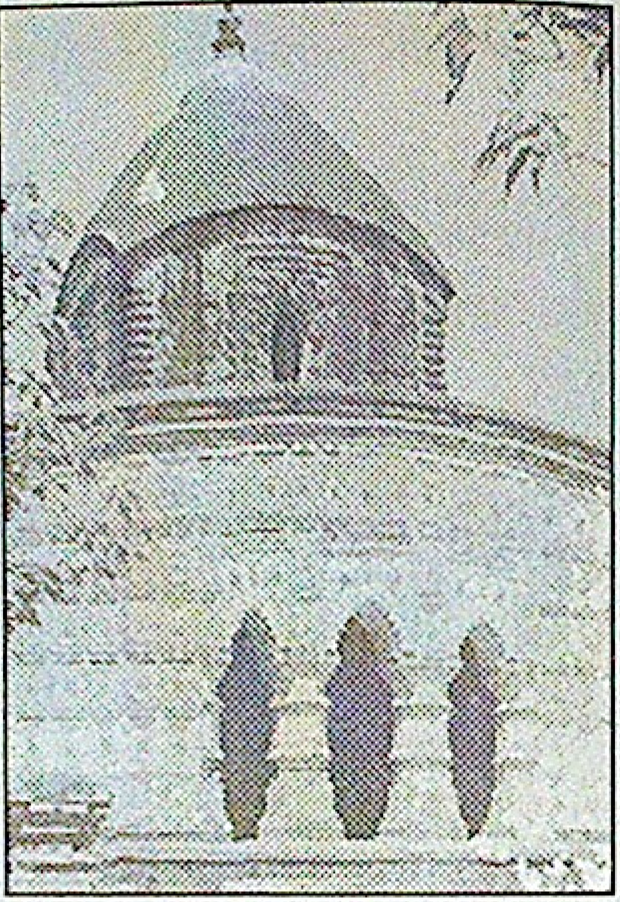
২৩. উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার　　　হুগলি : পাঠাগার আন্দোলন



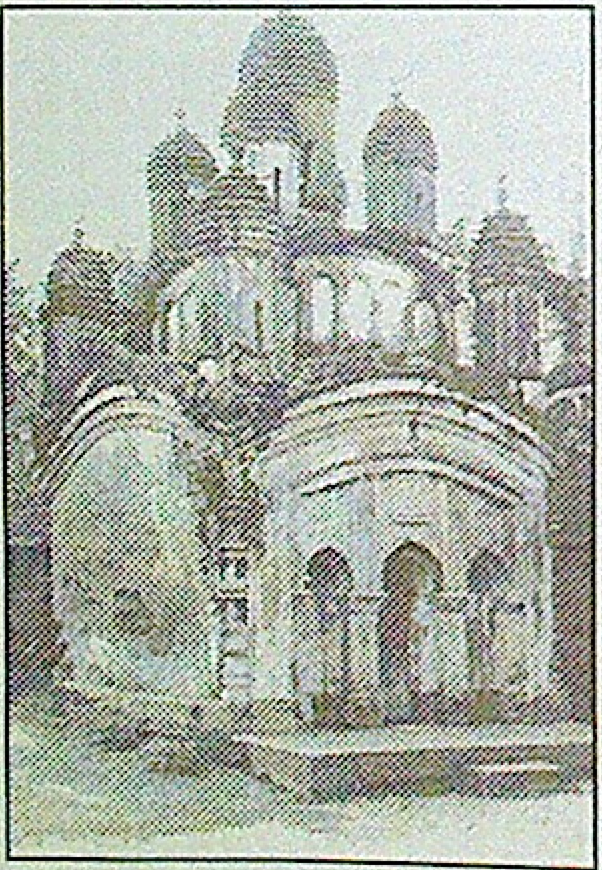
২৪. নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির ও চন্দননগর পুস্তকাগার　　　হুগলি : পাঠাগার আন্দোলন



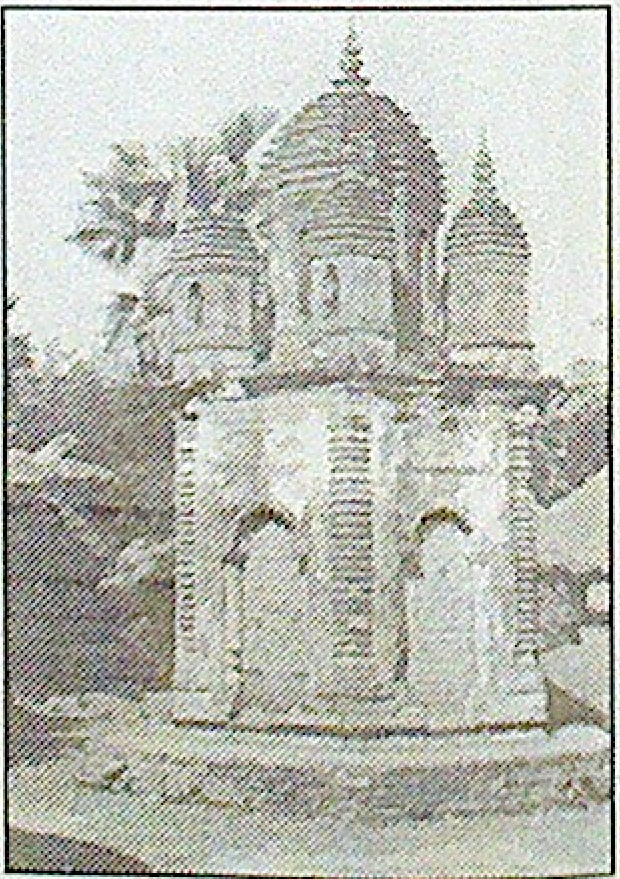
২৫. পঞ্চরত্ন - মামুদপুর, হুগলি



২৬. একরত্ন - কৃষ্ণনগর, হুগলি

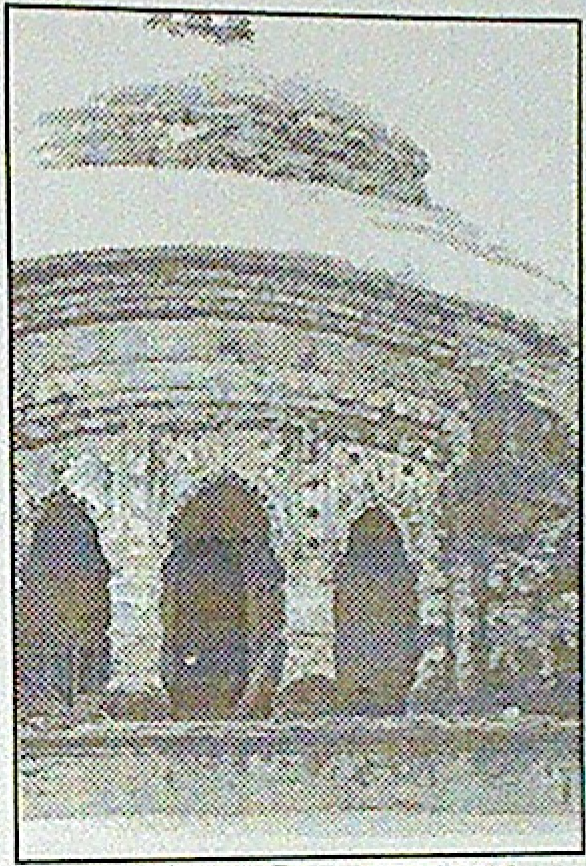


২৭. নবরত্ন - রামনাথ শিব মন্দির, ইছাপুর

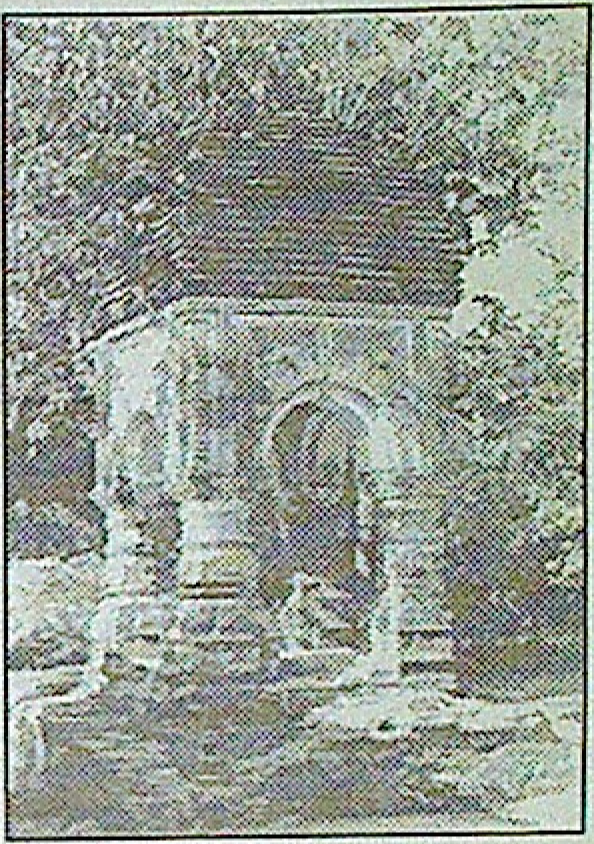


২৮. পঞ্চরত্ন - দোলমঞ্চ, কাঁকড়াকুলি

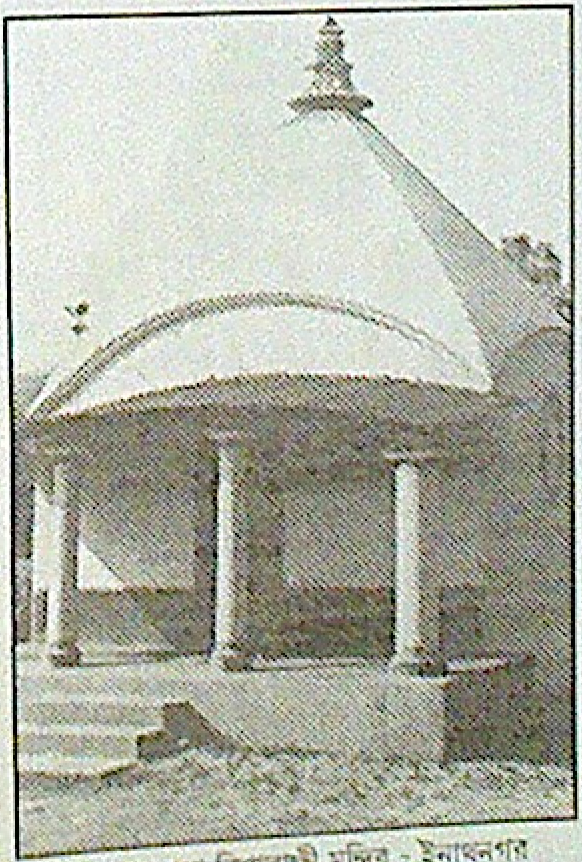
হুগলি : মন্দির স্থাপত্য



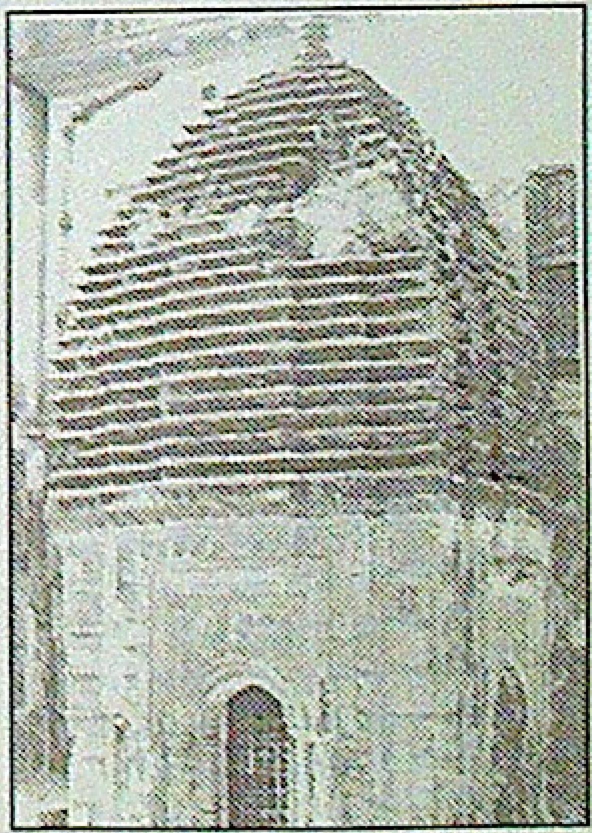
২৯. আটচালা দেউল ও চারচালা মণ্ডপ
রাধামাধব মন্দির - বৈঁচিগ্রাম



৩০. রাসমঞ্চ - কাঁকড়াকুলি

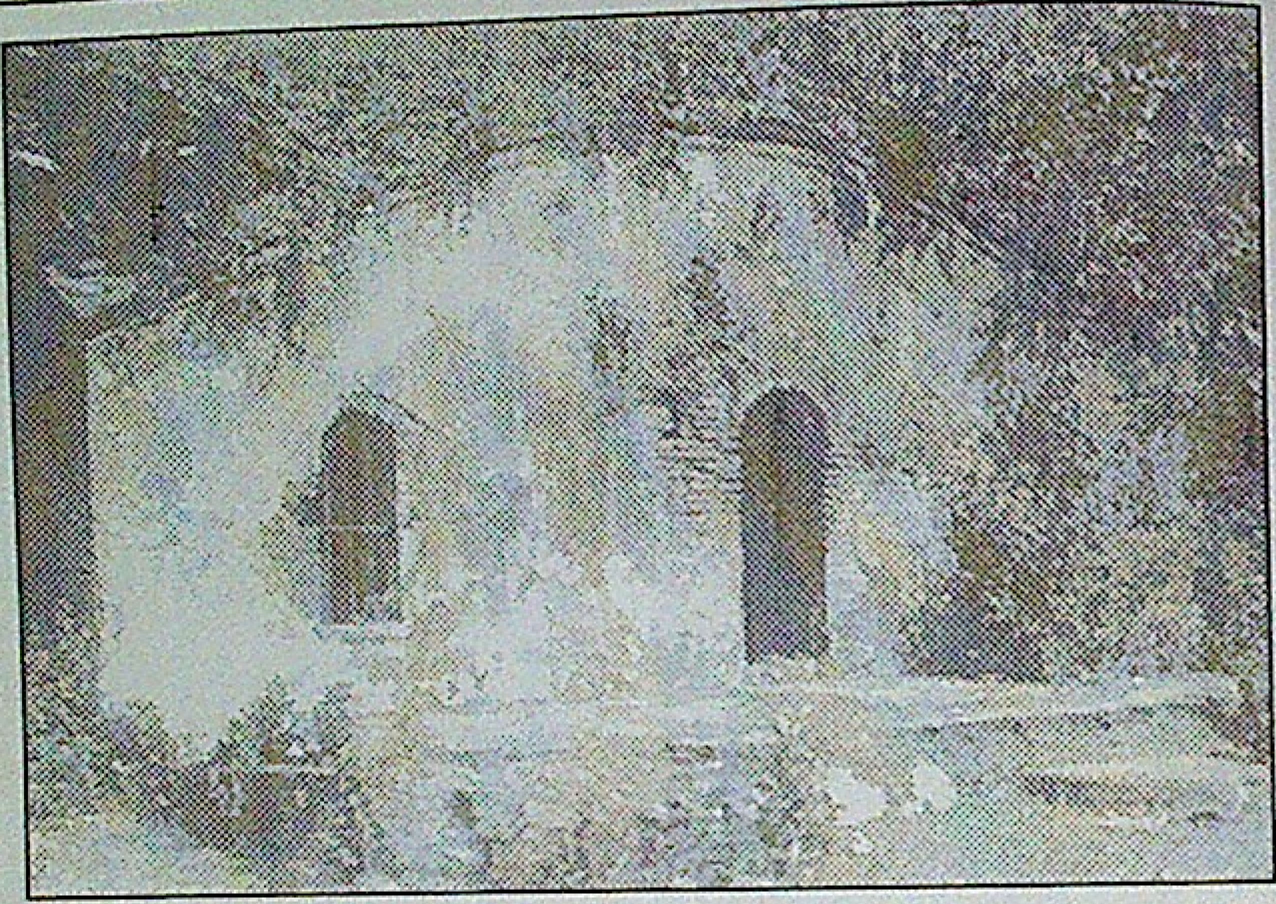


৩১. চারচালা বিশালাক্ষী মন্দির - ইনায়েৎনগর

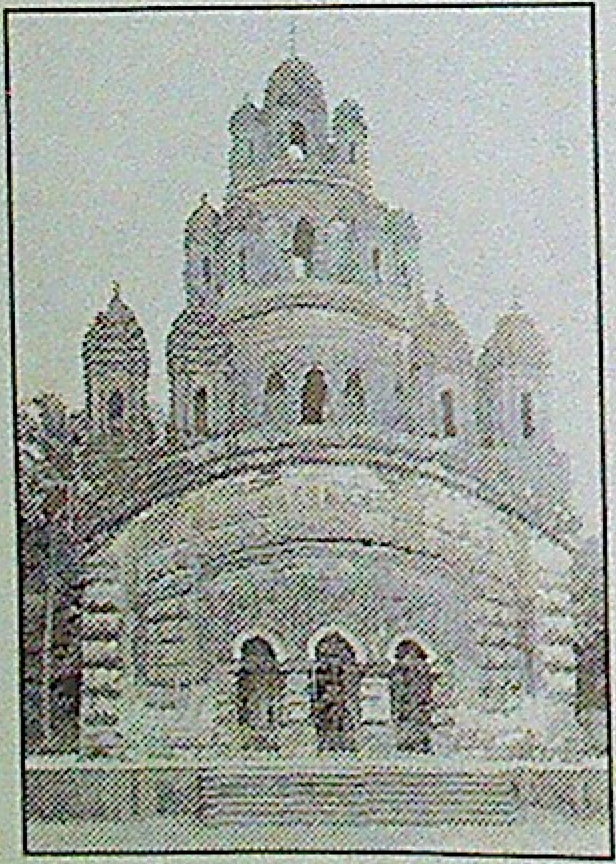


৩২. শিখর শিব মন্দির - বৈঁচিগ্রাম

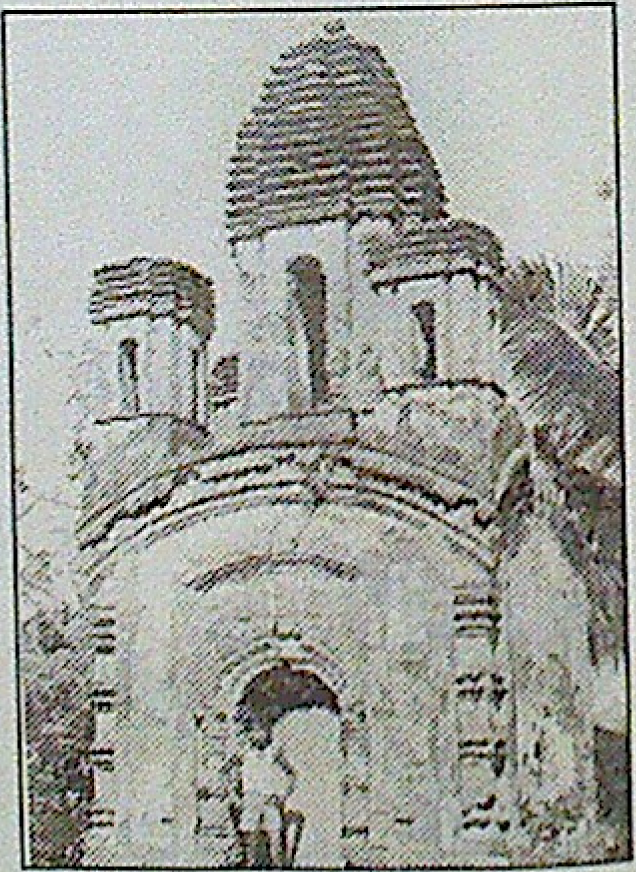
হুগলি : মন্দির স্থাপত্য



৩৩. দোচালা নন্দনন্দন মন্দির - চন্দননগর

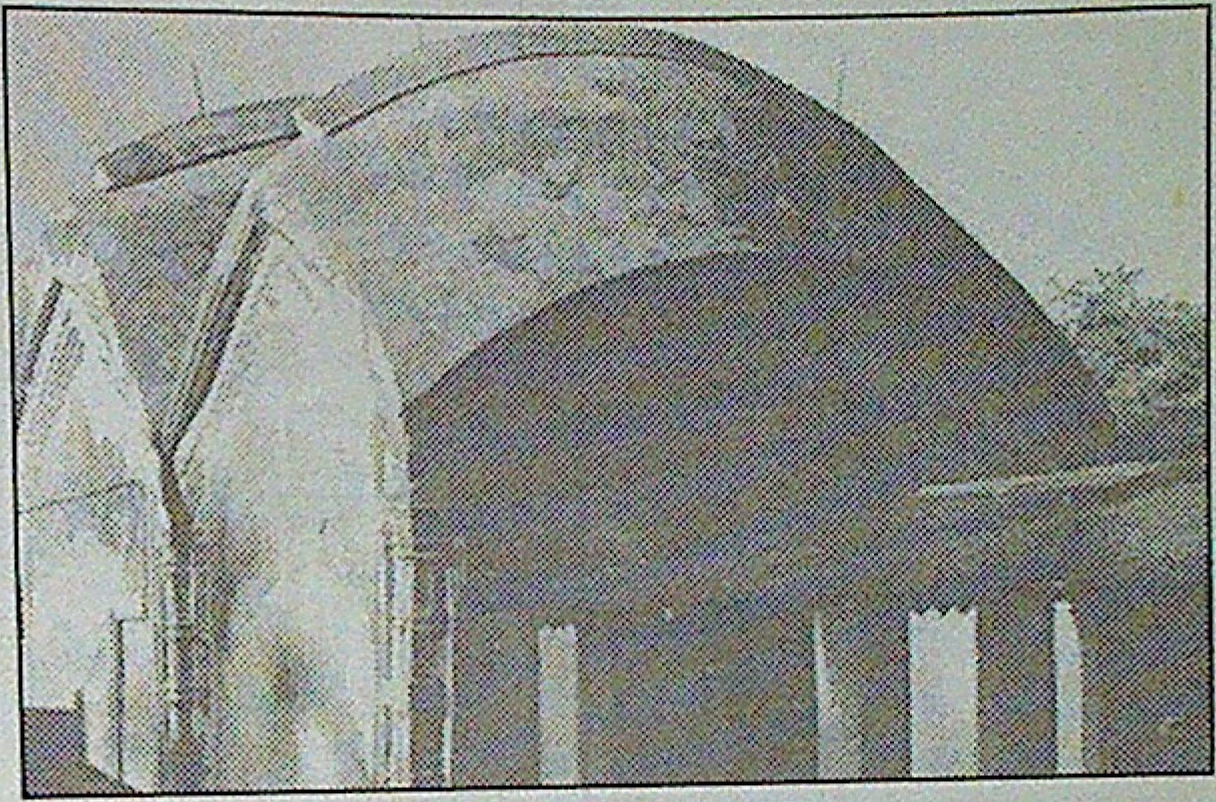


৩৪. পঁচিশ রত্ন আনন্দময়ী মন্দির - সুখাড়িয়া

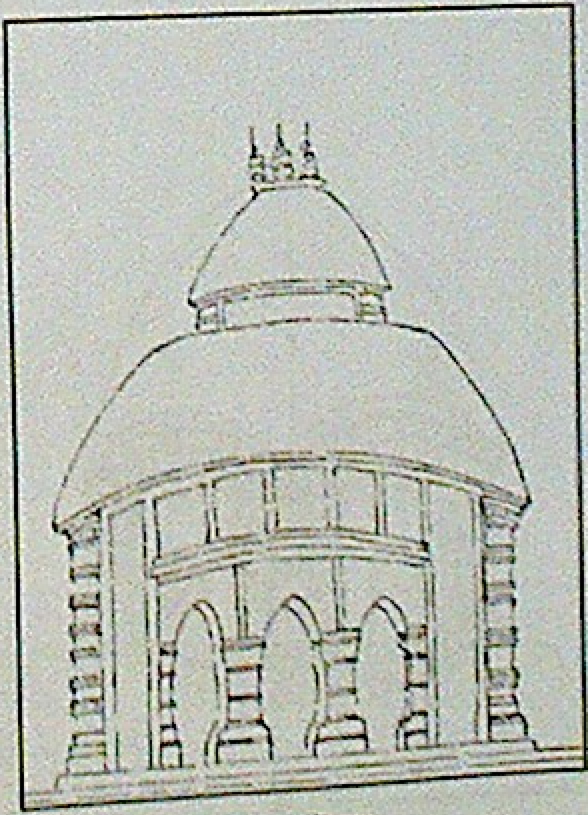


৩৫. পঞ্চরত্ন শিবমন্দির - বসুয়া

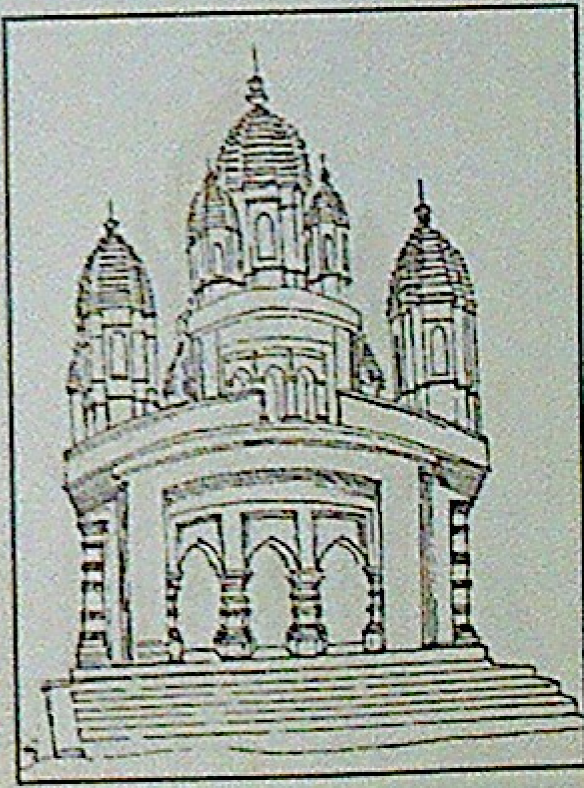
হুগলি : মন্দির স্থাপত্য



৩৬. জোড়বাংলো বিশালাক্ষী মন্দির - সিলেট

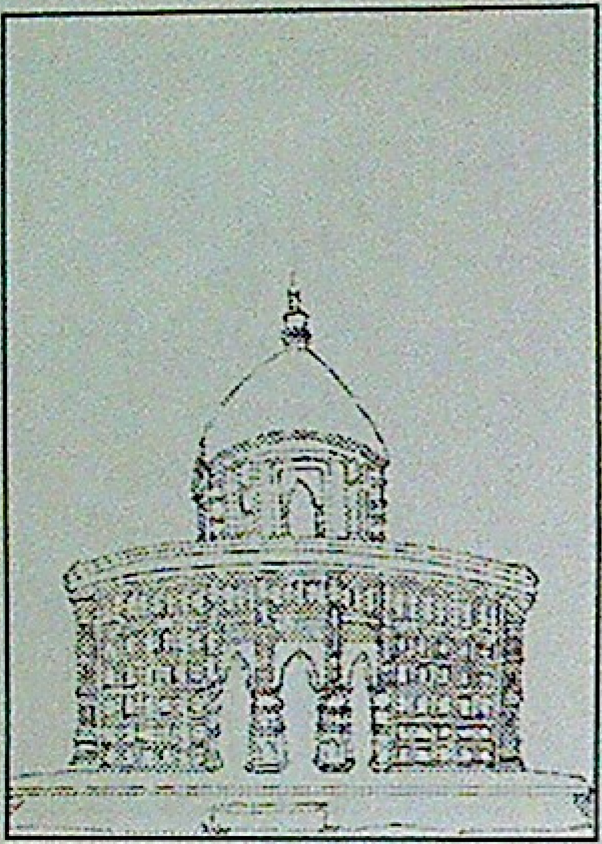


৩৭. আটচালা

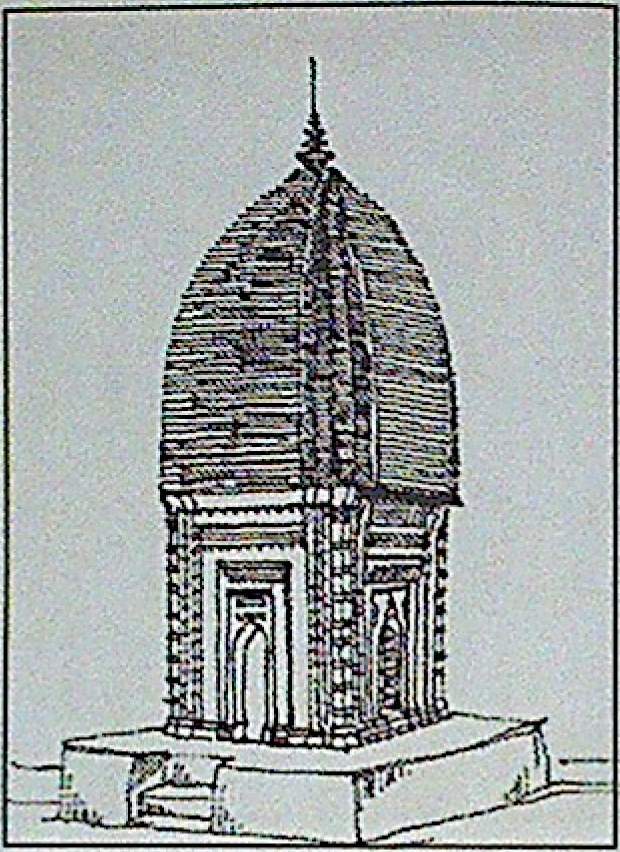


৩৮. নবরত্ন

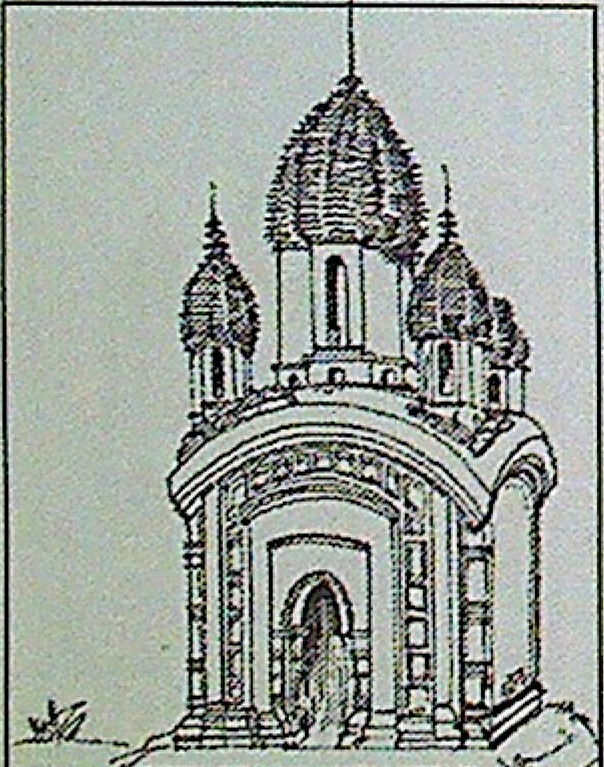
হুগলি : মন্দির স্থাপত্য



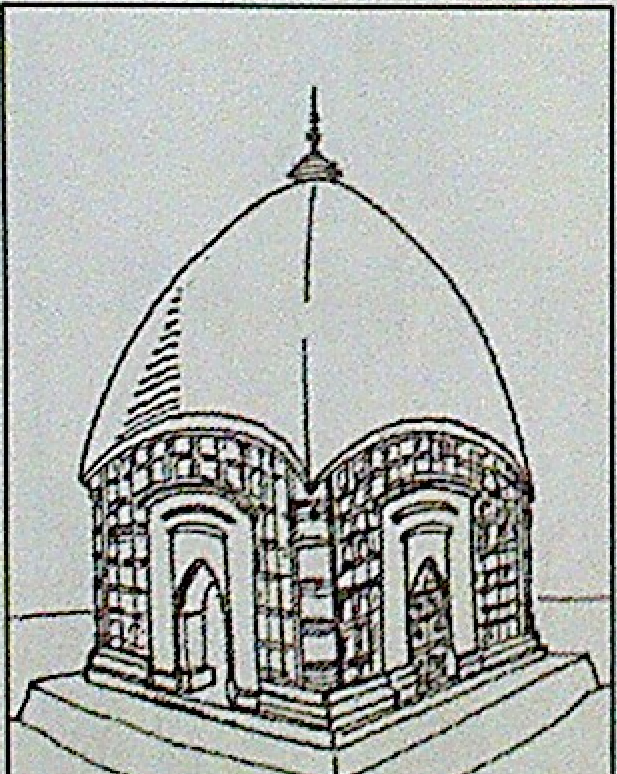
৩৯. একরত্ন



৪০. শিখর

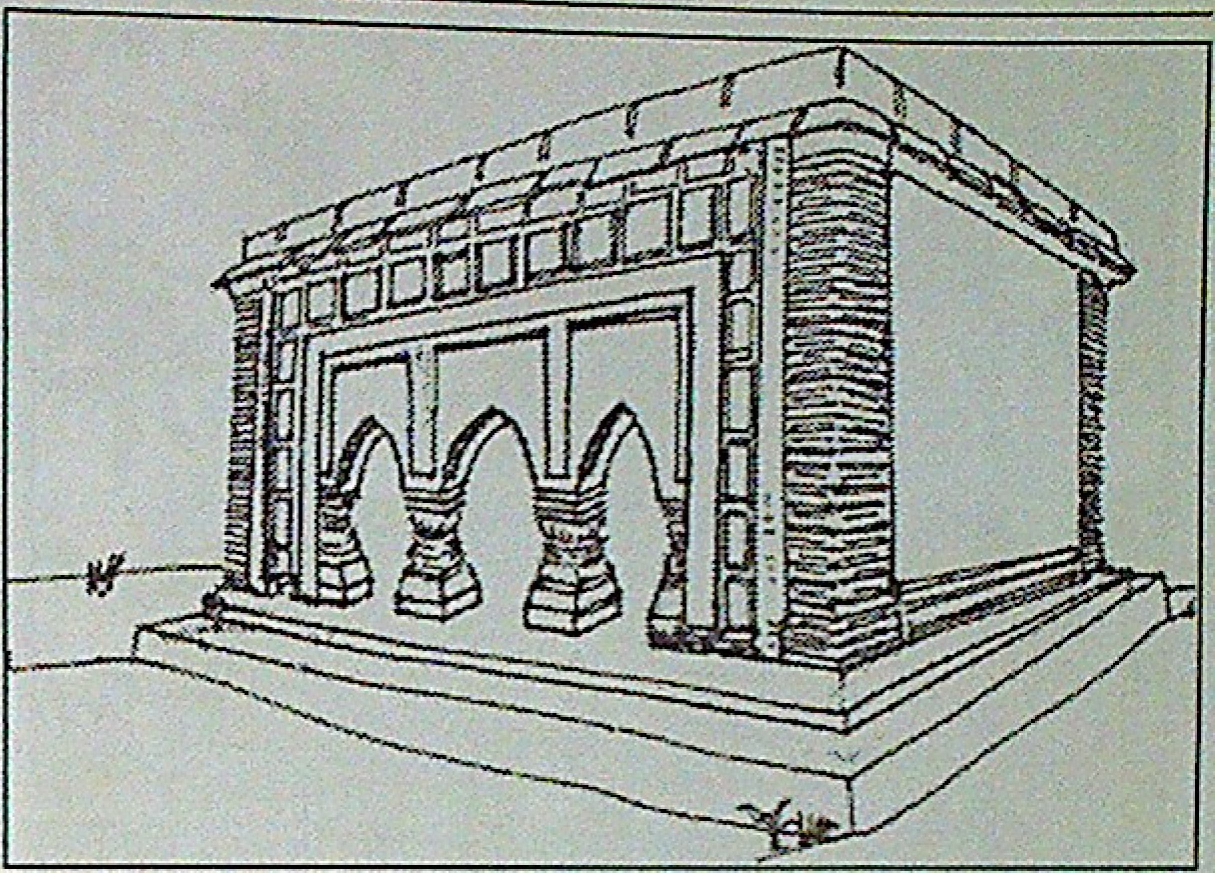


৪১. পঞ্চরত্ন

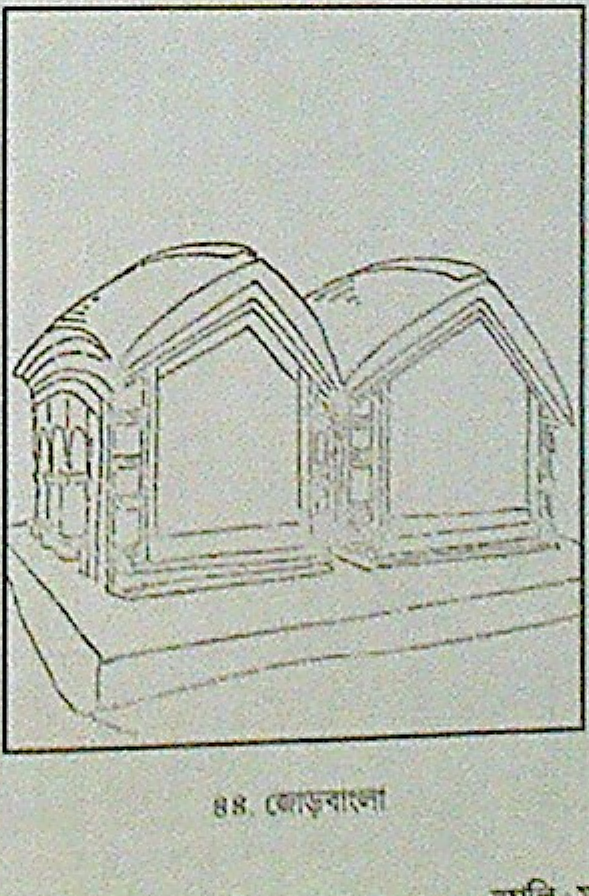


৪২. চারচালা

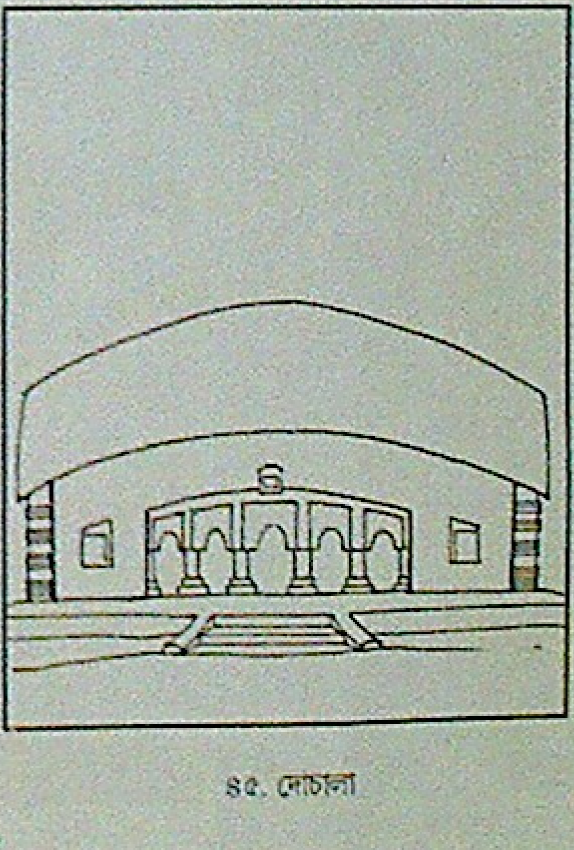
হুগলি : মন্দির স্থাপত্য



৪৩. দালান

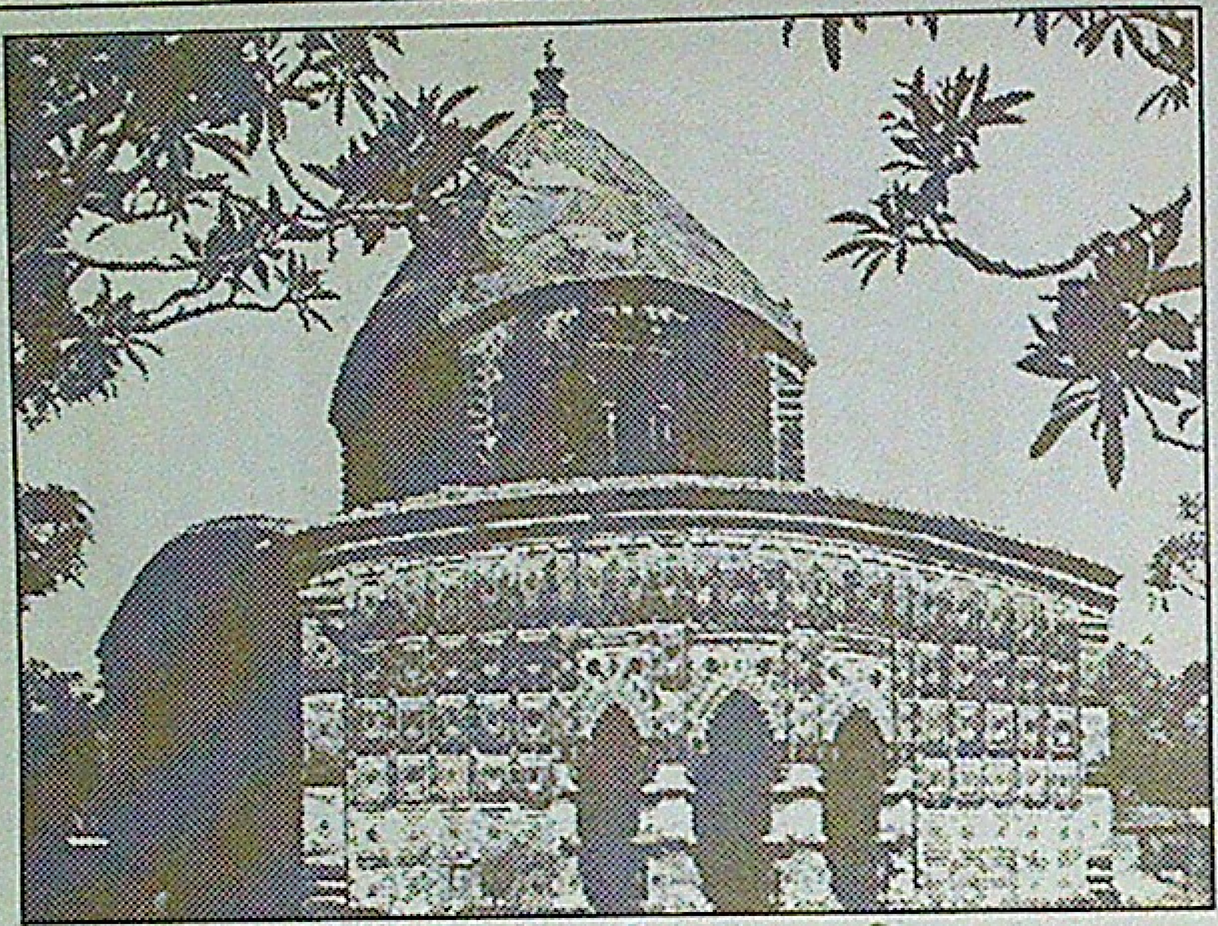


৪৪. জোড়বাংলা

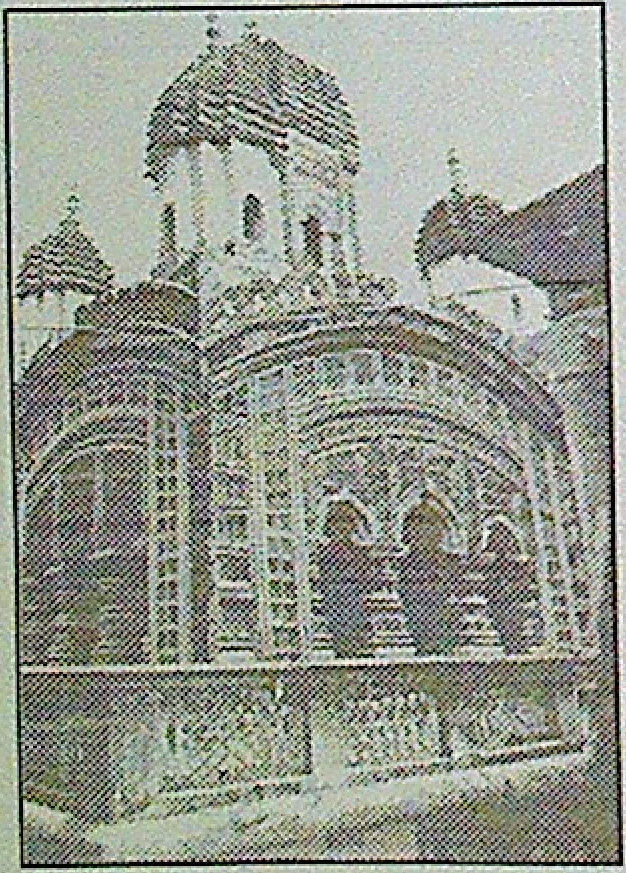


৪৫. দোচালা

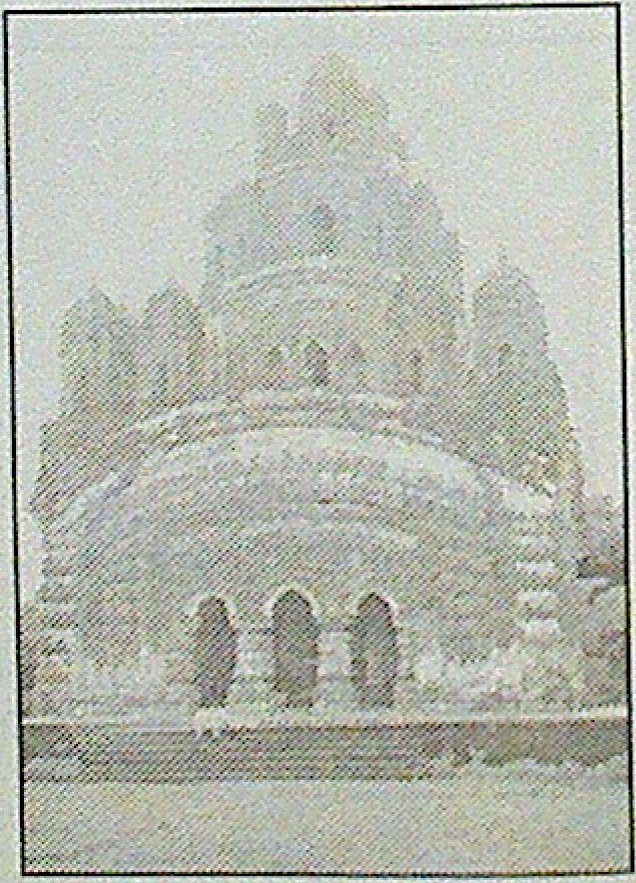
হুগলি : মন্দির স্থাপত্য



৪৬. একরত্ন রাধাবল্লভ মন্দির - কৃষ্ণনগর, হুগলি

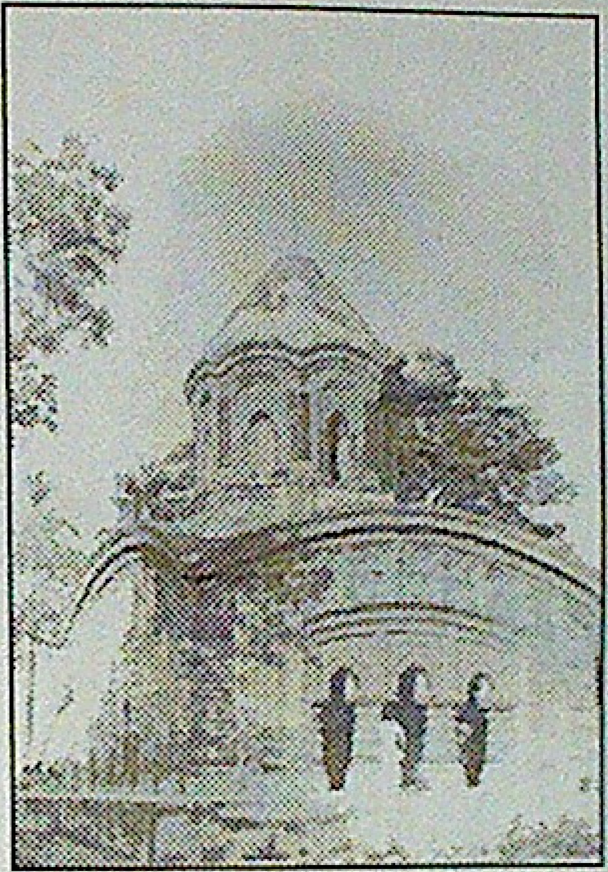


৪৭. পঞ্চরত্ন গোপীনাথ মন্দির - দশঘরা (১৭২৯)



৪৮. পঁচিশ চূড়া আনন্দভৈরবী মন্দির - সুখাড়িয়া (১৮১৪)

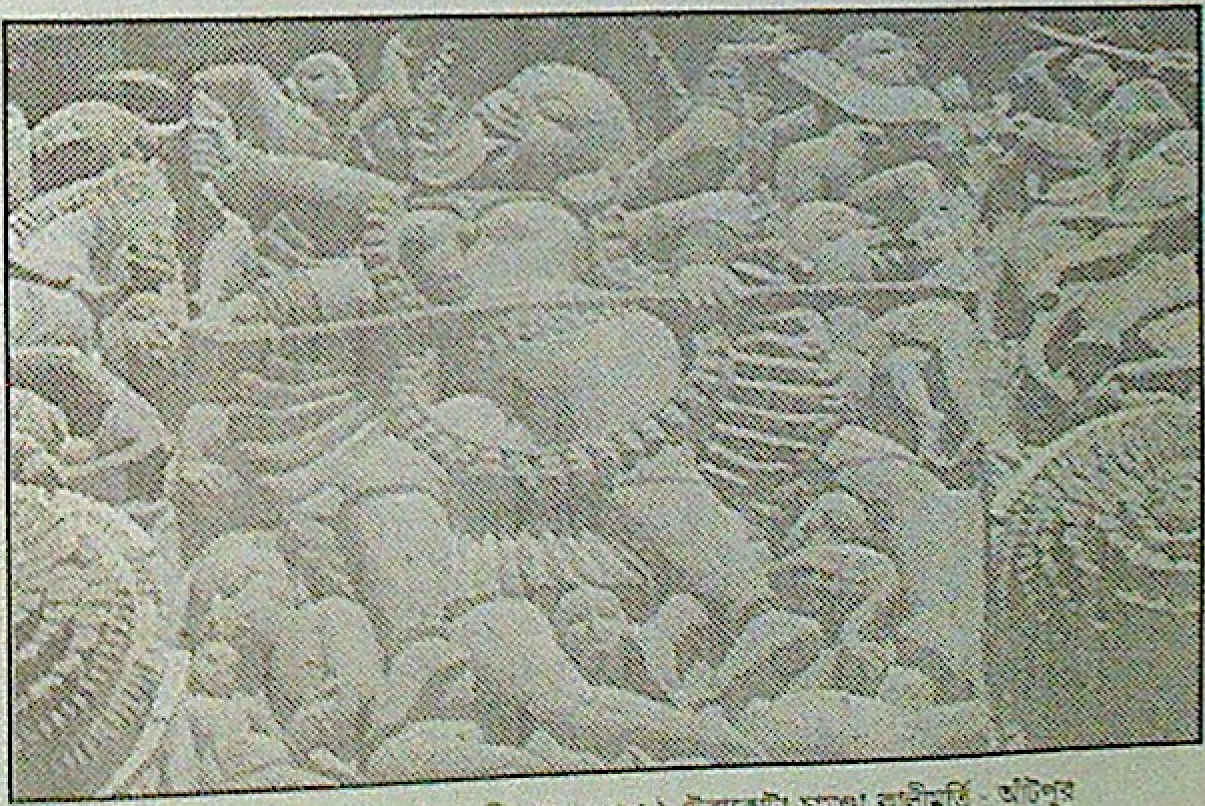
হুগলি : প্রত্নসম্পদ



৪৯. একরত্ন - অনন্তবাসুদেব মন্দির (১৬৭৯) - বাঁশবেড়িয়া

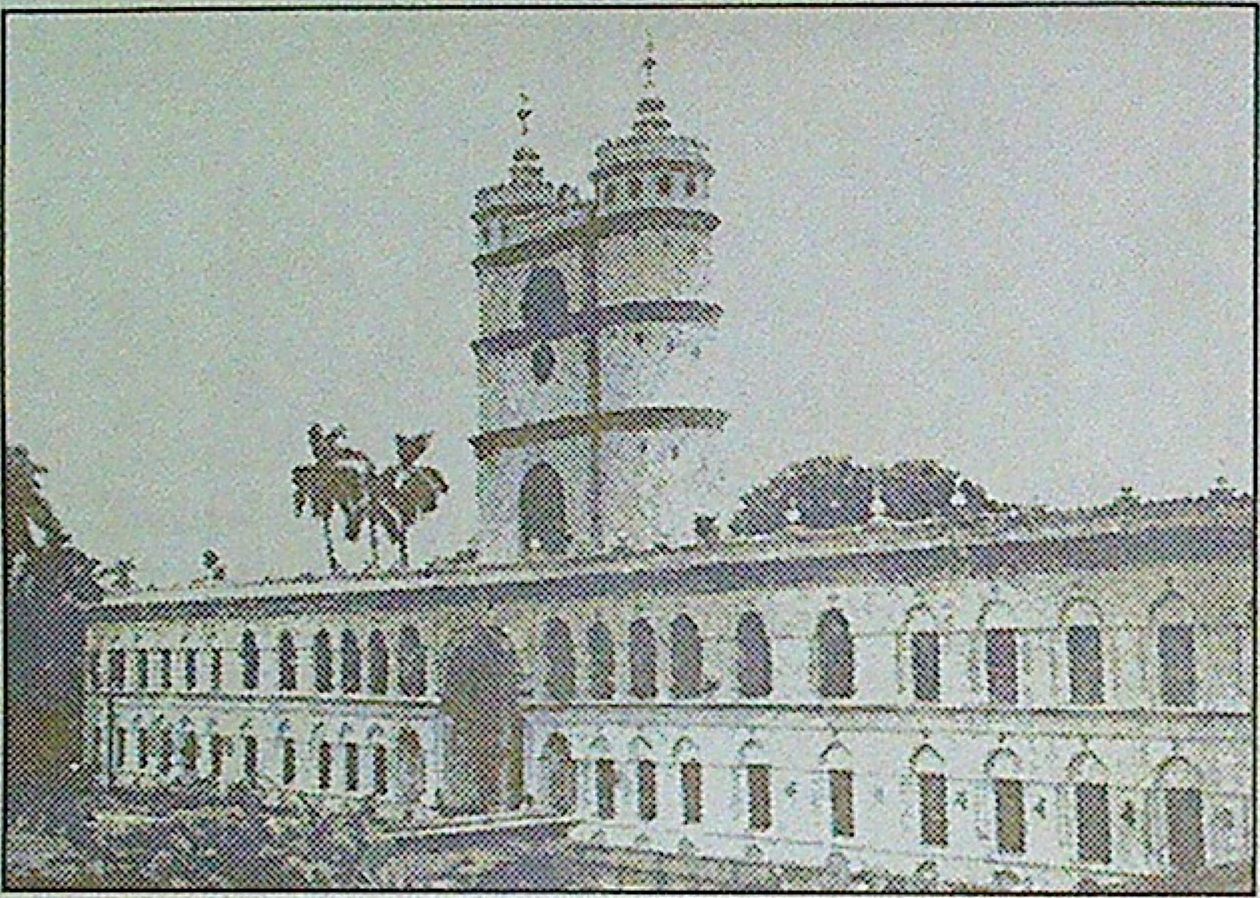


৫০. তেরো চূড়া হংসেশ্বরী মন্দির (১৮১৩) - বাঁশবেড়িয়া

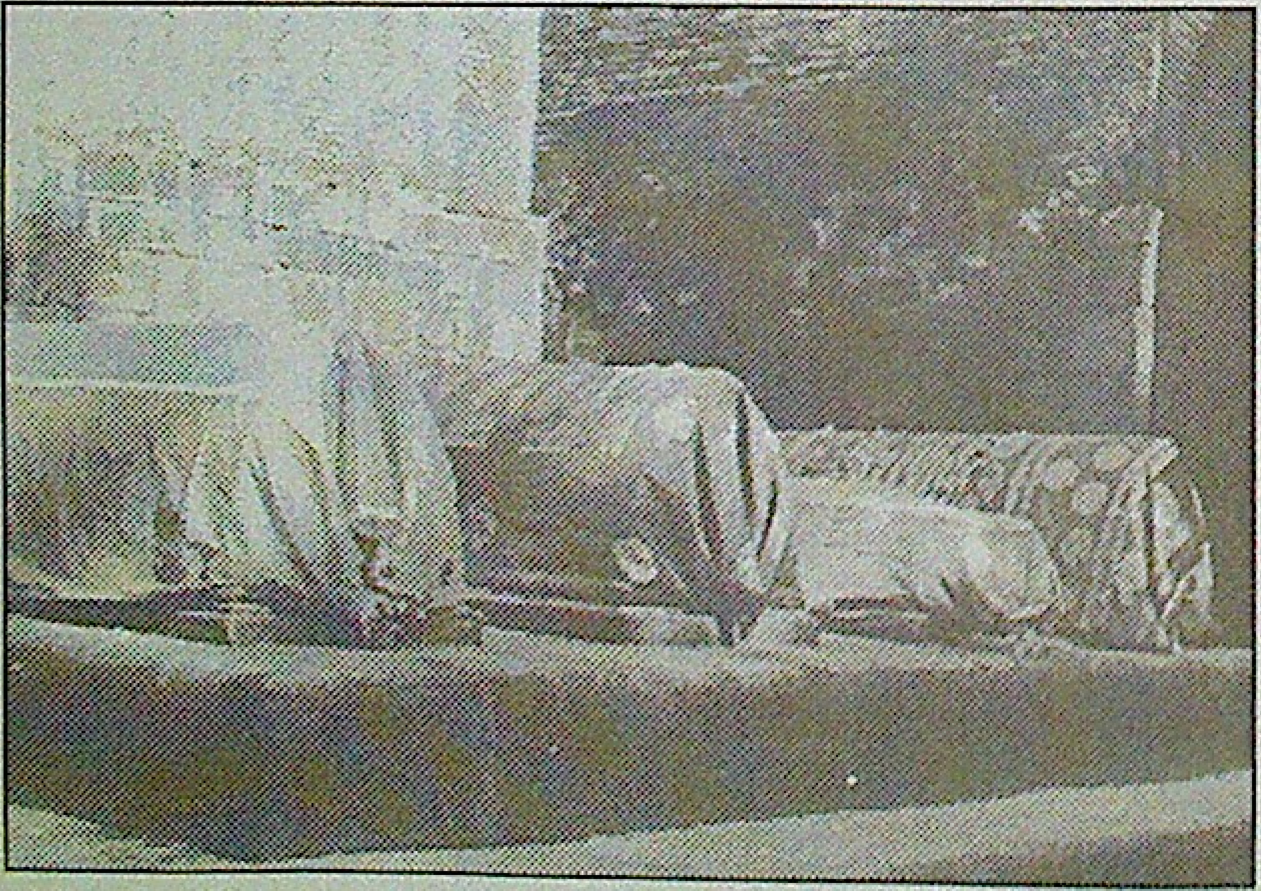


৫১ আটচালা রাধাগোবিন্দ মন্দিরের (১৭৮৬) টেরাকোটা চামুণ্ডা কালীমূর্তি - আঁটপুর

হুগলি : প্রত্নসম্পদ



৫২. ইমামবাড়া - হুগলি | হুগলি : প্রত্নসম্পদ



৫৩. জাফর খাঁ গাজীর কবর, ত্রিবেণী | হুগলি : প্রত্নসম্পদ (সংযোজন)



৫৪. শ্রীপুর গ্রামে নৌকো নির্মাণ



৫৫. রঘুনাথ মন্দিরের কাঠের কপাটে উৎকীর্ণ কালীমূর্তি - ভেলিয়া

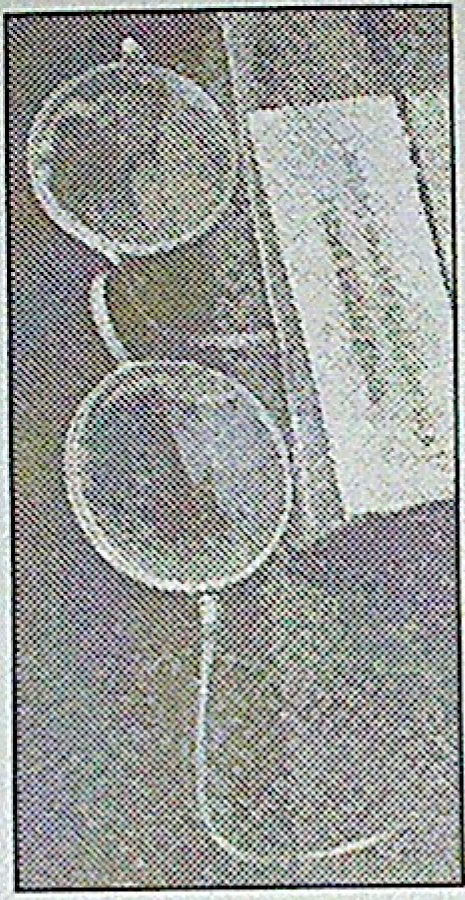


৫৬. ডাকাতে কালী মন্দিরের কপাটে শিবের মাথায় জল ঢালার উদ্দেশ্যে বাঁকবাহী ভক্ত - সিঙ্গুর

হুগলি : কাঠের কাজ

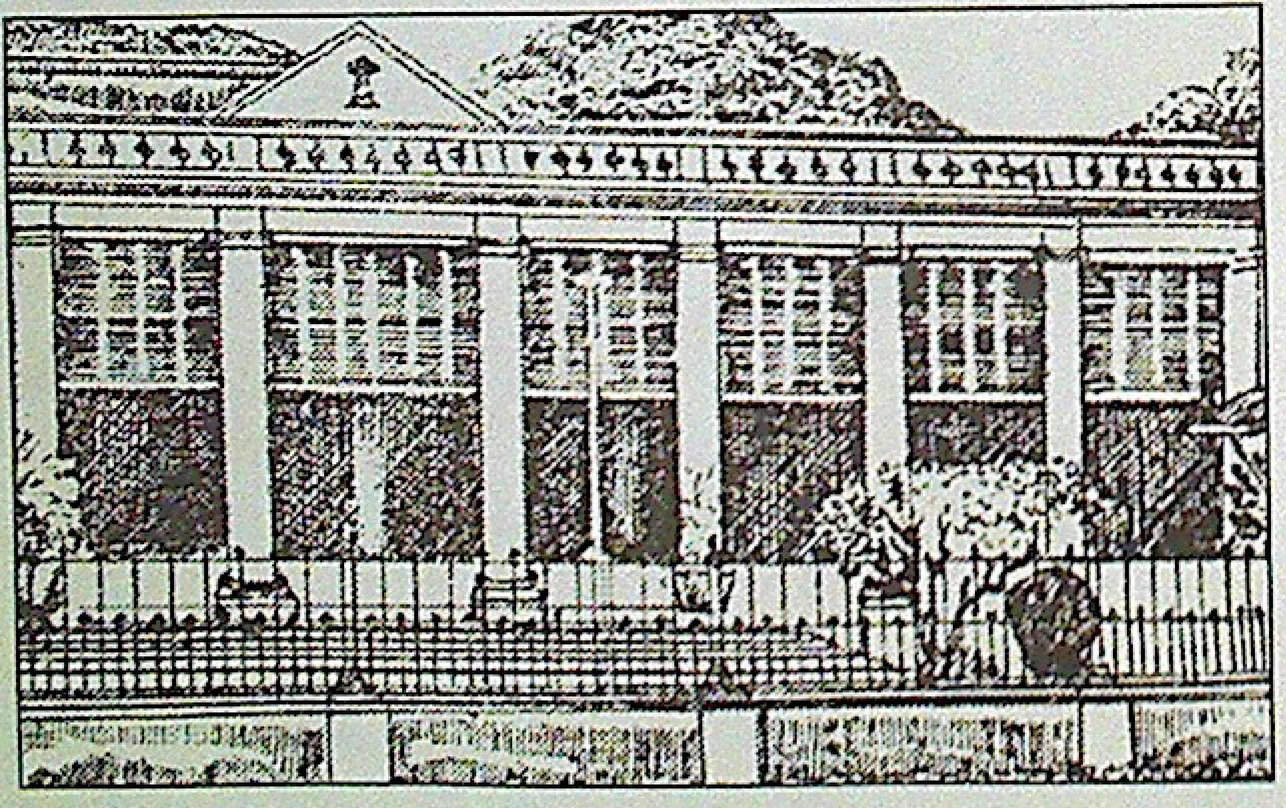


৫৭. বিষ্ণুমূর্তি

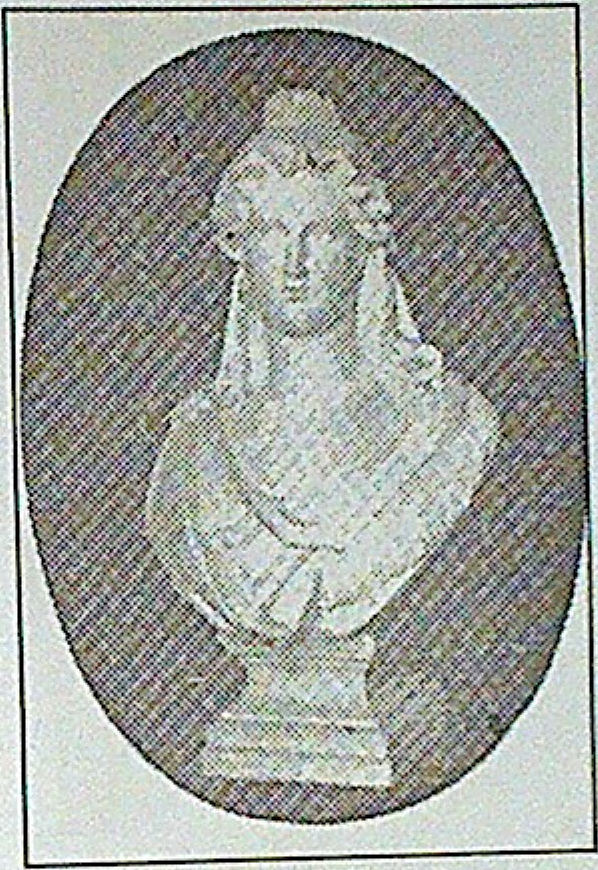


৫৮. শহিদ কানাইলাল দত্তের চশমা

হুগলি : সংগ্রহশালা



৫৯. ইনস্টিটিউট দ্য চন্দননগর হুগলি : সংগ্রহশালা



৬০. ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রতীক



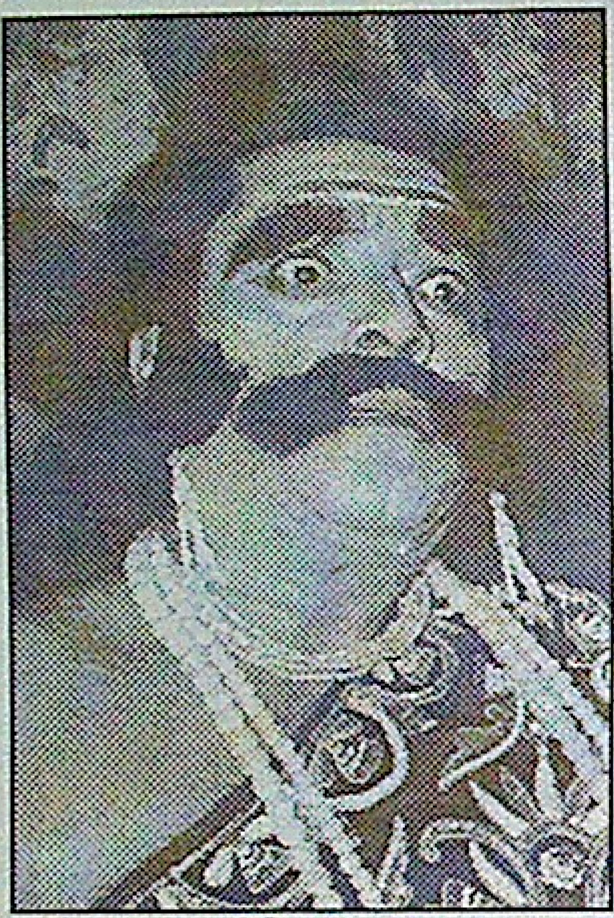
৬১. জোসেফ ফ্রাঁসোয়া দুপ্লে (১৬৯৬ - ১৭৬৩)

হুগলি : সংগ্রহশালা



৬২. শরৎ সংগ্রহশালা, দেবানন্দপুর

হুগলি : সংগ্রহশালা



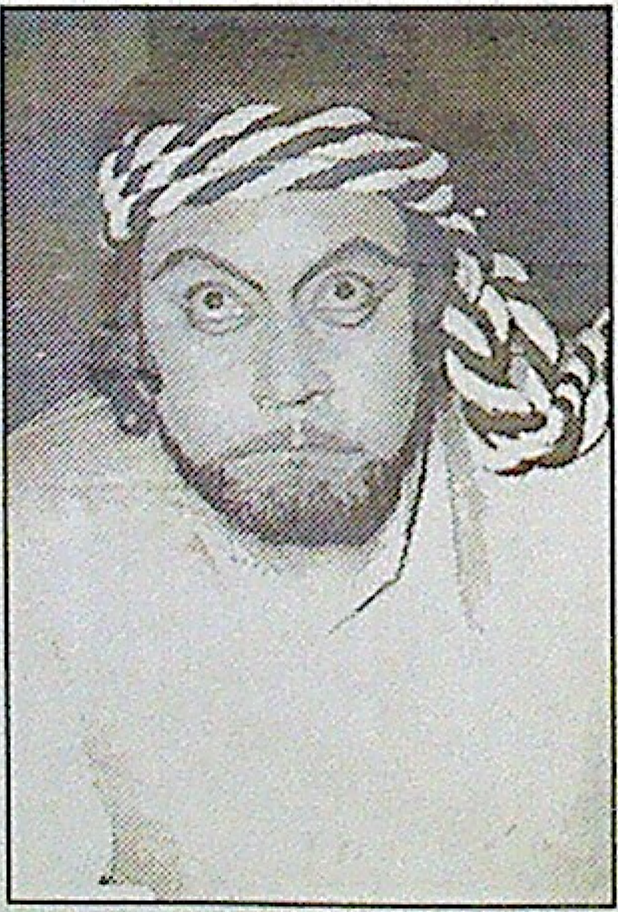
৬৩. দিলীপ চট্টোপাধ্যায়



৬৪. রাধারমণ পাল

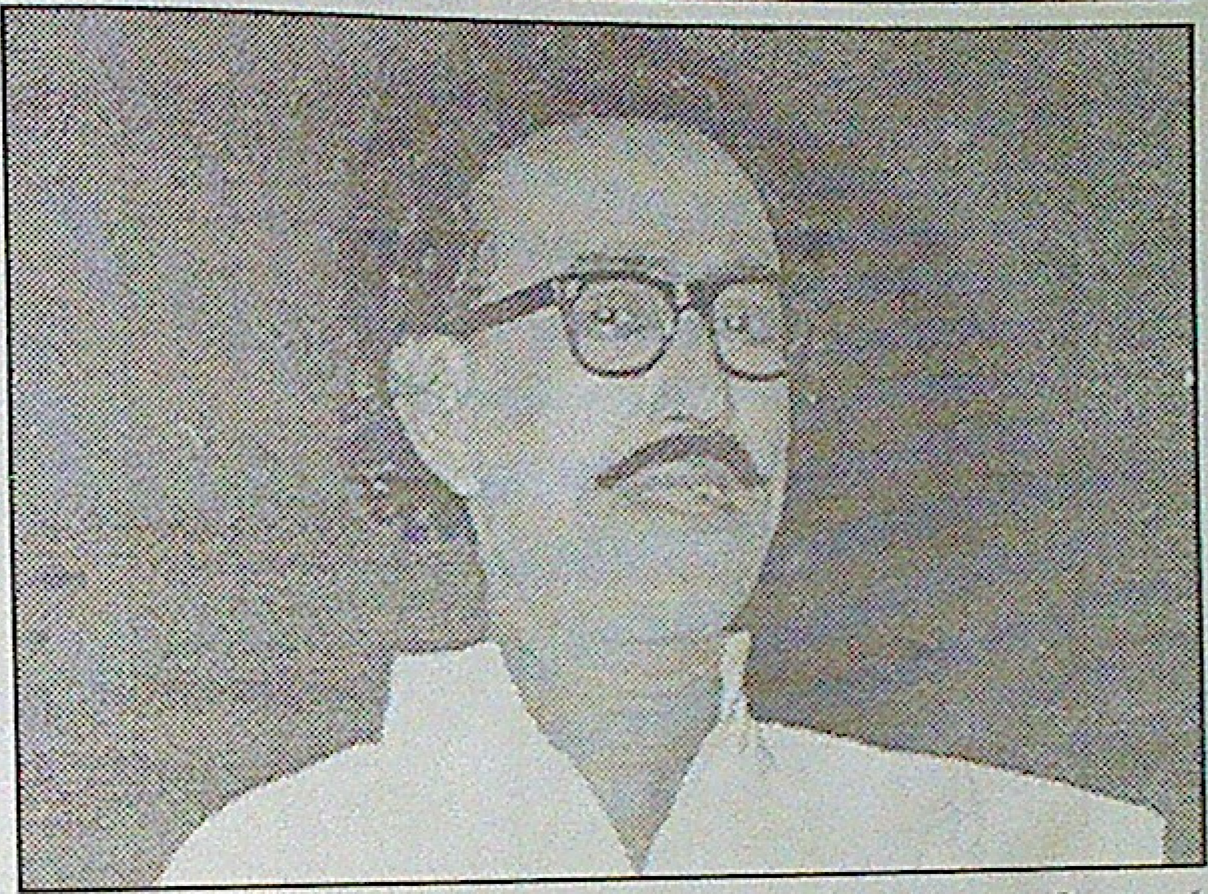


৬৫. নির্মল মুখোপাধ্যায়

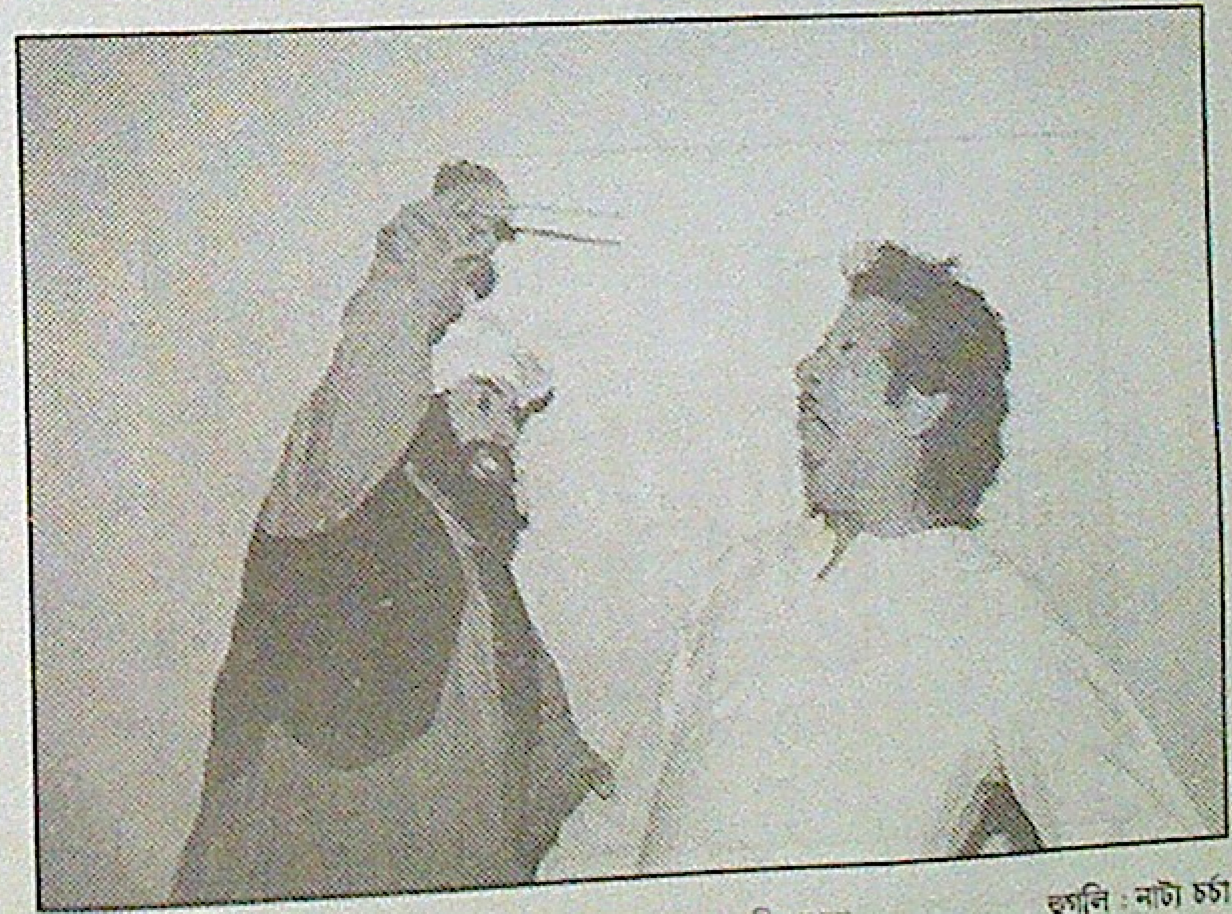


৬৬. পান্না চক্রবর্তী

হুগলি : যাত্রা চর্চা



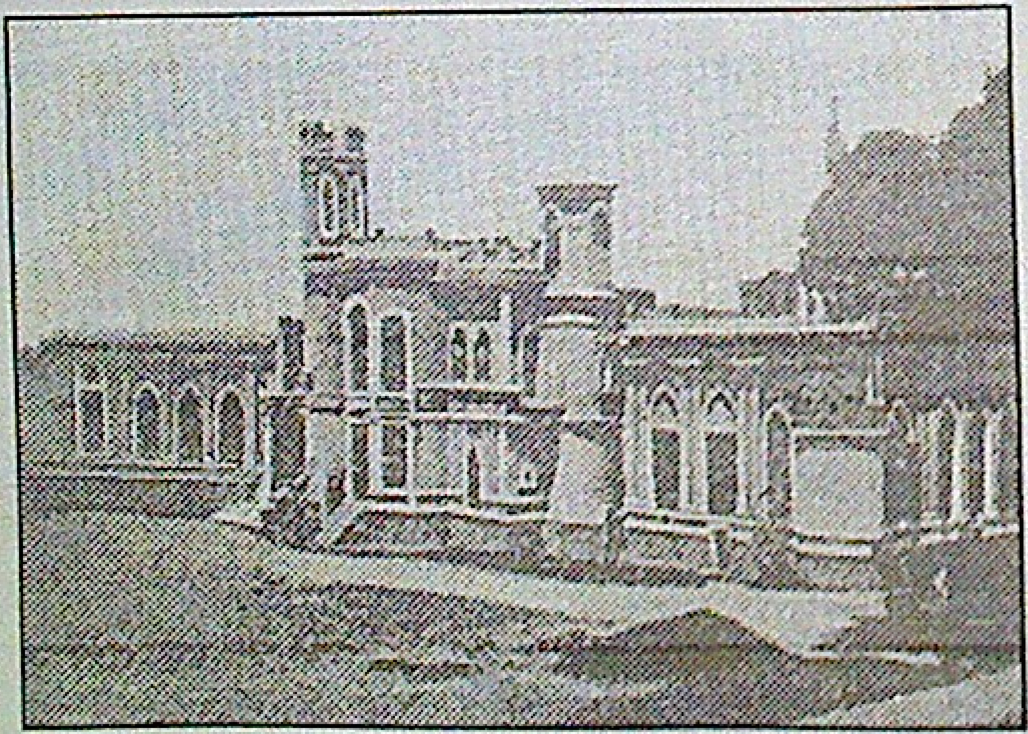
৬৭. আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলি : যাত্রা চর্চা



৬৮. মির্জা মহম্মদ আলি ও অজয় মজুমদার - রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা হুগলি : নাট্য চর্চা



৬৯. গাজন উৎসব : লোহার শলা দিয়ে জিভ ছিদ্র করার প্রথা হুগলি : লোকসংস্কৃতি



৭০. অধুনালুপ্ত মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি, গোন্দলপাড়া হুগলি : সাহিত্যগৌরব



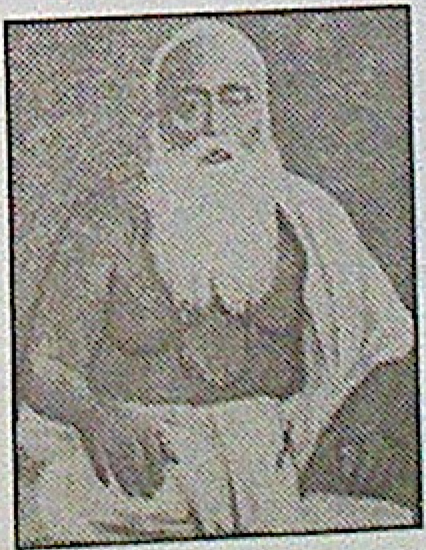
৭১. বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি : বি হাডসন



৭২. উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



৭৩. রামগোপাল ঘোষ



৭৪. অক্ষয়চন্দ্র সরকার

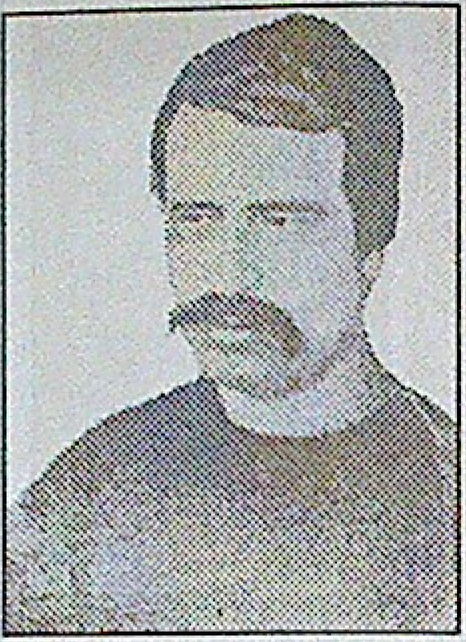


৭৫. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হুগলি : সাহিত্যগৌরব



৭৬. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়



৭৭. ভূদেব মুখোপাধ্যায়



৭৮. ইন্দিরা দেবী



৭৯. সুধীর কুমার মিত্র

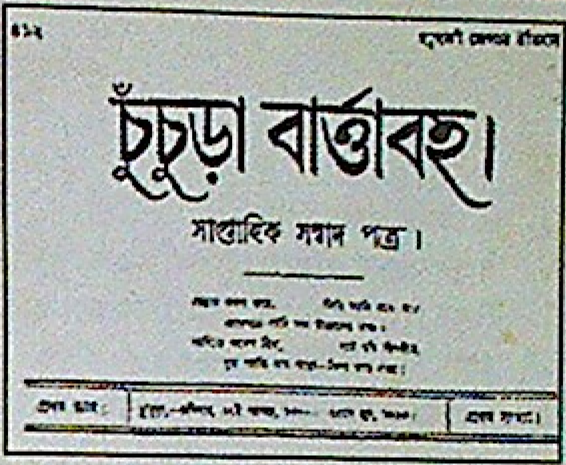


৮০. রাজা রামমোহন রায়

হুগলি : সাহিত্যগৌরব



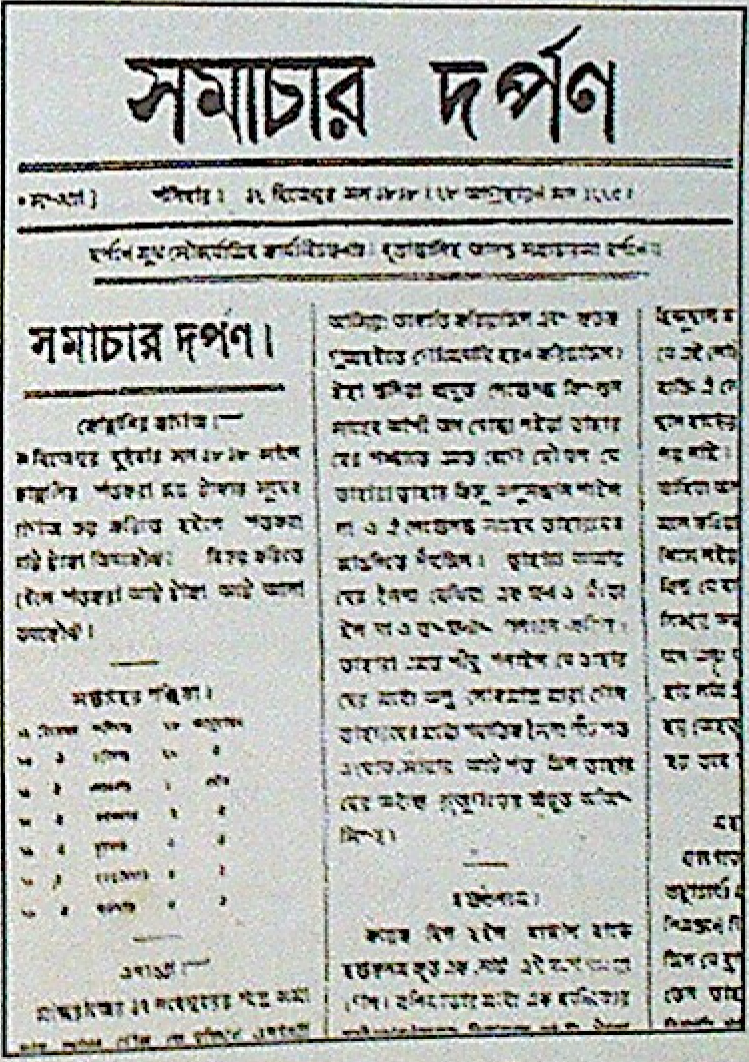
৮১. প্রদর্শনীতে সাহিত্য-সেতু



চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র।

৮২. চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ (প্রাচীন পত্রিকা)



সমাচার দর্পণ

সমাচার দর্পণ।

৮৩. সমাচার দর্পণ (প্রথম পত্রিকা)

হুগলি : বাংলা সাময়িকীর সূতিকাগার

লেখক পরিচিতি

- ড. বসন্ত কুমার সামন্ত

  হুগলি মহসীন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। গণিত শাস্ত্রে পি. এইচ. ডি. হলেও ইতিহাস ও সাহিত্যের উপর ত্রিশতাধিক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন। মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা আট। তাঁর ছদ্মনাম ঋতুরাজ সেনাপতি। প্রয়াণ : ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯।

- ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

  কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। ইংরাজী ও বাংলায় গবেষণাধর্মী গ্রন্থের সংখ্যা ২৭। সম্পাদিত গ্রন্থ ৪টি। তাঁর শেষ বই পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'হুগলী জেলার পুরাকীর্তি'। প্রয়াণ : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০১।

- শিশির দে

  বহু তথ্যমূলক প্রবন্ধের লেখক। অজস্র ভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরের মনস্বী চিন্তকের সাহচর্য লাভে ধন্য। তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ : বঙ্গীয় রেনেসাঁসের নির্মিতি পর্বে মিশনারিদের অবদান এবং Advent of Modernism in Bengal in 18th to 19th Centuries.

- অমলেন্দ্রনাথ ঘটক

  বহু প্রবন্ধের রচয়িতা। চারখানি বই আছে। ছোট বড় প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন এবং এখনও লিখে চলেছেন গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ। বহু পুরস্কারে পুরস্কৃত। আকাশবাণীর গল্প কথক ছিলেন। স্কুল শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়ে পুরোপুরি লেখাতে আত্মনিয়োগ করে রয়েছেন।

- বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

  চন্দননগর গভ. বি. এড. কলেজে অধ্যাপনা করেন। ইতিহাসের উপর নানা প্রবন্ধের রচয়িতা। তাঁর গবেষণার বিষয় : চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান।

- নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায়

  চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় লেখালিখির জগতে প্রবেশ। এ পর্যন্ত গোটা যাটেক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। উনি একজন তাম্রপত্র প্রাপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী। বহু সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। সমাজসেবার জন্য রাষ্ট্রপতি পদক লাভ করেন।

- অনন্তদেব মুখোপাধ্যায়

  পশ্চিমবঙ্গের বহু পত্র-পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ, রম্যরচনা এবং দেশ বিদেশের অনুবাদ গল্প প্রকাশিত হয়েছে।

- অনিল কুমার দত্ত

  পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম একজন দক্ষ গ্রন্থাগারিক। দীর্ঘ ২৭ বছর হুগলি জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ ও এশিয়াটিক সোসাইটিতেও গ্রন্থাগারিক ছিলেন। হুগলি জেলা গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ২২ বছর রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোমের গ্রন্থাগার বিভাগের পার্টটাইম অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছেন। গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বহু পুস্তিকা স্মরণিকার সম্পাদক। এ বিষয়ের উপর তাঁর কয়েকটি বইও আছে।

- ড. দীপকরঞ্জন দাস

  কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে কর্মরত অধ্যাপক। মন্দির স্থাপত্য বিষয়ে গবেষণায় রত। বাংলা, বিহার, ওড়িশার মন্দির স্থাপত্যের উপর ইংরাজীতে ৩টি বই আছে।

- **ভূপতিরঞ্জন দাস**

ভ্রমণ সাহিত্যের এক সার্থক লেখক। ভ্রমণের উপর তাঁর ১২টি বই আছে। জীবনও তাঁর বিচিত্র। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে খুলনার দৌলতপুরে সাধু বেশধারী এক ব্রিটিশ গোয়েন্দাকে বস্তায় বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দিয়ে দেশ ছেড়ে একা চলে যান কেদার বদ্রী। তারপর বেশ কয়েকবার ঘোরেন ছোটবড় বহু জায়গায়। তাঁর এইঘোরার অভিজ্ঞতা সম্বল করে তিনি বহু ভ্রমণ-কাহিনি লিখেছেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই চার খণ্ডে — 'তীর্থপতি শ্রীচৈতন্য'।

- **প্রণব রায়**

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বেসরকারী ও সরকারী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক। অধ্যাপনা ছাড়াও বাংলার পুরাতত্ত্ব, মন্দির-মসজিদ-গির্জা স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক। এই বিষয়ের উপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ৩০০-র উপর প্রবন্ধ লিখেছেন। ৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত। সম্পাদিত গ্রন্থ - মেদিনীপুরের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন - ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। আরও তিন খণ্ড প্রকাশের পথে।

- **তারাপদ সাঁতরা**

ছাত্রজীবনে বিভিন্ন বামপন্থী আন্দোলনে সক্রিয় যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৬তে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের পর পুরাকীর্তি ও লোকসংস্কৃতি চর্চায় নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গিত করেন। এই বিষয়ের উপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছয় শতাধিক প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ষোল। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও হাসপাতালে শুয়েই গবেষণায় এখনও অক্লান্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিউজিওলজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন। তিনি সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস-এ গবেষণায় যুক্ত ছিলেন ১৯৭৩ - ৭৫।

- **শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**

সরকারী কলেজের অধ্যাপক। কলকাতা রবীন্দ্র সদনের প্রাক্তন প্রশাসক-আধিকারিক। সরকারী রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রথম কয়েকটি খণ্ড সম্পাদনা করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইতিহাস ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত। ভারত সরকারের মানব সম্পদ বিভাগের অধীনে ৪গলি জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা ও প্রবন্ধ রচনার বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা রূপে যুক্ত ছিলেন। প্রয়াণ : ২৭শে ডিসেম্বর ২০০১।

- **ড. প্রভাতকুমার দাস**

বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। রবীন্দ্রভারতী থেকেই স্নাতকোত্তর এবং পি. এইচ. ডি.। গবেষণার বিষয় : পেশাদার যাত্রা। বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেশ কয়েকটি গবেষণাধর্মী বই প্রকাশিত হয়েছে। বহুরূপী পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক। বাংলা আকাদেমি, নাট্য আকাদেমি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য।

- **ড. প্রমোদ মুখোপাধ্যায়**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা। 'বাঙলা অনুবাদ নাটক' বিষয়ে গবেষণা পত্রের জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। যৌবনে ভারতীয় গণ নাট্যসংঘ, বহুরূপী, লোকরঞ্জন শাখায় অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন এবং নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ও শম্ভু মিত্রের সান্নিধ্য লাভ করেন। আবৃত্তি এবং নাটকের উপর দুটি বই আছে। প্রয়াণ : ৩ জুন ২০০২।

- **ডা. অসিত দত্ত**

পেশায় চিকিৎসক হয়েও সংগীত ও সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত। সংগীত তাঁর জীবনের চলার ছন্দ। তিনি নিজে একজন গায়ক এবং বছরে কয়েকটি সংগীতের আসর অনুষ্ঠিত হয় তার ব্যবস্থাপনায় শ্রীরামপুরে। সংগীতের উপর বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। শুধু সংগীত নয়, ছড়া কবিতা, রম্য রচনার উপর প্রায় নয়-দশ খানি বই রয়েছে। 'অভিজান' নামে একটি ছোটদের পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

- **বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়**

  সাহিত্য-সেতু পত্রিকার পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য। সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি অগাধ টান। নিজে সংগীত চর্চা না করলেও সংগীত পরিমণ্ডলে মানুষ।

- **অজয় মিশ্র**

  চলচ্চিত্রের উপর গবেষণাধর্মী বহু প্রবন্ধের লেখক। সত্যজিৎ রায়-এর উপর গবেষণাধর্মী পুস্তক 'সিনেমা সংকেত সত্যজিৎ' লিখে বি. এফ. জে. এ. পুরস্কার পান। এ ছাড়া চলচ্চিত্রের উপর আরো তিনটি বই আছে। চলচ্চিত্র বিষয়ক একটি পত্রিকা 'চিত্রধ্বনি' কিছুদিন সম্পাদনা করেন। বাঁশবেড়িয়া সিনে সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা। এ ছাড়া সাহিত্য-সেতু পরিচালক মণ্ডলীর অন্যতম সক্রিয় সদস্য।

- **বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়**

  ইনি একজন খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক ও গবেষক। লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। পুস্তক সংখ্যা ৯। আকাদেমি অব ফোকলোর পুরস্কার সহ বহু পুরস্কারে ভূষিত। গবেষণার জন্য দুটি বৃত্তিও পেয়েছেন। কর্মসূত্রে এশিয়াটিক সোসাইটি ও ভারতীয় ভাষা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেছেন। যৌবনে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

- **অরুণ মুখোপাধ্যায়**

  প্রবন্ধ ও গবেষণাধর্মী নিবন্ধ লিখতে সিদ্ধহস্ত। ইতিমধ্যে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ব্যবসায়িক অব্যবসায়িক সব ধরণের পত্রিকায়। প্রাচীন পাঠাগারগুলিকে নিয়ে এক ইতিবৃত্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এক নামি সাপ্তাহিকে। এখন লিখছেন বাংলার মিউজিয়ামকে নিয়ে। নামে ছদ্মনামে বহু পুস্তকের আলোচনা, সংবাদ পরিবেশন করে চলেছেন। প্রখ্যাত লেখকদের স্ত্রীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত 'আমার স্বামী' তাঁর প্রথম গ্রন্থ। বাণী বসুর সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন 'সেরা লেখিকাদের সেরা গল্প'।

- **ডা. জগবন্ধু কুণ্ডু**

  সাহিত্য-সেতু পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমানে সম্পাদক। নানা প্রবন্ধ ও আলোচনা লিখে থাকেন স্বনামে এবং ছদ্মনামে। তিনি জেলার পত্র-পত্রিকা ও লেখক লেখিকাদের নিয়ে একটি কাজে হাত দিয়েছেন। হুগলি জেলা পত্র-পত্রিকা সম্পাদক সমিতির সহসভাপতি। দেশ ও বিদেশ থেকে কিছু পুরস্কার ও সম্বর্ধনা লাভ করেছেন।

- **পীযূষকান্তি সিন্‌হা**

  বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি (শহর গ্রন্থাগার)-র গ্রন্থাগারিক। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মিত লেখক এবং সাহিত্য-সেতু পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য।

- **সন্দীপ দত্ত**

  কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা। লিটল ম্যাগাজিনই তাঁর প্রাণ। এ ব্যাপারে বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায় এবং ভারতের বহু রাজ্যে ঘুরেছেন। সাম্প্রতিক লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার। আজ পর্যন্ত প্রায় গোটা দশেক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। লাইব্রেরি থেকে চারটি পত্রিকা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রকাশিত হয়, সেগুলির মূল সম্পাদনার দায়িত্বও তাঁর।

- **অশোক উপাধ্যায়**

  পারিবারিক কারণে প্রথাগত শিক্ষায় বেশিদূর এগোতে না পারলেও দীর্ঘদিন বাংলা বই ও সাময়িক পত্র ঘাঁটাঘাটির সূত্রে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পঞ্জি প্রণয়ন, সম্পাদনার কাজে ব্যাপৃত। বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদন করেছেন। বর্তমানে সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং-এর হয়ে বাংলা ভাষায় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব চর্চা বিষয়ে লেখক ভিত্তিক ও জেলা ভিত্তিক প্রবন্ধ পঞ্জি প্রণয়নের বিশাল প্রকল্পে ব্যস্ত। আসল নাম দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

সারণি - ১

(১) ক্রমিক সংখ্যা	(২) গ্রন্থাগারের নাম ও স্থান	(৩) প্রতিষ্ঠাকাল	(৪) সদস্য সংখ্যা	(৫) দৈনিক গ লেনদেন
১)	প্রবর্তক সংঘ (গ্রন্থাগার, চন্দননগর)	১৯৩০	৪৯৭	৩৫
২)	চন্দননগর পুস্তকাগার	১৮৭৩	৬৬৬	৮৫
৩)	শিবশঙ্কর পুস্তকাগার, (চন্দননগর)	১৯১৯	৭০	৬
৪)	হুগলী পাবলিক লাইব্রেরি, (চুঁচুড়া)	১৮৫৪	৬১	১০০ (উপ
৫)	প্রগ্রেসিভ ইউনিয়ন, ব্রিটিশ চন্দননগর	১৯১৯	৩০	৫
৬)	তিলক লাইব্রেরি ভাণ্ডারহাটি	১৯২৩	১৯	৮ (সন্ধে লেনদে
৭)	দশঘরা (এসোসিয়েশন) লাইব্রেরি	১৯১৭	১৫০	১৫
৮)	[illegible]			

(১১) গ্রন্থসূচী	(১২) বিভাগ সমূহ			
	লেনদেন (L)	শিশুবিভাগ (C)	রেফারেন্স (R)	সংবাদ পত্র পাঠকক্ষ (N)
আখ্যা বর্ণানুক্রমিক	L		R	N
আখ্যা বর্ণানুক্রমিক, পরিগ্রহণ তালিকা	L			
পরিগ্রহণ তালিকা	L			
বিষয়, পরিগ্রহণ তালিকা	L	C	R	N
পরিগ্রহণ তালিকা, আখ্যা, বর্ণানুক্রমিক	L		R	N
লেখক বর্ণানুক্রমিক, আখ্যা বর্ণানুক্রমিক	L		R	N
লেখক, বর্ণানুক্রমিক, আখ্যা বর্ণানুক্রমিক	L			N
আখ্যা বর্ণানুক্রমিক	L	C		N
লেখক, আখ্যা, বিষয়	L	R		N
বিষয়ের অধীন পরিগ্রহণক্রম	L	R		N
	L	C	R	N

...গত শিক্ষায় বেশিদূর এগোতে ... বাংে ?

